মোহিতলাল
মজুমদারের
কাব্যসংগ্রহ

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংগ্রহ

ভবতোষ দত্ত
সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

ভূমিকা

কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর যে-কবিতাগুলিকে রক্ষণযোগ্য মনে করেছেন, শুধু সেগুলিকেই তাঁর সাতখানি কাব্যগ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে নিয়ে লেখা এই সনেটগুলি—একটি ছাড়া আর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় নি। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' মুদ্রিত হয় ১৯২২ সালে। কবির জীবদ্দশায় এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় : ১৯৪২ সালে—এই সংস্করণে সাতটি নতুন কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। সেইসঙ্গে পূর্ববর্তী 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' কাব্যে মুদ্রিত ১২ সংখ্যক কবিতাটি গৃহীত হয় 'দেবেন্দ্রনাথের সনেট' নামে। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী'র প্রকাশ ১৯২৭ সালে—কবির জীবদ্দশায় এর আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'স্মর-গরল' প্রকাশ পায় ১৯৩৬ সালে। কবির জীবদ্দশায় এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়—কিন্তু কোনো নতুন কবিতা তাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্ত-গোধূলি'র প্রকাশ ১৯৪১ সালে। কবির জীবদ্দশায় এর অন্য কোনো সংস্করণ হয় নি। ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'রূপকথা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে—এতে কয়েকটি নতুন কবিতার সঙ্গে 'বিস্মরণী' থেকে একটি এবং 'হেমন্ত-গোধূলি' থেকে দুটি কবিতা (একটি ভিন্ন নামে) গৃহীত হয়। পরের বছরই এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায়। কবির সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'ছন্দ-চতুর্দশী'র প্রকাশ হয় ১৯৫১। কবির রচিত সনেটগুলি এতে সংগৃহীত—অধিকাংশ কবিতা পূর্ব-পূর্ব গ্রন্থ থেকে গৃহীত। অতিরিক্ত ১৩টি নতুন কবিতা এতে রয়েছে।

এই সাতটি কাব্যগ্রন্থের বাইরে কবির আরও অনেক অগ্রন্থিত কবিতা সাময়িক-পত্রে বিকীর্ণ রয়েছে। বর্তমান কাব্য-সংগ্রহে সেই-সমস্ত অগ্রন্থিত কবিতা যথাসম্ভব সংকলন করা হল। কবির আরও অনেক কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অলক্ষিত থাকাও সম্ভব—সেজন্য বর্তমান সংগ্রহের সম্পূর্ণতা দাবি করা যায় না। তবু এই সংস্করণে আমরা কবির এ-পর্যন্ত সমস্ত সংগৃহীত কবিতাগুলি যথাসম্ভব শৃঙ্খলায় সন্নিবেশ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রকাশকাল উদ্ধারের প্রয়াস করেছি।

এই কাব্যসংগ্রহ সম্পাদনা ও প্রকাশে আমি বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তা পেয়েছি। অধ্যাপক শ্রী কৃষ্ণনাথ মল্লিক অনুগ্রহ করে তাঁর পিতৃদেব শ্রী কুলদাপ্রসাদ মল্লিক-সম্পাদিত 'বীরভূমি' পত্রিকাগুলি দেখতে দিয়েছেন। শ্রী সনৎকুমার গুপ্ত তাঁর মূল্যবান সংগ্রহ থেকে মোহিতলালের বিভিন্ন সংস্করণগুলি দেখতে দিয়ে এবং সে-বিষয়ে তথ্য-সরবরাহ করে এই সংগ্রহটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করতে সহায়তা করেছেন। কল্যাণীয়া

মহুয়া চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়) অনেক কবিতা সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেছেন। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী মণিলাল মজুমদার বইটির প্রুফ দেখা ও সূচিপত্র-রচনায় সহায়তা করেছেন। সেজন্য তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রী গোপীমোহন সিংহরায় মোহিতলালের এই গ্রন্থ প্রকাশে যে উদ্যম দেখিয়েছেন এবং সহায়তা করেছেন—সেজন্য বাঙালি পাঠক মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। ভারবি'র অবেক্ষক শ্রী গোরা সিংহরায় ও শ্রী রবীন্দ্রনাথ মাইতির নামও এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৬ অক্টোবর, ১৯৯৭ — ভবতোষ দত্ত

কবির দশাধিক-শততম জন্মদিবস

শান্তিনিকেতন

সূচিপত্র

মোহিতলালের জীবন ও কবিতা

১৩৪৬ সালের মাঘ মাসের শনিবারের চিঠিতে কবি মোহিতলাল মজুমদারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। মোহিতলাল তখন শনিবারের চিঠির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সম্পাদক সজনীকান্ত দাস তাঁর পরম প্রীতির পাত্র। মোহিতলালের মৃত্যুতে শনিবারের চিঠিতেই সজনীকান্ত সংবাদসাহিত্য বিভাগে মোহিতলালের সাহিত্যজীবন বিবৃত করেন। এই *দুটি প্রবন্ধ থেকেই মোহিতলালের জীবন ও কীর্তির তথ্যগত বিবরণ পাওয়া যায়। এই* দুটি বিবরণ থেকেই মোহিতলালের কবিজীবনের উন্মেষ ও বিকাশের একটা খসড়া তৈরি করে নেওয়া সম্ভব। এই বিবরণ যে মোহিতলালের থেকে পাওয়া সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

তাতে দেখা যাচ্ছে, আমরা কবিরূপে যে মোহিতলালকে চিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যসমুজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত রূপ ফুটে উঠতে থাকে ১৯১৪-র পর থেকে। এ সময়ে তিনি সেটেলমেন্ট বিভাগে কানুনগোর কাজ নিয়ে তিন বছর উত্তরবঙ্গে কাটিয়েছিলেন। তিন বছর পর কলকাতায় ফিরে এলেও তাঁর সেই কবিতারচনার ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯২৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোহিতলালের কবিপরিচয়ই সুজ্ঞাত ছিল। যদিও পরে অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন, তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তখন থেকে তিনি প্রধানত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনাতেই নিবিষ্ট হলেন। পরের কবিতা মূলত আগের কবিতার ভাবধারারই অনুবৃত্তি—বরং বলা যেতে পারে, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ক্লান্তির আভাস পাওয়া যায়। তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্ত-গোধূলি'র নামে তার পরিচয়।

এই যুগের আগেও মোহিতলাল কবিতা লিখেছেন—সে-সব কবিতার তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি হঠাৎ কবি হয়ে ওঠেন নি। তাঁর জীবনকথা যেটুকু জানি, তাতে এই ধারণাই হয় যে, কবিতা ছিল মোহিতলালের রক্তের সংস্কারের মতো। কবিতার প্রতি অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব নন্দলাল মজুমদারের থেকে। মোহিতলাল অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন, এ বিষয়ে তাঁর যদি কিছুমাত্র যোগ্যতা জন্মে থাকে, তবে সেজন্য তিনি তাঁর পিতার কাছেই ঋণী। পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট-জ্ঞাতিভ্রাতা, আর মাতা হেমমালা দেবী ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশের এক শাখার কন্যা। মোহিতলালের জন্ম ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে (১২৯৫ সালের ১১ কার্তিক)। তাঁর পৈতৃক নিবাস এবং মাতুলালয় কাছাকাছি। হুগলী জেলার বলাগড় তাঁর পৈতৃক নিবাস আর নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ছিল মাতুলালয়। মোহিতলালের কৈশোর ও স্কুলজীবন বলাগড় গ্রামেই কাটে। 'পিতার অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য তিনি বাল্যকালে কিছুদিন মায়ের মাতুলালয় হালিশহরে থাকিয়া সেখানকার হাই-স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে স্বগ্রাম বলাগড় স্কুলে পাঁচ বৎসর পড়িয়া ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন।'

কলকাতার মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশনে চার বৎসর পড়ে ১৯০৮ সালে বি. এ পাস করেন। ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তৃতীয় বিভাগে।[১] বি. এ পরীক্ষায় তাঁর অনার্স ছিল না। এ কথা এখানে উল্লেখ করবার তাৎপর্য এই যে, মোহিতলাল ছাত্র হিসাবে কৃতী না হলেও সাহিত্যসমালোচনা ও রসবিশ্লেষণে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে তাঁকে স্মরণীয় করেছে—এই ঘটনাটি যে প্রণিধানযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। মোহিতলাল সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এম. এ পড়তেও পারেন নি। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষা দিবার বাসনা তাঁহার অনেকদিন ছিল, তিনি পড়া ছাড়েন নাই। এই সময়ে তখনকার কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-র সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে মোহিতলালের যে অধিকার জন্মে, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনে তাহাতে তিনি বিশেষ লাভবান হইয়াছেন।' সুশীলকুমার ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষা দিলেও সংস্কৃত তাঁর বিশেষ চর্চার বিষয় ছিল। ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব মোহিতলালের কাব্যে যে প্রবলভাবেই পড়েছিল, তার সূত্র ছিল সুশীলকুমার দে-র সঙ্গে এই সময়ের বন্ধুত্ব। দুজনের বন্ধুত্ব আজীবন অটুট ছিল। মোহিতলাল তাঁর 'স্মর-গরল' কাব্যখানি সুশীলকুমারকেই উৎসর্গ করেন।

অবশ্য ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা ছাড়াও তাঁর কাব্যপ্রীতি স্বাভাবিক ভাবেই নানা ভাবে পোষকতা পেয়েছিল। গ্রামের থেকে কলকাতায় পড়তে আসার কিছুদিনের মধ্যেই কবি করুণানিধানের সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় ঘটে। সে-ও আকস্মিক ভাবেই। মোহিতলালের মৃত্যুতে লেখা 'লক্ষ্মণ-তর্পণ' কবিতায় করুণানিধান স্মৃতিচারণ করে বলেছেন,

> আমার দুয়ার পথে কতবার আসিতে যাইতে
> মুচুকুন্দ-তরুছায়ে ধূলামাখা ফুল কুড়াইতে ;
> "ফুল ভালবাস ভাই?' —শুধাইনু অচেনা তোমায়,
> হাসিমুখে নত-চোখে পশিলে আমার আঙিনায়।

করুণানিধানই মোহিতলালকে কলকাতার নানা সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে নিয়ে যান। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়-সম্পর্ক ছিল। সেদিক দিয়েও সেকালের সাহিত্য-সমাজে তিনি যাতায়াত করার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিলেন। করুণানিধান মোহিতলালকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনের সাহিত্যিক আড্ডাতেও নিয়ে গিয়েছেন। তখন মোহিতলালের বয়স ষোলো সতেরো। এখানে আসতেন 'ভারতী', 'মানসী' 'সাহিত্য' 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'যমুনা' 'অর্চনা' প্রভৃতি সেকালের সুপরিচিত সাহিত্য পত্রিকার লেখকগণ। প্রবীণদের মধ্যে সেখানে দেখা যেত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল, বনোয়ারিলাল গোস্বামী, ব্যোমকেশ মুস্তফী, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে। মোহিতলাল এঁদেরই সান্নিধ্যে এবং স্নেহে কাব্যসাহিত্যের অনুকূল আবহাওয়া পেয়েছিলেন। ১৯১০-এ তালতলা স্কুলের তরুণ শিক্ষক মোহিতলালের ছাত্র পরবর্তীকালে সুপরিচিত লেখক শ্রী নীরদ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'It was reported that he moved in literary circles and contributed to magazines.

১ Calcutta University Calender 1907. p. 422। ১৯০৬-এর পরীক্ষার ফল।

এই কবি-সাহিত্যিকদের মহলে তরুণ মোহিতলালের যাতায়াত ছিল। এই সময় থেকেই র্থাৎ সম্ভবত ১৯০৭ অথবা ১৯০৮ থেকেই তিনি কবিতা লিখতে থাকেন। এ সময়ে লখা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোহিতলালের সর্বপ্রাচীন কবিতা 'স্বর্গারোহণে'। কবিতাটি লেখা য়েছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রয়াণে (২৭ অক্টোবর ১৯০৭)। এটি মুদ্রিত হয়েছিল 'সন্ধ্যা' ?) পত্রিকায় ১৯০৭ সালে, ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পরেই।[২]

মোহিতলাল যখন বি.এ ক্লাশের ছাত্র তখন থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি কবিতা ও গদ্য চনা লিখতেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকার ১৩১৫ কার্তিক সংখ্যায় মাহিতলালের সনেট 'বিজয়া-দশমী' ছাপা হয়েছিল। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাণী' (অগ্রহায়ণ, ৩১৭) পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'বিফল' নামে একটি কবিতা। এ ছাড়া তাঁর অনেকগুলি লেখাই বরিয়েছিল ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মানসী'তে। মানসী তখন সদ্য প্রকাশিত। মানসীতে মাহিতলালের এই কবিতাগুলি বেরিয়েছিল— সুন্দর (আষাঢ় ১৩১৬), মন্দির-পথে (পৌষ ১৩১৬), মকেতু (বৈশাখ ১৩১৭), নির্মাল্য (ফাল্গুন ১৩১৭), তন্দ্রাতুর (বৈশাখ ১৩১৮), সূর্যাস্ত (শ্রাবণ ৩১৮), আলোজ্বালা (মাঘ ১৩২০)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'তুমি' নামে একটি গদ্য উচ্ছ্বাস বরিয়েছিল চৈত্র ১৩১৫-তে। আবার 'আমি' নামে আর একটি অনুরূপ রচনা বেরিয়েছিল পৌষ ৩২১। পাঠকরা স্মরণ করবেন, এই 'আমি' রচনাটি থেকে নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন বলে মোহিতলাল মনে করতেন।

১৯১৪-তে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে মানসীর এই লেখাগুলি ছাড়া কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন-সম্পাদিত বীরভূমি (নবপর্যায়) পত্রিকাতে মোহিতলালের এই কবিতাগুলি বরিয়েছিল—পদ্মফোটা (অগ্রহায়ণ, ১৩১৭), মানসিক (পৌষ ১৩১৭), প্রসাদ (মাঘ ১৩১৭) শ্রাবণে (শ্রাবণ ১৩১৮), শেষ গান (ভাদ্র, ১৩১৮), অভিসারিণী (অগ্রহায়ণ ১৩১৮) নৈবেদ্য (পৌষ ১৩১৮), ভীষণমধুর (মাঘ ১৩১৮), বসন্তের চিঠি (চৈত্র, ১৩১৮)।

১৯১০-এ মোহিতলাল তালতলা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন। এখানেই নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে তনি ছাত্ররূপে পেয়েছিলেন। এখান থেকেই তিনি সরকারী জরীপ বিভাগে কানুনগোর কাজ নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে যান। সেখানে কয়েক বছর থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, তাতে তাঁর পরবর্তী কবিতার বিশিষ্ট প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা তিনি কোনো গ্রন্থেই রক্ষা করেন নি। আজ সেগুলিকে বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় পত্রিকা থেকে খুঁজে নিতে হচ্ছে।

বস্তুত যে-বৈশিষ্ট্যের জন্য মোহিতলাল কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর প্রথম যুগের কবিতায় তার চিহ্নমাত্র নেই। এ সব কবিতার মধ্যে তার কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে নি। বিষয় হিসাবেও তার মধ্যে বিশেষত্ব নেই। তবে উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় যে গার্হস্থ্য বা সংসারচিত্র, নীতিপ্রবণতা, দেশচেতনা অথবা সুলভ আবেগোচ্ছ্বাস দেখা যেত, মোহিতলালের এ-সব কবিতায় তা নেই। বরং ক্বচিৎ মুগ্ধতা, সৌন্দর্যবোধের চকিত উদ্ভাস, প্রকৃতির কোনো একটি রূপ, কখনও আত্মমগ্ন চিন্তা—এ সবই লক্ষ্য করা যায় তাঁর কবিতায়। মোহিতলাল বলেছেন, তিনি যখন কলকাতার জীবনে প্রবেশ করেন, তখনও রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে

২ কবিতাটি পাওয়া গেছে কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গোটল্‌স্ লাইব্রেরিতে ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ এবং ফাদার টুমস-এর ব্রহ্মবান্ধব-সংক্রান্ত সংগ্রহে। এই তথ্য অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

তাঁর তেমন পরিচয় হয় নি। তখনও মেঘনাদবধ কাব্য, পলাশীর যুদ্ধই তাঁর প্রিয় কাব্য ছিল। হেমচন্দ্রের কবিতাবলীও তিনি পড়তেন। তা হলে মোহিতলালের কবিতায় এই ধরনের অভিনবত্ব কী করে এল। এর দুটি উত্তর হতে পারে। কলকাতায় কবিসমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে ততদিনে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যে কবিতার যে চমৎকারিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা তাঁকে বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। দ্বিতীয় কারণটি ছিল আরও প্রত্যক্ষ। সেটি করুণানিধানের প্রভাব। অনেক দিন পর মোহিতলাল 'কবি করুণানিধানের কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছিলেন।—'তাঁহার কাব্যে প্রধানত কোথাও প্রকৃতির রূপরাশি—শব্দচিত্রে, কোথাও বা সেই রূপসম্ভোগের আনন্দ—ছন্দলীলায় উৎসারিত হইয়াছে।' করুণানিধানের কাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য, কবির আনন্দচেতনা শব্দচিত্রে এবং ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে। মোহিতলালের প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা তাকেই অনুসরণ করেছে বলে মনে হয়। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা-সমৃদ্ধ কাব্যগুলি—সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মোহিতলালের প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনার ঐশ্বর্য, প্রসার, মাধুর্য এবং ভাষাশক্তি কিছুই নেই। তবে এ কথা মনে করা যেতেই পারে, একদিকে ইংরেজি রোমান্টিক কল্পনার দীপ্তি, তার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের কল্পনা মিশে মোহিতলালের কবিমনেও এক ভিন্নতর সৌন্দর্যজগৎ তৈরি করছিল—যা উনিশশতকীয় বাংলা কাব্যের ট্রাডিশন থেকে আলাদা, এবং যার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে আত্মমগ্নতা। ছন্দের দিক দিয়ে মোহিতলাল রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কলামাত্রিক ছন্দ বিশেষ করে ছয় কলামাত্রার ছন্দ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল—এমন কি তিনিই নির্দিষ্ট করে দেন যে, ছয়মাত্রা মিশ্রবৃত্তে কখনও ব্যবহৃত হবে না। ছয়কলামাত্রা সরল কলাবৃত্তেই ব্যবহার্য। তিনি নিজে এই ছন্দে বহু কবিতা লিখেছেন—তখনও বাংলা কাব্যে অন্য কবিরা এই ছন্দ তেমন ব্যবহার করেন নি। এই ছন্দে লেখা মোহিতলালের বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিফল' নামের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতীরে' কবিতার কল্পনাভঙ্গিরও অনুকরণ পাঠক অনুভব করতে পারবেন।—

> অরুণ তখনো উঠে নি উষার কনক উদয়াচলে,
> গুঞ্জনধ্বনি জাগে নি তখনো পূজার বেদিকাতলে।
> একদিন যবে চাহিয়া দেখিনু থরে থরে দীপজ্বালা,
> জনতায় ভরি উঠেছে আমার বিজন পূজনশালা,
> সকলের আগে পূজা দিতে মোর তুলিলাম মালাখানি
> গন্ধচূর্ণ মুঠা মুঠা লয়ে ভরিলাম ধূপদানি।

মোহিতলাল এসময়ে কয়েকটি সনেটও লেখেন। তার মধ্যে একটি সনেট 'ভীষণ-মধুর' (বীরভূমি, ১৯১১) বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। সনেটের গড়ন শেকস্‌পীয়রীয়। তার শেষের দুই পঙক্তিতে মিল। আঠারো মাত্রার মহাপয়ারে মিলের রীতি কখখক গঘঘগ চছছচ জজ। এই সনেটের বিষয় হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুকে নিয়ে মোহিতলাল পরেও একাধিক কবিতা লিখেছেন। মৃত্যু-কল্পনাতে মোহিতলালের যেমন বাস্তববোধ ছিল, তেমনি ছিল গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। কিন্তু এই কবিতাতে মৃত্যুর কল্পনা রোমানটিক—রবীন্দ্রনাথের 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'-এরই মতো।
বস্তুত বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে-ধারার প্রবর্তন করেছিলেন সেই ধারাতেই ছিলেন

করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়। এঁরা মোহিতলালের সামান্য বড়ো অথবা প্রায় সমবয়সী। এঁদের কবিতা এই যুগেই যথেষ্ট প্রচারিত হয়ে রবীন্দ্রযুগের সৃষ্টি করেছে। এঁদের বৈশিষ্ট্য কল্পনার সৌকুমার্য, ভাষা ও ছন্দের মনোরম্যতা। মধুসূদন-হেমচন্দ্র যে কবিতার আদর্শ স্থাপিত করেছিলেন, সেটা এই আদর্শের থেকে আলাদা। অক্ষয়কুমার বড়াল দেবেন্দ্রনাথ সেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী রবীন্দ্রযুগের বা রবীন্দ্রাদর্শের কবি নন। গীতিকবি হিসাবে সার্থক ও স্মরণীয় হলেও রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাছন্দ ও কল্পনার অভিনবত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এঁরা ঠিক তার অনুগামী নন। মোহিতলালের কাব্যচর্চার প্রথম যুগে এই দুই আদর্শের কবিরাই মোহিতলালকে প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য তিনি রবীন্দ্রাদর্শেরই কবি ছিলেন, সে-কথা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেনের বা অক্ষয়কুমার বড়ালের গাঢ়বদ্ধ কাব্যভাষার তিনি অনুরাগী ছিলেন, এ-কথাও সত্য। এই নিষ্ঠার পরিচয় মোহিতলালের পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যে যতখানি প্রকট, প্রথম পর্যায়ের কাব্যে তত প্রকট নয়। তবে সনেটের ঘনপিনদ্ধ শিল্পকলায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের যে সাফল্য ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র হিসাবে মোহিতলাল দেখেছিলেন, তাতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি যে দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেই একগুচ্ছ সনেট রচনা করেছিলেন, সেটাও লক্ষ্য করবার বিষয় অবশ্যই। অধুনা- দুষ্প্রাপ্য দেবেন্দ্র-মঙ্গল কাব্যখানা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে। সেটাই মোহিতলালের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

এই সময়ের একজন বড়ো কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথকে মোহিতলাল নানা সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে দেখে থাকবেন। তাঁর প্রধান কয়েকটি কবিতাগ্রন্থই ১৯১৪-র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। দলবৃত্ত ছন্দে লঘু কল্পনার উচ্ছলতা মোহিতলালকে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। কারণ মোহিতলালের স্বপন-পসারী কাব্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্বপন-পসারীর কবিতাগুলি ১৯১৪-১৫ থেকেই লেখা হতে থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে রবীন্দ্রীয় কল্পনালীলা যেমন ছিল, তেমনি ছিল রবীন্দ্রকাব্য-শিল্পকলার বৈচিত্র্যপ্রবণতা। কাব্যশিল্পে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি উনিশ শতকের কবিরা করেন নি—রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষাশিল্প, ছন্দ এবং রমণীয় সৌন্দর্য-কল্পনার অনুসরণেই করুণানিধান-'কুমুদরঞ্জন'-কালিদাস রায়ের অগ্রণী কবি হয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অবশ্যই এঁদের নিজের-নিজের বিশিষ্টতা স্বীকার্য। এঁদের দিয়েই রবীন্দ্রযুগের সূত্রপাত এবং ভারতীগোষ্ঠীর সৃষ্টি। মোহিতলাল তাঁর কবিজীবনে প্রথমত ছিলেন ভারতী-গোষ্ঠীরই অন্যতম এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর দিশারী। পরবর্তী কালে সত্যেন্দ্রনাথের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়েই মোহিতলাল বাংলা কাব্যজগতে স্মরণীয় হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে মোহিতলাল কবিতা এবং স্মৃতিকথাও লিখেছেন।

মোহিতলালের যৌবনে আর একটি সম্ভাব্য প্রভাবের কথাও উল্লেখ করা কর্তব্য। সম্ভবত এ ব্যাপারটি কেউ তেমন করে ভেবে দেখেন নি। মোহিতলালের কাব্যের একটি প্রধান বিষয় ছিল, মুস্লিম জীবন ও ফার্সি কবিতার জগৎ। করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়—কারো কাব্যেই এই ধরনের বিষয়ের প্রাধান্য ছিল না। তাঁরা বাংলার জীবন পল্লীপ্রকৃতি—এসব নিয়েই কবিতা রচনা করেছেন। এ-সব বিষয় নিয়ে মোহিতলালের কবিতার পরিমাণই বরং কম। কালিদাস রায় বলেছেন—'আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর নিজের রচিত কবিতাগুলির অধিকাংশেই বাংলার নিজস্ব প্রাণধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। আমি এ রহস্যের কোনো সমাধান করতে পারি নি।'

মোহিতলাল নিজেই বলেছেন, তাঁর পিতৃদেব ফার্সি কবিতার রসিক পাঠক ছিলেন। সম্ভবত তিনি বালক বয়স থেকেই ফারসি কবিতার রস আস্বাদন করে এসেছেন। তিনি যখন কলেজের

ছাত্র তখনই তিনি পরিচিত হন ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ইন্দুপ্রকাশ ছিলেন সদ্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনীলেখক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ফারসি সাহিত্যের পাঠক ছিলেন—তার থেকে কিছু অনুবাদও করেছেন। ইন্দুপ্রকাশের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে মোহিতলালের ফারসি কাব্যে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে আমাদের দেশে ফারসির খুবই গুরুত্ব ছিল। ইংরেজ আমলে তা কমে এলেও উনিশ শতকের শেষেও ফারসি কাব্যরসিক যথেষ্ট ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ফারসি খুব ভালো জানতেন। এ সময়ের ফারসি কাব্যপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় ওমর খৈয়ামের অনুবাদে। ১৩০৭ সালে পৌষ মাসের সাহিত্য পত্রিকায় প্রিয়নাথ সেন তিরিশটি রুবাইয়ের পদ্যানুবাদ করেন। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসের ভারতীতে সরলা দেবীর গদ্যানুবাদ এবং লোকেন পালিতের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। সরলা দেবীর ওমর খৈয়াম নামে একটি রচনাও ভারতীতে বেরিয়েছিল (১৩০৭ মাঘ)। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'পান্থ' নামে ওমর খৈয়ামের অনুবাদ সেকালে সুপরিচিত ছিল। এই কবিতাটি মোহিতলালের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর প্রথম দিককার সাহিত্যকৃতির মধ্যে ওমর খৈয়ামের জীবনকথা 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' (মানসী, চৈত্র ১৩১৫) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মোহিতলালের স্বপন-পসারী কাব্যে আমরা কয়েকটি কবিতা পাই—যার বিষয় ফারসি কাব্য থেকে নেওয়া। তাঁর কবিতায় ইংরেজি রোমানটিক সাহিত্যের প্রভাব সুবিদিত—তেমনি ফারসি সাহিত্যের প্রভাবও ছিল সুস্পষ্ট। তবে প্রত্যক্ষ প্রভাব অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথের।

১৯১৪-তে মোহিতলাল কলকাতার ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে উত্তরবঙ্গে পাবনায় সরকারী জরিপ বিভাগের কাজ নিয়ে গেলেন। এখানে এসে মোহিতলাল এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। এই অভিজ্ঞতাই মোহিতলালের কবিজীবনের দিক-পরিবর্তন ঘটাল। এই অভিজ্ঞতা না হলে তিনি হয়তো করুণানিধান-কালিদাস রায়ের মতোই শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের কবি হয়ে থাকতেন। পাবনায় জরীপের কাজে ঘোড়ায় চড়ে দগ্ধ মধ্যাহ্নে পদ্মার তীরে বালুভূমির উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল যেতে হত। সেখানকার প্রকৃতির কঠোর রূপ মোহিতলালের মনে এক ভিন্নতর কল্পনার জগৎ খুলে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও এই দেশে এসেছিলেন ; কিন্তু এ দেশে থেকেও এই রূপ তিনি দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ পদ্মার বোটে শরৎকালে এখানে থাকতেন। মোহিতলাল লিখেছেন,

'চরের সেই রূপ আমারই দেখা রূপ—রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখিলেও তাহাতে আকৃষ্ট হন নাই ; তিনি পদ্মার যে ভৈরবী মূর্তি দেখিয়াছিলেন—তাহা শিখাময়ী নয়—তরঙ্গময়ী ; সে তাহার সেই ভাঙ্গনের—প্লাবনের রূপ—যাহার পরে পদ্মা যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া এইরূপ বিশাল সিকতাশয্যায় ক্ষীণ তনু এলাইয়া দেয়।'—'শিলাইদহে রবীন্দ্রস্মৃতি'।

এখানকার কঠোর জীবনযাপনের রূঢ় অভিজ্ঞতা জীবনের একটা কঠিন রূপের উপলব্ধি ঘটিয়েছিল। পদ্মার চরে ঘোড়ায় চড়ে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন, আর নিজেকে মনে করেছেন বর্বর বেদুয়িন। এ জীবন আরামের নয়, সুখের নয়। এই জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যে বাস্তবতার উপলব্ধি মোহিতলালের ঘটেছিল, সে-বাস্তবতা সাধারণ দারিদ্র্য-দুঃখের সামাজিক বাস্তবতা নয়। এই বাস্তবতা একটা বড়ো জীবনচেতনাকেই জাগিয়ে দিয়েছিল। জীবন শুধু মধুর কোমল এবং স্নিগ্ধ নয়—জীবন রূঢ় কঠোর কঠিন দ্বন্দ্বসংকুল। সজনীকান্ত দাস মোহিতলালের জীবনচিত্র রচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন,

'এই তিন বৎসরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মানুষ ও প্রকৃতির সহিত তাঁহার মুখামুখি পরিচয়

তাঁহার সাহিত্যজীবনকেও নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মোহিতলালের কবিতায় ভীষণ-মধুরের যে দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি-পুরুষের যে সংঘর্ষ দেখিতে পাই, তাহার উৎস এইখানে।'[৩]

মোহিতলালের পরবর্তী কাব্যের আলোচনায় দেখা যাবে, 'সৃষ্টির যে-সত্যটিকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন, সে-সত্য ছিল ভীষণ ও মধুর, শক্তি ও সৌন্দর্যের সত্য।

সেখানে তিনি তিন বৎসর মাত্র ছিলেন। মনে হয় ১৯১৭-তেই তিনি কলকাতায় আবার শিক্ষকতায় যোগদান করলেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করলেন। এই সময়ে তিনি যে কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন, কবিতা হিসাবে সেগুলি পূর্ণ গঠিত। এ সময় থেকেই তাঁর কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হল। কলকাতায় এসে তিনি ভারতী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হলেন। তখন ভারতীর সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। স্বপন-পসারীর কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এ-সময়ের ভারতীতে এবং মোশ্‌লেম ভারত পত্রিকায় ১৩২৫ থেকে ১৩২৯ সালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৮ থেকে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। মোহিতলাল একটি চিঠিতে বলেছেন,

'স্বপন-পসারীর আগে অনেক কবিতা আছে, প্রকাশিতও হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলিকে কাব্যে স্থান দিই নাই। 'স্বপন-পসারী'ই আমার কবিজীবনের পূর্ণ যৌবনকাব্যের Romantic প্রবৃত্তির উচ্ছল উৎসার হইয়া আছে—অনেকের মতে উহাই আমার শ্রেষ্ঠ কাব্য।'[৪]

'স্বপন-পসারী' নামের কবিতা এই কাব্যগ্রন্থের প্রথমে সংযোজিত। এই নামেই এই কাব্যের নামকরণ। এ নামটি বস্তুত ইংরেজ কবি বেডোর 'ড্রিম পেডলারী' নামের চমৎকার অনুবাদ। অনুবাদ কেবল আক্ষরিক নয়—এই কাব্যের মর্মের দিক দিয়েও সুসঙ্গত। স্বপন-পসারী কাব্যে স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়েছেন কবি মোহিতলাল। এই কাব্যে নানা ধরনের কবিতা আছে। কিন্তু সর্বত্রই কবির আনন্দই উৎসারিত। এ কাব্যে বেদনার ব্যাকুলতা, অসফল বাসনার হাহাকার নেই। জীবনে দুঃখ-বেদনার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া আছে—কিন্তু সেজন্য রস ও আনন্দের ম্লানতা নেই। কল্লোলের আন্দোলনের আগে এই কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ। কবিতাগুলিও লেখা হয়েছিল ভারতীযুগে। বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই তখন প্রধান পুরুষ। সত্যেন্দ্রনাথকে ভারতীর কবিরা অনুসরণ করেছেন—তাঁর ছন্দলীলায় এবং তাঁর আনন্দচেতনায়। মোহিতলালের কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের আনন্দচেতনা বিশিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছে। কিন্তু তা ছাড়াও স্বপন-পসারীতে মোহিতলালের অন্য বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত এই কাব্যের কবিতাগুলি বিষয়প্রকৃতির দিক দিয়ে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর কবিতা বাঙালির গার্হস্থ্য রস ও সৌন্দর্যের কবিতা—যেমন চোখের দেখা, ভাদরের বেলা, চুড়ির আওয়াজ, কলসভরা, কিশোরী, শ্রাবণরজনী। এ-সব কবিতার মূলে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব ছিল বলেই মনে হয়। মোহিতলাল পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন, তাতে গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে রস ও সৌন্দর্যসৃষ্টির বিশেষত্বের উল্লেখ করেছিলেন। মোহিতলালের এই কবিতাগুলিও সেই রসেরই সৃষ্টি। এ-সব কবিতা সরল ভাষায় সহজ মাধুর্যের মুগ্ধতার রচনা। আবার এই সব কবিতার

৩ শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬ : 'মোহিতলাল মজুমদার'

৪ মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ (জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯)। পৃ. ৮৪-৮৫

সঙ্গেই স্বপন-পসারী কাব্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের কবিতাও কম নেই। ফারসি কবিরা—হাফেজ বা ওমর খৈয়াম সুরা ও সাকী দিয়ে যে উচ্ছল রসের আনন্দ সৃষ্টি করেছিলেন, তাও এই কাব্যে পাই—যেমন দিলদার গজলগান, হাফিজের অনুসরণে, ইরাণী। ফারসি কবিদের কবিতায় এ-সব ছিল রূপকের আবরণে তত্ত্বের আভাস। মোহিতলালের কবিতায় আছে কেবলই রসোপভোগের উচ্ছলতা। এ-ধরনের রসের অবাধ চিন্তাহীন কৌতুক ও আনন্দ বাংলা কবিতায় দেখা যায় না, পরবর্তী কালে নজরুল ইসলামের কোনো কোনো কবিতা ছাড়া।[৫] এ রস যেন বাঙালি জীবনের নয়। পারস্যের সুফী কবিদের লিরিক কবিতায় মোহিতলাল মুগ্ধ ছিলেন, তেমনি আরবীয় দুর্দম বলিষ্ঠ জীবনের কল্পনাতেও ছিলেন অভিভূত। তার প্রমাণ 'বেদুয়িন' কবিতাটি। বেদুয়িন কবিতাটি লেখার প্রেরণা তাঁর এসেছিল যখন তিনি উত্তরবঙ্গে পদ্মাতীরে অশ্বপৃষ্ঠে বেদুয়িন-জীবন যাপন করছিলেন। এই কবিতাটি সম্বন্ধে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন,

'বেদুয়িন' 'নূরজহান' ও 'নাদির শাহ' প্রভৃতি কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম— কাব্য ও ইতিহাস উভয়বিধ আকর হইতে। 'বেদুয়িন'-এর জীবন এবং মরুভূমির চিত্র আমি নানা স্থান হইতে প্রায় বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়াছি। তবে উহার প্রধান কল্পনা-উৎস ছিল—Monier William Jones-কৃত কয়েকটি আরবী কবিতার ইংরাজি অনুবাদ। ওই কবিতাগুলি খাঁটি বেদুয়িন-কবির রচিত— মক্কায় 'কাবার' মন্দির-গাত্রে সেগুলি এখনো নাকি ঝুলানো আছে। সেগুলি কবিতার আম-মাংস বিশেষ ; আমি তাহাকে সিদ্ধ করিয়া কিছু মসলা যোগ করিয়াছি এবং মাংসের ক্বাথটুকু আবশ্যক পরিমাণে আমার কবিতায় মিশাইয়াছি। 'মরুভূমি'কে প্রত্যক্ষ কবিয়া তুলিতে আমি এক প্রসিদ্ধ ইংরাজি গ্রন্থের The Terrible Sahara-র চিত্র কাজে লাগাইয়াছি—দুই একটি ইংরাজি কবিতার সাহায্য লইয়াছি। কিন্তু এই সকলের উপরে আমার 'বেদুয়িন-জীবন' বোধহয় সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়াছে। আমি এক সময় পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বালুচরে বৈশাখের রৌদ্রে অশ্বপৃষ্ঠে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, 'নাদির শাহের জাগরণ' এবং 'নাদির শাহের শেষ' কবিতা দুটি ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৫-এর মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে। পরে এ দুটি আবার মুদ্রিত হয় 'মোশলেম ভারত' পত্রিকার ১৩২৭-এর কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসে। আবার 'বেদুয়িন' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় মোশলেম ভারত-এর ১৩২৮-এর ভাদ্র সংখ্যায়—কিন্তু ১৩২৮-এর আশ্বিনের ভারতীতে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই কবিতায় বেদুইন-জীবনের কথা বলেছিলেন সত্য—কিন্তু মোহিতলালের 'বেদুয়িন' কবিতার স্বাদই অন্যরকম। এর নাটকীয়তাই এর বড়ো গুণ। বেদুইনের আত্মকথনের ভিতর দিয়ে সে-জীবনের দুর্ধর্ষতা এবং প্রচণ্ডতা ফুটে উঠেছে। 'শেষশয্যায় নূরজহান' কবিতাটিও ভারতীতে (১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয় পত্রিকার প্রথম রচনা হিসাবে। সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথই কবিতাটি এমন সমাদরের সঙ্গে প্রকাশ করতে সাহায্য করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ একদিন বৈঠকশেষে মোহিতলালকে একান্তে ডেকে মৃদুস্বরে জানালেন যে, মোহিতলালের একটি সদ্যপ্রকাশিত কবিতা তাঁর ভালো লেগেছে।—'ইহাও বলিলেন যে তাহা

৫ নজরুল ইসলামের 'জিঞ্জীর' কাব্যের 'নওরোজ' কবিতা। এ-সময়ে রচিত মোহিতলালের এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা 'শরাবখানা' 'গজল' 'ফার্সি ফরাস' হেমন্ত-গোধূলি কাব্যে সংকলিত আছে।

৬ মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, জিজ্ঞাসা ১৯৬৯, পৃ. ৪৫

সাধারণ পাঠকের রুচি ও রসবোধের অনুকূল নয়—কিন্তু কবিতাটি খুব ভাল হইয়াছে।"[৭] মোহিতলাল কবিতার নাম উল্লেখ করেন নি ; কিন্তু অনুমান করি, কবিতাটি ছিল 'অঘোরপন্থী'—১৩২৬-এর আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত। সত্যেন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন ; কিন্তু ইতিপূর্বে প্রকাশিত নাদির শাহ্ সম্পর্কিত দুটি কবিতা (ভারতী, ১৩২৫ মাঘ এবং ফাল্গুন) পড়ে তিনি খুশি হতে পারেন নি—সে-কথাও জানালেন। ভারতী যে রুচি এবং রসের পোষক 'অঘোরপন্থী' অবশ্যই তার থেকে আলাদা। কিন্তু আলাদা হলেও সত্যেন্দ্রনাথের উদার রসবোধ কবিতার শক্তিশালিতাকে স্বীকার করে নিয়েছিল।

ঐস্লামিক সংস্কৃতি এবং ইতিহাস থেকে আহৃত বিষয় হিসাবে কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। আবার শুধু বিষয়ের দিক দিয়ে নয়, কবিতায় নাটকীয়তা নিয়ে আসার মধ্যেও অভিনবত্ব ছিল। অবশ্য ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ একাধিক নাট্যকবিতা লিখেছেন, অনেক কবিতার মধ্যেই চরিত্র ও সংলাপ এনেছেন—যেমন 'ভাষা ও ছন্দ' 'গান্ধারীর আবেদন' 'নরকবাস' 'বিদায়-অভিশাপ' প্রভৃতি। কিন্তু এ-কথা বোধহয় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের গীতিধর্মী ভাষায় কবিতার আবেগময় তত্ত্বভাবনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ফলশ্রুতি। মোহিতলালের এসব কবিতায় চরিত্ররূপটাই বস্তুনিষ্ঠভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ফারসী কবিদের সৌন্দর্য-পিপাসা যেমন মোহিতলালের ফারসী কবিদের অনুসরণে লেখা কবিতায় বিহ্বল হয়েছে, তেমনি বেদুয়িন বা নাদির শাহ্-নূরজহান প্রভৃতি ইতিহাস থেকে নেওয়া কবিতাতে ফুটে উঠেছে মুশলিম সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—শক্তি ও জীবনাবেগের সঙ্গে ভোগ ও মুগ্ধতার সমন্বয়। এসব ক্ষেত্রে কবি যেন নিজেকে অনেকটা প্রচ্ছন্ন রেখে চরিত্ররূপকেই ফুটতে দিয়েছেন। তাই এই নাট্যকাব্য রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কবিতা থেকে আলাদা। প্রচুর আরবী-ফারসি শব্দের ব্যবহার মোহিতলাল নজরুলের আগেই করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাতে বাংলা কবিতার একটা ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সত্যেন্দ্রনাথ এটা লক্ষ্য করেছিলেন বলেই মনে হয়। মোহিতলালের 'শেষশয্যায় নূরজহান' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮) পড়ে 'তিনি মুখে মুখে সদ্যপঠিত কাব্যের ভাবকল্পনা ও সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যের বিশ্লেষণ করিয়া গেলেন। পরিশেষে হঠাৎ আবেগের মুখে বলিয়া উঠিলেন "আমার কবর-ই-নূরজহান" ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।"[৮]

একদিকে বাঙালি জীবন আর একদিকে ঐস্লামিক জীবন—দুইই মোহিতলালের কবিতায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে! আবার স্বপন-পসারীতেই মোহিতলাল আর-এক ধরনের রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। কবিতার নাম, 'পুরূরবা'। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের বিষয় নিয়ে লেখা এই কবিতাতে মোহিতলাল রচনা করেছেন প্রাচীন কাব্যজগতের এক নতুন রূপ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অজস্র চিত্র এবং ভাষার ইন্দ্রজাল দিয়ে এক স্বপ্নের সৌন্দর্যভূমি গড়ে দিয়েছেন। কবি স্বচ্ছন্দে অতীত ভারতের বনস্থলীতে, জ্যোৎস্নার কুহেলিকাচ্ছন্ন নিশীথে, 'ধূম্রগিরিশ্রেণী গাঢ় নীলাঞ্জনে লেখা'য়, সরসী-সলিলের তরঙ্গলীলায়—কল্পনাকে বিচরণ করিয়ে ফিরেছেন। কালিদাসের শব্দঝঙ্কার, অনুপ্রাস-ধ্বনি, উপমার সমারোহ 'পুরূরবা' কবিতাকে কবির রসসৃষ্টিক্ষমতার অভ্রান্ত এবং নিঃসন্দিগ্ধ সাফল্যে উত্তীর্ণ

৭ মোহিতলাল মজুমদার, বিচিত্রকথা, 'সত্যেন্দ্রস্মরণে', ১৩৩৪ আষাঢ়।
৮ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

করেছে। মোহিতলালের পরবর্তী কাব্যেও একদিকে ঐশ্লামিক জীবনচেতনা আর এক দিকে প্রাচীন ভারতীয় জীবনচেতনার স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেখতে পাই। কোনো একটির রসসৃষ্টি অন্যটির দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে নি।

স্বপন-পসারীর এই কবিতাগুলিতে মোহিতলাল সৃষ্টিক্ষমতার এক বিশেষ প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতলাল একে বলতেন রূপসৃষ্টি। রূপসৃষ্টির সার্থকতা রসের পরিণতিতে। উদ্দেশ্যহীন রূপ ও রসের সৃষ্টিতে হয় বিশুদ্ধ কাব্য। মোহিতলালের পরবর্তী কাব্য বিস্মরণী থেকে জীবনদর্শন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—স্মর-গরলে সেটা যথেষ্ট উচ্চারিত। স্বপন-পসারীতে তত্ত্বের ক্ষীণ আভাস পাওয়া গেলেও তত্ত্ব কখনোই সে-রকম প্রাধান্য পায় নি। বরং ভিকটর হিউগোর অনুসরণে লেখা উচ্চৈঃশ্রবার কল্পনা দিয়ে তাঁর নিজের কবিধর্মকেই সঙ্কেতিত করতে চেয়েছেন। যে কল্পনাপ্রবৃত্তি ছিল ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের, মহাকাব্যের সেই কল্পনাকেই মোহিতলাল গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন। গীতিকবির কল্পনা কেবল নিজের কথাই বলে, রূপ দেয় নিজের অন্তরের ভাবকে। মহাকবির কল্পনার বিচরণক্ষেত্র বিরাট—মানবলোক এবং বস্তুজগতের বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তোলে। মোহিতলাল গীতিকবিতার ক্ষুদ্রতর আয়তনে জীবনের ধর্ম ও প্রকৃতিকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। জীবন বলতে মোহিতলাল কোন্ সত্যটিকে বোঝেন, তিনি বহুবার বহুক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের দেহলীলাতে যার প্রকাশ ঘটে, সেটাই জীবন। জীবনের সুখ এবং বেদনাকে দেহ দিয়েই গ্রহণ করে নিতে হয়। দেহের এই লীলাকে বৈরাগ্যসাধক মিথ্যা মনে করে—তাই জীবনভোগ তার আদর্শে ঘৃণ্য। 'পাপ' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'পাপ কোথা নাই গাহিয়াছে ঋষি অমৃতের সন্তান'। কবি স্বপন-পসারী কাব্যে জীবনের রসের উৎসবে আত্মহারা ; 'অঘোরপন্থী' কবিতাতেও তেমনি গ্রহণ করে নিয়েছেন জীবনবাস্তবের সঙ্গে নিত্যযুক্ত অসুন্দরকেও। অসুন্দরকে গ্রহণ করে নেবার শক্তি আসে কোথা থেকে? সে আসে প্রেমের উপলব্ধিতে। এই তত্ত্ব মোহিতলালের এই কাব্যে আভাস-রূপে আছে—পরবর্তী কাব্যে তা বিষয়রূপে দেখা দিয়েছে। জীবন বলতে বাস্তব-সত্যকে বোঝেন বলেই স্বপন-পসারীতে মৃত্যু নিয়ে কোনো বাস্তবতাহীন রমণীয় কল্পনায় মত্ত হন নি। 'Far many a time I have been half in love with easeful Death'—কিংবা 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'—এমন মৃত্যুর ভীষণতা থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে প্রেমিকরূপে কল্পনা করার অবাস্তবতাকে মোহিতলাল বিদ্রূপ করেছেন।

'স্বপন-পসারী' কাব্যে জীবনকে বাস্তবরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে আছে স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের সাধ। এ দুইকে বিপরীত প্রবণতা বলেই মনে হয়। স্বপ্ন ও সৌন্দর্য হবে অবাস্তব—আর তাকে নিয়ে মগ্নতার নাম রোমান্টিকতা। রোমান্টিকতার প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে রিয়ালিজম বা রূঢ় জীবনসত্য। স্বপন-পসারী কাব্যে রিয়ালিজম নেই বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনকে ধরবার আকাঙ্ক্ষা আছে। মোহিতলালের কবিমানস যে মূলত রোমান্টিক, তাতে সন্দেহ নেই। সুখ-দুঃখ আবেগ বেদনাময় সত্য জীবনকে ভালোবাসার প্রচণ্ড প্যাশন থেকেই তাঁর রোমান্টিক চেতনার উৎসার। তাঁর আর কোনো জীবনতত্ত্ব নেই, সীমা-অসীম, রূপ-অরূপ অনাদি-অনন্তের ভাবনা নেই—যে-ভাবনা দিয়ে জীবনের অর্থ করে নিতে পারেন। মোহিতলালের তত্ত্ব একটিই—তার নাম 'প্রেম'। এই জীবনের খণ্ডতাকে প্রেম দিয়েই পূর্ণ করে তোলা যায়—

পান-শেষে চূর্ণ হয় শুধু পাত্রখানি ;
প্রেম যে আত্মার আয়ু!—ক্ষয় নাহি তার।[৯]

আবেগ ও উচ্ছ্বাস মোহিতলালের পরবর্তী কাব্য বিস্মরণীতেই সংযত হয়ে এল। বিস্মরণী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭-এ, স্বপন-পসারীর পাঁচ বছর পর। এই পাঁচটি বছর মোহিতলালের সাহিত্যজীবন নানা সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশায় জড়িত। নজরুলের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ও বিরোধ, কল্লোল ও শনিবারের চিঠির প্রকাশ, সাহিত্যে বাস্তবতাবাদ প্রবর্তনের ফলে আদর্শ-বিপর্যয় ও দ্বন্দ্ব এ-সময়ের ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে মোহিতলালের কবিতা, বিশেষত 'বিস্মরণী' 'স্মর-গরল' পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন ভাবনাসর্বস্ব কবিতা বলে মনে হলেও কবির মনে তাঁর সমকালের সংবেদনা প্রভাব ফেলেছিল—ব্যাপকতর বিশ্লেষণে সেটা অনুমান করা সম্ভব। সমকালীন বিষয় মোহিতলাল তেমন গ্রহণ করেন নি। গান্ধীজি-সম্পর্কিত দুটি কবিতা 'মহামানব' এবং 'আবির্ভাব' স্বপন-পসারীতে সংকলিত আছে। তা ছাড়া সমকালীন বিষয় বা সমকালের সমাজ নিয়ে কবিতা মোহিতলালের কাব্যে বিশেষ দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও বিস্মরণীর ভাবগম্ভীর কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে-সময়ের কবির 'মুড' বা মেজাজ।

স্বপন-পসারীর কবিতাগুলি যখন লেখা হয়, তখন তিনি ফিরে এসেছেন উত্তরবঙ্গ থেকে। থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। অবস্থা সচ্ছল ছিল না—কিন্তু সাংসারিক অসাচ্ছল্য স্বপন-পসারীর রস ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে বাধা ঘটায় নি। সম্ভবত এ-বাড়িতে থাকতেই এই কাব্যখানি প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরেই বোধ হয় ১৯২৩-এর আগেই মোহিতলাল বাদুড়বাগান লেনের মেসে চলে আসেন। সেই মেসেই থাকতেন সজনীকান্ত দাস। নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং সৌহার্দ্য পূর্বেই হয়েছিল। আবার 'বিদ্রোহী' রচনা নিয়ে মোহিতলালের মনে অপ্রসন্নতার মেঘ জমে উঠলেও প্রকাশ্যে তিনি এতদিন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করে নি। বাদুড়বাগান মেসে আসার পর সজনীকান্তের ইন্ধনে সেই ক্ষোভ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।[১০] ইতিপূর্বেই নজরুলের উদ্দেশ্যে তিনি দুটি প্রীতিপূর্ণ কবিতা লিখেছিলেন—'কবিভ্রাতা শ্রীযুক্ত নঃ ইঃ-র উদ্দেশ্যে' (উপাসনা, ভাদ্র ১৩২৮) এবং 'কবিবিদ্রোহীর প্রতি' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩০)। কিন্তু সেই নজরুলের উদ্দেশ্যেই এবার লিখলেন 'বিস্মৃতি ও স্মৃতি' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১)। বিস্মরণী-তে এই কবিতাটি আছে 'সুইনবার্নের অনুসরণে' নামে। প্রত্যক্ষত এতে নজরুলের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এটি নজরুলের উদ্দেশ্যেই মোহিতলালের তীব্র ভর্ৎসনা। সুইনবার্নের একটি কবিতার ভঙ্গি অনুসরণ করে এই কবিতাটি রচিত বলেই সম্ভবত এই নাম। কবিতাটির নাম The Wife's Vigil—এক স্বামিত্যক্তা ক্রুদ্ধ নারী :

As ripples reddening in the roughening breath
Of the eager east when down does night to death,
So rose and stirred and kindled in her thought
Fierce barren fluctuant fires that lit not aught,

৯ কবিতার নাম 'জন্মান্তরে'। কবিতাটি স্বপন-পসারীর অন্তর্ভুক্ত হলেও লিখিত হয়েছিল বিস্মরণীর কবিতাগুলি রচিত হওয়ার যুগে ; প্রকাশিত হয় : 'ভারতী', ফাল্গুন ১৩২৯।

১০ মোহিতলাল-নজরুলের 'বিরোধ' সম্পর্কে বিস্তৃততর তথ্যপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্টব্য : 'মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ' (আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত)। ভূমিকা পৃ. ৩৪-৪০ এবং তথ্যপঞ্জী পৃ. ৩১১-৩১৬।

But scorched her soul with yearning keen as hate
And dreams that left her wrath disconsolate.

এই কবিতারই একাংশে আছে তীব্র অভিশাপ :

Not iron, nor the might of force afield,
Nor edge of sword, and sheltering weight of shield,
Nor all thy fame since all thy praise began
Nor all the love and laud thou hast of man,
Nor, though his noiseless hours with wool be shod
Shall God's love keep thee from the wrath of God.[১১]

নজরুল ইসলামকে মোহিতলালই বঙ্গসাহিত্যে উল্লসিত অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন মোশলেম ভারতের সম্পাদককে লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে ; তারপর নজরুল কলকাতায় এলে তাঁকে গভীর স্নেহে গ্রহণ করে নেন। তাঁর সঙ্গে বিরোধ মোহিতলালকে যে খুবই আহত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিস্মরণীর যুগে এই আঘাত মোহিতলালকে পীড়িত করে রেখেছিল।

স্বপন-পসারীর পর বিস্মরণী পড়লে পাঠক সহজেই একটা পরিবর্তন অনুভব করতে *পারবেন। সমগ্রভাবেই দুটি কাব্যের মুড দুই রকম। স্বপন-পসারীতে প্রসন্ন উচ্ছলতা যেমন* আছে, বিস্মরণীতে তেমনি আছে গম্ভীর বিষাদের সুর। জীবনের নশ্বরতা, বেদনার ক্লান্ত কণ্ঠস্বর বিস্মরণীর কবিতায় প্রায়শই শোনা যায়। এটা পরবর্তী স্মর-গরল কাব্যেও অব্যাহত আছে। কিন্তু মোহিতলালের প্রথম কাব্য স্বপন-পসারীর সুর অন্যরকম। তাতে আনন্দ-উল্লাস-মুগ্ধতার সুরই যেন বেশী। এর কারণ ব্যক্তিগত দিক দিয়ে নির্দেশ করা কঠিন। স্পষ্টতই বিস্মরণীতে কবি তত্ত্বচিন্তার দিকে ঝুঁকেছেন। সেইজন্যই কণ্ঠস্বরও গভীর হয়ে উঠেছে। যেন বাস্তবজীবনের থেকে প্রতিহত হয়ে তাঁর কবিমানস জীবনের ধ্যানে মগ্ন হতে চায়। ১৯২৩-এর জুন মাসে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন,

'বর্তমান সাহিত্যসমাজের সহিত আমি কখনো সন্ধিস্থাপন করিতে পারি নাই, বরং ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছে আমি তাহার ক্ষুদ্রতা ও মিথ্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে অপসরণ করিতেছি।'[১২] তার কয়েক মাস পরেই আবার লিখছেন,

'কবিতা ভালই হোক আর মন্দই হোক, কেউ পড়ে না। ও জিনিষটার সমঝদার আজকাল আমাদের দেশে খুব কম আছে বলেই মনে হয়, অন্ততঃ কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে আমি বিশেষ সাড়া পাই নে। লিখি খুব কম—ছাপাতে বিশেষ উৎসাহ নেই। যে শ্রেণীর পাঠক ও যে শ্রেণীর সাহিত্য আজকাল সুলভ ও সুপরিচিত—তাদের মধ্যে আমার স্থান নেই।...কারণ আমি অধুনাতন সাহিত্যবুদ্ধির সঙ্গে আপন রুচি ও আদর্শের মিল খুঁজে পাই নি। উপেক্ষা অনাদর বিদ্বেষ বিরোধের মধ্যে চিত্তের স্ফূর্তি হয় না।'

কেন তাঁর এই মনোভাব? সে-সময়ের কবিদের রচনা তাঁকে তৃপ্তি দেয় নি। তিনি নিজেকে ব্যর্থ উপেক্ষিত বোধ করছেন কেন? নজরুলকে তিনিই অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। নজরুলের

১১ কবিতাটি Tristram of Syonesse থেকে Selection from the Poetical Works (London 1884)-এ সংকলিত। মোহিতলাল সম্ভবত এই সংস্করণই পড়েন।

১২ মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ। পৃ. ৫ এবং পৃ. ১৩

বিদ্রোহী ও অন্যান্য কবিতা নজরুলকে জনপ্রিয় করেছে। এদিকে তাঁর প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু (১৯২২) এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু (১৯২০) তাঁকে নিঃসঙ্গ করে ফেলেছে। অবশ্য অগ্রজ কবি করুণানিধান তখনও ছিলেন—তাঁকেই তিনি বিস্মরণী উৎসর্গ করেছেন। ভারতীর কবিদের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে তাঁর তৃপ্তি নেই—সেটা মোশলেম ভারত সম্পাদককে লেখা চিঠিতেই স্পষ্ট। নজরুলের জনমোহন কাব্যকেও তিনি শুদ্ধ কবিতা বলে ভাবতে পারছেন না। এ অবস্থায় মোহিতলালের স্পর্শকাতর কবিমন বিষণ্ণ থাকবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মোহিতলালের নিঃসঙ্গতাবোধের আর- একটা উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে।

১৯২১-এর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথকে ষাট বৎসরের সম্বর্ধনা দেয়।[১৩] তার আয়োজন প্রধানতই করেছিল ভারতীর দল। অনুষ্ঠানের মুদ্রিত কর্মসূচীতে তখনকার অন্যান্য কবিরা থাকলেও মোহিতলাল তাতে ছিলেন না। মনে হয়, মোহিতলাল তখনও ততো সুপরিচিত ছিলেন না। কিন্তু ভারতী পত্রিকাতে যে-সমস্ত প্রশস্তি-রচনা প্রকাশিত হয় তাতে মোহিতলালের কবিতাও ছিল। কবিতার নাম 'রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে'। তার চারটি পঙক্তি :

কত ভক্ত নিবেদিল পূজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
মন্ত্র পড়ি পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্য-সম্ভার!
হেরি মোর দৃঢ় মুষ্টি, রিক্ত হস্ত, নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
ডাকে নাই কেহ মোরে,—ধন্যবাদ! সে যে হত বড় অশোভন।

মনে হয়, মোহিতলালের এই কাব্যপঙক্তি রচনার কোনো সাময়িক উপলক্ষ ছিল। ভারতীগোষ্ঠীর কবি বলে পরে পরিচিত হয়েও, দেখা যাচ্ছে, তখনও ভারতীর দলে তিনি নেই। এই জন্যই কি তিনি প্রবোধচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন, 'ক্রমে দেখিবেন কোনো পত্রিকার সঙ্গে আমার সদ্ভাব থাকিবে না, কোনো coterie আর আমাকে আসন দিবে না?'

বিস্মরণী কাব্যে 'অকালসন্ধ্যা' ('বাণীবিদায়' নামে ভারতী, মাঘ ১৩২৯-এ প্রকাশিত) এবং 'বিস্মরণী' (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২) কবিতা দুটিতেও কবির বিষাদ ও অভিমানের ছাপ আছে। প্রথম কবিতাটিতে কবি কাব্যলক্ষ্মীর প্রেরণা স্মরণ করে পরে বলছেন,

প্রাণভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া,
আজি এ দিনান্ত-বরষায়
নেমেছে অকালসন্ধ্যা, বৃথা মুখ পানে চাওয়া
ছন্দ নাই, ভাষা না যুয়ায়!

... ...

নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি কেমনে হইব পার
দুস্তর তিমির-তরঙ্গিণী?
বনপথে-পথে শিবাদের অশিব চীৎকার
তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী!

১৩ এই উপলক্ষে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রমঙ্গল' পুস্তিকাটি দুষ্প্রাপ্য। রবীন্দ্রমঙ্গল সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮)।1894)-এ সংকলিত। মোহিতলাল সম্ভবত এই সংস্করণই পড়েছিলেন।

এই কাব্যের নাম-কবিতা বিষাদ এবং অভিমানেরই কবিতা :

আমারে তোমরা ভুলে যেয়ো ভাই!
এসেছিনু পথ ভুলে—
পান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্তিনাশার কূলে!
বহুজনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পূরিবে মনে ছিল আশা,
ভাঙা মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা
পুরানো বটের মূলে ;—
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব
কীর্তিনাশার কূলে!

আশ্চর্যের বিষয়, 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থে যেমন ক্লান্তি ও বিষাদের কবিতা আছে, তেমনি আছে বলিষ্ঠ জীবনের কবিতা। 'স্পর্শরসিক' 'মোহমুদ্গর' 'পান্থ' কবিতা-তিনটি মোহিতলালের জীবনদর্শনের বিশিষ্টতার জন্যই বিখ্যাত। কবি কীটস বলেছিলেন, Oh for a life of sensation rather than of thought—মোহিতলালও তেমনি 'স্পর্শরসিক' কবিতায় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জগতের রসিকরূপে দেখা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় তীব্রতা বেশি—কীটসের অনুভূতি প্রশান্ত স্নিগ্ধ। তেমনি মোহমুদ্গরেও কবির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ—বৈরাগ্যবিলাসীদের প্রতি ভর্ৎসনায় কঠিন। মোহমুদ্গর শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত কবিতা। সংসারের প্রতি মোহে তিনি মুদ্গর নিক্ষেপ করেছেন। মোহিতলাল করেছেন ঠিক বিপরীত—বৈরাগ্যের মোহের প্রতি মুদ্গর-নিক্ষেপ। একদিকে জগৎ-প্রকৃতিকে ভালোবাসা, আর একদিকে স্ত্রীপুত্রকন্যাকে ভালোবাসা— এর চেয়ে বড়ো বাস্তব সত্য আর কিছু নেই। এই জগতের দিকে তাকিয়ে হ্যামলেটের বিস্ময় :

What a piece of work is a man ! How noble in reason! how infinite in faculties ! in form and moving, how express and admirable ! in action, how like an angel ! in apprehension ! how like a god ! the beauty of the world ! and the paragon of animals ! আবার তার কণ্ঠে আকাশ ও পৃথিবীর বর্ণনা— This most excellent canopy of the air, look you, this brave o'erhanging firmament, this majestical roof fretted with golden fire.

এই বিস্ময়ই যেন কবি মোহিতলালের উচ্চারণেও :

এই চিরসুন্দরের রূপহর্ম্যে ফিরিব আবার ?
কক্ষে কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয়-দুয়ার ?

—এই দুটি কবিতাতেই কবির নিরঙ্কুশ জীবনভোগের বাসনা ব্যক্ত। 'পান্থ' কবিতাতেও তাই—তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দার্শনিক প্রত্যয়। এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল কল্লোলে (ভাদ্র, ১৩৩২)। কবিতায় ভাবগত দুটি ভাগ আছে। প্রথম দিকটা দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের শিক্ষা—জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের, দ্বিতীয় দিকটা সেই শিক্ষাকে অস্বীকার করে জীবনকেই গ্রহণ

করে নেবার ব্যাকুলতা। মোহিতলালের যে বিশিষ্ট কবিধর্ম তাঁর মোহমুদ্গর বা স্পর্শরসিক-এ প্রকাশ পেয়েছিল, এই কবিতাতে সেই কবিধর্মই গম্ভীর ভাষার ঐশ্বর্যে মন্থর ছন্দস্পন্দনে মহাকাব্যের মতোই বিশালতা অর্জন করেছে। এই কবিতাটি সেকালে খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। সে-খ্যাতি আজও অম্লান।

বিস্মরণী কাব্যগ্রন্থের কেন্দ্রীয় ভাব এটাই। এই জীবনবাদের ইশারা স্বপন-পসারী কাব্যে থাকলেও সেখানে আরও নানা সুরের রাগিণী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিস্মরণীতে এই জীবনবাদের সুরটাই আর সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এই তিনটি কবিতার মধ্যে যে ভাবসাম্য আছে, অন্য কবিতাতেও তার রূপরচনা দেখি। 'কালাপাহাড়' মোহিতলালের একটি সুপরিচিত কবিতা[১৪]। ইতিহাসের কালাপাহাড়কে কবি এখানে নবমানবতাবাদের রূপময় প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করেছেন। অন্ধ জড় ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারকে ভেঙে নতুন মানবসমাজ গড়বার জন্যই যেন কালাপাহাড়ের আবির্ভাব। 'রূপময়' বললাম এই জন্য যে, এই কবিতাটির মধ্যে চিত্র ও ধ্বনির সমন্বয় পাঠককে স্বভাবতই চকিত করে তোলে। কবি ভাষা দিয়ে চিত্রের সমারোহ ঘটিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ছন্দের উদাত্ততায় কালবৈশাখীর আসন্ন ঝড়ের শঙ্কিত প্রত্যাশা সৃষ্টি করে তুলেছেন।

সমালোচক মোহিতলাল যাকে রূপসৃষ্টি বলেন, 'কালাপাহাড়' তার একটি দৃষ্টান্ত। তেমনি দৃষ্টান্ত বিস্মরণী কাব্যে আরও আছে। 'নূরজহান ও জহাঙ্গীর' একটি নাট্যকবিতা। একে কাব্যনাট্য না বলে নাট্যকবিতা বলাই ভালো। তার কারণ পরিস্থিতি সৃষ্টি-চরিত্রসৃষ্টি, এসব নাট্যলক্ষণই এতে প্রধান। তথাপি এটি কবিতা। একটি বিশেষ রসের কেন্দ্রাভিমুখিতাই এর বৈশিষ্ট্য। স্বপন-পসারীতেও এ ধরনের কবিতা আছে। বস্তুত 'শেষশয্যায় নূরজহান' এবং 'নূরজহান ও জহাঙ্গীর' কবিতা দুটিকে পরিপূরক বলে গণ্য করাই সঙ্গত।[১৫] কবি নিজেও তাই মনে করতেন :

'নূরজহান ও জহাঙ্গীর' কবিতাটি আমার পূর্বলিখিত 'শেষশয্যায় নূরজহান' কবিতার companion piece। দু'টো কবিতা একই সঙ্গে পড়লে এই কবিতার বিশেষত্ব আরও বেশী করে ফুটে উঠবে বোধ হয়—সেটা ছিল Reflective Lyrical—এটা হয়েছে Dramatic passionate'।[১৬]

প্রেম, বিরহ ব্যথা, বেদনার ভিতর দিয়ে যে জীবন-তিতিক্ষার প্রবলতা, এই রূপসৃষ্টি দিয়ে মোহিতলাল তার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, রূপসৃষ্টিকেই তিনি সাহিত্যের সিদ্ধি মনে করতেন। নাটকে সেটা যত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, অন্য কিছুতে তত সুনির্দিষ্ট হয় না। মোহিতলাল নিজে বিস্মরণী এবং অন্যান্য কাব্যে সার্থক গীতিকবিতা লিখেছেন—সে সব ক্ষেত্রে আত্মভাবমুখরতা কবিতার বিশিষ্ট চবিত্র নির্মাণ করেছে। আবার আত্মনিরপেক্ষ রূপসৃষ্টি দিয়ে নাটক ও নাট্যকবিতাও কতখানি সার্থক হতে পারে, মোহিতলালই তার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর অপ্রকাশিত 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' কবিতাটিও স্মরণীয়।

বিস্মরণীতেই আর একটি বিখ্যাত নাট্যকাব্য আছে—'মৃত্যু ও নচিকেতা'। কঠোপনিষদের

১৪ সুকুমার সেন বলেন, মোহিতলাল 'কালাপাহাড়' লেখেন নজরুলের প্রভাবে। দ্রষ্টব্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড, ১৯৫৮) পৃ. ২৪১। এ বিষয়ে মোহিতলালের নিজের মন্তব্য তুলনীয় : মোহিতলালের 'জীবন-জিজ্ঞাসা'র ভূমিকা।

১৫ কবিতা দুটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হরনাথ পাল। দ্রষ্টব্য 'মোহিতলালের দুটি সহচর কবিতা' : শনিবারের চিঠি, মোহিতলাল সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৯।

১৬ মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ। পৃ. ১৩

সুপরিচিত যম ও নচিকেতা উপাখ্যানের একটি নতুন অর্থ দিয়ে মোহিতলাল এই কবিতাটি রচনা করেছেন। এই কবিতাতেও নচিকেতার মৃত্যুর অনুভূতি বোঝাবার জন্য কবি অনেকগুলি সঙ্কট-মুহূর্তের ছবি এঁকেছেন। প্রাচীন অরণ্যজীবনের বর্ণনার প্রত্যক্ষতায় ছবিগুলি অপূর্ব। উপনিষদের তপোবন-জীবন, অরণ্যভূমি, ঝড়, মেঘমেদুর আকাশ, উষাকে লাভ করবার জন্য অরুণের আকাশপথে যাত্রা এবং দিবাবসানে চিতানলে তাদের মিলন—এইসব বৈদিক কল্পনা মোহিতলালের লেখনীতে অসাধারণ প্রত্যক্ষতায় মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু যম নচিকেতার কাছে নিজের যে-রহস্য উন্মোচন করলেন, সেটাই মোহিতলালের নতুন যুগোপযোগী ব্যাখ্যা। যম নচিকেতার সনির্বন্ধ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন,

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো২র্ষশোকৌ জহাতি ॥

আমাদের কবি 'গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্'-এর কথা বলেন নি। আত্মতত্ত্বকে অবলম্বন করবার আগে জিজ্ঞাসুকে শ্রেয়-প্রেয়র দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে। শ্রেয় কি সে-বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। মোহিতলালও নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুর মুখে শ্রেয়-তত্ত্বের কথাই বসিয়েছেন। সেই শ্রেয়তত্ত্ব মানবজীবনের কল্যাণে আত্মোৎসর্গেরই তত্ত্ব।

এই আত্মোৎসর্গ জীবনের প্রতি অমলিন ও দুর্বার প্রেম ছাড়া হয় না। 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায় কবি জীবনবাদের পরম রূপটির কথা বলে দিয়ে গেলেন। তাঁর স্বার্থপর ভোগসর্বস্বতা নয়। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মূল আত্মসুখচরিতার্থতা তাঁর জীবনবাদ নয়। যে-মানুষ সত্য, যে-মানুষ দেহময়—কল্পিত ভাবময় মানুষ নয়—তারই জন্য কবির প্রেম। বিস্মরণী কাব্যেই কবিমানসের পূর্ণতা এসেছে। স্মরগরল কাব্যে তার বিস্তার।

বিস্মরণী কাব্যখানাকে অনেক দিক দিয়ে পড়া যেতে পারে। তার কয়েকটা দিকের ইঙ্গিত মাত্র করা গেল। আর একদিকে এর অসাধারণত্ব নির্দেশ করা যায়। এতে একদিকে বিশুদ্ধ আত্মমগ্ন গীতিকবিতা আছে, আবার আছে নাট্যকবিতা—যাতে লেখকের আত্মভাবমগ্নতা থাকে না। কোনো কবিতায় কল্পনাক্ষেত্র ক্ষুদ্র—বাঙালির পল্লীজীবন, পল্লীপ্রকৃতি, পাখি, ফুলের জগতে সীমায়িত ; আবার কোনো-কোনো কবিতায় কল্পনার ক্ষেত্র বিস্তৃত ; ইতিহাসে পুরাণে দূর অতীতে প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবনে অরণ্যসভ্যতায়, মোগল যুগের উন্মত্ত ক্ষমতালিপ্সার হানাহানিতে, শক্তিসামর্থ্যের দ্বন্দ্বে, প্রেমের ট্রাজিক পরিণামে, আরবের মরুচারী জীবনের নিরঙ্কুশ মত্ততায়। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যখন যেমন বিষয় কবি নিয়েছেন, উপমাচয়নে ভাষাভঙ্গিমায়, শব্দধ্বনির উত্থানে কিংবা প্রবহমানতায় কবিতার বিষয়েব সঙ্গে প্রকাশের ভাষার সমন্বয় ঘটেছে অনায়াসে। মৃত্যু ও নচিকেতার আবহ তৈরি করতে উপনিষদের ছোট-ছোট কথিকা, উপনিষদের বিশেষ শব্দ, চিত্রকল্প, বেদের প্রচলিত কাহিনী-প্রবাদ বিশ্বাস-সংস্কার —সব কিছু কবির কল্পনাকে একদিকে সমুচ্চতা আর একদিকে বিস্তৃতি দিয়েছে। অগ্নিবৈশ্বানর-এর মতো কবিতা যে কেউ যে কোনো সময়ে লিখতে পারবেন না। মৃত্যু ও নচিকেতা ও অগ্নিবৈশ্বানর লিখতে কবিকে দীর্ঘকাল বৈদিক জীবনের সুর ও ছন্দকে ধরবার জন্য অধ্যয়ন

করতে হয়েছে সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল কবিকে সেই ভাবের জগতে বাস করতে হয়েছে—তবেই এমন বাকপ্রতিমা এমন প্রকাশভঙ্গিমা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পেরেছে। প্রতিভার সঙ্গে শ্রমের মিশ্রণে জন্ম হয় মহাকাব্যের মতো শিল্পের। মোহিতলালের মৃত্যু ও নচিকেতা সেই বিশ্বাসই জন্মায়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি মনে আসে। সত্যকাম-জবালার সেই কাহিনী রবীন্দ্রনাথের হাতে চিরশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে উপনিষদের কালটি পুনর্জীবিত হয়েছে। তবু মোহিতলালের কবিতায় ঋগ্বেদ এবং উপনিষদের বহু প্রসঙ্গ ও বর্ণনারীতির স্বাভাবিক বিন্যাসের ফলে কবিতা বিস্ময়কর বলেই মনে হবে। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের মোগল ইতিহাসের এবং মুশলিম সংস্কৃতির পুনঃসৃষ্টিতে ফার্সি ভাষা, চিন্তা ও কল্পনাভঙ্গি প্রয়োগের দক্ষতাও তেমনিই বিস্ময়কর।

কবিশক্তির এই দুই প্রকৃতি—লিরিক এবং এপিক—মোহিতলালের বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্ব বিস্মরণী কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের সময়েই মোহিতলাল কবিতার 'ফর্ম' সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন—তাঁর পরবর্তী কাব্য স্মর-গরলের ভূমিকায় দেখা যায় সেই চিন্তাই কবিকে অধিকার করেছে। সত্য সত্যই বিস্মরণীর কবিতাগুলিতে বাণীবয়নের বহিরঙ্গ মনোযোগ এবং সতর্কতা যেমন দেখা যায়—সেই বহিরঙ্গ রূপকে ভাব ও চিন্তার অতিকথন ও অকারণ কথন-বর্জিত সুপরিমিত প্রকাশেও অনিবার্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। একে বলা যায়, ক্ল্যাসিক্যাল রীতি। মোহিতলালের রোমান্টিক আবেগ এই ক্ল্যাসিক্যাল বন্ধনে সুডৌল। বিস্মরণী কাব্যের একটি বিশেষত্ব এখানে।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'স্মর-গরল'। এই বইয়ের প্রথম কবিতার নামেই কাব্যগ্রন্থের নাম। 'স্মর-গরল' শব্দটি নেওয়া হয়েছে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের দশম সর্গ থেকে :

স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো
হরতি তদুপাহিত-বিকারম্ ॥

'স্মর-গরল' শব্দটির অর্থ কামবিষ। গীতগোবিন্দে কামবিষকে খণ্ডন করতেই কৃষ্ণ প্রার্থনা করেছেন রাধিকার পদপল্লব। রাধিকার পদপল্লবস্পর্শে কৃষ্ণের অন্তরের কামনার জ্বালা নির্বাপিত হবে। গীতগোবিন্দের বালবোধিনী টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'কামক্লেশ এব দারুণোঽরুণঃ সূর্যঃ ময়ি জ্বলতি, অতস্তেনোপাহিতবিকারং হরতু'—আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলছে, তোমার চরণস্পর্শে সে বিকার দূর হোক। গীতগোবিন্দের সম্পূর্ণ শব্দ 'স্মর-গরলখণ্ডন'। মোহিতলাল কেবল 'স্মরগরল'-অংশটুকু গ্রহণ করেছেন—কবি কামবিষের খণ্ডন চান নি, চেয়েছেন শুধু কামবিষকেই। কবিতায় বারবার উচ্চারণ করেছেন, সেই কামনারই কথা।

বিস্মরণী কাব্য থেকেই এর সূত্রপাত। 'পান্থ'-এ কবি বলেছিলেন, 'সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির মরণপিপাসা'। শোপেনহাওয়ার জগতের আদিম আকর্ষণের নাম দিয়েছিলেন, 'উইল'। আমাদের ঋগ্‌বেদেও সেই আদি কামনাকেই বলা হয়েছিল, কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি। মোহিতলাল নরনারীর প্রেমকে সেই আদি কামনারই একটি অভিব্যক্তি বলে ভেবেছেন। এই আদি কামনা

আছে বলেই জীবের বেঁচে থাকার ইচ্ছা—সৃষ্টির রক্ষা এবং বিকাশ। এই ইচ্ছার টানেই মানুষ পৃথিবী ও জগৎকে ভালোবাসে। এই তত্ত্বটি মোহিতলালের 'স্মর-গরল' কাব্যের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি সহজিয়াতন্ত্রেরও মূল কথা। রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণে তার প্রকাশ। সহজিয়া সাধনা যে কাব্যরূপ পেয়েছে গীতগোবিন্দে, তাতে 'স্মর' বা কামকে খণ্ডন করে উত্তীর্ণ হবার প্রার্থনা শুনি কৃষ্ণের মুখে। মোহিতলাল 'স্মর-গরল' কবিতাটিতে দেহের দেহলীতে মদনের দেউল রচনা করেও শেষে চিরন্তন অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলছেন। তিনি বলেছেন, 'মোর কামকলা—কেলি উল্লাস নহে মিলনের মিথুন-বিলাস'। এর দ্বারাই বোঝা যায়, দেহসম্ভোগের রূপরস রচনাই তাঁর কবিধর্ম নয়। অথচ তিনিই আবার বলছেন,

> দেহ-অরণিরে মন্থন করি লভি যে অগ্নি-কণা—
> সেই দহনের মিঠা বিষে মোর মদনের আরাধনা !

এই আপাতবৈষম্যটিকে বোঝাবার জন্য স্মর-গরল কাব্যের পশ্চাৎপটটি স্মরণ করা যেতে পারে। স্মর-গরল কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩৬ সালে। বিস্মরণীর (১৯২৭) পর দশ বৎসরের কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। অবশ্য এই সময়ে এমন কিছু কবিতাও ছিল, যেগুলি পরবর্তী হেমন্ত-গোধূলি কাব্যে (১৩৪৮) সংগৃহীত হয়েছে। বিস্মরণী প্রকাশের পরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হয়ে যান। ১৯২৮-এর জুলাই মাসে ঢাকা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত মোহিতলাল কলকাতার এক সাহিত্যিক ঝোড়ো পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করে গিয়েছেন। কল্লোল প্রকাশের পর থেকেই বাংলা কবিতায় ও গল্পে বাস্তবতা-প্রবর্তনের হাওয়া এল।[১৭] একদিকে সমাজ-জীবনের বাস্তবতা আর-একদিকে যৌন বাস্তবতার নগ্ন প্রসার ঘটল—যাকে প্রতিহত করবার চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল শনিবারের চিঠি। তখনকার তরুণ সাহিত্যিকরা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করছিলেন যে, রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক কল্পনার দিন বিলীয়মান—এখন এসেছে বাস্তব-জীবনকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার যুগ। তাঁরাও জীবনের কথাই বলছিলেন। এই বিষয়ের বর্ণনায় সময়ক্ষেপ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। লক্ষণীয় এই যে, মোহিতলাল প্রথম দিকে এঁদেরই অন্যতম ছিলেন।

বিস্মরণীর কিছু কবিতা এবং স্মর-গরলের কিছু কবিতা যা এই সাহিত্যিক আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি পড়লে দেখা যায়, মানুষের কামপ্রবৃত্তিকে কবিতায় গ্রহণ করে তিনি জীবনের সত্যকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কল্লোলে বেরিয়েছিল তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'পান্থ' (ভাদ্র, ১৩৩২), 'প্রেতপুরী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২)। কালিকলমে বেরিয়েছিল 'নাগার্জুন' (বৈশাখ ১৩৩৩), 'নারীবন্দনা' (আষাঢ় ১৩৩৩)। কালিকলমে আরও কয়েকটি কবিতা বেরিয়েছিল—তার মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'স্মরগরল' (বৈশাখ, ১৩৩৪)। *এসব কবিতার বেশ কিছু পঙক্তি অশ্লীল বলে গণ্য হতে পারে। দেহ-বাস্তবতাকে এমন অকুণ্ঠ* প্রকাশ করায় মোহিতলাল যেন রবীন্দ্র-যুগের সংস্কারকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। এজন্যই তিনি সেকালের আধুনিক লেখকদের মধ্যে সমাদৃত হয়েছিলেন 'আধুনিকোত্তম' বলে। মোহিতলাল

১৭ সময়টি বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের। এ সময়ের ইতিহাস পাওয়া যাবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ', সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি', জীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থে।

কবিতায় এবং অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ গুপ্ত-প্রভৃতি কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের গল্পে-উপন্যাসে বাস্তব-জীবনের সত্যকে অসঙ্কোচে রূপ দিতে লাগলেন। এই বাস্তবতা-চিত্রণের আতিশয্য রবীন্দ্রনাথকেও চিন্তিত করে তুলল। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখলেন,

'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখনকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ। ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য ; যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুতাটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।'[১৮]

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর তৎকালীন তরুণ লেখকদের মধ্যে নানা বাদ-বিতর্ক উপস্থিত হয়। তার কয়েক মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'যাত্রীর ডায়ারি'। তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন,

'আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, একথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে-মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে, তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এই জন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই।'[১৯]

ইতিপূর্বে মোহিতলালের 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, স্মর-গরলের বেশ কিছু কবিতাও বেরিয়েছে—যার মধ্যে এমন-কিছু ছিল যাকে বে-আব্রুতা বলা যেতে পারে। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের কবিতার পৌরুষ-চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি বলেছেন, 'পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে ; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই।' মোহিতলালের কবিতায় তিনি দেখেছিলেন জীবনের খণ্ডতা নয়, জীবনের সমগ্রতা দেখবার সাহস। বস্তুত বে-আব্রুতার অভিযোগ মোহিতলালের কাব্য-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয় এই জন্যেই। তিনি জীবনের যে সমগ্রতাকে দেখেছেন সেটা দেহধর্মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে—কোনো খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে। মোহিতলাল সেকালের শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেও এই কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

'মানুষের প্রাণের মধ্যে সত্যকার সাড়া না জাগিলে কোন সত্যবস্তুর জন্ম হয় না, এই সাড়া জাগে বাস্তবজীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নায়। সাহিত্যও শুধু রস-রূপের ধ্যান নয়—তাহা দেহ-চেতনাহীন আত্মার আনন্দগান নয় ; অতি নিবিড় ও গভীর দেহ-চেতনাই সাহিত্যের জন্মহেতু। সেই চেতনা দেহকে অতিক্রম করে বটে, তথাপি দেহের ভিতর দিয়াই তাহার জন্ম হয়। নিছক মনঃকল্পিত কোন বস্তুই মানুষের জীবনের সত্য হইতে পারে না।'[২০]

সেকালের তরুণ লেখকরা মোহিতলালকে তাঁদেরই একজন রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এই

১৮ 'সাহিত্যধর্ম' বিচিত্রা, ১৩৩৪ শ্রাবণ।

১৯ প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ। পরে 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে 'সাহিত্যের পথে'-গ্রন্থে সংকলিত।

২০ দ্রষ্টব্য : মোহিতলালের সাহিত্যবিতান, ১৩৪৯—'সাহিত্য ও যুগধর্ম' প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৩৪।

কারণে যে, মোহিতলাল দেহসত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—কিন্তু তিনি যে দেহবাস্তবতার মধ্যে বদ্ধ না থেকে নিত্য জীবনসত্যের সঙ্কেত দিয়েছেন, সেটা তাঁদের চোখে পড়ে নি। একই সঙ্গে মোহিতলাল যে রবীন্দ্রকাব্যে দেহসত্যকে গৌণ করে শুচিতার আতিশয্যে নির্বস্তুক হওয়ার প্রবণতাকেও সমালোচনা করেছেন, তাও স্মরণীয়। এই দেহচেতনা থেকেই মোহিতলালের কাব্যে কাম-প্রসঙ্গ এসে যায়। স্মর-গরল নামটি এই কারণেই তাৎপর্যবহ।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' এবং 'সাহিত্যে নবত্ব' সাহিত্যান্দোলনের ঝড়কে প্রশমিত করল না। অতঃপর বিদেশভ্রমণ থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা-ভবনে একটি সাহিত্যসভায় তরুণ ও অন্যান্য লেখকদের আহ্বান করলেন। ৪ এবং ৭ চৈত্র ১৩৩৪ (১৯২৮-এর মার্চ মাসের শেষে) সেই সভা বসল। তখন নীরদচন্দ্র চৌধুরী শনিবারের চিঠির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন। এই সভায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং মোহিতলাল দুজনেই ছিলেন। সেখানে মোহিতলাল কোনো কথা বলেছিলেন বলে মনে হয় না। শনিবারের চিঠির পক্ষে যা বলবার নীরদচন্দ্রই বলেছিলেন। তিনি লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায় : 'On the whole we came back satisfied.'[২১]

এপ্রিল মাসে এই সভার অনুষ্ঠান হয়। জুলাই মাসেই (১৯২৮) মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করে কলকাতা ত্যাগ করেন। শনিবারের চিঠির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। কিন্তু কবিতা নয়, সাহিত্যের নীতি-আদর্শ-প্রকৃতি-ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধগুলি শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হতে থাকে। সেই প্রবন্ধগুলি পরে 'সাহিত্য-কথা' নামে গ্রন্থভুক্ত হয়।

স্মর-গরলের কবিমানসকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে বাংলা সাহিত্যের এই আদর্শগত দ্বন্দ্বের পটভূমিকাকে মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-বাস্তববাদ বা রিয়ালিজ্‌মের হাওয়া এসেছে, মোহিতলালের 'বিস্মরণী' ও 'স্মর-গরল' তার থেকে মুক্ত ছিল না। মোহিতলালের সমকালীন অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, করুণানিধান-প্রমুখের কাব্যে এ ধরনের বাস্তববাদ ছিল না। বরং তুলনা করলে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অজিত দত্তের কবিতায় তা পাওয়া যাবে। দেহ নিয়ে এরা পাঠকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। এই রিয়ালিজ্‌মের পাশ্চাত্য সাহিত্যরূপ একালের তরুণ লেখকদের সম্মুখেই ছিল। এই রিয়ালিজ্‌মকে তাঁরা কতটা শেকস্‌পীয়রীয় জীবনবোধের পর্যায়ে তুলতে পেরেছিলেন, সে সম্বন্ধে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু মোহিতলাল য়ুরোপীয় সাহিত্য ও চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমুন্নত জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন—তাঁর কবিতায় এবং প্রবন্ধের বক্তব্যেই তা প্রমাণিত। কামনার যে-তত্ত্বটি মোহিতলালের জীবনকল্পনার মর্মে নিহিত, তার সঙ্গে শোপেনহাউয়ারের The World As Will and Idea-র যোগ থাকাই সম্ভব। বিস্মরণীর 'পান্থ' শোপেনহাউয়ারের চিন্তার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া। আবার 'স্মর-গরল' কাব্যের 'নারীস্তোত্র'-র ভাবটি যদি শোপেনহাউয়ারের The Woman-এর ভাবের দ্বারা প্রাথমিক ভাবে প্রণোদিত হয়ে থাকে, তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। The woman

২১ নীরদচন্দ্র চৌধুরী, (Thy Hand Great Anarch ! (Chatto and Windus, London, 1987) পৃ. ২২৯। এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে (A Literary Campaign) এই সময়ের শনিবারের চিঠি-র সঙ্গে নীরদচন্দ্রের যোগের বিবরণ আছে। মোহিতলাল যে বিচিত্রা-ভবনের সভায় উপস্থিত ছিলেন এখানেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাহিত্যিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী) ২৩ খণ্ড, পৃ. ৫০৩-৫১২।

pays the debt of life not by what she does but by what she suffers —এই উক্তি মোহিতলাল একাধিক স্থলেই ব্যবহার করেছেন। শোপেনহাউয়ার নারী-বিদ্বেষী ছিলেন। নারীকে তিনি তাঁর কল্পিত জগত্তত্ত্বের প্রতীক রূপে দেখিয়েছেন। দার্শনিকের মুমুক্ষা মোহিতলালের ছিল না—কামরূপা নারীর বন্দনাই নারীস্তোত্রে উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের দেশের তন্ত্রের প্রকৃতি-তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল। মোহিতলাল বলছেন,

নমি সেই মানবীরে— দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা ;
চিনেছি তোমারে, নারী, অয়ি মুগ্ধা মর্ত্য-মায়াবিনী!

এভাবে নারী-প্রকৃতিকে আধুনিক কবিরা কেউ দেখেছিলেন কিনা সন্দেহ। এই দেখার মধ্যে যে তত্ত্ব-প্রবণতা আছে তা অবশ্যই অস্বীকার্য নয়। কবিতা হিসাবে এর সার্থকতা এই যে, যাকে আমাদের কাছে তত্ত্ব বলে মনে হয়, সেটা কবির চেতনা থেকে প্রবল বিশ্বাস ও উপলব্ধিরূপে নানা উপমায়-উৎপ্রেক্ষায় পুরাণ ও ইতিহাসের স্মৃতিতে গম্ভীর ও সমুজ্জ্বল হয়েছে। কবির বস্তুপঠনশীলতার পরিচয় আছে এই কবিতায়—কিন্তু নারীপ্রকৃতির একটা মূল উপলব্ধি কবির মননকে আকর্ষণ করে স্তোত্রে পরিণত হয়েছে—এটাই এর বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের চিঠি থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

'আমার কবিতায় যে জ্ঞানের বা চিন্তার প্রাধান্য দেখিতে পাও তাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, তাহা প্রাণপুরুষের ঐকান্তিক আকূতিপ্রসূত—পরে তাহার সহিত কোন-একটা দার্শনিক তত্ত্বের আশ্চর্য মিল ঘটিয়াছে। জীবনকে যে অতিশয় গভীর ও গুরুতর উৎকণ্ঠার সহিত জানিতে চাহিবে, সে আপনার প্রাণের ভিতর হইতেই একটা তত্ত্বকে আশ্রয় না করিয়া পারে না। কিন্তু ঐ তত্ত্বের মূলে আছে সারা চৈতন্যের প্রাণশক্তির আকুল জিজ্ঞাসা। জীবনের রহস্য যেমন বিরাট তেমনই দুর্ভেদ্য—তাই প্রাণের সেই আকুল জিজ্ঞাসা কোনকালে নিবৃত্ত হয় না। আমি জীবনের যে রূপ দেখিয়াছি , তাহাকেই বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার বিষ ও অমৃত দুইই আমি সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়াছি এবং বিষকে হজম করিবার জন্য একটা তত্ত্ব নিজেই—মস্তিষ্ক নয়—প্রাণের অনুভূতি দ্বারা স্থির করিয়াছি।'[২২]

এমনি আর একটি কবিতা, 'বুদ্ধ'। এই কবিতাতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব-বিকাশ এবং পরিণামের ইতিহাসকে কবি আশ্চর্যভাবে নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যরূপ দিয়েছেন। নারীস্তোত্র (১৯২৭) এবং বুদ্ধ (১৯২৮)—ছয় মাসের ব্যবধানে লেখা। পাঠক ইতিহাসাশ্রিত বিষয় নিয়ে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সঙ্গে 'বুদ্ধ' কবিতাটির তুলনা করে দেখতে পারেন। বুদ্ধের ওই নির্বাণমুক্তির সাধনা তাঁর পৌরুষের মহত্তম প্রকাশ হলেও ওই সাধনা কবির নয়। বৌদ্ধ আদর্শের পরবর্তী ইতিহাসই প্রমাণ করেছে, যে-সাধনা জীবনবাস্তবহীন, সে সাধনা নিষ্ফল হয়। মহাশূন্যতার হাহাকার নয় প্রেমের পরম পূর্ণতাতেই জীবনের সার্থকতা।

জীবন ও প্রেমের এই তত্ত্বের উন্মেষ দেখা গিয়েছিল স্বপন-পসারীতেই সে কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিস্মরণীতে সেটি স্পষ্টতর হয়েছে। স্মর-গরলে সেটা তত্ত্ব হয়ে

২২ মোহিতলালের প্রবন্ধগুচ্ছ, পৃ. ৮৩। পত্রের তারিখ ১৫ জুলাই, ১৯৪৭।

উঠেছে। 'প্রেম ও জীবন' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭) কবিতাতেও কবি গোবিন্দদাসের পদের একটি পঙক্তি 'চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত' অবলম্বন করে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং প্রেমের পরম আশ্রয়ের ভাবনাটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ক্ষণস্থায়ী দুরন্ত জীবনে প্রেমই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা—স্মর-গরলের একটি কবিতায় সেই কথাটাই একমাত্র বক্তব্য হয়ে উঠেছে। কবিতাটির নাম 'শেষ-শিক্ষা'।

পায় নাই ভালবাসা কেহ কভু এ মর্ত্ত্য-আবাসে—
মিথ্যা কথা! ধরণী যে প্রেম, প্রীতি, স্নেহের নিলয়!
বাসে নাই ভাল কারে যে অভাগা—তারি দীর্ঘশ্বাসে
দিনান্তে ডুবিছে রবি—

স্মর-গরল কাব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতা কবির কাব্যধর্মকে বিষয় করে—প্রথম কবিতা স্মর-গরল, দ্বিতীয় রূপমোহ এবং তৃতীয় রতি ও আরতি। এই তিনটি কবিতারই বক্তব্য কাব্যসৃষ্টির তত্ত্ব। 'স্মর-গরল' কবিতার তত্ত্বটা কি সেটা আগেই আলোচনা করেছি। 'দেহেরি মাঝারে দেহাতীত' বললে বিদ্যাপতির সেই বিখ্যাত পঙক্তিটাই মনে পড়ে যায়—'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' রবীন্দ্রনাথ ছন্দের এবং রসের আলোচনায় কাব্যের অনির্বচনীয়তার কথা বলেছেন। সীমার মধ্যে অসীমের কথা বলেছেন। মোহিতলাল এখানে দেহে থেকে দেহাতীতের ক্রন্দন শুনেছেন—সেটা ঠিক এই অর্থে নয়। এটা কোনো অধ্যাত্মপিপাসাও নয়। মোহিতলালের সমালোচনায় যেখানে বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের কথা বলা হয়েছে, (তিনি দুটি ইংরেজি শব্দ Particular এবং Universal ব্যবহার করতেন) এই কবিতাতে দেহ অর্থাৎ Particular এবং দেহাতীত অর্থাৎ Universal-কে তেমনি বোঝাতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, হ্যামলেট একটি বিশেষ দেশকালের চরিত্র হয়েও মানবত্বের দিক দিয়ে দেশকালবদ্ধ নয়। স্মর-গরল কোন সাহিত্য-বিতর্কের মধ্যে রচিত হয়েছিল, সেটা মনে রাখতে হবে।

'রূপমোহ' কবিতাতে বক্তব্য কবির রূপসাধনা। রূপসৃষ্টিই যে কবির প্রধান কাজ সমালোচক হিসাবে তাঁর সেটাই ছিল অন্যতম মুখ্য বক্তব্য। এই কবিতাতে তিনি বলছেন, কবির দুটি সত্তা—একটি কবিসত্তা, আর একটি ব্যক্তিসত্তা। ব্যক্তি জীবন থেকে রূপরসের স্মৃতি সঞ্চয় করেন—আর কবি তাকে নতুন করে রূপ দেন। কবি যে রূপসৃষ্টি করেন তার মধ্যে ভোগের স্থূলতা নেই। সেইজন্য কবি হন নির্লিপ্ত উদাসীন, আর ব্যক্তি-কবি বিস্মিত হয়ে দেখেন তাঁর কল্পনার মানসী 'স্বপ্নশেষ-প্রেম-মরীচিকা'। এই দুই সত্তার কথা 'রতি ও আরতি' কবিতাতে আরও স্পষ্ট। 'দুঁহু দোঁহা ভুঞ্জে শুধু, দুই-আমি এক-আমি হয়' কবিতাসৃষ্টির মুহূর্তে।

যে প্রতিভা শব্দ-বন্ধে ছন্দস্পন্দে রূপ দেয় চঞ্চল তরলে,
ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে
সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে—

কবি ও কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে শেকস্‌পীয়রের বিখ্যাত উক্তির সঙ্গে এর মিল—

The poet's eye in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

কাব্যতত্ত্ব এই কবিতাগুলির বিষয় বলেই এতে এমন সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা তত্ত্বালোচনাতেই স্বাভাবিক—যেমন দেহ, আত্মা, শব্দ, স্পর্শ, রাগ, রস, গন্ধ দুই-আমি। এসব শব্দ ভাবানুভূতির চেয়ে তত্ত্বানুভূতিই জাগিয়ে তোলে।

স্মর-গরল কাব্যগ্রন্থে এছাড়া কয়েকটি বিশুদ্ধ গীতিকবিতা বা লিরিক আছে—আর আছে, সনেটগুচ্ছ। এই কাব্যের একটা ভাগই সনেট। সনেট রচনায় মোহিতলালের সাফল্য সর্বস্বীকৃত। এ-সম্বন্ধে আমরা আলাদা আলোচনা করব।

এই কাব্যগ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মোহিতলাল দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতেই বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

'স্মর-গরলের কবিতাগুলিতে আমার নিজস্ব স্টাইল আরও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সে স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ইংরেজিতে যাহাকে রচনার 'form' বলে, তাহাই এতদিনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস।'

মোহিতলাল অবশ্য বলেছেন, ইংরেজি form কথাটার ঠিক সাহিত্যিক তাৎপর্য বোঝাবার মতো শব্দ বাংলায় নেই। কিন্তু ঠিক সেই অর্থে তাঁর কবিতার রূপ-নির্মাণ সার্থকভাবেই করতে পেরেছেন এই কাব্যে। কবিতার রূপনির্মাণ সম্বন্ধে মোহিতলাল যে আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, স্বভাবতই সে-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে গুরুত্ব বিবেচনা করেই। তবে একটা বিষয় পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, স্মর-গরল কাব্যের কবিতায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট গভীর। এই কাব্যের অনেক কবিতাই ইংরেজি কবিতা বা সাহিত্যের ভাবানুসরণে রচিত। কবিতার গঠনরূপ যেমন ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত, ভাবের দিক দিয়েও অনেক কবিতাই বিদেশী ভাবনা-কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত। মোহিতলালের কবিতায় য়ুরোপীয় ভাবকল্পনার ছায়া অবশ্য স্বপন-পসারী থেকেই লক্ষ্য করা যায়। উচ্চৈঃশ্রবা ভিক্টর হিউগোর কবিতার অনুসরণে। নাট্যকাব্যগুলির টেকনিক ব্রাউনিঙের কবিতার মনোলগের অনুরূপ—কয়েকটি কবিতায় স্পষ্টতই উল্লেখ পাওয়া যায় 'সুইনবার্নের অনুসরণে' বলে। বিস্মরণী থেকেই স্পেনসারিয়ান পদবন্ধের অনুসরণ দেখা গেল। রোমান্টিকদের মানসী-কল্পনা 'মানসলক্ষ্মী' কবিতায়, স্মর-গরলের 'রতি ও আরতি' কবিতায়, ওড ও সনেট শ্রেণীর কবিতা বিস্মরণী থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ ভাবে মনে হয়, বিস্মরণী ও স্মর-গরলের কবিতায় কল্পনার সংযম প্রকাশ পেয়েছে ভাষার গাঢ়বদ্ধতায়, সুচিন্তিত এবং সতর্ক শব্দনির্বাচনে। এই সংযম এবং পরিমিতি-বোধ ইংরেজি কবিতার আদর্শ অনুসরণ করার ফলেই সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়। এ কথাও সাহস করে বলা যায়, সমকালে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের অতিকথন বা ভাবাতিরিক্ত প্রকাশ-চাপল্য তাঁর ছিল না। এ-বিষয়ে নজরুল ইসলামের কবিতা বোধহয় আবেগ ও উচ্ছ্বাসে আর সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। মোহিতলাল যে-সময়ে কবিতা লিখছিলেন, সে-সময়ের তরুণ কবিরাও যে বিদেশী ভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। মোহিতলালও

হয়েছিলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়, শুধু যে শেলী, ব্রাউনিং, ল্যাণ্ডর, কোলরিজ-প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের প্রভাব তাঁর মধ্যে পড়েছিল তা নয়—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইংরেজ কবি মরিস, ক্রিশ্চিনা রসেটি, সুইনবার্ন এ-সব প্রিরাফায়লাইট কবিদের কবিতার অনুবাদ-অনুসরণ মোহিতলালের কাব্যে সুলভ। এমন কি রবীন্দ্র-পরবর্তী তরুণ কবিরা যে-সব কন্টিনেন্টাল কবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, সেই বোদলেয়ার, ম্যালার্মে, রুপার্ট ব্রুক, হাইনে, জন সিলভেষ্টার ভিরেক প্রভৃতি-কবিরাও মোহিতলালকে আকর্ষণ করেছিলেন। হেমন্ত-গোধূলি কাব্যে এ রকম সোজাসুজি অনুবাদ-অনুসরণের অনেক কবিতা সংগৃহীত আছে। টেনিসনের তিনি ভক্ত ছিলেন—'শ্যালট-বাসিনী' কবিতাটি টেনিসনের The Princess-কাব্য থেকেই নেওয়া। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার প্রিয় কবি ছিলেন তিনজন Tennyson, Keats ও Landor.'[২৩]

মোহিতলালের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ হেমন্ত-গোধূলি বেরিয়েছিল ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে। এতে সদ্যরচিত কবিতা তেমন কিছু ছিল না। এর অনেক কবিতাই স্মর-গরলের যুগের লেখা। এমন কি নাগার্জুন (কালিকলম, ১৩৩৩), প্রেতপুরী (কল্লোল, অগ্রহায়ণ ১৩৩২), শরাবখানা (ভারতী, চৈত্র ১৩৩০), এবং আরও সে-সময়কার রচিত কবিতা হেমন্ত-গোধূলি কাব্যে বহুকাল পর সংকলিত হল। অথচ নাগার্জুন, প্রেতপুরী এবং উত্তরায় প্রকাশিত তীর্থ-পথিক কবিতা তিনটি খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। কবিতাগুলি সেকালের তরুণদের প্রায় উন্মত্ত করে তুলেছিল। অথচ বিস্মরণী বা স্মর-গরলে *মোহিতলাল এদের গ্রহণ করেন নি।*

এই তিনটি কবিতা (তীর্থপথিক কবির জীবিতকালে অসংকলিত) বাদ দিলে হেমন্ত-গোধূলি কাব্য সুরের দিক দিয়ে কবির পূর্বতন কাব্য থেকে আলাদা। এই কাব্যে আর সেই দুর্ধর্ষ জীবনচিন্তা নেই, কামনার সেই উদ্দামতা নেই, দেহতন্ত্রের ঝঙ্কৃত উন্মাদনা নেই, তত্ত্বের অভিমুখিনতা নেই। বিস্মরণী-স্মর-গরলের যুগে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী সত্যসাধক— 'সুন্দরে হানো সত্যের শূল টুটাও স্বপন হে নির্দয়।' হেমন্ত-গোধূলিতে কবির উদাত্ত কণ্ঠ শান্ত হয়ে এসেছে—অতীতের বিদ্রোহ স্মৃতি-রোমন্থনে পরিণত হয়েছে। কবি এখন বিরাম-শান্তি এমন কি নির্বেদলাভের প্রয়াসী। হেমন্ত-গোধূলি নামের কবিতাতে কবি উন্মত্ত যৌবনের শেষে শান্ত বিরামই আকাঙ্ক্ষা করেছেন :

> ফুটেছিল যারা যৌবন-বৈশাখে
> রৌদ্রমদিরা পান করি শাখে-শাখে
> যত তাপ তত সরস যাদের তনু
>   হাসিতে যাহারা হাহাকার ঢেকে রাখে—
> তারা নাই আজ, ভয় নাই—এস তুমি...

এই কাব্যে উপরে কথিত মাদকতাপূর্ণ তিনটি কবিতা ছাড়া আর কোনো কবিতাতেই মহাকাব্যিক কল্পনা, কঠিন সংহত প্রকাশ-ভাষা, সেই গাম্ভীর্য ও তত্ত্বপ্রবণতা নেই। এই কাব্যের কবিতাগুলি নিভৃত কবিকণ্ঠের আত্মগুঞ্জন। কবি নিজের জীবনের অতীত সুখ-দুঃখ-বেদনারই রোমন্থন করে

---

২৩ অবশ্য কবি এই প্রসঙ্গে যে-কথাটি বলেছেন ('আমি Swinburne পড়িয়াছি অনেক বেশি বয়সে বিস্মরণীরও পরে)—তার মানে ঠিক বোঝা গেল না। বিস্মরণীতেই 'সুইনবার্নের অনুসরণে' কবিতা আছে।

চলেছেন। এইজন্য এ-কাব্যের লিরিক সৃ [illegible] এক [illegible] স্বপন-পসারীর লিরিসিজ্‌মের সঙ্গেও এর মিল নেই। স্বপন-পসারীতে কবি জী[illegible]গের উল্লাসে আত্মহারা। হেমন্ত-গোধূলিতে কিছু নির্লিপ্ততা ও প্রশান্তি এসেছে। স্বপন-পসারীর বৈচিত্র্যও এতে নেই। কবি তাঁর চারটি কাব্যের বিবর্তন-ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন—

'স্বপন-পসারী হইতে স্মর-গরল পর্যন্ত ঐ Romantic এবং Classical দুই ধারার যুগ্মস্রোত লক্ষ্য করা যাইবে। 'স্বপন-পসারী'তে Romantic-এর প্রাধান্য, স্মর-গরলে Cassical-এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ; 'বিস্মরণী'তে দুই-এরই একটা সাম্যভাব। হেমন্ত-গোধূলিতে কবির ব্যক্তিগত আত্মপরিচয়—উহা অতিশয় lyrical ; যদিও উহার ভাষা ও রচনাভঙ্গীতে সেই classical সংযম অতিমাত্রায় লক্ষিত হইবে।'[২৪]

বিস্মরণী স্মর-গরলের পর হেমন্ত-গোধূলি পড়লে মনে হয়, জীবনে যে ঝড় এসেছিল, এবার সেই ঝড় থেমে গিয়েছে—ঔদ্ধত্য-অবিনয় আর নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জীবনের প্রতি কবির বৈরাগ্য এসেছে। শান্ত সুর ধ্বনিত হলেও প্রেম, সৌন্দর্য, প্রকৃতির বিস্ময়, মানুষের আত্মদানের মহিমা কবিকে এখনও জীবনের প্রতি আকর্ষণ করে চলেছে। 'অজ্ঞান' কবিতায় তিনি বলছেন,

> তোমার করুণ আঁখি সাধিল যে বিষমধু
> করিবারে পান,
> তাহারি অসীম জ্বালা পীরিতির সুখাবেশে
> করিল অজ্ঞান!

স্মর-গরলকেই কবি এখানে বলেছেন বিষমধু। সেই বিষমধু পান করে কবি আজও বিভোর হয়ে আছেন। সেই জন্যই হেমন্ত-গোধূলির কবিতাগুলি নিটোল গীতিকবিতা—এর বিষয় এখনও সেই মর্ত্যপ্রেম।

এই কাব্যের কবিতাগুলি বড়ো প্রায় কোনটাই নয়। তত্ত্বের আভাসও কোনোটাতেই নেই। এর পরিমিত গঠন, পঙক্তি-শেষের নিখুঁত মিল, ভাষার সংযম দিয়েই এর ক্ল্যাসিক্যাল চরিত্রটি প্রমাণিত। হেমন্ত-গোধূলির কবিতা যখন লেখা হচ্ছিল, তখন বাংলা কাব্যে গদ্যছন্দ এসে গিয়েছে—জীবনানন্দ প্রকাশের নতুন শিল্পপদ্ধতি খুঁজছেন, বুদ্ধদেব বসু কঙ্কাবতীতে তরল দেহতন্ত্রী প্রেমের উচ্ছ্বাসে মগ্ন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নতুন শব্দের সন্ধান করতে গিয়ে অপ্রচলিত প্রয়োগের দিকে ঝুঁকেছেন, অমিয় চক্রবর্তী এনেছেন স্প্রাং রিদ্‌ম। এ সময়ে বাংলা কাব্যে অভিনবত্বের নানা পরীক্ষা চলছে। মোহিতলাল প্রগতিতে একটি সনেট লিখেছিলেন—তার নাম 'শ্রাবণ-শর্বরী'। সনেটটি সুন্দর কিন্তু অভিনব কিছু নয়। এই সব আধুনিক লেখকরা অত্যন্ত সচেতনভাবেই তখন প্রথাগত কাব্যভাষা পরিহার করে মৌখিক ভঙ্গিমার প্রবর্তন করবার চেষ্টা করছিলেন। এই নতুনত্ব কোনো দিক দিয়েই মোহিতলালকে স্পর্শ করে নি। এই আধুনিক কবিরা যেমন কাব্যভাষার পরিবর্তন আনছিলেন, তেমনি কাব্যরূপেরও পরিবর্তন নিয়ে আসছিলেন। বোধহয় একমাত্র সনেট ছাড়া পূর্বতন যুগের মিলের কৌশল, পদবন্ধের নানা গঠন—এসবের আদর্শেও তাঁরা বাঁধা থাক্‌তে চাইলেন না। অজিত দত্তের সনেটে ও পদবন্ধে মোহিতলালীয় আদর্শ রক্ষিত ছিল।

২৪ মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ। পৃ. ৮৫।

রবীন্দ্রযুগের মোহিতলাল-সমকালীন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হেমন্ত-গোধূলির কালেও কবিতা লিখছেন। এঁরা কাব্যভাষার পরিবর্তনের খেলায় যোগ দেন নি। পল্লীবাংলার বা বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব সৌন্দর্য থেকেও বিচ্যুত হন নি। মোহিতলালের সঙ্গে এঁদের যে যোগ ছিল ব্যক্তিগত ও সাহিত্যগতভাবে, সে যোগ অব্যাহত ছিল—তবু হেমন্ত-গোধূলিতেও মোহিতলাল নিছক প্রথানুগামী ছিলেন না। তিনি প্রচুর সনেট রচনা করেছেন। সনেটেই তাঁর কবিপ্রকৃতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। তীব্র অনুভূতি ও পঙক্তিবিন্যাসের সতর্কতায় তাঁর রোমান্টিক আবেগ সংযত হতে জানত। এই বিশেষত্বটি মোহিতলালের মতো কেউ দেখাতে পারেন নি। কিন্তু ভাষার শুচিতা, অলঙ্কার ও মিলের মাধুর্য, ছন্দের স্পন্দনলীলায় মোহিতলাল ছিলেন এঁদেরই সমধর্মী। হেমন্ত-গোধূলির কবিতা পড়লে এসব দিক দিয়ে এঁদের সঙ্গে তাঁকে একগোত্রের বলেই মনে হবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোহিতলাল স্বতন্ত্র, উচ্ছলতাহীন জীবনপ্রীতির ভাবগভীর আকর্ষণে। তিনি যেমন তরুণ আধুনিকদের মতো বাস্তবতা নিয়ে ব্যস্ত হন নি, তাঁদের ভাষাগত পরীক্ষা তাঁকে একেবারেই আকর্ষণ করে নি—তেমনি তাঁর বন্ধু-কবিদের অভিজ্ঞতার বদ্ধতাও তাঁকে বদ্ধ করতে পারে নি। হেমন্ত-গোধূলিতে ঈশ্বর বা অধ্যাত্ম-বিষয়ক কবিতা একটিও নেই। 'গঙ্গার তীর' নামে সুন্দর একটি কবিতা আছে, জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'কেই মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙালির সংসারজীবন বা পল্লীজীবন নিয়েও কবিতা নেই। মোহিতলালের আত্মমগ্ন কবিতাগুলিতে শোনা যায় তাঁর একান্ত নিজস্ব মনোজীবনের দীর্ঘশ্বাস—মর্ত্য-জীবনের প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসার উচ্চারণ। এ দিক দিয়ে মোহিতলাল তাঁর পূর্বাগত জীবননিষ্ঠাকে অম্লান রেখেছেন। তাঁর কবিতা ক্ল্যাসিক্যাল প্রসাধন-কলায় সজ্জিত এবং তাঁর নবীনত্ব অক্ষুণ্ণ।

হেমন্ত-গোধূলির আর একটি বৈশিষ্ট্য : মোহিতলাল প্রচুর বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে যেমন সুপরিচিত কবি আছেন, তেমনি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত কবিও আছেন। এই কাব্যের অনেকটাই জুড়ে আছে অনুবাদ কবিতা। সব কবিতাই উৎকৃষ্ট বলেই করেছিলেন তা হয় তো নয়। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মতোই সংস্কারমুক্ত হয়েই তিনি এই অনুবাদের পরীক্ষা করেছেন। অর্থাৎ রসের জন্যই হোক, চাতুর্যের জন্যই হোক, রোমান্টিক প্রবণতার জন্যই হোক, অনুবাদের পরীক্ষণের জন্যই হোক—কবিতাপ্রীতির ফলেই মোহিতলাল এতগুলি কবিতার অনুবাদ করেছেন। এদিক দিয়েও তাঁর কবিপ্রকৃতি তাঁর সতীর্থ কবিদের মধ্যে স্বতন্ত্র। হেমন্ত-গোধূলির ভূমিকাটি প্রায় সবটাই অনুবাদ-কবিতা নিয়ে। বিস্মরণী-স্মর-গরলের যুগে লেখা তিনটি কবিতা 'নাগার্জুন', 'প্রেতপুরী' এবং 'তীর্থপথে' মার্কিন কবি জর্জ সিলভেস্টার ভিরেকের কবিতার অনুবাদ। ভিরেক এমন কিছু বিখ্যাত কবি ছিলেন না। কামনার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি, পুরুষের অতৃপ্তি, নারীর নারীত্ব-ক্ষুধার তীব্রতার জন্য কবিতা তিনটি মোহিতলালকে আকৃষ্ট ও অনুবাদে প্রণোদিত করে থাকবে। মুক্তক গঠনের এই কবিতা ভাষার সাধু গাম্ভীর্যে সংযত, কাম-ভাবনাটি কোথাও চপল হয়ে ওঠে নি। মোহিতলালের নিজস্ব স্টাইলে কবিতা রচিত—অনুবাদের গন্ধ কোথাও নেই। কবিতার শিরোনামগুলিও মৌলিক বলেই পাঠকের মনে হবে। মোহিতলালের অনুবাদ-কবিতার বৈচিত্র্যে বাঙালি সাহিত্যপাঠক বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা কবিতার সমানুভূতি অর্জন করল—এই অনুশীলন ছিল রবীন্দ্র-পরবর্তী তরুণ বাঙালি কবি বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ-প্রভৃতি কবিদের মধ্যেও। এক সময়ে বিদেশী কবিদের

অনুকারী বলেই বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমী সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর দ্বারা এঁরা উপহসিত হয়েছেন। মোহিতলাল কিন্তু বাঙালি কবির সাহিত্যসৃষ্টিকে বিদেশী কবির মানেই বিচার করে দেখেছেন।

শেষের দশ-বারো বছর মোহিতলাল কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মোটামুটি ১৯৩০ থেকে তিনি প্রবন্ধ রচনাতেই সম্পূর্ণ মন দিয়েছিলেন। তাঁর 'সাহিত্যকথা' (১৩৪৫) বইটি পর্যন্ত সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি য়ুরোপীয় জীবনতত্ত্বকে সাহিত্যের আদর্শ বলে মনে করেছেন।[২৫] তাঁর কবিতাতেও সেই দৃষ্টির জীবনতত্ত্বই প্রকাশিত হয়ে এসেছে। এদিক দিয়ে তাঁর সতীর্থ-কবিদের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের প্রবণতাতেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ১৯৪০-এর পর তাঁর গদ্যলেখাতে বঙ্গসংস্কৃতি, বাঙালি ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ তীব্র ও প্রকট হয়ে ওঠে। 'বাংলার নবযুগ' 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বইগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। কিন্তু কবিতা-রচনায়, সাহিত্যবিচারে য়ুরোপীয় আদর্শে তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল। 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৯৪৬) বইটিতে কবিতার রূপনির্মাণ-ব্যাখ্যায় তা স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে তিনি ঢাকায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। কবির প্রয়াণ-উপলক্ষে যে-দীর্ঘ কবিতা তিনি লিখেছেন, তা প্রকাশিত হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র রবীন্দ্র-প্রয়াণ সংখ্যায়। এতে মোহিতলালকে আবার দেখি স্মর-গরল যুগের সেই দীর্ঘ পদবন্ধের কবিতা লিখতে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু-বছর পর তিনি ঢাকা থেকে অবসর নিয়ে প্রথমে বাগনান পরে বড়িশায় চলে আসেন। এ-সময়ে শনিবারের চিঠিতে তিনি লিখতেন। কিন্তু পরে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৫২-তে মোহিতলাল প্রয়াত হলেন।

বঙ্গসংস্কৃতি এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যাদর্শের যে-দ্বন্দ্ব মোহিতলালের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, সে-সম্পর্কে আরও কিছু বলা যায়। স্মর-গরলের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৪-তে বেরিয়েছে। এই সংস্করণে কবি একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। এই ভূমিকায় তিনি দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন—একটি কবিতার রূপ, অন্যটি তাঁর কবিতার প্রেরণা। এই দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমার কবিতার বহিরঙ্গ বিলাতী কাব্যকলার অনুরূপ হইলেও, তাহা adaptation—তাহাও একরূপ সৃষ্টিকর্ম, তাহাতে কোনো অগৌরব নাই। কিন্তু কবিতার প্রেরণাও আমি য়ুরোপীয় কাব্য হইতে লাভ করিয়াছি, একথা সর্বৈব সত্য নহে। বরং, যে কবিতাগুলিতে ভাববস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাহা সম্পূর্ণ নিজস্ব, অর্থাৎ আমার বাঙ্গালী-সংস্কৃতি বা রক্তগত প্রেরণার ফল।' 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি' বলতে তিনি অবশ্যই তন্ত্র ও সহজিয়া সাধনার রক্তগত সংস্কারকেই বুঝিয়েছেন। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ উপযুক্ত গবেষকেরই কাজ। যে গভীর জীবনানুরাগ, কামনার জ্বালা, দেহধর্মের প্রবল স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের রহস্যকে ধরবার প্রয়াস মোহিতলালের কাব্যে দেখেছি, ভারতীয় সাহিত্যে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তা থাকলেও এক অধ্যাত্মমোহ সব কিছুকে ম্লান করে দেয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাঁর নিবিড় রসোপলব্ধির ব্যাপক পরিচয় তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। আমরা মনে রাখতে পারি, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আধুনিকদের যত নিকট তিনি ছিলেন, এ যুগের তরুণেতর কবিদের সঙ্গে তত একাত্ম তখন তিনি ছিলেন না।

কবিতার 'ফর্ম' বা রূপ নিয়ে মোহিতলাল তাঁর গদ্যপ্রবন্ধে বহু আলোচনা করেছেন। বস্তুত

২৫ সাহিত্যকথায় 'সাহিত্যে স্বরাজ' (১৩৩৮) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

'রূপ-তত্ত্ব'ই মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্ব বললে অনুচিত হবে না। সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তিনি তাঁর 'কবিতার বহিরঙ্গকে বিলাতী কাব্যকলার অনুরূপ' বলতে দ্বিধা করেন নি। এ বিষয়টা মোহিতলালের কবিতার আলোচনায় অত্যাবশ্যক। এমন সুগঠিত, সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত কাব্যরূপ নিরবচ্ছিন্নভাবে রচনা করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বাংলায় প্রচুর নেই। সম্ভবত এই জন্যেই তাঁর সংকলিত কবিতার পরিমাণ কম এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে চারখানি। বহিরঙ্গ কাব্যকলা সম্পর্কে মোহিতলালের সমগ্র কাব্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কয়েকটি বিশেষ-বিশেষ দিকনির্দেশই সম্ভব।

প্রথমেই একটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। মোহিতলালের কাব্যে অনুপ্রাস-ইত্যাদি অলঙ্কার প্রচুর থাকলেও অলঙ্কারের ঝঙ্কার কবিতার রূপ এবং মর্মকে আচ্ছন্ন করে নি। 'অসির ফলকে অশনি ঝলকে গলে যায় যত ত্রিশূলচূড়া'—এর মধ্যে অনুপ্রাস অনেকগুলি আছে, কিন্তু 'নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'এর মতো উদগ্র নয়—বরং মোহিতলালের কাব্যপঙক্তিতে অভিপ্রেত ছবিটি অনুপ্রাস এবং উপমার গুণে পাঠকের দৃশ্য ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে রেখায়িত হয়ে ওঠে। মোহিতলালের কবিতায় অজস্র অনুপ্রাসের প্রয়োগ কেবল ধ্বনির জন্যই নয়—ইন্দ্রিয়গত রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্য। তা ছাড়া আর একটি কারণও আছে। অনুপ্রাসের ঘন-ঘন প্রয়োগ কবিতায় যে-চপলতা আনে মোহিতলাল তার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর স্বভাবই ছিল গভীর ও গম্ভীর বক্তব্য উপযুক্ত শব্দবিন্যাসে উপস্থাপিত করা। বোধহয় এই কারণেই তিনি দলবৃত্ত ছন্দ খুব বেশি ব্যবহার করেন নি। ছয় কলামাত্রার কলাবৃত্তই তিনি ব্যবহার করেছেন—'কালাপাহাড়' সেই ছন্দেই লেখা। কিন্তু মিশ্রবৃত্ত, যাকে মোহিতলাল বলতেন পদভাগের ছন্দ, সেই ছন্দেই তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘ কবিতা রচিত। স্বপন-পসারীতে দলবৃত্ত-ছন্দের বেশ কিছু কবিতা আছে—সম্ভবত সেটা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে। তার জের বিস্মরণী পর্যন্ত চলে এসেছে।

দলবৃত্ত এবং সরল কলামাত্রিক ছন্দ লিরিকের বিশেষ উপযোগী। এদের পর্বভাগ প্রস্বর এবং দ্রুতগতি গানের সুরের মতো মনকে নৃত্যপরায়ণ করে তোলে। ফলে কবিতার সঙ্গীতধর্ম বলতে এই ছন্দর কথাই মনে আসে। কিন্তু মহাকাব্যের দীর্ঘ পদবিন্যাসে যে গাম্ভীর্য এবং মন্দ্রধ্বনি তার সঙ্গীত ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো ধীর এবং উদাত্ত। কবিতার 'মিউজিক' বলতে এই মন্দ্রধ্বনিকেই বোঝায়। হোমারের ষন্মাত্রিক ছন্দে, মিলটনের অমিত্রাক্ষরে, কীটসের ওডসে সঙ্গীত চপল গীতিসুরের নয়। এই জন্য মোহিতলাল বলেছেন,

'আমি নিজে যে ধরনের পদবন্ধকে উচ্চতর বা গভীরতর ছন্দসঙ্গীতের বাহন বলিয়া মনে করি, তাহা ঠিক এইরূপ গীতোচ্ছল, লঘুললিত, দ্রুতচ্ছন্দের পদবন্ধ নয়—আমার কান উদাত্ত-মধুর দীর্ঘচ্ছন্দের অনুরাগী। ইংরেজ কবিদের পদবন্ধ-রচনায় আমি সেই সুরের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার মনে হয়, গীতিকবিতার পদবন্ধেও সেইরূপ স্নিগ্ধ-মধুর অথচ গভীর-গম্ভীর সুর শুধুই সম্ভব নয়—উপাদেয় বটে। কারণ রোমান্টিক গীতিবিহ্বলতার মধ্যেই ক্ল্যাসিক্যাল সংযম ও দাঢ্য থাকিলে রস যেমন গভীর—তাহার আবেগও তেমনি স্থায়ী হইয়া থাকে ; জয়দেবের গীতগোবিন্দ অপেক্ষা কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর কাব্যরস ভাষায়-ভাবে ও ছন্দে যে গাঢ়তর—তাহা কে অস্বীকার করিবে?'[২৬]

এখানে ছন্দবন্ধের প্রসঙ্গেই কবি কথাটা বলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের

২৬ বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) পৃ. ১৩৫-৩৬

একটি কারণ অবশ্যই এর গাম্ভীর্য ও উদাত্ততা। অমিত্রাক্ষরে তাঁর অনেকগুলি কবিতা রচিত হয়েছে। অমিত্রাক্ষর মিশ্রবৃত্তেই রচিত হয়ে থাকে, তার পদভাগগুলি (আট ও ছয় মাত্রার মূল ভাগ বজায় রেখে) অসমান, মৌখিক ভঙ্গির অনুরূপ ; শব্দ-নির্বাচনে ধ্বনিসৃষ্টির দিকেই লক্ষ্য। ধ্বনির উচ্চাবচতা ও প্রবহমানতা দিয়ে মিলটন যে সঙ্গীত (music) সৃষ্টি করেছিলেন, তারই আদর্শে মধুসূদন বাংলায় নতুন সৃষ্টি করলেন—অমিত্রাক্ষর, যার অনুরূপ বাংলা কাব্যে আগে ছিল না। মোহিতলাল সার্থক ভাবেই এর অনুসরণ করেছেন।

শুধু অমিত্রাক্ষরে নয়, মোহিতলালের এই নিজস্ব স্টাইল প্রকাশ পেয়েছে পদবন্ধ বা stanza রচনায়। পদবন্ধ রচনাতে তিনি ইংরেজি কবিতার আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অবশ্য মোহিতলাল বলেছেন, বাংলা কবিতায় পদবন্ধের বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ সম্মুখে থাকলেও মোহিতলাল যে ইংরেজি রোমান্টিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, মোহিতলালের পঙক্তি-সজ্জা এবং মিলবিন্যাসকলা দেখেই তা মনে হয়।[২৭] পদবন্ধ রচনায় রসের সার্থকতা এখানে আলোচ্য নয়। কবিতার বহিরঙ্গ কাব্যকলা—পঙক্তি এবং মিলের দিকটাই এখানে আলোচ্য।

চার লাইনের কমে সাধারণত পদবন্ধ বা স্তবক হয় না। সংস্কৃত কাব্যের শ্লোককে আধুনিক অর্থে stanza বলা যায় না। সংস্কৃত শ্লোকে মিল থাকে না। স্টাঞ্জাতে চার লাইনে মিলের নানা সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য দিয়ে হয় চতুষ্ক। পয়ারের আট-ছয় ভাগের চোদ্দ মাত্রার লাইন চারটের সঙ্গে নানাভাবে মিল দেওয়া যায়—যেমন কখগঘ, কখকখ, ককখখ কখখক। চার লাইনের stanza সহজ ও সুলভ। কিন্তু চোদ্দ মাত্রা ছাড়াও আট-দশের দুই পদ দিয়ে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ পর্যন্ত পঙক্তির stanza মোহিতলাল নির্মাণ করেছেন এবং এসব পঙক্তির মিলও যথেষ্ট চাতুর্যপূর্ণ অথচ অপ্রগলভ। পঙক্তিগুলি দীর্ঘ হওয়ায় এবং মিল উপরি-উপরি না হওয়ায় প্রলম্বিত শব্দধ্বনিতে মন্দ্রতার সৃষ্টি হয়। মোহিতলাল একেই বলতেন মিউজিক। কীটসের একটি ব্যঞ্জনাগর্ভ উক্তি স্মরণীয়—music yearning like a god in pain। এখানে বলা দরকার, তিন লাইন দিয়ে তের্জা রিমাও মোহিতলাল লিখেছেন—'শেষ শিক্ষা'। এর গঠন হচ্ছে কখক খগঘ গঘগ-ইত্যাদি। শেলীর ওড টু দি ওয়েষ্ট উইণ্ড তের্জা রিমাতেই লেখা। এর মাধুর্য ও গাম্ভীর্য সম্বন্ধে বলা বাহুল্য মাত্র। তেমনি পাঁচ লাইনে ককখখক মিল দিয়ে রচিত বসন্ত-বিদায়।[২৮] বিখ্যাত 'বুদ্ধ' কবিতাটি রচিত হয়েছে ছয় পঙক্তি দিয়ে। তাঁর মিল-বিন্যাস কখগ কখগ। 'পান্থ' কবিতার পদবন্ধ সাত লাইনের—তার মিল কখকখ কখখ। একে ইংরেজিতে বলা হয় Rhymes Royal। এর মিলবিন্যাস হয় কখকখখগগ। কিন্তু মোহিতলাল এতে কিছু হেরফের করেছেন। শেকস্‌পীয়রের রেপ অফ লুক্রেশি সাত লাইনের স্টাঞ্জায় রচিত। বিস্মরণীর 'স্পর্শরসিক' আট লাইনের স্টাঞ্জার সমষ্টি। এর মিল কখকখগগকখ। ইংরেজিতে এর নাম Ottava Rima। বায়রনের ডন জুয়ান অট্টাভা রিমায় রচিত। মোহিতলাল ইচ্ছা করেই মূল আদর্শের কখকখকখগগ-র একটু অদলবদল করে একে জটিল করে তুলেছেন—নয় লাইনের পদবন্ধ পরিচিত স্পেনসারিয়ান স্ট্যাঞ্জা নামে। মোহিতলালের বিখ্যাত নারীস্তোত্র কবিতাটি স্পেনসারিয়ান স্ট্যাঞ্জা দিয়ে রচিত। এর মিলের বিন্যাস কখকখখগখগগ। নবম পঙক্তিটি পূর্ববর্তী পঙক্তির তুলনায় দুই সিলেবল বেশি। মোহিতলালের কবিতায় আট

২৭ পদবন্ধ নিয়ে মোহিতলাল বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইতে।
২৮ 'ব্যথার আরতি' কবিতাটিও পঞ্চপঙক্তিক।

লাইন আট-দশ মাত্রার, নবম লাইন আট-আট-ছয় মাত্রার। মোহিতলালের 'প্রেম ও জীবন' দশ পঙক্তির স্টাঞ্জা নিয়ে গঠিত ; প্রতি পঙক্তি আট-দশ মাত্রার—মিলের বিন্যাস কখকখগঘঙগঘঙ । এগারো পঙক্তির পদবন্ধও আছে—তার মিল কখখকগগঘঙঙঘঙ। পঙক্তিগুলি আঠারো মাত্রার—শেষ পঙক্তি চোদ্দ। দ্রষ্টব্য হেমন্ত-গোধূলির 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' (১৩৩৮)।

এ সবই সম্ভব হয়েছে মিশ্রবৃত্ত ছন্দে। এই ছন্দেই লেখা নাগার্জুন, প্রেতপুরী এবং তীর্থপথিক—কিন্তু তাতে নির্দিষ্ট পদবন্ধ নেই। প্রতি পঙক্তিতে আট-ছয়, আট-দশ, আট-দশ-ছয়, আট-আট-আট-ছয় পর্যন্ত পদ আছে। এই দীর্ঘ কবিতায় চারটি বড়ো ভাগ আছে—এগুলিকে stanza না বলে verse-paragraph বলা যায়। প্রতি verse paragraph-এর শেষ পঙক্তিতে যশোধরা এবং 'বসন্তসেনারে' শব্দ দুটি থাকায় প্রতি ভাগই চমৎকার সঙ্গীত-মণ্ডল সৃষ্টি করে তুলেছে। কখনও 'কুলবধূ যশোধরা, বারবধূ,বসন্তসেনারে' কখনও 'শুভ্র যূথী যশোধরা, নিশিপদ্ম বসন্তসেনারে'।

কলামাত্রিক ছন্দেও মোহিতলালের দক্ষতা লক্ষ করলে বোঝা যায়। ছয় কলার কলামাত্রিক পঙ্‌ক্তি কখনও তাঁর হাতে লিরিক্যাল স্নিগ্ধ, কখনও গম্ভীর বজ্রনিনাদিত।

কখনও কতবার তার ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে,
কভু সে আমারি চিতায় বসেছে চরণতলে

কখনও বজ্র কোথায় লুকাইয়া আছে নির্মেঘ-নীল গগনতলে?
ধূর্জটি ! যোগমগন তোমার নয়নে কোথায় অনল জ্বলে?

রবীন্দ্রনাথ কলামাত্রিক ছন্দে নানা আকারের পর্ব রচনা করেছেন। মোহিতলালের কবিতায় সে-বৈচিত্র্য নেই।

সবশেষে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, মোহিতলালের সনেট। সনেট তাঁর প্রিয় কবিতাশিল্প। যে-কারণে তিনি তীব্র আবেগকে মিল ও পঙক্তির নির্দিষ্ট নিয়মে সংযত করেছেন। সেই কারণেই সনেটের কঠিন বন্ধন তাঁর প্রিয়—অর্থাৎ আবেগ বা বক্তব্যকে নির্দিষ্ট রূপময় করে তুলেছেন। কবিতা-রচনার প্রথম যুগ থেকেই তিনি সনেট লিখেছেন। তাঁর 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' সনেটগুচ্ছ। তখন তিনি আট-ছয় অর্থাৎ পয়ারপঙক্তি দিয়ে সনেটের চোদ্দ লাইন লিখতেন। পরে তিনি সনেটের দুরূহ পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। পরের দিকের সনেটগুলি আট-দশ মাত্রার আঠারো পঙক্তির। সনেটের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে বর্তমান-প্রসঙ্গে আলোচনা বাহুল্য হবে। মোহিতলাল নিজেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—প্রসঙ্গত স্বরচিত সনেটও বিশ্লেষণ করেছেন। সনেট রচনায় মোহিতলালের সাফল্য তর্কাতীত।[২৯]

তবে সনেট-রচনায় মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে একদিক দিয়ে অভিনব অবশ্যই। ইংরেজিতে সনেট-সিকোয়েন্স আছে। বাংলাতে মোহিতলাল একাধিক সনেট-সিকোয়েন্স রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামের সনেট-পরম্পরাটি অসাধারণ। ছয়টি সনেট পরপর মূল বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেও প্রত্যেকটি সনেট হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করেছে। এই সনেট-পরম্পরাতে বঙ্কিম-উপন্যাসের মর্মটি এমন করে নির্দিষ্ট পরিমিতিতে ফুটিয়ে তোলায় যে-দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা দুর্লভ।

২৯ বাংলা কবিতার ছন্দ, 'বাংলা সনেট'।

দেবেন্দ্র-মঙ্গল

১৯১২

'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'- প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

দেবেন্দ্র-মঙ্গল।

শ্রীমোহিতমোহন মজুমদার
প্রণীত ও প্রকাশিত।
৯০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১লা কার্ত্তিক, ১৩১৯।

মূল্য—/০ এক আনা।

'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

১

বঙ্গকবি-সভামাঝে, হে দেবেন্দ্র, তুমি
দেবেন্দ্র বাসব! কবিতা-উর্বশী নাচে
রঙ্গে ভঙ্গে, কি লীলাতরঙ্গে! বক্ষ চুমি,
ঝলকিছে ইন্দ্রনীল! মুকুতা-রতনে
দ্যুতিময় কণ্ঠহার ; কটিতটে বাজে
মুখর কনককাঞ্চী ; চারুচন্দ্রাননে
অলোকসম্ভবা বিভা ; বেড়ি' বরতনু
বিলসিছে ঝক্‌মক মোহিনী ঘাঘরি,
মুহূর্তে মুহূর্তে সৃজি' লক্ষ ইন্দ্রধনু!
কভু বা সরমে বালা থমকি' শিহরি',
দুই হাতে ঢাকে তার আরক্ত কপোল,
ভুলে যায় নত নেত্রে কটাক্ষ বিলোল,—
হর্ষে অশ্রু আঁখি-কোণে উঠে গো উথলি',
অশ্রুমাঝে হাসি পুনঃ ফোটে গো উজলি'!

২

তাই বলি হে দেবেন্দ্র, কবীন্দ্র-সমাজে
দেবেন্দ্র বাসব তুমি! তোমার উদ্যানে
নিত্য ফোটে পারিজাত, শ্রীহরিচন্দন ;
দেবকন্যা, বিমোহিয়া অপরূপ সাজে,
তোলে নিত্য সপল্লব মন্দার-মঞ্জরী ;
তোমার ও কবিচিত্ত অপূর্ব নন্দন
কুহরিত বাসন্ত কোকিলে ; বিষ্ণু-ধ্যানে
মগ্ন সেথা স্বরীশ্বরী, কেশব-ভামিনী,
ফুল হ'তে অনিলে সঞ্চরি',
আসে দিব্য মদগন্ধ ; দিগ্‌গজ নিকরে
বপ্রস্নানরত, —কোথা গৌরী, সুহাসিনী,—
করিছে কন্দুকক্রীড়া মহাহর্ষভরে,
সুবর্ণ-সৈকতভূমে! নিত্য উষাকাল,—
নিত্য ফোটে বালার্কের নবরশ্মিজাল।

৩

আনন্দ-কদম্ব-শাখে, হৃদয়-হিন্দোলা
দোদুল দুলিছে! কুঞ্জে তব, বর্হ তুলি',
নাচিছে শিখিনী-সখী, সুনীল নিচোলা,
বিথারিয়া চন্দ্রিকা-বিভব ; বুল্‌বুলি,
মদ্‌না, চন্দনা, টিয়া, মোহনীয়া নুরী,
উড়ে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, যেন ফুলঝুরী,
আতস তারার বাজী, আকাশ বাহিয়া!
কোথা বা শ্যামার শিস্‌, বন-সারিকারা
আনন্দকূজনে কোথা উঠিছে গাহিয়া ;
প্রতি শাখে, প্রতি শাখে, কোকিলের সাড়া!
হেন কোকিলের মেলা কভু হেরি নাই!
বসন্ত বাহার রাগ আলাপে দোয়েল,—
তুমি তাহাদের গুরু, অপূর্ব কোয়েল!
কি মধুর কলকণ্ঠ, বলিহারি যাই!

৪

মুচকি' মুচকি' হাসে দিগঙ্গনাগণ ;
তোমা সাথে উষারাণী পেতেছে 'গোলাপ'
কুন্তলে চম্পক আর সিঁথিতে রঙ্গণ,
নিত্য আসি কুঞ্জে তব করে সে আলাপ!
জ্যোৎস্নার আবছায়ে উঁকি দেয় আসি',
তোমার দুয়ার ফাঁকে বিহ্বলা যামিনী,—
রুণু-রুণু ঝুম্‌-ঝুম্‌ ঝিল্লিমল বাজে,
মুখে তার ফুটে উঠে গোলাপের দল,
প্রাণকর্ণে ঢালে তব কি সুধা-রাগিণী!
দেহ-কদম্বেতে মরি কি পুলক রাজে!
অধরে উথলি' উঠে হাসি রাশি রাশি,—
প্রাণের পিয়ালা তব করে টলমল ;
ভাবে ভোলা চিরদিন তুমি আত্মহারা,
তোমার অধরকূলে হাসির ফোয়ারা!

৫

কবে সেই দেখা হ'ল অশোকের তলে,
দীপ হস্তে দাঁড়ায়েছে বালিকা রূপসী,—
সীমন্তে সিন্দুর তার জ্বল্‌ জ্বল্‌ জ্বলে,
দু'খানি কাঁকণে শোভে সুবর্ণ অতসী ;

ঝির ঝির বয়ে যায় রূপ-নির্ঝরিণী,
কে যেন খুলিয়া দেছে গোলাপ কারাবা!
কেশমেঘে কি ভঙ্গিমা! কটিতে কিঙ্কিণী
নাহি বাজে, মুখে তার স্বরগের আভা।
তাই হেরি' মুগ্ধ কবি, রূপধ্যানে ভোর,
গাহিয়াছ নারীস্তোত্র, গীতি গরীয়সী!
পতি-সোহাগিনী, সতী, হোক শ্যামাঙ্গিনী,
তারো অঙ্গে নাহি আহা সুষমার ওর!
কল্পনার শিল্পশালা-নিরালায় বসি',
এঁকেছ শারদাকাশে নারী-রূপ-শশী।

৬

বিবাহের রাত্রে কোন্ বাসর-ভবনে,
এক রাশি ব্রীড়াহাসি করিলে চয়ন?
নবোঢ়ার লাজদীপ্ত আরক্ত বদনে,
ফুটাবারে মুকুলিত নিমীল নয়ন,
কত চেষ্টা! খোঁপা হতে চাঁপা গেছে খসি,—
কুন্তলের ফুলদানি দিয়াছ ভরিয়া।
সরমভরমময়ী কবির প্রেয়সী,
ছল করি, মান করে পতিরে হেরিয়া,—
পুলকিত, আকুলিত সোহাগ-রভসে,
বুঝেও বোঝেনা তাঁর হৃদয়ের কথা ;
বৈশাখী চুম্বন ফোটে অধর-সরসে,
তবুও ঘোচেনা হায়, বিরহের ব্যথা!
তাই সাধ "গাঁথিছ যে বকুলের মালা,
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা।"

৭

নিশাশেষে, প্রাচীমূলে, পাণ্ডুর চন্দ্রমা,—
বঙ্গের বিধবাবালা। তারে তুমি, কবি,
সাজায়েছ কি অপূর্ব দেবী নিরুপমা।
কি পবিত্র, কি সুন্দর, তপস্বিনী-ছবি!
শ্বেত করবীর ভাতি ঠোঁট মাঝে তার,—
জ্যোৎস্নারেশমে বোনা মাধুরী-দুকূল!
পুণ্যজাহ্নবীর নীরে অপরাজিতার
শ্যামকান্তি! চৌদিকে ঝরিছে বেলফুল,—

বর্ষা-রূপসীর রূপ! অশোকের বনে
সীতা যেন ; গৌরীশৃঙ্গে মগ্ন তপস্যায়
উমারাণী হিমাদ্রিনন্দিনী! সযতনে
তুলিয়া রেখেছ তার সিন্দূর কৌটায়।
শুধু, মুখ-বালার্কের মহিমা-কিরণ
সীমন্তের শুকতারা করেছে হরণ।

৮

নয়ন-মুকুতা ঝরে গৃহস্থের তরে,—
ঘরে ঘরে কি কাহিনী দুঃখী বাঙ্গালায়!
কোথায় কুলীন কন্যা কাঁদিছে কাতরে,
(দেহ-মালঞ্চের তার অর্ঘ্য ঝরে যায়,—
প্রাণের দেবতা কোথা, কোথা পরমেশ!)
জননী,—বিদায়-বাণী মুখে না জুয়ায়,—
চেয়ে আছে পুত্র পানে,—যাবে সে বিদেশ ;
অন্ন নাই, করে তারে নীরবে বিদায়!
নিদাঘের একাদশী, কাল-নিশীথিনী—
বিধবা দুধের মেয়ে—বুঝি না পোহায়!
মাতা তার পড়ে আছে, সেও অভাগিনী,—
ক্ষুদ্র রাধারাণী ফুল প্রভাতে শুকায়!
ফুকারি কাঁদিয়া উঠি, পরাণ আকুল,
কবি কিম্বা সখা তুমি, হয়ে যায় ভুল।

৯

আবার তখনি ফোটে দু'অধরে হাসি,
বরিষার মেঘযুক্ত কৌমুদী সমান ;
সে হাসি তুলনা কোথা নাই তপাসি',
—শিশুমুখ হেরি যবে আহ্লাদে অজ্ঞান।
খোকাটিরে কোলে করি' দাঁড়ায় যুবতী,—
কি গরিমা, কি ভঙ্গিমা, কি সৌন্দর্য্যরাশি!
ফুলের অলকে যেন চারু প্রজাপতি!—
সে শোভা দেখিতে আঁখি চির উপবাসী।
আঙ্গুরেতে মাখা তার চুম্বন-সোহাগ,
শিরীষ-কোমল তনু শিশির-বিমল ;
পীচফলে সিক্ত তার অধরের রাগ ;
ইন্দুবিম্ব সম কান্তি, নেত্র নীলোৎপল।

ভাবের চমকে ভোর দেখিছ দেয়ালা,
সে শিশুমঙ্গলগীতে কি মাধুরী ঢালা!

১০

রূপমধুপিপাসু মানস-মধুকর,
প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে, উঘারি' উঘারি',
ফিরিয়াছে মাতোয়ারা, নাহি অবসর,—
অপূর্ব সে বর্ষ-পঞ্জী, কবির ডায়ারী!
সুরসাল ঢল ঢল পিয়াল, পনস,
কনকিত পাকা আম, নিদাঘ-সোহাগ,
বধূর চুম্বন সম আঙ্গুর সরস,
ব্রজসুন্দরীর যেন গণ্ডওষ্ঠরাগ
আরক্ত আনার, ফলশিশু লিচুগুলি,
নখাগ্রে ছিঁড়িতে তাই বড় ব্যথা লাগে
কবি চিত্তে, কি মধুর! যাই বলিহারি!
কি রঙ্গে ডুবায়ে তুলি', মোহন অঙ্গুলি,
আঁকিয়াছে ফলডালি, বসি' কোন্ বাগে?
রসে রঙ্গে ভরপূর, নিত্য মনোহারী!

১১

কোথাও শশককুল, ছাড়ি' ঝোপ ঝাপ,
পলাইছে ইতি-উতি, পাইয়ে তরাস ;
ইক্ষুক্ষেত্রে ক্রৌঞ্চবধূ করিছে বিলাপ,
কাঠ্‌ঠোকরার ডাক,—স্বর কি উদাস!
ব্যূহ রচি' পিপীলিকা, দলে দলে চলে,
শ্রান্ত বিধাতার সৃষ্টি, গীরগিটি হোথা
চালে বসে' আছে ; মোহন পুকুর কোথা,—
ডুব দেয় পানকৌড়ি গভীর অতলে ;
মাছরাঙ্গা ঝুপ করে' উড়ে পড়ে জলে!
দেবদারু-তলে ওই বৃষভযুগল—
অন্নপূর্ণা-পূজা-দিনে দোলায়েছে গলে,
অতসীর মালা গাঁথি পল্লীবাল দল।
কাঠবিড়ালীর পুচ্ছ, লাফানি তাহার,—
কবি তুমি, তব চক্ষে তারো কি বাহার।

১২

হে দেবেন্দ্র, কি সুন্দর তোমার সনেট—
কাব্যলক্ষ্মী সাজে যেন বাসন্তী দুকূলে!
মদন-মোহিনী যেন প্রদানিল ভেট,
গোলাপের স্বপ্ন যেন হেমন্ত-মুকুলে!
একবাটী পূর্ণ যেন নারিঙ্গীর রস!
কবিতা-বিহগী যেন বসে ক্ষুদ্র ফুলে—
নুয়ে পড়ে বৃন্ত তার অলস, অবশ![1]
গোলাপী আতর যেন!—একরাশ চুলে
এক ফোঁটা করি' দেয় সুরভি-মধুর!
দখিনা বাতাসে রাখি বাতায়ন খুলে'—
তথাপি তেমনি বাস অলকে বধূর,[2]
সারারাত্রি বিছানায় গন্ধ ভুর্-ভুর্!
বঙ্গ-কবিভারতীর সিত-সিঁথিমূল
সনেট-সিন্দূরে কবি করেছ অতুল!

১৩

ফুলকবি, ফুলময়ী তোমার কবিতা।
ফুলবালা সঙ্গে রঙ্গে কত নাগরালি!
সেঁউতি, মালতী, যত মল্লিকার আলি,—
তুমি প্রজাপতি, তারা তব পরিণীতা।
বকুলপারুলপুঞ্জে মধুকরপালি,
তুমিও তাদের সাথে মকরন্দ-পানে
ক্ষ্যাপা আলাভোলা ; নিত্য তব ঘটকালি,
কৃষ্ণচূড়া, ল্যাভেণ্ডার-চাঁপার বিতানে ;
সোহাগিনী ফ্রান্‌শিস্‌সিয়া, ডালিয়া কুসুম,
শিরীষ, শিউলি হাসে, চাহি' তোমা পানে
নিশিগন্ধা মধু দিয়ে পাড়াইছে ঘুম ;
কি কথা কনকগ্যাঁদা, দোপাটীর কানে?
অঙ্গে ঝরে নাগেশ্বর-কাঞ্চন-পরাগ,—
প্রাণে শুধু লালে লাল অশোকের রাগ।

১. 'স্বপন-পসারী'তে পাঠান্তর : 'নুয়ে পড়ে বৃন্ত তার বেদনা-বিবশ।'
২. 'স্বপন-পসারী'তে পাঠান্তর : 'তবুও তেমনি বাস অলকে বধূর—'

১৪

তার পর, একদিন, গীতি রাধিকার
অঙ্গে অঙ্গে উথলিল প্রস্ফুট যৌবন।
রচিলে গো গোপীপ্রেমপ্রীতিকল্পনার
কবিতা-কালিন্দীতীরে নব বৃন্দাবন।
নিত্য সেথা ফুলদোল, নিত্য রাসকেলি ;
রাধাপদ্ম ল'য়ে উঠে রাধার সহেলি
নারীঘাটে, ভেসে যায় গোপিনীগাগরি ;
ভাব-গোপীবৃন্দ নাচে হাতে হাত ধরি'
হৃদি-কদম্বের কুঞ্জে ; মাধবমুরলী
পশে যবে রাধাচিত্তে, দ্রুত যায় চলি'
আত্মা তার, দেহ পিছে করে অভিসার!
(নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া, লুণ্ঠিত অঞ্চল!
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল।)
কি অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা, হে কবি, তোমার!

১৫

কভু দীন-অন্তরাত্মা ত্রিবক্রা কুবুজা,
সুরভিয়া দেহ তার যৌবনচন্দনে,
হতে' চায় করি, আহা, শ্যামপদপূজা,
সুন্দর-সরল-তনু! সে ভুজ-বন্ধনে,
চন্দ্রাবলী রূপসীর হৃদয়-আগারে,
পুড়ে যায় কামধূপ, প্রেম-হোমানলে!
ললাটে বৈষ্ণবী টীকা, গুঞ্জমালা গলে,
হরিবিরহিণী ভাসে নয়ন-আসারে।
প্রেমময়ী রাধা বলে,—'বাঁধিব তাহারে,
পীরিতির ঝল্মল গজমোতি-হারে।'
কবি চাহে হইবারে ক্ষুদ্র বনফুল,—
ঋষিপত্নী-উন্মাদন জ্বালিয়া গুগ্‌গুল,
শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া, সিঞ্চি গঙ্গাজলে,
নিবেদিবে গোবিন্দের চরণকমলে।

১৬

সার্থক সাধনা তব, হে কবি প্রবীণ,
রূপপূজা-পুরোহিত তুমি মহাব্রতী।
চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ,
তাই দেব, করিলাম তোমার আরতি।

এ নহে তোমার যোগ্য পূজা-উপচার।
কিছু নাই,—কিছু নাই, আমার সঙ্গতি,—
তোমারি মালঞ্চে গাঁথা একাবলী হার,
আনিয়াছি, তোমা তরে আমি মূঢ়মতি ;
তুমি চিরসুন্দরের বিরহে বিধুর,
তব চক্ষে কিছু নহে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হীন ;
সকলি মহিমময়, সকলি রঙ্গীন্!
হৃদি-বৃন্দাবনে তব সকলি মধুর।
তোমার শ্রীকণ্ঠে বন-তুলসীর মালা—
তারি স্পর্শে, এ ভূষণ হউক্ উজালা!

স্বপন-পসারী

১৯২২

স্বপন-পসারী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস,
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
[illegible]

'স্বপন-পসারী' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

প্রকাশক

শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত।

'স্বপন-পসারী' প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র

ভূমিকা

'স্বপন-পসারী'র অধিকাংশ কবিতা 'ভারতী'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এতক্ষণে 'ভারতী'রই স্নেহছায়ায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

প্রথম-বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই। গত দশবৎসরে যাহা লিখিয়াছি তাহার মধ্যে যাহা মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারি কতক বাদ দিয়া, বাকি রচনাগুলি একত্র করিয়া দিলাম ; অপ্রকাশিত কবিতা দুই-চারিটি মাত্র আছে। 'উচ্চৈঃশ্রবা'-শীর্ষক কবিতাটি ভিক্টর হিউগোর অনুসরণে লিখিত।

'বেদুঈন'-নামক কবিতাটি 'মোসলেম-ভারত'-সম্পাদক বহু সমাদরে চিত্র-সম্বলিত করিয়া তাঁহার সুন্দর পত্রিকাখানিতে প্রকাশিত করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

স্বপন-পসারীর মুখপত্রের পরিকল্পনাটি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, বি. এস-সি. মহাশয়রে প্রতিভা ও বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন। এই ধরণীর ফুল্ল-শ্যামল পসরাখানি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, জাগর-রাজ্যের অপর পারে দাঁড়াইয়া, নীল নৈশাকাশের চন্দ্রমণ্ডলে আপনার যে প্রতিচ্ছায়া দেখিতেছে, চিত্র-কবি তাহাকেই স্বপন বলিয়াছেন—সে যেন বাস্তব অপেক্ষাও সত্য!

কান্তিক প্রেসের সুযোগ্য কর্মচারী আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দালাল গ্রন্থখানির মুদ্রণ-ব্যাপারে কর্তব্যাতিরিক্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, এজন্য তিনিও আমার ধন্যাবাদভাজন।

শ্রীপঞ্চমী
১৩২৮ সাল

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

গ্রন্থকারের নিবেদন

'স্বপন-পসারী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল—প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৩২৮ সাল। সে সময়ে ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রয়োজনীয় অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রথম বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই। গত দশ বৎসরে যাহা লিখিয়াছি তাহার মধ্যে...কতক বাদ দিয়া বাকি রচনাগুলি একত্র করিয়া দিলাম...'উচ্চৈঃশ্রবা'-শীর্ষক কবিতাটি ভিক্টর হিউগোর অনুসরণে লিখিত।"

এ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের কথা ; এখন এ কবিতাগুলিকে অন্য কাহারও লেখা মনে হয়, অথচ অতি-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাও আছে ; তার ফলে, ইহাদের সম্বন্ধে আমার মনে কোন ভাব-অভাব নাই—নিজের লেখা, অথচ কেমন যেন পর। তাই, আজ আবার এগুলিকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া একটা কর্তব্য সমাধা করিতেছি মাত্র ; তার কারণ, প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্বে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে, এবং পুনর্মুদ্রণ যে আবশ্যক, তাহার প্রচুর প্রমাণও ইতিমধ্যে পাইয়াছি ; তা' ছাড়া, কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, আমার এই প্রথম কবিতাগ্রন্থই তাঁহাদের সমধিক প্রিয়।

গতবারের কবিতা হয়তো দুই-একটি বাদ দিলে ভাল হইত, কিন্তু তৎ-পরিবর্তে আমি এবার সেকালের লেখা আরও দুই-চারিটি কবিতা গ্রহণ করিয়াছি; কারণ, এখন সকলই আমার পক্ষে সমান। ভাবিয়াছিলাম, বিদেশী শব্দগুলির একটি অর্থসূচী পুস্তকের শেষে যুক্ত করিয়া দিব, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না—মুদ্রণকার্য অতিশয় দ্রুত শেষ করিতে হইয়াছে।

ঢাকা
২৮এ ফাল্গুন, ১৩৪৮

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

তোমাকে

স্বপন-পসারী

করি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি—
স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত— পান্না কি হীরা,
মুকুতার হার দামী।
ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপন-বালিকা!
যে বাণী বাজাতে আলো-নীহারিকা
ছায়াপথে যায় থামি'—
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে
স্বপন-পসারী আমি।

বাসবের-ধনু-বরণ-সুষমা
নীলিমায় মিলি' যায়—
পটগুলি দেখ সেই রঙে আঁকা
মৃণালের তূলিকায়!
গোলাপ—আঁকা এ চুম্বন-রাগে!
বধূ হেসে চায়—বসন্ত জাগে,
ডালিম-দানার রস যেন লাগে
অধরের কিনারায়!
পটগুলি দেখ কোন্ রঙে আঁকা
মৃণালের তূলিকায়!

একখানি ছবি এই যে হেথায়—
চেয়ে দেখ এর পানে!
এমনটি আর দেখেছ কোথায়
—বল দেখি কোন্‌খানে?
চেয়ে দেখ শুধু আঁখিতে ইহার,
ভঙ্গিমা দেখ অধর-রেখার,
ললাট বেড়িয়া সন্ধ্যা-আঁধার
কেশ-রচনার ভাগে
ছায়া-সুষমার মোহিনী অপার—
চেয়ে দেখ এইখানে!

মর্ত্য-মরুর যত দাহ আছে,
—বাসনার মরীচিকা,
আত্মার আধি, নিদারুণ ব্যাধি
ললাটের তলে লিখা!
নিবিড়-আঁধার কেশ-তপোবনে
লুকায়ে রেখেছে ঋষি-ধ্যান-ধনে,
ফুরিছে অধর-গোলাপ-কাননে
অলকার ভোগ-শিখা!
মানবের আশা-নিরাশার সীমা
ও দুটি নয়নে লিখা!

জ্যোৎস্না-চিকণ গুণ্ঠন এই
আঁধার-কবরী-ঢাকা—
পরাবে দেখ গো প্রেয়সীর মুখে,
বুঝিবে কি সুধামাখা!
তারার চুম্‌কি—কালো পেশোয়াজ,
মখমল সাজ, সুকোমল ভাঁজ,
পাড়ে লতা-পাতা-কুসুমের কাজ,
নাহি যে দাগটি আঁকা!
এ চারু বসন-বিভবে সাজিলে
হাসিটি যাবে না ঢাকা।

এনেছি আরসী—মানস সরসী,
বিম্বিত বুকে তার—
যে ছায়া তোমারি, আকাশ-সকাশে
পড়েছে অসীমাকার!
হেরিবে সেখানে আননে তোমার
শত-পারিজাত-বরণ-বিথার!
শতদল-দল বাসনা-ব্যথার
আঁখির বিজুলী-হার!
এনেছি আরসী, সবটুকু তব
বিম্বিত বুকে যার।

অনাদি-কালের অসীম-দেশের
গোপন নাট্যলীলা
দেখিবারে চাও? ধর অঙ্গুরী—
খচিত মোহিনী-শিলা।

যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে—
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
তবু আঁকা আছে হৃদয়ের পাতে
জল-রেখা রঙ্গিলা—
সেই জলচ্ছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা!

দেখিবে যেখানে লতার বিতানে
জোনাকির দীপ জ্বালা—
ফুলে-ফুলে সেথা অতি চুপিসারে
বিলসিছে পরীবালা।
গভীর জ্যোৎস্না-নিশীথে জাগিয়া
হেরিবে তোমার বাতায়ন দিয়া,
চন্দ্রকিরণে কে আসে নামিয়া
দুলায়ে মৃণালমালা—
শঙ্খ-ধবল একটি কমল
গাঁথিয়াছে তা'য় বালা।

পাহাড়ের ধারে শিখর-সমীপে
তারাটি যেতেছে দেখা,
রূপার নূপুর বাজা'য়ে তটিনী—
নটিনী চলেছে একা।
ঝঙ্কার তার মিলায় আকাশে,
ফিস্‌ফিস্‌-কথা কভু বা বাতাসে,
চারিদিকে যেন কত চোখ ভাসে,
আলোকে পলক ঢাকা—
সারাটি আকাশে আঁখি বিথারিয়া
কে আছে চাহিয়া একা!

হোথায় কুয়াসা-তুষার-পুরীতে
ঊষার মাধবী-বন,
তা' হেরি' একদা গিরিরাজ-বালা
যৌবন-অচেতন!
তনু এলাইয়া শৈল-সোপানে
ঘুমায় অঘোর বাহুর শিথানে,
পূর্ণিমা-চাঁদ অতি সাবধানে

করে মুখে চুম্বন!
রূপেরি বাসরে চির-ঘুমঘোরে
তাই বালা অচেতন।

ধূ-ধূ-ধূ সুদূর প্রান্তর-পথে
শীত-শেষ রজনীতে
মরিয়া গিয়াছে জল-সোহাগিনী
কুমুদেরা সরসীতে।
বিশীর্ণ-কায়া, তুরগ-আসীন,
ছুটিয়াছে যুবা-বীর নিশিদিন,
কণ্ঠে কাতর স্বর হল ক্ষীণ,
নারে সে যে পাসরিতে—
অপ্সরী-প্রিয়া গেল মিলাইয়া
অধর না পরশিতে!

দেব-দানবের মন্থনে আজও
অসীম সাগর-নীল
অমৃতের ফেনা ছিটায় আকাশে,
বায়ু কাঁপে ঝিল্‌মিল্‌!
তারি মাঝখানে—কুন্তল লোল,
খসি' পড়ে পায় কুহেলি-নিচোল-
নিখিল ভুবন করি' উতরোল,
অমিলের করি' মিল,
সেই ইন্দিরা উরিছেন আজও—
সাগর তেমনি নীল!

অঞ্জন এই আছে সবশেষে
মণি-সম্পুট-ভরা,
আনন্দ-ঘন-রস-সরসিত,
দিবসের জ্বালাহরা।
দরশে হইবে পরশ উদয়!
ঘুচে যাবে খেদ, যত ভেদ-ভয়,
কায়া আর ছায়া—বৃথা সংশয়,
স্বর্গ হইবে ধরা—
লও, কিনে লও স্বপন-পসরা
দিবসের জ্বালাহারা!

ও খানি? কিছু না, বাঁশের বাঁশীটি—
যারে তারে নাহি সাজে,
লইবে সে-জন, যে-জন বুঝিবে
লাগিবে তাহার কাজে।
এমনি বাজালে বাজিবে বেসুর,
সে যেন কোথায়—দূর প্রেতপুর!—
নিশান্ত-বায়ু বহিছে বিধুর
হাহা'র আগার মাঝে—
মানবের পদ-পরশের ধ্বনি
কভু না সেথায় বাজে!

থাক্, থাক্—ওরে বাজায়ে কি কাজ?
থাক্ শুধু ওইখানি;
আর যাহা আছে সব তুলি' লও,
কিছু না কহিব বাণী।
যেজন শুনাবে—জীবন-মরণ
একই আলোকেতে চির-জাগরণ,
বাঁশীতে করিবে সে-শ্বাস ভরণ
'বেসুরা'-কে বশে আনি'—
তারে বাঁশী দিয়ে স্বপন-পসরা
ধূলায় ফেলিব টানি'।

ভারতী, পৌষ ১৩২৬

রূপ-তন্ত্র

কনক-কমল রূপে
প্রেম যবে ফুটে' উঠে—
তবেই আমার মানস-মরাল
অলস পক্ষপুটে
চকিতে জাগিয়া উঠে!

ফুলের হিয়ার মধু,
চাহিনা চাহিনা, বঁধু!
রেশ্‌মী-রঙীন্ পাপড়ি যদি না
চারিধারে পড়ে লুটে'।

আমি বুলবুল—
গোলাপেরি গান গাহি ;
আমি সে শিশির—
প্রভাত-অরুণে চাহি!
আমি পতঙ্গ—রূপানলে যাই ছুটে'!

ক্রন্দন—মোর সঙ্গীত সে যে,
হাসিতে অশ্রুরাশি!
আমার দেবতা—সুন্দর সে যে!
পূজা নয়, ভালোবাসি!
আঁধারে মন্ত্র ভুলি,
আলোক-তুফানে হৃদয়-জড়িমা টুটে-
সুন্দর লাগি' ভালোবাসা মোর,
অন্তর-আঁখি ফুটে!

দিল্‌দার

পেয়ালা যে ভর্‌পূর—
আয় আয়, ধর্ ধর্,
বেয়ালায় সব সুর
কেঁদে ঝরে ঝর-ঝর!
দিল্ করে হায়-হায়,
দিল্‌দার আয় না—
আহা, যেন আবছায়
ফিরে কেউ যায় না!
গুগ্‌গুলে মশ্‌গুল্
বিল্‌কুল্ ভর্-ভর্,
কার ছায়া জ্যোৎস্নায়!—
সুন্দর! সুন্দর!

রাতভোর শোর্-গোল—
দিল্ খোল্, খেয়ালি!
কলিজায় দিক্ দোল,
—দিল্ নয় খোয়ালি!

দূর কর্ আফ্‌সোস
জামিয়ার কুর্তির,
গেয়ে যা না আপ্-খোস্—
ওক্ত যে ফুর্তির!
বড় মিঠা শরবৎ!
—ফের ভর্ পেয়ালি,
কানে বাজে নওবৎ,
চোখে লাগে দেয়ালি!

দিল্-মিল্-মঞ্জিল,
ভাঙা-ঘর সরা'য়ের—
করে' তুলি রঙ্গিল,
আয় ভাই মুসাফের!
এই ঘাসে পাতি আয়
পান্নার গালিচা,
হাসিতেই লুটে যায়
বস্‌রার বাগিচা!
থাক্ তোলা আল্‌বোলা—
পেয়ালায় মুখ ধর্!
চেয়ে দেখ্ মন্-ভোলা,
দুনিয়া কি সুন্দর!

মোশলেম ভারত, কার্তিক ১৩২৭

চোখের দেখা

ঘাটের পথে, বটের ছায়াতলে
একটু দাঁড়ায় অন্য-মনের ছলে,
একটু আঁধার একটু আলোর মেলা—
যুঁইটি-ফোটার বেলা।
ভুরুর কোণা সুরু কোথায়—নজর নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়াতলে।

ঠোঁটের রাঙা—চোখের হাসি, কালো—
নিশীথ-সাগর-সাঁতার-দেওয়া
বাঁকা-চাঁদের আলো—
চাই না আমার—চাই না অধিক আর,
ওই টুকুতেও নেই যে অধিকার!
ভিক্ষা বলে' যেটুকু পাই ভালো—
ঠোঁটের ঈষৎ রাঙা হাসি, চোখের হাসি কালো!

গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁজে ।
প্রাণের ভিতর সোনার সারং বাজে!
পিছন হতে কেমন জানি কেন
যবের ক্ষেতে বাতাস বারেক নিঃশ্বসিল যেন!
ফুলল্ হবে আকাশ তবু অস্ত-মেঘের ভাঁজে,
গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁজে।

একলা কাটে জ্যোৎস্না আমার শূন্য-আঙিনাতে,
ঝাঁ-ঝাঁ করে বিজন রাতি, ঝিঁ-ঝিঁ তখন মাতে।
যতেক স্বপন বকের পাখার মত
চোখের আগে ভিড় করে সব কত!—
টাট্‌কা-টানা একটি ছবি ফুট্‌বে সন্ধ্যার সাথে,
ফুট্‌ফুটে মোর জ্যোৎস্না-আঙিনাতে!

এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো!
যেখান-সেখান ঘুরে' বেড়ায়—
কাঁচপোকাটি ধোরো!
মেরে রেখো কোটোয় তুলে',
গোলাপ যখন পর্‌বে চুলে,
টিপ্ করে', সই, কপালটিতে পোরো!
এমনি করে' মনটি চুরি কোরো।

ভারতী, পৌষ ১৩২৫

পুরূরবা

দিনশেষে রাত্রি এল, শারদ-শর্বরী
কেটে গেল বহুক্ষণ ভুবন-ভবনে!
গৌরী-গোধূলির ভালে রৌপ্য-দীপাধার
কখন উঠেছে জ্বলি'! — সন্ধ্যা জ্যোৎস্নামুখী
রচিল কনকবেণী কানন-কুন্তলে।
অতিমুক্ত, কর্ণিকার, পুন্নাগ, পাটল
বিথারিল দেবতার নিভৃত শয়ন
পুষ্পোচ্ছ্বাসে, ফুলবনবীথিকার তলে।
ক্রমে ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে, স্ফটিক-বিমানে
আরোহি', আকাশবর্ত্মে প্রবেশিল শশী
উন্মাদনী যামিনীর নিশীথ-বাসরে।

তখনো ভ্রমিছে একা অরণ্য-গহনে,
নদীতীরে, পর্বতের সঙ্কট-শিখরে
প্রিয়াহারা পুরূরবা—হৃত-উত্তরীয়,
ছিন্নবাস, নগ্নশির, উন্মাদের মত!
অতিদূর গিরীশের নীহার-বলয়ে
বিচ্ছুরিত চন্দ্রহাস ধাঁধিছে নয়ন—
দিগন্ত-প্রসারী কার অট্টহাসি যেন'
বিজ্ঞাপিছে বিরহীর বৃথা অন্বেষণ!
অরণ্য-গভীরে, বনশাখা-অন্তরাল
নিত্য-অন্ধকারে, জনমিছে দৃষ্টি-ভ্রম—
তিমিরপটলে যেন তরল সরসী,
দুলিছে তাহারি তলে দীপাবলিসম
অযুত আলোক-বিম্ব—নহে খদ্যোতিকা,
অপরূপ মরীচিকা কানন-আঁধারে!
কুসুমিত তৃণস্তরে, গন্ধলতিকায়,
বিথান বসনপ্রান্ত গিয়াছে লুটিয়া
প্রিয়ার, প্রয়াণ-পথ সুরভিত করি'।
সচকিত কুরঙ্গীর কস্তুরী-সুবাস
তাহারি নিশাস যেন! জ্যোৎস্না হেথা-হোথা
লেগে আছে তরুশাখে, ব্রততীবিতানে—
শুভ্র-চীনাংশুক-শোভা! ঝিল্লীর ঝঙ্কার
কাহার মঞ্জীরগুঞ্জ? কার দীর্ঘশ্বাস

নীড়সুপ্ত বিহঙ্গের পক্ষ-বিধূননে?
গুঞ্জরিছে মুখে তার ভাব-গদগদ
অসম্বদ্ধ বাণী— হৃদিসিন্ধুমন্থশেষ
সুধার বুদ্বুদ যেন অধরের ফাঁকে!
চলিতে চরণ বাজে কভু শিলাতটে,
কঠিন কণ্টকে কভু, কভু বল্লী-ফাঁসে—
স্বপনে-উন্মীলনেত্র চলে পুরূরবা
সুরযোষা উর্বশীর অলীক সন্ধানে।
সহসা কাননতলে অসম্ভব বিভা—
স্থিরদীপ্ত সৌদামিনী, প্রখর-ভাস্বর,
দীর্ঘায়ত, অতর্কিতে খসি' স্বর্গ হ'তে
ভরিল পাদপস্থলী! সহস্র শাখার
অসংখ্য সে রন্ধ্রময় জালায়ন দিয়া
ঢালিল কৌমুদী-ধারা মেঘমুক্ত শশী,
আরোহিয়া গগনের গম্বুজ-শিখরে ;
নিদ্রাতুরা ধরণীর দু'নেত্র-উপরি
স্বর্ণ-শতদল যেন উঠিল ফুটিয়া
উচ্চবৃন্তে,— তাহারি সে নাভি-পদ্মনালে!
হেরি তা'য় নরবর থামিল থমকি' ;
অমনি সে বরবপু হ'ল রূপান্তর
অটল-নিটোল শুভ্র পাষাণ-পুত্তলে!
বক্ষ সুবিশাল ধরিল তুহিন-কান্তি!
স্ফুরিল ললাটশোভী স্রস্ত কেশদাম
কিরণ-কিরীট সম ; রশ্মিরস-পানে
নিস্তার নয়নযুগ হারাইল দিশা ;
দাঁড়াইল পুরূরবা ঊর্ধ্বমুখে চাহি'—
জ্যোৎস্নাধারা শিরে যেন নব-গঙ্গাধর!
অপলক নেত্র তার অলোক-সুষমা
গণ্ডূষে সাগর-সম করিল নিঃশেষ ;
তীব্র বাসনা-রণনে সারা মর্মমূল
বীণার তন্ত্রীর মত হারাল কম্পন:
মনে হ'ল দিকে দিকে প্রিয়ারি পীরিতি
উথলিছে লাবণ্যের মত! সে মিলন
অহরহ—কোথা নাই বিরহ-কল্পনা!
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা,—মহাকাল যেন
সহসা নিশ্চল! আলোক-আঁধারে দ্বন্দ্ব

ঘুচে' গেল মানবেরি পিপাসার সাথে!
অবগাহি' অফুরন্ত জ্যোতির প্রপাতে
দেহ হ'ল ছায়াহীন, মৃত্যুজয়ী প্রেম
ধরিল সর্বাঙ্গ-শুভ্র মূর্তি আপনার—
নাই তার কোনোখানে বিষের নীলিমা।

পরক্ষণে তেমনি চকিতে মুদে' গেল
জ্যোতিঃ-শতদল!— স্বপ্ন-ভঙ্গে পুরূরবা
অলস-অবশ-দেহ বসিল ভূতলে।
আবরিল আঁখি তার আঁধার-অঞ্চলে
বনস্থলী, লেপি' দিল স্নেহভরে পুনঃ
সর্ব-অঙ্গে ম্লানচ্ছায়া চন্দ্রিকা-চন্দন।
আলোক-বন্যার সেই গভীর প্লাবনে
স্থির ছিল জলজ কুসুম—উর্ধ্বমুখে,
বৃন্ত দৃঢ় করি' ; বন্যা যবে গেল সরি',
নমিয়া পড়িল শির—লুটাইবে বুঝি
আপনারি পাদমূলে পঙ্কিল শয়নে!
অনচ্ছ আলোকে তাই নয়নের কোণে
বাহিরিল দুই বিন্দু তরল মুকুতা,
অবরুদ্ধ বাসনার অরুদ্ধ আবেগে।
কি-এক সঙ্গীত— যেন বিয়োগ-রাগিণী,
আত্মারি সে আর্তরব— উঠিল ধ্বনিয়া
সকল শিরায় তার, সারা চিত্ত ভরি' ;
মর্মকোষে দেহ-পুষ্প-মধুর তাড়না
ফুটাইল একসাথে পঞ্চেন্দ্রিয়-দল,
রূপের কিরণধারা পান করিবারে!
অমনি সে, বাণবিদ্ধ কেশরীর মত,
আন্দোলিয়া কেশরকলাপ ছুটে গেল
বনান্তরে, উর্ধ্বশ্বাসে, উত্তান আননে।
ক্ষণপরে অতি-উচ্চ রোদন-আরাব
সমস্ত কান্তার বাহি' পঁহুছিল শেষে
পর্বতকন্দরে, অতি-দূর-দূরান্তরে
হ'ল প্রতিধ্বনি, শিহরিল তারাব্যোম
অনন্ত সে ব্যোমপথে—প্রৌঢ়া নিশীথিনী
ফিরিয়া বাঁধিল তার বিশীর্ণ কবরী।

পাণ্ডুর বদনে বিধু হেরিল তাহারে ;
সে যে তাঁরি বংশধর—প্রতিষ্ঠান-পতি
ঐল পুরূরবা! সেই পূর্ব-ইতিহাস—
যৌবনের মধুময় মোহের কাহিনী
স্মরিল বিষাদে সোম ; সে কলঙ্ক-লেখা
এখনো বাজিছে বুকে—তবু কি মধুর!
তখন অধরে সদ্য-অমৃতের ক্ষুধা,
পৌর্ণমাসী তখনো তরুণী ; পারিল না—
ব্রহ্মচারী—ফিরাবারে নিষিদ্ধ চুম্বন।
গুরুপত্নী তারা ধরিল সন্তান তাঁর
আপন জঠরে—সেই পুত্র বুধ হ'তে
জনমিল পুরূরবা, ইলার তনয়।
কভু নর, কভু নারী—ইলার কাহিনী
সুবিচিত্রতর! তাই সে অপূর্বজন্মা—
যেমন অহীন-ক্লান্তি—লভিল তেমনি
ধরাতলে প্রথম সে পূর্ণ-মানবতা।
একদা নেহারি' তায় চৈত্ররথবনে,
প্রগল্‌ভে প্রসাদ তার যাচিল উর্বশী—
উন্মদনা অপ্সরা সে অমরা-আলোক!
স্বর্গের লাবণ্য হরি' আনিল ধরায় —
চন্দ্রবংশ-অবতংস বীর পুরূরবা।
নন্দনে যে ফুল ঝরি' ফুটিল না আর,
ফুটিল সে পুঞ্জে পুঞ্জে ধরণীর বনে,
উর্বশীর রাগারুণ নয়ন-আলোকে—
ফুটিল অমরী-বাঞ্ছা মানবের প্রেমে!
সেই প্রেম, সেই বধূ—ফিরে' গেছে আজ
আপন আলয়ে —তারি শোকে পুরূরবা
উন্মাদ ভ্রমিছে, হের, কান্তারে-গহনে।

যবে রাত্রি আয়ুঃশেষ—অটবী-সীমায়
ফুটিছে ধূসরচ্ছায়া অলক-তিমিরে,
ক্লান্তিহর শীতস্পর্শ নিশান্ত-সমীর
সহসা বুলায় ধীরে অতি সুকোমল
করাঙ্গুলি, জ্বরতপ্ত ললাটে চিবুকে,
স্বেদলিপ্ত শিরোরুহ-মূলে! আচম্বিতে
জ্যোৎস্না নিবে' গেল নভে, প্রভাত-গোধূলি

ঢালিল কলসী-জল তরল তিমিরে ;
শুধু ঊর্ধ্বে, চিত্রসম চন্দ্রের বদনে
তখনো জাগিছে জ্যোৎস্না নিশীথ-লাঞ্ছন!
এতক্ষণে পার হয়ে শীর্ণা শুক্তিমতী
উত্তরিল পুরূরবা অম্ভোজের তীরে।
একটি পুন্নাগ-তরু সরল-সুঠাম—
তারি দেহে দেহ রাখি', বাহু বাঁধি' বুকে,
ডুবায়ে চরণযুগ মুঞ্জতৃণ-বনে,
দাঁড়াল সম্বিৎ-হারা শ্রীহীন উদাস—
ত্রয়োদশদ্বীপাধিপ প্রতিষ্ঠান-পতি।
সম্মুখে সরসী-জলে সরোজ-শয়নে
ঘুমায়ে পড়েছে অলি মধুপান-শেষে,
দুলিছে নলিন-দোলা জলের দোলনে।
ধূপধূম্রসমোচ্ছ্বাস বাষ্প-যবনিকা
গোপন নেপথ্য রচি' আবরিছে দিক্
প্রাচী-মুখে,—যেন কারা অন্তরীক্ষ-পথে
স্বপ্ন-জাগরের মাঝে করে আনাগোনা ;
যেন কারা—স্নানার্থিনী—তেয়াগি' বসন,
নামিয়াছে পদ্মবনে অম্ভোজ-সরসে,
সোপান-শিখরে রাখি' একটি সে দীপ—
শুকতারকার, ছড়াইয়া চারিদিকে
রতনভূষণরাজি আকাশ-কুট্টিমে!
কাঞ্চন-কঞ্চুক' 'পরে মুকুতার সিঁথী
রাখিয়াছে আবরিয়া জরীর প্রাবারে ;
কোথাও বা একরাশি সদ্য-চয়নিত
নব-সিন্ধুবার। গাঁথিবে বিনোদ কাঞ্চী
মাধবী-মুকুলে বুঝি? কেশর-কলাপে
গড়িবে গুণ্ঠন? হেরি' তায়, পুরূরবা
কি যেন আশ্বাস-সুখে, স্বপন-রভসে,
মুদিল মদিরদৃষ্টি ; মেলিল যখন—
সুবঙ্কিম দীর্ঘায়ত আঁখির তোরণে
ফুরিছে অমৃত-ভাতি দিব্য-চেতনার!
তখন সুদূর দিক্-চক্রবাল-তটে
ফুটি' উঠে ধীরে ধীরে জ্যোতির বলয়,
ধূম্রগিরিশ্রেণী গাঢ় নীলাঞ্জনে লেখা—
ক্ষৌমবস্ত্রপটে যেন চিত্র-ঘনাবলী।

পলে পলে নব শোভা উঘারি' উঘারি'
কে করিছে নেত্র-সেবা? মুগ্ধ পুরূরবা
বিস্মৃতি-বিস্মিত,—ভুলিয়াছে এত ত্বরা
কামরূপা অপ্সরার অপার মোহিনী,
অসীম ছলনা!

সহসা সরসী-বুকে
দুলিল সলিল, ভিন্ন কুহেলির ফাঁকে
ফুটিল আভাসে কার স্তনাংশুক যেন,
মনোহর বাহু-ভঙ্গি!—কি মধুর হাসি
মুহূর্তেকে মিলাইল পাটল অধরে!
তখনি চিনিল তারে ; বর্ষ সহস্রেও
যার সাথে নিত্য ছিল নবপরিচয়!
তখন প্রসারি' বাহু, উন্নমিত মুখে,
উচ্চারিল পুরূরবা—সত্য-সমুজ্জ্বল
প্রেমের প্রাণদ-মন্ত্র তাহারি উদ্দেশে।—

'কোথায় চলেছ, অয়ি জীবিত-রূপিণী
জায়া মোর!—শূন্য করি' এ দেহ-দেউল?
হের ওই পূর্বাশার উদয়-দুয়ারে
দাঁড়াবে এখনি আসি' চির-উদাসিনী -
স্বপ্নসুখ-হন্ত্রী উষা। কোন্ অপরাধে
কি ছলে ত্যজিলে মোরে, কহ তা', উর্বশি।
নিত্য-জ্যোৎস্না নিত্য-পুষ্প নন্দনের লাগি'
বিরহী হৃদয় তব? তাই উদাসীন
মর্ত্য-সুখে—সদ্যঃপাতি ধরার কুসুমে?
কভু নহে! রচিয়াছি, হৃদয় প্রসারি'—
তোমার মন্দির ঘেরি' নন্দন-অধিক
রূপময় উপবন, আনন্দ-হিন্দোলা!
স্বপ্নাঞ্জন পরায়েছি নেত্র-ইন্দীবরে—
মোর মুখে চেয়ে তব অকুণ্ঠিত আঁখি
শিথিল নিমেষ-পাত। পক্ষ-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিরীষ-কেশরে
শিশির যেমতি। সুনিবিড় আলিঙ্গনে
উপজিল হৃদিতলে মধুর বেদনা,
নীল-ভৃঙ্গ বিলসিল উরস-কমলে—
সফল হইল তব যৌবন-প্রসূন!

ষষ্ঠিশত-শতাব্দের অযুত রজনী
এই হৃদিপাত্র ভরি' যে-সুধা ঢালিয়া
পিয়াইনু এতকাল—তারি মোহাবেশে
নিদাঘ-যামিনী কত রহিতে জাগিয়া
বিলম্বিত চন্দ্রোদয়ে, অলিন্দের 'পরে—
হেরিবারে জ্যোৎস্না মোর সুখসুপ্ত মুখে,
অধর অধীর হ'ত চুম্বন-লালসে।
ছিলে না কি সুখী? তোমার অম্লান রূপ—
দেবতাকাঙ্ক্ষিত, ধন্য, অনির্বচনীয়!—
রাজ্যসুখ তুচ্ছ করি' চেয়েছিনু আমি
ধরণীর পতি, তুমি তাই পণ দিয়ে
জিনিয়া লইলে মোর কৌমার অতুল—
অ-স্বর্গীয়, দেবতা-দুর্লভ! স্বর্গ হ'তে
রূপ আসে নামি', ধরার অনর্ঘ দান
মানবের প্রেম,—এ দোঁহার বড় কে যে,
বুঝিবারে নারি! তবু কহ সত্য করি',
আর কেহ ওই ফুল্ল রক্তাধর পানে
নিমেষে-সর্বস্বহারা চেয়েছে এমন?
ও-কটাক্ষে সুধাপাত্র হাত হ'তে খসি'
পড়েছে কভু কি কারো ত্রিদশ-মণ্ডলে?—
তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! এত ত্বরা ফিরায়ো না মুখ!
অয়ি মানস-নিষ্ঠুরে! কর অন্তরাল
আমার নয়ন হ'তে উষার অঞ্চল!
ওই না হেরিনু সেই মরণ-মোহিনী—
অনির্বাণ কামনার অশেষ ইন্ধন—
উর্বশীর বিবসনা-শোভা! কি বলিলে?
দৈবাধীনা তুমি? ফিরিতেছ দেবাদেশে
দুখস্বর্গে, দেবতার সুখচর্যা লাগি'?
তোমারো নয়নে অশ্রু! থাক্ থাক্ তবে,
আমার সকল ব্যথা নিয়েছ হরিয়া
অশ্রুমুখি! কিন্তু ওই মর্ত্য-মনোহর
অনুপম নেত্র-ভূষা কোথায় লুকাবে
অমর-সভায়? যেয়ো না, যেয়ো না প্রিয়ে!
মাগি' লও স্বর্গ হতে চির-নির্বাসন,
চেয়ো না অমৃত, এসো মরি দু'জনায়!
অজর-অমর হয়ে নিত্যের নন্দনে

থেকো না অরূপ রূপে—অনিত্য-সদনে
অন্তহীন মৃত্যুস্রোতে এস গো নামিয়া!
নব-নব জন্ম-বিবর্তনে আঁখিযুগ
চিনি' ল'বে আঁখিযুগে, চির-পিপাসায়!
বার বার হারায়ে হারায়ে ফিরে পাব
দ্বিগুণ সুন্দর! আবার বিচ্ছেদ-কালে
ফুটিবে চুম্বন যেই মর্মান্ত হরষে
ওষ্ঠপুটে, তারি গন্ধ-মকরন্দ-লোভে
লুকায়ে নামিবে মর্ত্যে সকল দেবতা।
নিত্যেরে কে বাসে ভালো?—চিরস্থির ধ্রুব
অনন্ত-রজনী কিম্বা অনন্ত-দিবস?
নহি তা'য় অনুরাগী ; আমি চাই আলো
ছায়ারি পশ্চাতে ; চাই ছন্দ, চাই গতি,
রূপ চাই ক্ষুব্ধ-সিন্ধু-তরঙ্গ-শিয়রে—
ধরিতে না ধরা যায়, পলকে লুটায়!'

নীরবিল পুরূরবা,—কোথায় উর্বশী!
রেখে গেছে হাসিখানি প্রভাতের মুখে
করুণ-কোমল,—বিদায়ের মত নয়!
আবার কোথায় যেন হইবে মিলন।...
সেই কথা লিখি' দিয়া সোনার অক্ষরে,
মিলাইল মধুবর্ণ বিবাহ-দুকূল
মেঘস্তরে ; শূন্যমনা মুগ্ধ পুরূরবা
হেরিল গরল-নীল মৌনী গিরিমালা
বালারুণ-রক্তরাগে অমৃতায়মান!

ভারতী, পৌষ ১৩২৭

বসন্ত-আগমনী

যাই-যাই করে' শীত চলে' গেল সেদিন কুহেলি-প্রাতে,
আজি সন্ধ্যায় বসন্ত এল, পঞ্চমী-চাঁদ সাথে!
কত দিন পরে আজিকে ফিরিল ধরণীর বরণীয়—
দক্ষিণ-বায়ে উড়িয়াছে তার পরাগ-উত্তরীয়!

রাজার নকীব বাসন্ত-পিক ফুকারিল দিক্-পথে—
হয়েছে সময় ঋতু-অধিপের আসিবার ফুল-রথে!
পতঙ্গ-পাখী-মধুপপুঞ্জে মুখরিত দশ দিশি,
কি নেশা বিলায়ে মাতাল বাতাস গানে ও গন্ধে মিশি'!
সারা দিনমান গাইয়াছে গান—বসন্ত-আগমনী,
অরুণ উঠেছে তরুণ-বদন নবীন আশার খনি।
পল্লব-মুখে চুম্বন সম আলোকের পিচ্‌কারী,
সুরভি নেশায় মশগুল-করা মধুভরা ফুলঝারি—
আম্র-মুকুলে ভরেছে দুকূল সকল বনস্থলী,
গ্রাম-পথে-পথে সজিনার ফুলে দিয়েছে লাজাঞ্জলি!
আলিপনা এঁকে বসন্তশ্রী-পঞ্চমী-আবাহন—
ঘরে-ঘরে আজ হ'য়ে গেছে পূজা, সুমধুর আয়োজন!
কাননে কাননে শুনিয়া ফিরেছি সকল পাখীর শিস্,
ধান্যবিহীন ক্ষেত্র-সীমায় আহরি' যবের শীষ ;
স্তব্ধ গভীর নিথর সলিলে আকাশ দেখিছে মুখ,
গুঞ্জন-ভরা বাতাসের শ্বাসে কভু বা কাঁপিছে বুক,
ডাহুক-ডাহুকী পক্ষ ভিজায়,—এমন সরসীতীরে
আর্দ্র-শীতল মৃত্তিকা 'পরে শরবনে এনু ফিরে।
আতপ্ত দিবা-দ্বিপ্রহরের আলোক-মদিরা পিয়ে
রসালসে দেহ এলায়েছি মোর ছায়া-তরুতলে গিয়ে—
শিয়রে আমার চেয়ে ছিল দুটি আঁখি-সম নীল-ফুল,
তাহারি স্বপন দেখেছি জাগিয়া, কেবলি করেছি ভুল!

পথ দিয়ে যবে ঘরে ফিরিয়াছি দিবসের পরিশেষে,
বালকের মত বাকস-বৃন্ত চুষিয়া, একেলা হেসে—
ধূলার উপরে হেরিলাম ছবি, অস্ফুট-রেখার আঁকা
ছায়াখানি মোর চলিয়াছে পাশে! মদনের ধনু বাঁকা—
উদিয়াছে চাঁদ, দেখিনু তখন আকাশের পানে চাহি',
অলখিতে ওঠে মাঠ-বাট ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় অবগাহি'!
বনবালাদের কবরী-কুসুম ঘোম্‌টা-আঁধারে ঢাকা,
মৃদু-সৌরভ কোনোমতে তবু যায় না লুকায়ে রাখা!
নেবু-মঞ্জরী-মন্থরবাস অন্তরে গিয়ে পশে,
কেদারবাহিনী—দখিনা-বাতাসে কত কথা কহিল সে!
কতদিন পরে ঘরে ঘরে আজ বাতায়ন খুলিয়াছে!
সোহাগিনী ওই করবীর ঝাড় পাশে তার দুলিয়াছে!

ঝির্ ঝির্ ঝির্ বহিছে সমীর, বাঁশীর রাগিণী ভাসে,
আজিকে চাঁদিনী-চাঁদোয়ার তলে প্রাণ খুলে কারা হাসে!
এমন সময়ে যদি কেহ ডাকে কানে-কানে, 'প্রিয়তম'!—
গীত গেয়ে পারি উত্তর দিতে প্রতিধ্বনির সম।
মরমের কথা কহেনি যে-জন, আজিকে কহিবে যে সে,
কঠিন-হৃদয় আজিকে হইবে কৃতার্থ ভালোবেসে!
মনে হ'ল, আজ জীবনের যত নিরাশার পরাভব—
রঙীন এ রাতি—বাসনার বাতি যত আছে জ্বালো সব!
তৃণভূমি 'পরে বসিয়া ক্ষণেক হেরিলাম নিশানাথে,
বুঝিনু আবার বসন্ত এল পঞ্চমী-চাঁদ সাথে।

চূত-মঞ্জরী

কালি রজনীতে এসেছিল কারা ধরণীর উপবনে—
নন্দন হতে বসন্তে যবে নামিল সঙ্গোপনে?
নূপুর তাদের শোনে নাই কেহ নীরব গভীর রাতে?
—মৃদু-সঙ্গীত মিলাইয়া যায় বাসন্ত-বন-বাতে!
সহকার-শাখে আঁকা ছিল বুঝি মঙ্গল-আলিপন—
মুকুলোন্মুখ পল্লবদলে মৌন-নিমন্ত্রণ?
তাই বুঝি তারা জ্যোৎস্না-চিকণ কুয়াশায় ঢাকি' দিশা,
চূত-মণ্ডপে যাপিল গোপন মধুর মাধবী-নিশা!
চুম্বন-মধু কনক-হাস্য বিতরিল তারা কত—
আদর-সোহাগ মান-অভিমান সব আমাদেরি মত!
প্রণয়-রভসে মুকুতাকলাপ মালা হ'তে পড়ে খসি'—
ভ্রূক্ষেপ নাই, পিঙ্গল-বাস ভুলে যায় দিতে কসি'!
অপরের বুক বাহুডোরে বাঁধা, শিয়রে কবরী খোলা—
প্রেমিক-প্রেমিকা মিলন-শয়নে চিরদিন আলাভোলা!
রজনীর শেষে জ্যোৎস্নার দেশে পরীরা মিলায়ে গেল,
প্রতি পল্লবে রতি-পরিমল পরীরা বিলায়ে গেল!

কিশোরী

'নাকের নোলক কোথা রেখে এলি? হ্যাঁলা ও পোড়ারমুখী!'
দিদি শুধালেন, রাধারাণী বলে—'আমি কি এখনো খুকী?'
কাঁচপোকা-টিপ কপালে এখনো, ছাড়েনি পুতুল-খেলা ;
রাগ-অভিমান, কাঁদাকাটা-হাসি লেগে আছে সারাবেলা!
সেধে' ভাব-করা যেমন, তেমনি চিম্‌টি কাটিতে পটু,
বৌদিদিদের পরিহাসে হারি' রাগিয়া কহিবে কটু!

সকলের আগে শিব-পূজা তার ; ভিজাচুল একরাশ
পিছনে গোছানো, পাছে সরে' যায়—চুলেরি ফিতার ফাঁস।
চুড়ী কয়গাছি ক্ষণে-ক্ষণে বাজে, ঝম্-ঝম্ বাজে মল,
আধ-মুকুলিত উরস পরশি' হার করে ঝল্‌মল্।
জোড়াভুরু আর অলকার মাঝে পঞ্চমী-চাঁদ পাতা,
ডাগর চোখের সরল চাহনি অশ্রু-হাসিতে গাঁথা!
ফুল জিনি' নাসা পেলব নিখুঁত—নিশ্বাসে কেঁপে উঠে,
অতি পবিত্র চিবুক-ভঙ্গি, কি ভাষা ওষ্ঠপুটে!
ললিত-কোমল কপোল তাহার শত চুম্বন-আঁকা—
বাপের, মায়ের, সোদরা-স্নেহের আদর-সোহাগ-মাখা!

অঞ্জলি-ভরা জবাটি ছিঁড়িয়া ভরিল যখন ডালা,
জবা সে ত' নয়—আমারি হৃদয় হরিল কিশোরী-বালা!

নারী

রাজার ছেলে তোমায় নিয়ে সোনার রথে তুলে'
প্রাসাদে তার প্রবেশ করে সিংহ-দুয়ার খুলে ;
রতন-ভূষণ মণির মালায় সাজিয়ে দ্যাখে মুখ—
বুকের ভিতর জাগছে তবু দুঃখহীনের দুখ!

পথের পাশে পর্ণ-কুটীর বেড়ায় আড়াল-করা,
শাঁখা-শাড়ীর অতুল শোভায় ঘরটি আছে ভরা।
তৃণের ডালায় ফুলের মতন সেই যে আয়োজন—
রাজার ছেলে ভাবছে তবু—সেই বা কেমন ধন।

কোথায় নারী। কোথায় তারি হৃদয়-রতন খানি।
বিশ্ববিজয় সিংহাসনের কোথায় ঠাকুরাণী।
সেই যে সিঁথায় নখের মুখে একটু সিঁদুর টানা—
দেখছে তেমন উজল কিনা রাণীর মুকুটখানা।
* * *
ভিজা মাটী কাদার 'পরে শিউলি যেমন ঝরে—
তেমনি যখন রূপের রাশি লুটায় দুখীর ঘরে,
রাণীর মুকুটখানির কথা প্রেমীর মনে জাগে—
নারীর পূজার তরেই সে যে রাজার বিভব মাগে।

শ্রাবণ-রজনী

সেদিন বরষা-রাতি,
ঘনঘোর মেঘে জ্যোৎস্না ডুবেছে, বাতাসে নিবেছে বাতি।
সাঁই-সাঁই করে গাছের পাতায় থেকে থেকে নামে জল
কখনো মেঘের আড়ালে ফুটিছে চন্দ্রিকা সুবিমল।
বাতায়ন-পথে মাঠ-ঘাট-বাট যতদূর যায় দেখা—
সকলেরি পরে ছায়া-আলোকের সজল চিত্র-লেখা।
আকাশে কোথাও মসীর মতন জমাট মেঘের স্তূপ,
কোথা'ও ধূসর মুক্তাবরণ আলিপনা অপরূপ।
আলোক যেখানে অধিক ফুটেছে সেখানে দুধের বান,
কালো মেঘ-আড়ে চন্দ্রবিম্ব তিলকের উপমান।

একবার ফিরে' চাহিয়া দেখিনু প্রিয়া ঘেঁসে আছে শুয়ে,
কঠিন কেয়ূর বাজিছে পারশে, মুখখানি আছে নুয়ে ;
তুলিয়া ধরিয়া বারেক চাহিনু—কি করিল বলি শুন,
নয়নে নয়ন বারেক রাখিয়া দু'হাতে ঢাকিল পুনঃ।
নাকের নোলক দোলাইয়া দিয়া চিবুক পরশি যবে
কহিলাম, 'কিবা মানায়েছে তোমা!—নোলক পরিলে কবে?'
উপহাস ভাবি' নোলক তখনি নাকের ভিতরে গুঁজি'
লাজে মরে' গিয়ে মুখ লুকাইয়ে প্রিয়া রহে চোখ বুজি'।
যখনি কিন্তু মুখ-পানে চাই তখনি পড়ে গো ধরা—
চুরি-করে'-চাওয়া চপল নয়ন ভয়ে মুদে' যায় ত্বরা।

এমনি করিয়া অর্ধ-রজনী আলস-বিলাসে কাটে,
জ্যোৎস্না-রূপসী মেঘ-গুণ্ঠন খুলিল আকাশ-বাটে।
চরাচর-জোড়া ছায়া-আলো-বোনা মিহিন্ জরীর জাল
অসীম শোভার স্বপনে বাঁধিল ধরণীরে সুবিশাল!
মেঘ-আড়ে যবে জ্যোৎস্না ফুটিয়া সিক্ত ধরণী-মুখ
চুম্বন করে, মনে পড়ে মোর কবেকার সুখ-দুখ!
শ্রাবণ-নিশীথে নবীনা রাধার প্রাণখানি ধুক্‌ধুক্—
জানিয়াছি কেন ভরি আছে হেন বাঙালী কবির বুক।
আমারি দেশের আষাঢ়-গগনে নবীন-নীরদ-ছায়া
স্থলে-জলে রচে বরষে-বরষে বৃন্দাবনের মায়া।
গোঠে যায় ধেনু, মাঠে বাজে বেণু আমারি শ্যামল দেশে—
"চাঁদিনী উঠিলে ফুলটি ফুটিলে কদমতলায় কে সে!"
মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, অভিসার অভিরাম—
যাহারে ঘেরিয়া উছলিছে গীতি যুগ-যুগ অবিরাম,
মুকুল-বয়সী, গোকুলে বসতি, হৃদয়ে পীরিতি-মধু—
রাইকিশোরীর রূপ-গুণ হরে আমারি কিশোরী-বধূ!
মেঘের আঁধারে সাঁজের আঁধার কিছু নাহি চেনা যায়,
প্রদীপ সাজায়ে শাঁখটি বাজায়ে প্রণমে দেবতা-পা'য় ;
বিকালে-কুড়ানো বকুলের রাশ, ছিল যা থালায় ঢালা—
তাই নিয়ে সারা সন্ধ্যাটি কাটে গাঁথিয়া দীর্ঘ মালা।
রাধিকারি সখী সে কমল-মুখী কিশোরী বঙ্গবালা,
তাহারি স্নেহের সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ঘরে হয় জ্বালা!
নবনীত জিনি' রূপের নিছনি, পুষ্পকেশর কেশ,
কবরী ঘেরিয়া যূথিকার মালা, নীলাম্বরীর বেশ ;
মিলনের বুকে বিরহের ভয়, হাসিতে অশ্রু মেশে—
এমন হাসিতে এমন কাঁদিতে কেবা পারে কোন্ দেশে!

বাহিরে ঝরিছে জল অবিরল, বায়ু করে মাতামাতি ;
এত কাছে শুয়ে বুকে মাথা থুয়ে তবু ভয় সারারাতি!
কণ্ঠ আমার বেড়িয়া ধরেছে কখন ঘুমের ঘোরে,
অতি সুকোমল 'নোয়া'-পরা ছোট একটি বাহুর ডোরে।
ঘুমন্ত মুখে ঘোম্‌টা খেসেছে, উসুখুসু চুলগুলি
সন্তর্পণে নয়ন হইতে ললাটে দিলাম তুলি' ;
কপোলে জ্বলিছে মাণিকের মত কানের রতন-দুল,
শিথানে পড়েছে কখন খসিয়া খোঁপার দু'চারি ফুল।

ঈষৎ-ভিন্ন অধর-পাতায় হাসিটি করিছে খেলা,
মুদিত চোখের পাপ্‌ড়ি-কিনারে স্বপন-শোভার মেলা!
বারেক চাহিনু আকাশের পানে, বারেক ধরণী-পানে,
সঘন বরষা ঘনায় আবার, ঘন চিকুর হানে।
একটু জ্যোৎস্না খসিয়াছে শুধু কোন্ সে মেঘের ফাঁকে
আমারি ঘরের বালিশ-আলিশে, হৃদয়ে ধরিনু তাকে ;
শ্রাবণের গান, কবিতার ভান—সকলি হারায়ে গেনু,
বিভোর-পরাণে নিমীল-নয়ানে চুমিয়া সকলি পেনু!

ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৭

চুড়ির আওয়াজ

চুড়ির আওয়াজ—আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি—
কতবার যে কতই সুরে বাজে তাহাই শুনি!
সোনার হাতে সোনার চুড়ি—কে কার অলঙ্কার?
নয় সে শোভা, বধূই জানে চুড়ি কি ধন তার!
ঘুরিয়ে দিয়ে ছোট্ট দুটি কোমল কর-মূল,
আড়া[illegible]কে চম্‌কে দিয়ে করায় কতই ভুল!
শব্দ-তাড়িত প্রাণের তারে জানায় কত কথা—
কেউ জানে না লাজুক বধূর চুড়ির মুখরতা!

নিশীথ-রাতের গোপন-গভীর মিলন-মধু'র আশে
তরুণ যুবার নিদ্রাকাতর নয়ন মুদে আসে ;
চম্‌কে ওঠে, কোথায় যেন বাজ্‌ল কাঁকণ কার!
কই—কোথা নয়! ওই যে বাজে, শুনছি পরিষ্কার!
সকল নীরবতার মাঝে কি-ওই বাজে কানে?
দুয়ার-পাশে ওই যে বাজে, বাজ্‌ছে সে কোন্ খানে?
কান সে বাজায় আপন মনে, শাসন নাহি মানে,
সত্যি-বাজায় মিথ্যা-বাজায় প্রভেদ নাহি জানে!
এমন সময় ঝুন্‌ঝুনিয়ে বাজ্‌ল বারান্দায়
চুড়ির আসল সাততারাটি, তন্দ্রা ছুটে যায়।
কি সুর বাজে সকল শিরায় শির্‌শিরিয়ে রে!
একটু শুধু রুন্‌ঝুন্ আর রিন্‌ঝিনিয়ে রে!

গুমট্-ভাঙা দম্‌কা-হাওয়ার পরশ লাগে গা'য়,
সকল ফুলের সকল সুবাস জাগ্‌ল লহমায়!
আঁধার ঘরে আচম্বিতে জ্যোৎস্না ফিনিক্ ফোটে।
শীতের শেষে প্রথম যেন কোকিল ডেকে ওঠে!

মান-ভরে আজ আছেন তিনি—কথা নাইক' মুখে,
তিনটি দিনের পরে বোধ হয় প্রাণ গলেছে দুখে।
দোষটি আমার ছিল যাহা, দেখেন তাহা নিজের—
বুকের ব্যথা বাড়ছে, তবু যায় কি মানের সে জের!
ঘন ঘন বাজিয়ে চুড়ি সামনে দিয়ে যাওয়া,
আমার ঘরেই খুঁজ্‌তে আসেন, যায় না কি যে পাওয়া।
চুড়ি বলে, 'একবারটি কওনা কথা ডেকে,
জুড়াই ব্যথা বুকের 'পরে মাথা বারেক রেখে!
কইব কেন? হবই আমি হবই বেরসিক,
শুন্‌ব চুড়ির মধুর আওয়াজ, থাক্‌ব এখন ঠিক!
বাজুক এখন ঝন্‌ঝনিয়ে, বাজুক রেগে কেঁদে,
বাজুক আবার নরম সুরে—'মার্‌ছ কেন বেঁধে?'
মিথ্যে করে ঘুমিয়ে যখন পড়ব ধীরে ধীরে,
এটা-সেটা রাখার ছলে বাজুক ঘুরে ফিরে।
হাতের চুড়ি এমন যখন বল্‌ছে মুখের বোল—
কাজ কি কথায়? শুনছি বেশ ওই মধুর গণ্ডগোল!

মনে পড়ে, শেষবার সেই এগ্‌জামিনের পড়া—
দুই ঘরেতে দু'জন আছি, শাসন বড়ই কড়া!
বল্‌লে ডেকে, 'কাল সকালে ঘুমটি ভাঙার পর
মুখটি তোমার দেখার যেন পাই গো অবসর।
থাক্‌ব আমি দুয়ার ধরে' তোমার দুয়ার চেয়ে,
দেখ্‌ব শুধু একটি পলক, লাজের মাথা খেয়ে।'
রাত্রি জেগে' ভোরের সে-ঘুম ভেঙেও ভাঙে না,
কানে আসে কিসের আওয়াজ? থেমেও থামে না।
বুকের ভিতর কেমন বাজে চুড়ির রিনিঝিনি,
ভোরের ভজন এ কোন্ সুরে গাইছে ভিখারিণী!
আকুল হয়ে কাঁদন যেন ফিরছে নিরাশায়—
"ওগো জাগো, ডাকছি আমি, সময় বয়ে যায়"!
দুয়ার খুলে' তাকিয়ে দেখি, বিউনি খোলার ছলে
ভোমরা-কালো চুলের মূলে আঙুল দ্রুত চলে।

একে একে সাপ-কাঁটা আর চিরুণ, প্রজাপতি,
সব নেমেছে—খোঁপার সে কি অপূর্ব দুর্গতি।
খুলছে না ক' ফিতার গিরা, ফাঁসটি ধরে' টানে,
অম্‌নি চুড়ি বালার 'পরে কি ঝঙ্কারই হানে!
অবাক হয়ে দেখ্‌নু চেয়ে চোরের চতুরালি,
দুষ্টু চুড়ির দুষ্টামী সে, নূতন দূতিয়ালী!
চুড়ির আওয়াজ—আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি!
কতই সুরে কতবার সে বাজে তাহাই শুনি।

ভারতী, চৈত্র ১৩২৭

ভাদরের বেলা

ভাদরের বেলা আদরে কাটিয়া যায়—
এটা, ওটা, সেটা—প্রাণ তবু কি যে চায়।
ভিজা বায়ু বয়, দিন মেঘময়,
এমন আঁধারে একরাশ চুল কেমনে শুকাবে হায়,
কেন ভুল করে? কি হবে বাঁধিয়া—কেবলি যা' খুলে যায়!

এলো-খোঁপা আজ দু'হাতে বাঁধিয়া নাও,
যূথিকার হার উহাতে দুলায়ে দাও।
কাণে দোলে আজ ওই যে দোদুল দুল—
আঁখি দু'টি মোর হেরিয়া হরষাকুল!
গণ্ড-গ্রীবায় নবনীত ভায়!
কেতকী-কেশর-গৌর তোমার ভুজ-শাখা সবলয়
মনটি আমার কেমন করিয়া আজিকে কাড়িয়া লয়!

নীলশাড়ী খুলি' পোরো না খয়েরী খানি।
খয়েরের টিপে ভুরু ভেঙ্গে দাও, রাণি!
মুখর নূপুর করি' দাও দূর।
আজ শুধু ভালো—কালো চুড়ী আর কাঁকনের রুনিঝুনি,
বকুলের মালা গাঁথ বসি' বালা, দেখি, আর তাই শুনি।

ভারতী, ভাদ্র ১৩২৬

পরম-ক্ষণ

তোমার সাথে একটি রাতে
বদল হ'ল মিলন-মালা—
একটি প্রহর সুখের লহর,
একটি নিমেষ সুধায়-ঢালা!
তোমার খোঁপার পাপ্‌ড়ি চাঁপার
ঝর্‌ল আমার শিথান 'পরে,
টুট্‌ল শরম. রূপটি পরম
ফুট্‌ল তখন ক্ষণেক তরে!
বাহুর শাখা—পরীর পাখা!—
বুকের পরশ সব ভোলায়!
আলস-রসে আবেশ-বশে
চাউনি দোলে চোখ-দোলায়!
কালো-ফুলের গন্ধ—চুলের—
উথ্‌লে ওঠে নিশাস-বশে,
ঠোঁটের ঠোঙায় চুমায়-চুমায়
চুমুক দিলাম হাসির রসে!

তোমার সাথে মিলন-রাতে
সেই পরিচয় নিবিড়তম!—
ক্ষণেক লাগি' দুজন জাগি
গৌরী-হর মূর্তি সম!
দেহের মাঝে আত্মা রাজে—
ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ ;
আত্মা-দেহ ভিন্ন কেহ
নয় যে কভু—এক সমান!
তাই ত' তোমায় দেহের সীমায়
ধরতে পারি আলিঙ্গনে—
দুই'এর ক্ষুধা একের সুধা
কেবল ত' সেই পরম-ক্ষণে!
সকল প্রাণে পুলক-বানে
স্বর্গ আসে ধরায় নামি'—
একটি বোঁটায় ফুল সে ফোটায়
তোমার তুমি, আমার আমি!

মোশলেম ভারত, চৈত্র ১৩২৭

তারকা ও ফুল

সে ডাকি' কহিল, পথের ধূলায় লুটি',
শেফালির মত সকরুণ আঁখি দুই—
'লহ, ওগো মোরে লহ,
নিষ্ঠুর তুমি নহ!'
সুন্দর ফুল! কেন উঠেছিলে ফুটি'?
কেমনে কুড়াব—জোড়া যে এ হাত দুটি!

সে ডাকি' কহিল সাঁঝের গগনে ফুটি'
তারকার মত সুগভীর আঁখি দুটি—
'বন্ধু, তোমারে চাই,
এই আকাশের ঠাঁই!'

সুদূর স্বপন! কে দিবে আমারে ছুটি?
মাটির ঢেলায় চাপা যে চরণ দুটি!

সে যবে কহিল, নখেতে কাঁকন খুঁটি',
রমণী আমার—আনত নয়ন দুটি—
'ব্যথার নিশীথে প্রিয়,
আমারে জাগায়ে দিও!'—
তারা আর ফুল এক-সাথে ওঠে ফুটি'!
বিরহে স্বপন, মিলনে সে ভরে মুঠি!

ভারতী, মাঘ ১৩২৭

মৃত্যু

মৃত্যুরে কভু চোখোচোখি দেখিয়াছ—
শিহরি' সভয়ে সহসা কাঁধের কাছে?
দুইটি আঙুলে পরশি' তোমার দেহ
দুটি কথা বলি'—শোনেনি সে আর কেহ-
কি যেন সে ভাষা, অর্থ কিছু না আছে,
ধ্বনি নয় যেন প্রতিধ্বনির মত,
নিমেষের মাঝে করিয়া মূর্ছাহত—

আঁখি না মেলিতে আঁধারে সে মিশিয়াছে?
অথবা যেন সে পথের প্রান্তে আসি',
এতখন চলি' অচেনা সাথীর প্রায়,
সহসা আপন পরিচয় পরকাশি'
চেয়েছে কভু কি উপহাসি' ইশারায়?
চতুর চাহনি কুটিল হাসিতে ভরা—
যেন সে তোমারি কুশল-প্রশ্ন-করা,
ভীষণ-নীরবে বারেক বাঁকায়ে গ্রীবা
সমুখে ঝুঁকিয়া চোখ দিয়ে চোখ ধরা,
জিজ্ঞাসে যেন—মধুর ভঙ্গি কিবা!—
'চিনিলে না মোরে, কেমনে ভুলিয়া আছ'।
—মৃত্যুরে হেন মুখোমুখি দেখিয়াছ?
কবির কাব্যে 'বঁধূ' বলে' তারে ডাকা,
ধর্মের নামে পরিচয় করে' থাকা—
সে কথা বলি না, দেখেছ কভু কি তারে
বাহির-দুয়ারে সম্মুখে একেবারে?
রক্তনয়ন, বিকটবদন, হাসিতে রক্ত ঝরে,
নিঃশ্বাসে বাক্ হরে!
কণ্ঠে রজ্জু, জিহ্বা বিগলিত, ভীষণ দশনমালা,
শ্মশানের ধূম, চিতা-বহ্নির জ্বালা—
এ সব দেখেছ, আহ্বান শুনেছ?
ডেকেছে কি নাম ধরে'
সুখ-রজনীর ভোরে?
আঁধারে তাহার দীপ্ত-নয়ন
বাঁকায়ে দেখেছে তোরে?

জীবনের আশা কিছু পূরে নাই,
মেটে নি প্রাণের কোন কামনাই,
স্বজন-সখারা দূরে,
নির্বান্ধব পুরে
হঠাৎ ধরিয়া কেশেতে তোমার
টানিয়াছে বার বার?
জীবন-চক্র হয় নাই ঘোরা,
খোলা হয় নাই একটিও ডোরা
মায়ার মদিরা-মোহে,
অতি চঞ্চল ছুটিতেছে স্রোত হৃদয়-ধমনী-লোহে

আদি ও অন্ত কিছু নাহি বুঝি,
চলিয়াছি পথে অতি সোজাসুজি-
শ্যেনসম হেন কালে,
পাখা-ঝটপট রক্ত-নখরে
তুলে' নিয়ে যাবে আপন বিবরে,
আঁধার গহ্বরে তার!
আমি জেগে র'ব, সকল চেতনা
রহিবে, সহিব সকল বেদনা—
এত ভালবাসা, এত চেনা-শোনা,
সকলি স্বপন-সার!

ঘাতকের অসি ঝলসিছে দিনরাতি,
আঁধার কারায় কঠিন শয়ন পাতি'
মরণের সাথে সন্ধি করিতে চায়,
গণিতেছে দিন ভীষণ প্রতীক্ষায়—
বন্দী-জনের জীবন-শেষের মত
মরণ-লগ্ন নিকট হইছে যত,
জীবন-চেতনা ততই বাড়িছে হায়!

অথবা যক্ষ্মা-রোগীর মতন
পেয়েছে যে জন মরণ-নিমন্ত্রণ—
বিষকটু সেই মরণ-পাত্র
লয়ে বসে' আছে দিবস-রাত্র,
সারা প্রাণ শিহরায়,
চুমুকিতে চমকায় ;
দর-দর ধারা নয়নের জল
মিশিছে তাহাতে শুধু অবিরল
নিদারুণ বেদনায়!
জীবনের আলো কত মধুময়
নিবিবে এখনি নাহি সংশয়,—
পাণ্ডুর মুখ, শুষ্ক অধর,
দিন-দিন ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর,
মৃদু-উত্তাপে তনু জর-জর,
নিঃশ্বাসে ব্যথা লাগে ;
আকুল নয়নে সবারে সে চায়,
এত লোক সব হাসিয়া বেড়ায়—

কাতর কণ্ঠে সব দেবতায়
জীবন-ভিক্ষা মাগে!
নাহি কোনো পথ, নাহিক উপায়,
মরণ টানিছে ধরিয়া দু'পায়,
জীবন তাহারে করেছে বিদায়
বহু বহু দিন আগে!
ক্রমে দেহ হয় অস্থি'র মালা,
স্ফীত নাসিকায় অগ্নির জ্বালা,
ওষ্ঠ কালিমাময়।
ললাটে শিশির—ঘর্ম-বিন্দু,
চক্ষুর জ্যোতি প্রভাত-ইন্দু,
যেন পৃথিবীর নয়!
যেন সে ঢুকেছে সমাধি-গহ্বরে,
অতিদূর কোন পাতাল-বিবরে—
স্তব্ধ বিজনালয়!
সেথা হ'তে দুই গবাক্ষ খুলে'
চাহিয়া দেখিছে গেছে কিনা ভুলে'
মানবের মেলা, মানবের খেলা,
—কি যেন সে বিস্ময়!

দেখেছ কি হেন মৃত্যুর বিভীষিকা
ক্ষণেক টুটিয়া জীবনের মরীচিকা—
নিবিয়াছে দীপশিখা
হঠাৎ প্রমোদরাতে?
বল দেখি সে কি ভীষণ আঁধার!
রুদ্ধ-নিশাসে সে কি হাহাকার!
আছে কি তাহার কোনো প্রতিকার—
আছে মানবের হাতে?
ধর্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে—
মন্ত্রে-তন্ত্রে প্রাণ নাহি পূরে!
আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে করি' ল'ব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
জীবনের শোক, জীবনের দুখ,
জীবনের আশা, জীবনের সুখ—
পরাণ আমার চির-উৎসুক

লইতে পাত্র ভরি'।
উচ্ছল-ফেন মদিরার মত
কানায় কানায় বুদ্বুদ শত
অধরে তুলিব ধরি'—
ধরণীর রস জীবনের রস যত।
শিরা-উপশিরা স্নায়ুতে স্নায়ুতে,
কীচকরন্ধ্র যেমন বায়ুতে—
ভরিয়া লইব জগতের শ্বাস
সুখ-দুঃখের বিলাস-বাঁশরী-তানে,
সুর দিব আমি হাস্য-অশ্রু-গানে,
ফুটাব ঝরাব ফুল-পল্লব বারমাস।
নিশীথ-আকাশে তারকার রাজি
ভরি' দিবে মোর স্বপনের সাজি,
নীরব আঁধার-রাতে!
ঈশানের কোণে মেঘ হবে জমা,
ধরণী হইবে অতি মনোরমা!
দিগঙ্গনারা পিঙ্গল হাসে,
শাখা তুলি' তরু নাচে উল্লাসে
বজ্র-ঝঞ্ঝাবাতে—
তাণ্ডবে মাতি' জাগিব বিপদ-রাতে।
তার পর যবে কবে—
দুখে দুখ নাহি র'বে,
সুখ, সেও আর নাহিক ছলিবে,
জীবন-ক্লান্ত চরণ টলিবে,
বাহুযুগ ক্ষীণ হবে—
ঝিরি-ঝিরি নিশা-বায়
ফুল যথা মূরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি
ধরণীতে মাথা রাখি'—
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোনো শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো সুন্দর পরলোক!

ভারতী, আষাঢ় ১৩২৭

ক্ষ্যাপা

শিশুর মত সরল হেসে উঠ্‌ল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে—
জ্যোৎস্না-মেয়ের ওষ্ঠ চুমি', ঝড়ের সাথে দিল্‌ মিলিয়ে!
প্রাণের গানের মন্ত্র গেয়ে ক'র্‌লে সোনা ইট-পাথর,
ফুলের মুঠি উঠ্‌ল ফুঁসি' সাপের ফণায় কিল্‌বিলিয়ে!
"সোনার লোভে আসিস্‌ ছুটে'?—বিষের ভয়ে পিছ্‌-পা তোর!"
—বলেই আবার দুধের হাসি হাস্‌ল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে।

উঠ্‌ল নিশায় কাঁদন তাহার আকাশ-সেতার ঝুন্‌ঝুনিয়ে,
ছিন্ন-মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে তারার আগুন-ফুল বুনিয়ে।
চোখের কোণে ফিন্‌কি ফোটে, রক্ত কিনা যায় না চেনা—
ভালোবাসার লোকটি যে তার কোলের উপর যায় ঘুমিয়ে!
"দিল্‌-পিয়ারা, ঘুমাও, ঘুমাও! রাত্রি অনেক, আর নাচে না!"
—বলেই বুকে বসিয়ে ছুরী, ডুক্‌রে কাঁদে কোন্‌ খুনী এ!

কিসের কাঁদন, কিসের হাসি? কে বলে' দেয়—কোন্‌ সেয়ানী?
বাঁধন-হারার ছন্দ-মাতন—ব'লবে কেবা—খুব সে জানি!
এক তালে সে আগুন জ্বালায়, আরেক তালে ফুল ফুটিয়ে
অবাক করে', বেহুঁশ করে' সবার হিয়া নেয় সে টানি'!
বুঝ্‌মানেরা বুঝ্‌তে নারে, দিল্‌দারই দেয় শির লুটিয়ে ;
কে যে ক্ষ্যাপায়!—কোন্‌ ক্ষ্যাপা সে লুকিয়ে বাজায় বংশীখানি!

মোশলেম ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

অমৃতের পুত্র

নীরব জ্যোৎস্না-রাত্রি, গ্রাম-পথ দিয়া
গেয়ে চলে পান্থ একা আপনার মনে ;
বনের প্রাচীর যেন আছে দাঁড়াইয়া
দুইধারে—খোলা ছাদ!—পড়িছে নয়নে
ঊর্ধ্বাকাশ, আলোকিত চন্দ্রতারাগণে।

নাহি কেহ, কোথা নাই! নিম্নে প্রসারিয়া
গেছে পথ কতদূরে!—আজ তার হিয়া
জানিবারে নাহি চায়, আর কতক্ষণে
পঁহুছিবে ঘরে ; চলিয়াছে নিরুদ্দেশে
ঊর্দ্ধমুখে গেয়ে গান, প্রাণ মুক্ত করি',
কর্ম্মক্লান্ত দিবসের রৌদ্রতাপ-শেষে—
প্রাণ তার গান হ'য়ে পশে কোন্ দেশে!
'অমৃতের পুত্র তোরা!' —ঋষিমন্ত্র স্মরি'
আনন্দ-বিষাদে মোর আঁখি এল ভরি'!

অ-মানুষ

ওগো আমার হাত ধোরো না,—যে হও তুমি— সরো, সরো!
আমার মুখে কেউ চেয়ো না—মানুষ যে নই! এ কি কবো?
চক্ষে দেখ—কিসের নেশা?
সে-রস ত' নয় আঙুর-পেষা!
পূজার প্রসাদ আমার লাগি' আবার কেন থালায় ধরো?
ওগো আমার হাত ধোরো না, বন্ধু! প্রেমিক!—সরো—সরো!

আমার লাগি' কাঁদ্‌ছে বসে' বিজন-অকূল-অন্ধকারে,
সব-হারানো পথের শেষে—সর্বনাশের হাহাকারে—
ঘোমটা-পরা মিথ্যাময়ী,
সেই যে আমার সর্বজয়ী!
জনমকালে কখন সে যে জড়িয়েছিল কণ্ঠহারে—
একটি চুমায় বন্ধ করে' রাখ্‌ল প্রাণের নিশাসটারে!

মিথ্যা কেন গন্ধ-প্রদীপ জ্বালো মিলন-শয়ন-ঘরে?
গুঞ্জরিলে বৃথাই তোমার সোহাগ-গাথা কানের 'পরে!
ভেবেছিলাম হয়ত' এবার
বুঝ্‌ব দরদ প্রেমের সেবার—
কাচের মতন নয়ন-তারায় এবার বুঝি পলক পড়ে!
মিথ্যা আশা! চাঁদের কিরণ ঠিক্‌রে সেথায় আগুন ঝরে!

আমি তোদের কেহই যে নই! দেহের আমার নেই যে ছায়
আমি যাহার আপন—তারো নেই যে আমার মতন কায়া!
নদীর ধারে ভাঙন যেথায়,
ঘরখানি মোর বাঁধব সেথায়—
শ্মশান-স্বপন-বিভীষিকায় করবে আদর সে মোর জায়া!
জনম-জনম এমনি কাটে, ঘুচ্‌ল না ত' ছায়ার মায়া!

অঘোর-পন্থী

কাচের পেয়ালা ভেঙে ফেল্ তোরা, লও রে অধরে তুলি'
—শ্মশানের মাটী লাগিয়াছে যা'য়—মড়ার মাথার খুলি!
ভাবে বুঁদ হয়ে, বুদ্‌বুদে ভরা,
বাসনার রঙে রাঙা-রঙ্-করা,
নীর নাহি যা'য়—বহ্নির প্রায় সুরায় পড় গো ঢুলি';
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি—
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি'।

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব-শিব একাকার!
জীবন-সুরায় নিঃশেষ করি' দেখি যে 'তলানি'-সার!
তখন মাথাটি রিম্ ঝিম্ করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে পড়ে!
জ্ঞান হয়, এই জগৎ যেন রে মড়ারই মাথার খুলি—
কঠিন, সুগোল—সবটাই খোল্—সুরায় ভরিয়া তুলি'
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি'!

জ্বলে' যাক্ বুক—বুকের পাঁজর! ঢালো খাও, ঢালো খাও!
কঙ্কাল-ভাঙা করোটির বাটি সবারে ঘুরায়ে দাও!
শুনিছ কি গান গায়িতেছে তারা—
মরণের পারে গিয়াছে যাহারা?

—সে-গান শুনিয়া শিহরি' আকাশে তারকা উঠিছে দুলি'!
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, তবু আমরা তাহাতে ভুলি!
টিট্‌কারী দাও, দাও টিট্‌কারী—
পড় গো সবাই ঢুলি'!

জীবন মধুর! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হ'য়ে যাক্ হিতাহিত-জ্ঞান!
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শম্ভুর মত তুলি'—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি।
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি'!

দেহের সকল রক্তকণিকা উতরোল উতরোল!
ওকি ও মধুর হাস্য বিকাশি' জগৎ দিতেছে দোল!
অপরূপ নেশা—অপরূপ নিশা!
রূপের কোথাও নাহি পাই দিশা—
সোনা হয়ে যায়, সোনা হয়ে যায় শ্মশানভস্ম—ধূলি!
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি!
চুমুকে চুমুক দাও বার বার—
পড় গো সবাই ঢুলি'!

ভারতী, আশ্বিন ১৩২৬

পাপ

পাপ কোথা' নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—
গেয়েছিল, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা—মধুমান্!
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু? হবে তা'য় অপযশ।

সাগর যখন মন্থন করি' উঠিল অমৃত, শশী—
দেব-দানবের ঈর্ষার জ্বালা তখনি উঠিল শ্বসি' ;
ছিল না যখন কোজাগর-শশী, ছিল না যখন সুধা,
রূপের পিপাসা ছিল না তখন, ছিল না তখন ক্ষুধা!

শশী-পাশে রাহু, অমৃতে গরল—আদিম সে অভিশাপ—
তাই হ'তে শেষে লভিল জনম সুখ-পরিণাম পাপ ;
কলঙ্ক তবু করে কি আবিল শশধর-কররাশি?
ওটুকু নয়ন-সলিল বিহনে মধুর হ'ত কি হাসি?

দানবের আশা বিফল করিতে দেবতা গড়িল ধরা,
লুকায়ে রাখিল অমৃত-ভাণ্ড, জীবনে আনিল জরা।
অজর হইতে চাহিল দানব, স্বরগে পাতিল থানা,
মানবের রূপে দেবতা ভরিল প্রেমের পেয়ালাখানা।

তবু সে ভুলিতে পারিল না আজও দানবের রোষ-ভয়,
ঈর্ষার জ্বালা এখনো দহিছে, ঘুচিল না সংশয়!
তবু চেয়ে থাকে স্বরগের পানে অমর জীবন লাগি',
আপনারি মায়া—মরণের ছায়া—হেরিয়া সর্বত্যাগী!

দানবের দল হাসে খল খল, হেরি' তার পরাজয়—
যে-প্রেম তাহারা ভুঞ্জিতে নারে , তারে তারা পাপ কয়।
যে-মরণ তারা মরিতে জানে না, তাহারে গরল বলে!
জানে না, গরল নীল হ'য়ে আছে মৃত্যুজিতের গলে!

কামনার মণি, বাসনার সোনা, আশার রতন-খনি—
জানে না—জীবন কল্পলতিকা, ধরণী কি ধনে ধনী!
বেদনার মূলে বিকাইছে তাই নাম হ'ল তার পাপ!
ওইটুকু দিতে তবুও কৃপণ, হায় এ কি অভিশাপ!

পাপ কারে বলে?— হৃদয়ে ফোটে যা' যৌবন-মধুমাসে?
যার সৌরভে অবশ পরাণ কভু কাঁদে কভু হাসে?
সাগরের মত আকুলি-ব্যাকুলি পূর্ণিমা-চাঁদ লাগি?
যে-তৃষা জুড়াতে চাহে এ-হৃদয় পায়ে ধরি' কৃপা মাগি'?

পাপের লাগিয়া ফুটিয়াছে হেন অতুল অবনী-ফুল?—
রসে রূপে আর সৌরভে যার চরাচর সমাকুল!
পরতে পরতে দলে দলে যার অমৃত-পরাগ ভরা—
মধুহীন যারে করিবারে নারে শোক তাপ ব্যাধি জরা!

চিররোগী—সেও চাহে তার পানে, তৃষিত নয়ন দুটি!
বুড়ারও অরদ-অধরে মধুর হাসিটি উঠিছে ফুটি'!
হায়-হায় করে চিরদুখী যেই—সেও কি ছেড়েছে আশা?
বিমুখ হইয়া বসে' থাকে যেই—নাই তার ভালোবাসা।

পাপ কারে বলে? সুখ-খুঁজে'-ফেরা আঁধার কুটিল পথে?
কে বলেছে তার ঘুচিবে না ঘোর, জাগিবে না কোনো মতে?
আছে তারো শোভা, আঁধারের বিভা—সেও যে অমৃতরস!
দেবতাত্মার অগতি কোথায়? সকলি যে তার বশ!

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি', যেই জন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ!
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।

কত যুগ কত জনম ধরিয়া কত হাহাকার করি',
ধরণী-মাতার স্তন যে আঁকড়ি' তুলিবে অধরে ধরি';
স্পন্দিত হবে স্তব্ধ হৃদয়, ক্রন্দন করি' শেষে
জুড়াবে জীবন, অজানা হরষে অবশে উঠিবে হেসে!

ভুল করিবারে পাবে অধিকার, পাপ সে জানিত যারে—
একটি মধুর চুম্বনে দিবে সারা প্রাণ একেবারে!
শতবার করি' পুড়িয়া মরিবে বাসনা-বহ্নি-মুখে—
মরি' মরি' শেষে অমর হইবে প্রেমের স্বর্গ-সুখে।

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান;
গাহিয়াছে, আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান্!
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস!
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু—হ'তে পারে অপযশ!

ভারতী, কার্ত্তিক ১৩২৬

নাদিরশাহের জাগরণ

স্থান—পারস্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত।
কাল—নিশাবসান।

নাদির! নাদির!
কার আহ্বান আকাশে বাতাসে আজ!—
মেঘে-চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে মিঠা যেন এস্রাজ!
চাঁদ ডোবে যেথা পাহাড়ের চূড়ে—বিরাট প্রেতের কায়া!
আক্রোশে যেন ডাক দিয়ে ফেরে ইরাণ-বীরের ছায়া।
কতকাল ধরি' বালুকার তালু 'আমু-শির'-দরিয়ার
পায় নি পরশ তুরাণী টুঁটির রক্তের ফোয়ারার!
খিভা হ'তে সিস্তান্—
সারা মুল্লুক জুড়ে' বসে' আছে ইল্লত্ আফগান!

নাদির! নাদির!—
ওই ডাকে শোন', মাথায় আগুন জ্বলে!
থির হ'য়ে যায় চোখের পলক অন্ধকারের তলে!
মনুচেহ্‌রের সেনাপতি ওই অঞ্জলি ভরি' আনে
'হেল্‌মদ'-বারি, পান করি' তায় কি আশা জাগিছে প্রাণে!
রোস্তমেরি সে বিশাল মুষ্টি দেখাল কৃপণ-ধরা—
বক্ষে-বাহুতে একি উল্লাস, বিজয়-অশনি-ভরা!
দিকে দিকে জয়রব—
হাহাকার করে ফেরুপাল যত—নরবলি-উৎসব!

নাদির! নাদির!—শুনিয়াছি আমি উঠিয়াছি তাই জাগি'—
ইস্পাহানের গুলাব-বাগান—কে ছোটে তাহার লাগি'?
সিরাজী-শরাব, দ্রাক্ষার চুনী করে নাই চোখ রাঙা—
শাহ জামসীদ-প্রাসাদের ভিত —হেরি নাই সে কি ভাঙা!
উত্তর হ'তে হুহু-হুহু—হাওয়া ছুটে আসে দিশাহারা,
লাফাইয়া ছোটে ঝরণার জল শ্বেত-চমরীর পারা!
তুহিন, তুষাররাশি!—
বাজ-বিদ্যুৎ—তারি মাঝে প্রাণ উঠিয়াছে উল্লাসি'।

নাদির! নাদির!—আর কাজ নাই, বুঝিয়াছি কারে বলে—
মাটীতে এ মাথা রাখিবার আগে—দলে' নেওয়া পা'র তলে।

পশু-মেষ যেই পালন করেছে—মানুষ-মেষের দল
তারি দুর্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল!
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিব দুর্বলতার গ্লানি—
লুটাইব পা'য় হীরার মুকুট, রাজা আর রাজধানী!
—কাবুল কান্দাহার
দিল্লী হিরাট মেশেদ্ গজ্‌নী নিশাপুর পেশাবার!

ইস্পাহানের ইস্পাত হ'তে রক্তের ধোঁয়া-ধার
নিভিবে না কভু—প্রাণের মমতা ঘুচাইব সবাকার!
কোহি-রহমতে 'চেহেল্-মিনার' গড়েছিল জান্‌জান্—
আমিও গড়িব কাঁচা মাথা দিয়ে, দেহ করি' খান্ খান।
লক্ষপ্রাণীর গল-শৃঙ্খল বাজিবে সমুখে পিছে,
তখ্‌তের পরে চড়িয়া শুনিব, বান্দারা গায় নীচে—
'ধন্য নাদির শাহ!
মারিবে, তবুও একবার দেখি—অভাগারে ফিরে' চাহ!'

'নাদির! নাদির! নারীর জঠরে জন্ম কি তোর নয়!'—
পাপ-শয়তান কুহরিছে কানে কাপুরুষ-সংশয়!
খোদার বান্দা এন্‌সান্ যেই, নাই তার নিস্তার—
চিবাইয়া খাবে আপন কলিজা! যদি সে ফেরেস্তার
'আখেরি-জ্‌মানা'-দিনের নিশান তুলিবারে চায় ধরি'—
মরণের পরে 'দোজোকে' নামিবে, দু'বার করিয়া মরি'!
—হাহা, মোর হাসি পায়!
মমতার চেয়ে আর কিছু পাপ আছে নাকি দুনিয়ায়!

বুলবুল্ আর বস্‌রার গুল্ নয় শুধু আল্লার—
বজ্র-বাজনা মরু-মরীচিকা আরো যে চমৎকার!
শুধু মিট্‌মিটে তারার লাগিয়া আকাশের শামিয়ানা!
ধূমকেতু আর উল্কার দলে পাতে নি সেথায় থানা?
শিশুর অধরে মা'র পয়োধরে মিলায় খেলার ছলে,
তেমনি খেলার খেয়ালে ছড়ায় মারী-বিষ থলে-জলে!
বাহবা কি বাহবা রে!
আল্লার মত দিলাওয়ার যেই—এ খেলা খেলিতে পারে!

বাম হাতখানি তুলিয়াছে ঊষা 'পামীর'-পাহাড়-চূড়ে,
আগুনের বাণ অরুণের ওই উড়িল কুয়াসা ফুঁড়ে'!

আলোকের বিষ-বল্লম ছুঁড়ি' রাত্রির কালো বুকে
পূবের শিকারী নীল-বালুচরে দাঁড়াইল রাঙা-মুখে!
উহারি মতন ঊর্ধ্বে উঠিবে এই প্রাণ-বাজপাখী,
'হিন্দু-তাতার-তুরাণী-শোণিত!'—চীৎকার করে' ডাকি'।
—ইরাণ! গানের রাণি!
রক্তপাগল নাদির তুহার পীড়ন করিবে পাণি!

গানের মহিমা কিছু নাই নাই, চোখ জলে ভেসে যায়!
মূর্খ সে কবি গানেরই নেশায় বিকাইত বোখারায়!
গজ্‌নীর রাজা দিয়েছিল দাম? মনে নাই তার ব্যথা?
তারি শোকে কবি তেয়াগিল প্রাণ, হাসি পায়' শুনি' কথা!
সাকী ও পেয়ালা, শ্লোক দুই-চারি—জীবনের দান এই!
নাইশাপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই!
দাস যারা গান গায়—
ভীরু-হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা গানেই মিটাতে চায়!

দূর করে' দাও গোলাবের মালা! পেয়ালা ভাঙিয়া দাও!
'নাদির! নাদির!'—শুধু ওই সুরে পার ত' আবার গাও।
কত বড় আমি—একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
অধীর হয়েছে বক্ষ-কারায় শুধু সেই কামনাই!
বর্ষা-ফলকে ঝলসি' উঠেছে মধুর রক্তরেখা,
ছায়াখানি মোর পড়িয়াছে পিছে—যতদূর যায় দেখা!
—কাবুল কান্দাহার
গজ্‌নী হিরাট দিল্লীতে ওই ওঠে বুঝি হাহাকার!

রতী, মাঘ ১৩২৫

নাদিরশাহের শেষ

স্থান—প্রান্তর-মধ্যস্থ শিবির।
কাল—হত্যা-রাত্রি, নিশীথ।

তুমি চলে' যাও এখনি এ রাতে উজ্‌বেগ্‌-সর্দার!
আমি একা রব'—কোনো ভয় নেই, দেরী আছে মরিবার!
কে মারে আমারে!—এখনো ছেঁড়েনি আকাশের গ্রহতারা!
জমিন্‌ ফাটিয়া নীলশিখা কই? প্রলয়ের বারিধারা?
অতলের তলে এখনো নামেনি 'আলবুরুজে'র চূড়া,
সুলেমান আর হিন্দুকুশের পাঁজর হয়নি গুঁড়া!
আমি না শাহান্‌-শাহা!
কার ভয়ে বাজ আকাশে ফিরিবে এখনি?—বাহা রে বাহা!

চলে' যাও ফিরে ইমাম জাফর ! ডেকে দিও দুরাণীরে—
কাল প্রাতে যেন আফগান-সেনা দাঁড়ায় শহর ঘিরে'!
কাল, কোহিনুর-তাজ শিরে, আর তখ্‌ত-তাউসে চড়ি',
আর একবার খুন্‌-খুশরোজ্‌ খেলিব পরাণ ভরি'!
দিল্লীর শাহ রেখেছিল পা'য় উষ্ণীব তরবার,
তাই নিয়ে যাও, পরে যেন কাল আব্‌দালি-সর্দার।
আলির বংশধর!
মনে থাকে যেন ইমাম হোসেন, কারবালা-প্রান্তর!

শেখ শিয়া সুফী দরবেশ যত—বাঁচে না যেনই কেহ,
কাটিয়া পাড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড করিবে দেহ!
ওমরাহদের শ্মশ্রু-বাহারে পাকাও পলিতা-ধূপ!—
ভাঙা-মগজের চর্বি-চেরাগে রোশ্‌নাই হবে খুব!
জাফর! তোমার কাফেরগুলাকে রাখিব না কাল প্রাতে,
'রোজ্‌ কেয়ামত' দেখো দাঁড়াইয়া জুম্মা-বাড়ীর ছাতে!
—কোনো কথা নয় আর!
যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার!

আঃ বাঁচা গেল! তবু মনে হয়, কে যেন রহিল পাছে।
না না, কেহ নয়,—আমারি ও ছায়া পর্দায় পড়িয়াছে!
একি হ'ল, একি! বড় তাজ্জব!—ছায়া নয়, ও যে ছবি!
একবার সেই দেখেছিনু ও'রে, ভুলে গিয়েছিনু সবি।

দিল্লী-শহরে দুইপহরের মহামারী-চীৎকার,
একা বসেছিনু, মস্‌জেদ সেই রুক্‌নৌদ্দৌলার,—
হঠাৎ দেয়ালে ছায়া!
ঠিক এইমত ঘুরে' গেল মাথা, হঠে' গেল চৌপায়া!

দূর দূর! আরে দেখ দেখ—যেন পাহাড়ী সাপের চোখ!
অবশ করিয়া বেহুঁস করিল, হরিল সকল রোখ!
ওর পানে চেয়ে সেদিনের মত আজো জাগে আফ্‌সোস,
মনে পড়ে' যায় বালক-কালের দিনগুলি নির্দোষ।
দেখ, শয়তান মিলাইয়া যায় স্মরণে সে কথা আনি'—
চোখ দিয়ে বুকে বিষ ঢেলে' দিয়ে, মাথায় মুগুর হানি'।
—এ কি হ'ল, হায় হায়!
এ বুড়া-বয়সে সে দিনের মত আবার দাঁড়ান' যায়!

মাথা হ'তে যেন সকল রক্ত শুষে নেয় নাভি-শিরা,
কি যেন বাঁধন বেঁধেছিল বুকে, খুলে যায় তার গিরা!
'হাশিশ্‌' খাওয়া'য়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল এতদিন—
'জম্‌জম্‌' জলে ধুয়ে দিল মাথা দিল্‌দার কোন্‌ জিন!
রক্তের নেশা একেবার যেন ছুটে' যায় লহমায়—
পরীর আঙুলে পরাইল চোখে স্তাম্বুলি সুর্মায়!
—ডুবে' যাই গলে' যাই!
তাজ শম্‌সের ফেলে দিনু এই, কিছুতেই কাজ নাই।

নাদির! এখনি ভুলে' গেলে—তুমি দুনিয়ার দুষ্‌মন!
বাতিল করেছ কায়কোবাদের ধর্ম সিংহাসন!
কোটী শবদেহে দেওয়াল তুলিয়া আল্লার আশ্‌মান্‌
আঁধারিয়া, তুমি দিনের জলুস্‌ করিয়া দিয়াছ ম্লান!
পাথরে আছাড়ি' মারিয়াছ শিশু, জননীর কোল ছিঁড়ে!
ক্রোশ হ'তে ক্রোশ আগুন দিয়েছ মানুষের সুখ-নীড়ে!
আপন ছেলের চোখ—
নখে করি' ছিঁড়ি' উপাড়ি' ফেলেছ, কিছু কর নাই শোক!

সে নহে নাদির, মানুষ নহে সে!—খোদারি সে কারসাজি!
শয়তান, সেও পারে কি এমন দেখাবারে ভোজবাজি?
স্থির হও মন! ভেবে দেখি আজ, কে করেছে সেই খেলা—
আমি ত' মানুষ সবারি মতন, কাদা ও মাটীর ঢেলা!

বুকে মারো ছুরি, গল্ গল্ করে' বাহিরিবে রাঙা জল,
এই দেখ—চোখে এখনি অশ্রু করিতেছে টল্‌টল্,
—এত কুদরৎ তার!
আল্লা তা'লা-আকবর! এ যে মতলব বোঝা ভার!

বারুদের মত কালো-মেঘে বাজ তোপ দাগে—দেখ নাই!
আগুন ছুটিয়া পাহাড়ের মুখে—কত দেশ হ'ল ছাই!
সাগরের জল-স্তম্ভনে আর ভূমিকম্পনে যাঁর
হুকুম তামিল করে দেবদূত পৃথিবীতে বারবার—
ইসারায় তাঁরি জেগেছিল দূর ইরাণের সীমানায়
যুবা আফ্‌সারী, নাদির—এ নাম দিয়েছিল বাপ মা'য়!
মেষ-পালকের আজি
দুনিয়ার সেরা দুষমন্ নাম—এ কাহার কারসাজি?

সেই কথা মোর ছিল নাক' মনে, থাকে না বোধ হয় কারো
ভুলেছিনু, আমি মানুষ যে শুধু—ভেবেছিনু, বড় আরো!
লক্ষপরাণ হানিবার কালে ভুলেছিনু এক প্রাণ—
সে যে সেইমত করে ধুক্ ধুক্ তেমনি দয়ার দান!
তারি সাথে আজ মুখোমুখি করে' দিয়ে গেল মাঝরাতে—
দেখিতেছি তা'য় আগাগোড়া ছুরি মারিয়াছি এই হাতে!
রহিমর্ রহমান্!
নাদির তোমার বান্দাই বটে, যত হোক্ বেইমান!

নাদির! নাদির!—সাড়া নাহি দেয়, একেবারে মরিয়াছে!
অরে শয়তান! শয়তানী তোর বেইমানী ধরিয়াছে!
সেই বাহু এই লোহার সমান, ওই সেই করবাল!
তুর্কি-শোণিত-মেহেদির রঙে নখ যে এখনো লাল!
বোখারা-বিজয়-উৎসব-দিনে নর-শির-পর্বত
করে নাই খুশী, ক্ষীণ মনে হ'ল দরবার-নহবত!—
আজ তার হ'ল ভয়!
নাদির! নাদির! এতদিনে তোর এই হ'ল পরিচয়!

মরিয়াছি আমি! চলে' গেছি আজ সেই পাহাড়ের ধারে—
প্রেত হয়ে আজ সন্ধান করি, জীবনে ভুলেছি যারে।
জ্যোৎস্নার মত প্রভাত-রৌদ্র মিশে আছে কুয়াসায়,
ঝিক্-ঝিক্ করে' বহিছে নদীটি পাহাড়ের পা'য়-পা'য়,

দেবদারু-শাখে জড়ায়েছে লতা সোনালি-ঝুমুকাভরা,
আখরোট্-সারি ঝুরিছে শিশিরে, আপেল পাকিবে ত্বরা—
এই সেই গ্রামপথ,
এর ধূলা ছেড়ে চেয়েছিনু আমি বাদশাহী মস্নদ!

নওরোজ্-বেলা হ'ল অবসান, আকাশে সুতালী চাঁদ—
তরুণী ইরাণী সারাদিন কত পাতিয়াছে ফুল-ফাঁদ!
কস্তুরী-কালো পশ্মিনা চুলে বিনায়ে 'লালা'র মালা
আজ গোলাপের অপমান কেন? গজল্ গাও নি বালা?
আঙুরের রস কোথা পেয়ালায়?—তহ্মিনা! তহ্মিনা!—
চাও, কথা কও! কোথা' সুখ নাই নাদিরের তোমা বিনা!
আজ নওরোজ্-বাতে
আশেক এসেছে, যৌতুক দিতে দিল্ তার ওই হাতে!

কবেকার কথা! আমি ভুলেছিনু, তহ্মিনা ভুলিল না—
স্বপনেও তার চোখদুটি মোর মুখ'পরে তুলিল না!
সে নয়ন যেন তুষার-রশ্মি সন্ধ্যাতারার মত—
চাহিল বিঁধিতে বড় ঘৃণাভরে হৃদয়ের এই ক্ষত।
লুটাইনু পা'য়, বলিনু—বাঁচাও! তুমি জানো সেই পাতা
যার রসে এই যাতনা জুড়ায়, আর কেহ জানে না তা'।
তহ্মিনা চলে' যায়,
দূরে—দূরে, শেষে মিশে গেল ওই আকাশের তারকায়।

চাঁদ ডুবে গেল, নিবে' যায় ওই 'পারবিন্' 'মুশ্ তারা'—
একি থম্-থম্ করে আশ্মান্ নীল ইস্পাতপারা।
মাঝখানে তার আগুনের চাকা ঘুরে' ঘুরে' উঠে নামে!
জ্বলন্ত-বালু পার হ'য়ে আসে মুর্দারা তাঞ্জামে!
ঘূর্ণি ঘুরিছে দক্ষিণে বামে—রক্তের দরিয়ায়!
দব্ দব্ করে বাতাস, যেন সে মার খেয়ে মূরছায়!
ঢাল যেন তলোয়ারে-
সারা ময়দান ঝন্ ঝন্ করে, ফেটে যায় হাহাকারে!

কি ঘোর পিপাসা! জিহ্বা-তালু যেন ফুলে' যায় সবাকার,
কালো হয়ে গেল ওষ্ঠ-অধর, জল নাই ভিজাবার!
দূরে দেখা যায় ঝর্ণা ঝরিছে, কাছে গেলে আর নাই!
এ কি দিল্লগী আল্লা গাফুর! মাফ চাই, মাফ চাই!—

আঃ বাঁচা গেল! বোখার ছুটেছে!—কি যেন আওয়াজ হয়?
বাহিরে বুঝি বা পাহারা-বদল? নাঃ, ও কিছুই নয়!
খোদা যে মেহেরবান্—
ভয় নাই—ও যে স্বপনে দেখিনু 'হাশরে'র ময়দান।

কে পশিল ওই চোরের মতন? কারা আসে পাছে পাছে?
দুরাণীর লোক—হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি—এস ভাই, এস কাছে।
কিরীচ খোলা যে! আরে বেতমিজ্ বুজ্‌দেল্ কাপুরুষ।
নাদির দাঁড়ায়ে সমুখে তোদের, এখনো হয়নি হুঁস্!
হা হা, হঠে' যায়!—মারিবে, তবুও স্বর শুনে' হঠে' যায়!
আয় চলে' আয়, ধর্ গর্দান, কাজ নাই তামাসায়!
আফ্‌সারী সর্দার!
তুমিও এসেছ!—বংশের কাঁটা ঘুচাইবে এইবার?

ভয় নাই, এস—নাদির মরেছে! নহিলে এখনো তুমি
দাঁড়ায়ে রয়েছ মাথা না নোয়ায়ে—জানু পাতি', মাটী চুমি'!
ফেলিয়া দিয়াছি তাজ দেখ ওই, কাছে নাই হাতিয়ার—
তোমাদেরো আগে পেয়েছি সমন মৃত্যু-ফেরেস্তার।
এসেছিস বড় ওক্‌ত বুঝিয়া, তা' না হ'লে—কুক্কুর!
আর কিছু আগে বুঝিতাম তোরা কত বড় বাহাদুর!
নসীবের কেরামত!—
এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ!

তক্‌রার রেখে ধর্ তরবার! আহমদ্ আব্‌দালি
এখনি আসিবে, শিরগুলা কাটি' কুত্তারে দিবে ডালি'!
পিঠে কেন? আহা, ঘাড়ে মারে ফের! স্থির হ'য়ে মার্ বুকে—
বড় সে কঠিন!—খুব করে' ছুরি বসাও, মরিব সুখে।
আহাহা আল্লা! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে!—
বিচারের কালে এ-কথা ধরিয়া, গুনা কিছু মাফ হ'বে?
শেষ হয়ে গেল—বাপ!—
ইরাণের ধ্বজা—ইরাণের গ্লানি—বিধাতার অভিশাপ!

ভারতী, ফাল্গুন ১৩২৫

মহামানব

জন্ম তোমার হয়েছিল কবে ঋষির মনে—
এই ভারতের মহামনীষার তপের ক্ষণে!
সর্বমানবে অভেদ করিয়া দেখিল যারা—
তা'রাই তোমায় দেখেছে প্রথম, জেনেছে তা'রা!
তার পর তুমি যুগে-যুগে এলে মূরতি ধরি'—
অমৃত পিয়ালে মৃত্যু-সাগর মথিত করি'!
কুরুক্ষেত্রে বাজিল শঙ্খ মাভৈঃ-রবে!
প্রথম-প্রেমিক শাক্যসিংহ উদিল ভবে!
পাপ-পশ্চিমে ভগবৎ-কৃপা দানিল ঈশা!
আরও একজন মরু-সন্তানে দেখাল দিশা!
সেই এক বাণী-মূর্তি ধরিয়া আসিলে তুমি!
হে জীব-ব্রহ্ম-অভেদ! তোমার চরণ চুমি।

হে প্রাণ-সাগর! তোমাতে সকল প্রাণের নদী
পেয়েছে বিরাম, পথের প্লাবন-বিরোধ রোধি'!
হে মহামৌনি, গহন তোমার চেতন-তলে
মহাবুভুক্ষাবারণ তৃপ্তি-মন্ত্র জ্বলে!
ধন্বন্তরি! মন্বন্তর-মন্থ-শেষ—
তব করে হেরি অমৃতভাণ্ড—অবিদ্বেষ!
জগত-জনের বেদনা-সমিধ্ কুড়ায়ে সবি—
সেই ইন্ধনে ঢালিলে আপন প্রাণের হবি!
পরিলে ললাটে মহাবেদনার ভস্ম-টীকা,
জীবন তোমার হোম-হুতাশন ঊর্ধ্বশিখা!
শঙ্কাহরণ আহিতাগ্নিক পুরোধা তুমি!
যজ্ঞ-জীবন দৈবত! তব চরণ চুমি!

নিরাময় দেহে বহিছ সবার ব্যাধির ভার!
তুমি নমস্য, সবারে করিছ নমস্কার!
চিরতমিস্রাহরণ তোমার নয়ন-কূলে
অন্ধ-আঁখির অন্ধকারের অশ্রু দুলে!
অর্ধ-অশন বিরলবসন হে সন্ন্যাসি,
তুমিই সত্য সংসারতলে দাঁড়ালে আসি'!
আদিকাল হ'তে কতকাল তুমি এমনি রত—
হে মহাজাতক! জাতক-চক্র ঘুরিবে কত?

কতবার দিবে আপনারে বলি যাগের যূপে—
ছোট-'আমি'গুলি ভরিয়া তুলিবে তোমার রূপে!
চিনেছি তোমারে, যুগে যুগে অবতীর্ণ তুমি!
হে বোধিসত্ত্ব! বুদ্ধ! তোমার চরণ চুমি!

ধ্যানীর ধেয়ানে আসন তোমার চিরন্তন
ইতিহাসে যবে ধরা দাও, সে যে পরম-ক্ষণ!
দেশে-দেশে তব শুভ-আগমন-বার্তা রটে,
তোমার কাহিনী কীর্তন হয় দেউলে মঠে!
পরে যেই দিন তোমারে ভুলিয়া তোমার নাম
জপ করে সবে নিজেরি লাগিয়া অবিশ্রাম—
নরে ভুলে' গিয়ে শুধু 'নারায়ণ'-মন্ত্র পড়ে,
মনের মতন স্বার্থসাধন মূর্তি গড়ে—
জগৎ-অন্ধ জগদানন্দে করিয়া হেলা
রতনে-ভূষণে সাজায় কেবলি মাটীর ঢেলা—
জগজ্জীবন-মূর্তি ধরিয়া এস গো তুমি!
মানব-পুত্র! মৈত্রেয়! তব চরণ চুমি!

এস গো মহান্ অতীত-সাক্ষী হে তথাগত!
হের এ ধরণী মরণ-শাসনে মূর্ছাহত!
কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া, মানব-রাজ!
গাহ জয়, গাহ মানবের জয়, গাহ গো আজ!
মহাব্যাধি-ভার কর গো হরণ পরশি' কর—
ধন্য হউক নিজেরে নিরখি' নারী ও নর!
আর বার ডাক' ঘরে ঘরে, 'এস আমার পিছে,
ভয়ের সাগর হেঁটে পার হও, ভয় যে মিছে!'
মৃতজনে পুনঃ নাম ধরে' ডাক', মৃতক-নাথ!
প্রেতভূমে আজি একি হুলাহুলি রোদন সাথ!
সূতিকালয়ের শোভা ধরে যত শ্মশানভূমি—
মহাদেব নয়—মহামানবের চরণ চুমি'!

আবির্ভাব

আঁধার-রজনী বাঁধা প'ল যবে নিশীথের জিঞ্জিরে,
হোরা, পল—সব অচল হইল অস্ত-উদয়-তীরে।
গঙ্গা-কাবেরী-কৃষ্ণার কূলে কলহীন জলরাশি—
ক্ষত-দেহে শুধু ফুৎকার করি' কাঁদিছে শ্মশান-বাসী ;
গলিত শবের বসার মশালে নিবারিয়া নিশাচরে,
কোনোমতে তার প্রাণটি ধরিয়া রেখেছে দেহের ঘরে!

আকাশে কোথাও জ্বলে না প্রদীপ, উদাসীন দেবতারা!
প্রাচী-মালঞ্চ পুষ্পবিহীন, বায়ু সে শিশিরহারা!
রঞ্জনহীন বক্ষ-শোণিত উছলিয়া নাকে-মুখে,
হেথা-হোথা ঝরি' আমিষের লোভে ভুলাইছে জম্বুকে।
চীৎকার করি' উঠিছে কেহ বা ভাক্ত-সূর্য্য হেরি'—
নাচে উল্লাসে পাগলের মত মরণ-শয়ন ঘেরি'!

পশ্চিমে হোথা—আঁধার ছাড়ায়ে, জীবনের ঐ-পারে—
প্রলয়-রাত্রে দ্বাদশ সূর্য উদিয়াছে একেবারে!
আলো নাই, তার উত্তাপে গলে অনাদি সে হিমালয়—
অগ্নি-বাষ্প, তরল অনল ছুটিছে ভারতময়!
বিধাতার আদি-কীর্তির এই সব-শেষ জঞ্জাল
এতদিনে বুঝি মুছিয়া ফেলিবে নির্মম মহাকাল!

দশ-সহস্র-বর্ষের সেই অপূর্ব অভিনয়
শেষ হ'য়ে গেছে—এখনো তবু যে শেষ হইবার নয়!
দেব-দানবের বিষম-বীর্যে মহাপারাবার মথি'
কালো-কালকূট কণ্ঠে ধরিয়া অমৃত মিলাল তথি!
পুরুষোত্তমে বরিল হেথায় বিশ্বের মনোরমা!
সত্য রাখিতে আপনা বেচিল—সুত, জায়া নিরুপমা!

আপনি করে নি স্বর্গ-কামনা, তবু সে স্বর্গ লাগি'
মহাতপস্বী দানিল অস্থি দেব-কল্যাণ মাগি'।
পিতার আদেশে মৃত্যু-সদনে সত্যের সন্ধানে
পশিল বালক-ব্রাহ্মণ সেই, চির-নির্ভয় প্রাণে!
রাজা আর ঋষি—দু'এর সন্ধি ঘটিল একের নামে!
গোলোক-নিবাসী রাজা হ'ল আসি', কমলারে ল'য়ে বামে!

এইমত কত পুরাণ-কাহিনী—কল্পনা সে ত' নয়!
প্রাণের মাঝারে অহরহ তার হেরিয়াছে অভিনয়!
ইতিকথা হেথা দেবতার লীলা, দেবলীলা ইতিহাস—
(মানব-মনের গহন-গুহায় নটনাথ করে বাস!)
সেই সে বিরাট নাট্যশালায় দুলিতেছে যবনিকা—
নাটকের শেষে চলে প্রহসন, নাম তার বিভীষিকা!

হেথায় ললাটে প্রথম ফুটিল তৃতীয়-নয়ন-তারা!
গঙ্গোত্তরী-ফেন-তরঙ্গে উথলিল হাসি-ধারা!
মন্ত্রদ্রষ্টা মানবে শুনাল অমৃতের অধিকার—
আপনা ও পর, দ্যুলোক-ভূলোক আনন্দে একাকার!
শিব-সুন্দর-সত্য-স্বরূপ আপনারে চিনি' লয়ে
মুক্তি-সাধন শক্তি-মন্ত্র সাধিল অকুতোভয়ে!

দেবতাদমন মানব-মহিমা—এই তার পরিণাম!
অন্ধ-কারায় সভয়ে জপিছে প্রেত-পিশাচের নাম!
বুকে হেঁটে আর লালা-পাঁক ঘেঁটে কোনোমতে বেঁচে থাকা!
মুখে মুখ দেয় পথের কুকুর—তা'ও যেন সুধামাখা!
আঁধারে হাতাড়ি'—হাত-ধরাধরি—টলিছে এ ও'র গা'য়!
পিপাসা মিটায় নয়নের জলে, তবু না মরিতে চায়!

এমন সময়ে কোথা হ'তে ওঠে তিমির-গগন ভেদি'
আবাহন-গান, স্তোত্র মহান্—'আবিরাবির্ম এধি'!
কাহার কণ্ঠে কুমারী-উষার বোধন-মন্ত্র-বাণী
বাণের মতন প্রাণ-কোদণ্ডে ভীম টঙ্কার হানি',
ধ্রুবলোকে পশি' ফিরিয়া আনিল আলোকের সন্ধান—
চেতন-দুয়ারে ভ্রান্তি-কবাট ভেঙে হ'ল খান্-খান্!

আড়ষ্ট-শির পঙ্গু-সমাজ বাড়া'য়ে শীর্ণ গ্রীবা,
স্পন্দবিহীন স্তিমিত নয়নে লভিল কি যেন বিভা!
উষার বাতাস ব'য়ে গেল যেন শিহরিয়া কলেবর—
ভয়ের স্বপন ছুটে যায় আজ শত-শতকের পর!
অমৃত-সায়রে গাহন করিয়া এ কোন্ গগন-চারী
নিবিড় নিশীথে নেমে এল হেথা, 'শিবোঽহং' উচ্চারি'।

অসিত আকাশ নীল হ'য়ে এল আত্মাহুতির শেষে,
ম্লান হ'য়ে এল মোহের দীপালি প্রভাতের উদ্দেশে!
নর-নারায়ণ-পদরজঃ মাখি', মাটিতে লুটায়ে শির,
বদ্ধ-জনেরে বক্ষে বাঁধিল আপনি-মুক্ত বীর!
শুষ্ক হৃদয়-তমসার তীরে অগ্নিহোত্র জ্বালি'
সাগর-পারের তীর্থ-সলিলে আঁখি দিল প্রক্ষালি'।

শিহরি' সভয়ে হেরিল তখন বিশ-কোটী নর-নারী—
হ'ল না প্রকাশ মুক্তি-বিভাত কোন্ বাধা অপসারি'!
উদয়-তোরণে অসাড়-শরীর পড়ে' আছে উষা-সতী—
দিব্যহাসিনী নির্মলা উষা—পরমা সে বেদবতী!
লঙ্ঘিতে নারি' লাঞ্ছিতা সেই সত্যের ঘরণীরে
আঁধার-বিজয়ী অরুণের রথ বার-বার যায় ফিরে'।

কত-না দম্ভ করেছিল কত প্রাণহীন মতিমান্—
পিশাচ-সিদ্ধ, আঁধার-বিলাসী—মুক্তি করিবে দান!
কম্পিত করে পলিতার বাতি মলিন কামনা-ধূমে—
ধরিছে কখনো পরের সমুখে, আপনি ঢুলিছে ঘুমে!
তর্ক-কুটিল পাটোয়ারী-নীতি—মৃতজনে জীয়াইতে!
শকুনের সাথে রফা হয় শেষে শবদেহে ভাগ নিতে!

কত-না মন্ত্র পড়িল আবেগে কত-না মনীষী ঋষি—
সুপ্তি-গভীরে ক্ষণিক চেতনা—স্বপনে যায় সে মিশি'!
কত-না সাধক বীর-বিক্রমে দুয়ারে হানিল কর—
এক-সে মন্ত্র পড়িল না মনে, লুটাইল ভূমি'পর!
কোন্ জাদু জানে এ নবপন্থী!—একি ভাব, একি ভাষা!
অনলদগ্ধ শুদ্ধ চরিত!—উদ্দাম ধায় আশা!

জয়ভেরী তার বাজে কি বাজে না—সে ভাবনা নাই বটে!
লিখিল না কেহ নামটি তাহার উদ্ধত ধ্বজ-পটে!
কোন্ পথে সে যে কোন্ দিক দিয়ে হেথায় দাঁড়া'ল আসি'-
মৌসুমী বায়ু সঙ্গে যেমন সুমেদুর মেঘরাশি—
সে কথা কেহই জানিবার আগে হঠাৎ দেখিল দেশ,
নব-শ্রাবস্তি—জেরুজালেমের—অপরূপ একি বেশ!

অধরে তাহার মৌন-মহিমা, ললাটে অমৃত-ভাতি!
নয়নে গভীর প্রসাদ-দীপ্তি, হেরিছে প্রভাত রাতি!
ক্ষীণ তনু, তবু বজ্রে রুখিতে—ঝড়েরে বাঁধিতে জানে!
উদ্যতফণা কালিয় তাহার বাঁশির শাসন মানে!
জন-সমুদ্রে কল্লোল ওঠে—'অবতার! অবতার!'
রুদ্ধ-নিশাসে হেরিছে ভারত নব লীলা বিধাতার।

মোশলেম ভারত, পৌষ ১৩২৭

কবি করুণানিধানের প্রতি

('শান্তিজল' পাঠ করিয়া)

তোমার কবিতা নহে লীলা-পুষ্প, কুঙ্কুম কেলির—
অগুরু-গুগ্‌গুল-ধূমে মিশে গন্ধ চম্পা-চামেলির!
অমরী-মঞ্জীর—গুঞ্জ মিশে' যায় আরাত্রিক-গানে—
সৌন্দর্য-স্বপনে চিত্ত ডুবে' যায় মঙ্গলের ধ্যানে!
রূপ-পিপাসায় তব অরূপের তৃষা জেগে রয়,
প্রেম মহামহিমায় মরণে হাসিয়া করে জয়!
প্রেম যেথা ধরিয়াছে সুধা-শুভ্র বৈজয়ন্ত-বিভা,
যে-কবি ধরায় প্রেমে আনিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিবা—
প্রেম-ধর্মী ভারতের সেই দুই দুর্লভ সম্পদ,
প্রেমযোগী চণ্ডীদাস, মমতাজ প্রেম-কোকনদ—
হিন্দুর সে ভাবমূর্তি, মোস্‌লেমের গম্ভীর গম্বুজে
অর্পিয়াছ উপায়ন, ভক্তি-প্রেম-শতদল—অম্লান অম্বুজে!

রূপ-রসে টল্‌মল্‌—কবে তব হৃদিপাত্র ভরি'
উছলিল ভাবধারা? কোন্‌ স্বপ্ন দিবা-বিভাবরী
ভরিয়াছে আঁখি তব? সারদার শ্রীচরণমূলে
সর্ব-সমর্পণ করি' আছ তুমি দুঃখ-সুখ ভুলে'!
কবে মাতা তুলি' নিলা অঙ্কে তোমা, চুমিলা নয়নে—
অধরে চুমিলা শেষে!—নেহারিলে ভুবনে-ভুবনে
শতচন্দ্র আলোকিছে অপরূপ রূপ-বৃন্দাবন!—
বাজিল ও বাক্‌যন্ত্রে সুমধুর মুরলী-বাদন!

দিল কি অঞ্জলি ভরি' দেবীর সে মানস-মরাল
চয়নিয়া চঞ্চুপটে পুণ্ডরীক ফুল্ল সমৃণাল!
তাই তব গীতি-পুষ্পে নিত্য হেন মধু-পরিমল!
তাই হেন সুবিশদ স্বচ্ছ ভাষা—পূর্ণস্ফুট, উজ্জ্বল, অমল!
সৌন্দর্যের জ্যোৎস্নাঙ্কিত একপদী লয়েছে তোমারে
বনভূমি-শেষে চিরসুন্দরের দেউল-দুয়ারে!
যেথায় মধুর মন্দ্রে মন্ত্রারতি হয় দেবতার—
বসিয়া পড়েছ সঁপি' আপনার নৈবেদ্য-সম্ভার!
চঞ্চল সে চন্দ্রদ্যুতি—সসীম সে সুষমার শেষে
পঁহুছিতে আকিঞ্চন কবি তব, শাশ্বতের দেশে!
রস-সাগরের কূলে উদিয়াছে একটি অরুণ—
সেই শোভা হেরিবারে কবি, তব ক্রন্দন করুণ!
জন্ম-মৃত্যু দুই দ্বারে করিবারে এক হরিদ্বার,
জীবাননে চন্দ্রানন হেরিবারে আকুতি তোমার!
তোমার বৈষ্ণবী গীতি, সুবিচিত্র বরগুঞ্জমালা
নবরঙ্গে নব বঙ্গ-বাণীকুঞ্জ চিরদিন করুক উজালা!

উচ্চৈঃশ্রবা

প্রাণপণে তার রশ্মি পাকড়ি' ধরিনু পক্ষিরাজে—
পেশীগুলা ফুলে' শিরায় ধরিল গিরা ;
অতি-দুর্দম উন্মদ-বেগ রুদ্ধ করার কাজে
কুঞ্চিত ভাল, আঙুলেতে কালশিরা!

* * *

ঐরাবতের মত উঠেছিল সাগর-ফেনার স্রোতে,
মহাতেজা সেই দিব্য তুরগবর!
আহার তাহার প্রতিদিন হয় অরুণের হাত হ'তে
তারার প্রাসাদে, আলোর থালার 'পর!

অতুলন গতি! অমিত মহিমা!—কিছুতে মানে না বশ—
ক্রমাগত ধায় উর্ধ্ব-আকাশপানে!
গভীর-স্বনন হ্রেষারবে ভরি' প্রতিপলে দিক্-দশ,
গগনের নীল খিলানে সে খুর হানে!

এই অপরূপ অদ্ভুত প্রাণী—চড়িয়া তাহারি' পরে,
সুরার পাত্র স্বর্গের দিকে ধরি',
তারার শিখায় মশাল জ্বালায়ে লইয়া যে যার করে—
কবিরা সবাই ছোটে বায়ু সন্তরি'!

তারি নিঃশ্বাসে বহে মৃদুগীতি, গরজয় মহাগান—
সে কি ভয়রাশি, বাসনার সন্তাপ!
পিধান হইতে ঝলসিয়া উঠে তরবারি দ্যুতিমান্—
নৃপতি-হৃদয়ে উলসয় মহাপাপ!

সৃষ্টির শেষ-ভবিষ্যতের প্রলয়ের নীল রাতে,
মৃত্যু, নিরাশা—দুই দানবেরে বহি'
উধাও ছোটে সে, কালো ডানা মেলি' নিসাড় ঝঞ্ঝাবাতে-
চাঁদ নিবে যায় তাহারি আড়ালে রহি'!

অন্ধমুনির রোদনের রবে, ভীমের কঠিন পণে,
যেমন উচিত—নাসা-বিস্ফার হয় ;
কবি যে-ছন্দে বিশ্বরূপের ধেয়ান গীতায় ভণে—
তারি তালে-তালে পড়িছে চরণচয়!

গলিত ফলের উপরে—দেখ, সে নোয়ায় তরুর শাখা,
জননী যেন সে—মৃত-সুত লয়ে কাঁদে!
তাহারি কারণে অশোক-কাননে আনন অশ্রুমাখা!
গান্ধারী তাই নয়নে বসন বাঁধে!

কল্পলোকের যাত্রী মহান্!—থামে না অর্ধ-পথে,
উড়িছে কেশর, সদাই ত্বরিত গতি!
অসম্ভবেরি অতল-পরশ নহিলে সে কোনমতে
অধীর-গমন-শাসনে করে না মতি!

তড়িতের চেয়ে চকিত-গমনে ধেয়ে চলে দিশি -দিশি,
লোকালোক-গিরি-শিখরে সহসা বসে!
হেম-স্যন্দনে বাহন হয় সে, যখন সপ্তঋষি
প্রহরক্লান্ত, বিবশ তন্দ্রালসে!

মহানীল ব্যোমে বিহরে স্বাধীন উদাস অকুতোভয়!
একমুখে ধায় কভু সে মেরুর পানে!
রাশিমেখলার নাগর-দোলায় দোল খেতে সাধ হয়—
ভীম ঘূর্ণনে ভয় নাই তার প্রাণে!

করে সে প্রয়াণ উর্ধ্ব-আকাশে কুজ্‌ঝটি ভেদ করি',
উতরিতে চায় অসীম-পন্থ-শেষে—
অন্ধ-তমস ঘনমসীময় সঙ্কোচে যায় সরি'
হেরিয়া নবীন দিবালোকে যেই দেশে!

অবাঙ্মনসগোচর তাহার সেই পথ হ'তে ফিরে',
অতি-অসহন দহন-দৃষ্টি দিয়া
নিরখি' বারেক ক্ষীণপ্রাণ এই মানুষ-কীটাণুটিরে,
হিম করি' দেয় ভয়-কম্পিত হিয়া!

অশান্ত বটে!—ধরি' তবু তা'য় চালায় আপন পথে,
বহুসাধনায়, কত কবি মতিমান্‌!
মহাগহ্বর পার হ'য়ে যায় চ'ড়ি তায় কোনোমতে,
—জ্ঞানী নয় যেথা এক পা'ও আগুয়ান!

জগত-জনের প্রাণমন শুধু তাহারি শাসন মানে,
যম—সেও নমে, হইবারে নির্ভয়!
তারি প্রাঙ্গণ মার্জন করি' সারাদিন অবসানে
বিদুর নীরবে খুদ-কুঁড়া খুঁটি লয়!

প্রাণ চমকিয়া যার পথে কভু দেখা দেয় একবার,
সেজন জীবনে পাবে না সুখের লেশ!
তার দিবসের সকল প্রহরে গোধূলি-অন্ধকার—
প্রাণ জর্জর, নিরাশার নাহি শেষ!

পিঠ থেকে পড়ে' অনেক সওয়ার বহুদূর পশ্চাতে
কোথায় হারায়—ধূলায় ধূসর দেহ!
ক্ষমা সে জানে না, দয়া নাই তার, —ফলে তাই হাতে হাতে
স্পর্ধার ফল—আঁটিতে পারে নি কেহ!

আগুনের-ফুল-ঝল্‌মল্‌-করা বক্ষের দুই পাশ
স্ফুরিত গর্বে, নিজ বিক্রমে ধায়!
বীর ভবভূতি, শেক্ষপীয়র, কৌশলে ধরি' রাশ
দিয়েছিল বটে কবিতার বেড়ী পায়!

আমি তবু তা'র ঘুরাইয়া দিনু ভাবনা সে দিশাহারী—
স্বর্গ-নরক, রাজাদের ইতিহাস!
নিয়ে গেনু তারে—আঁধার-বিলাসী অসীম-আকাশচারী—
মাঠে-মাঠে যেথা ফুল ফোটে বারোমাস।

নিয়ে গেনু ধরে' মাঠের মাঝারে সুরভি তৃণের পাশে,
যেথায় মধুর প্রভাতে পুলক-ভরা
ফুটিছে-টুটিছে রাখালিয়া-গীতি চুম্বনে কলহাসে,
অমরার শোভা পলকে ধরিছে ধরা!

নিকটে তাহার নদীতীর-ভূমি, সেখানে লইনু তারে—
যেথায় জনমে সুকোমল পদাবলী!
সুনীল সলিলে কণ্টক শোভে শ্লোকের কমল-হারে,
ত্রিদল-ত্রিপদী ফুটে' আছে গলাগলি!

অক্ষি-গোলকে বিদ্যুৎ হানি' তরজে তুরগবর,
বিদ্যুৎ সে যে খড়্গ-ফলক প্রায়!
সিন্ধুর বুকে ঝড়ের দাপটে গর্জে যেমন স্বর—
সেইমত তার পঞ্জর উথলায়!

সে যে হাহা করে, ছুটে' যেত পুনঃ অজানার উদ্দেশে,
পৃথিবীর মায়া-বাঁধন কাটিতে চায়!
নীলশিখা সম নিঃশ্বাস তার ফুঁসিছে সর্বনেশে,
চোখে তার তিন-ভুবনের জ্যোতি ভায়!

সুরার সাধক তান্ত্রিক যত নর-নারী অগণন
সেই সাথে সব চীৎকার করি' ওঠে!
সহসা আকাশে একসারি মুখ গম্ভীর-দরশন—
থির-কটাক্ষ নয়নের পাঁতি ফোটে!

তারকারা এবে জ্বলিতে জ্বলিতে গগনের গম্বুজে
শিহরি' কাঁপিল শুনি' সে আর্তস্বর,
কাঁপে যথা দীপ, রমণী যখন তুলসীর বেদী পূজে,
—থরথরি' হাতে, সন্ধ্যাপবন 'পর।

যতবার রুষি' ঝাপটিল তার দু'পাখা আঁধার-কালো–
আঘাতি' অধীর পাংশু আকাশ-গায়,
ততবার তত তারকাপুঞ্জ নিবায়ে তাদের আলো,
গভীর আঁধারে অসীমায় ডুবে যায়!

*　　*　　*

আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন—
প্রকৃতি যেথায় বিলাস-লীলায় মুনিদেরো মন ছলে,
জোনাকীরা জ্বলে শিলাগৃহে অগণন!

দেখাইনু তারে ছায়া-তরুদল সুদূর মাঠের শেষে,
আষাঢ়ের-ধারা-পরশে-রঙীন ঘাস—
নন্দন বলি' বাখানে যে ঠাঁই কবিগণ সবদেশে,
যার গানে তারা বাঁশীতে ভরিছে শ্বাস।

এ-হেন সময়ে দেখিলেন পথে কবিগুরু বাল্মীকি,
শুধালেন, 'বাছা, চলেছ এ কোন্ কাজে?'
কহিলাম, 'তাত! উচ্চৈঃশ্রবা—এ সেই পৌরাণিকী-
চরাইতে যাই স্বর্গ-তুরগরাজে!'

ভারতী, মাঘ ১৩২৬

কলস-ভরা

ফাগুন-বেলা পড়ে' এল বুকটি জলে না জুড়াতে—
কলস-ভরা শেষ হবে সই, মনের কথা না ফুরা'তে!
শাড়ীর রাঙা-পাড়ের রেখা
জলের তলে যায় যে দেখা,
এখনো যে ছায়ায় নাচে চোখের তারা ঢেউয়ের সাথে!
কালো নদী আলোয়-ভরা, মন যে আমার তাইতে মাতে!

থাকতে নারি জল্‌কে এসে চোখের উপর ঘোম্‌টা ফেঁদে,
একটুখানি সাঁতার-খেলায় বিউনি আমার নিইনি বেঁধে।
পদ্মটিরে ভাসিয়ে দিতে,
ভেজা এ-চুল নিংড়ে' নিতে—
একটু সবুর সইবে না তোর! প্রাণ যে আমার উঠছে কেঁদে!
সাঁজ না হতেই কি হবে তোর আল্‌তা পরে' বিউনি বেঁধে?

এখনো দেখ্‌ অনেক বেলা—বনের মাথায় জ্বলছে আলো!
গানের তরী যায় যে ভেসে—সুদূর সে সুর শোনায় ভালো!
এম্‌নি কি তোর কাজের ত্বরা?—
সত্যি হ'ল কলস-ভরা!
হ'লই যদি, কাঁখের ও-জল নদীর জলে আবার ঢালো!
জলের কালোর চেয়ে ভালো ঘরের আলো!—বল্‌ না, হ্যাঁলো?

ফিরব ঘরে অলসপ্রাণে মন্দপদে বন্ধ্যাপারা—
পশ্চিমে ওই ফুলবাগানে তুলবে গোলাপ সন্ধ্যাতারা!
ঘোম্‌টা টেনে লাজের ভানে,
চেয়ে আপন পায়ের পানে,
কলস ভরে' উঠ্‌ব যখন, আকাশ তখন আলোক-হারা,
যাবার পথে পড়বে ঝরে' সিক্ত-দেহের কাঁদন-ধারা!

ঘরের বাঁধন

বেরিয়ে-পড়া এতই সোজা?—বারে বারে তুই যে বলিস?
কানুর-পিরীত-নেশায়-রঙীন্ অন্ধকারে তুই যে চলিস্!
পাঁয়জোরে তোর ঝম্ঝমাঝম্
ছিট্‌কে পড়ে শঙ্কা-শরম!
কাল্-ফণী সে লুটায় ফণা, পায়ের তলায় যখন দলিস্!
আল্‌তা পরায় পথ যে তোরে, গহন বনে যখন চলিস্
—কাঁটা দলিস্!
তোমার মাতাল-দেহের দোলায় মূর্চ্ছা হানে বাঘের চোখে!
বাদল-রাতের নিবিড় কাজল গল্‌ছে অলখ্-চন্দ্রালোকে!
আকুল তোমার কেশের রাশে
জোনাক-পাঁতি যখন হাসে—
খুনীর ছুরী, বাঁধন-ডুরি—শিথিল যে হয় ঘুমের ঝোঁকে,
চাইতে নারে কেউ যে তোমার সাগর-নীল ঐ ডাগর চোখে
—পাগল-চোখে!

বেরিয়ে-পড়া নয় ত' সহজ—সে কাজ শুধু তোরেই সাজে,
ফাগুন-ফুলের মালা গাঁথে যে-জন আগুন-খেলার মাঝে!
মধুবনের মঞ্জরী সে
ভর্‌ছে নিশাস মন্দ-বিষে,
কামনা যার মনের কোণেই গুম্‌রে মরে শতেক লাজে—
বেরিয়ে-পড়া তার কি সাজে নিশীথ-রাতে পথের মাঝে,
স্বপন-মাঝে!

শ্যাম যে আমার নামটি ধরে' ডাক দিল না, হায় অভাগী!
সারা জনম গোঁয়াই একা—মনে-মনেই শ্যাম-সোহাগী!
কুলকে আমি সাধে ডরাই?
শক্ত করে' তারেই জড়াই!—
বাঁশীর ও-সুর বলছে না ত'—আমার তরেই সে বিবাগী।
নাম ধরে' ডাক ডাকল না ত'—এমন কপাল! হায় অভাগী!
—ঘর-সোহাগী'!

ভারতী, ভাদ্র ১৩২৮

গজ্‌ল্‌ গান

গুল্‌নার-বাগে ফুল বিল্‌কুল,
নাশ্‌পাতি
গালে গাল দিয়ে লালে-লাল হ'ল
বোস্‌তানে!
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের
আব্‌ছায়া,
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল
খোশ্‌-গানে!
কহিল সহেলি, 'আজ যে গানের
নওরোজা!
ফুল দলে' চল, কেন গো ফলের
বও বোঝা?'
সে কোন্‌ শরাবে করিলি বেহোঁস-
মস্তানা—
নার্গিসাক্ষি! কি কথা আমার
কো'স্‌ কানে!

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্‌ সাকী!
হর্‌দম্‌ দাও!—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?

তার সে ভুরুর এক্‌টুকু চাঁদ
আধ্‌-ঢাকা
'রোজা'র উপোস ভেঙে দিল যেন
'ইদ্‌'-রাতে!
রাত হ'ল দিন সেই আতশের
রোশ্‌নায়ে—
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল
নিদ্‌ প্রাতে!
ইয়ার! তোমার পিয়ালা শপথ—
সেই দিনই
শরাব-খানার পথটি প্রথম
নেই চিনি'!
পথে বাহিরিনু, পিরাহান মোর

মদ-মাখা—
সেই দিন হ'তে ঠাঁই নাই আর
'ঈদ্‌গা'-তে।

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্‌ সাকী!
হর্‌দম্‌ দাও!—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?

কালো-কস্তুরী—জুল্‌ফি যে তার
ঘা'ল্‌ করে—
বিছার মতন নড়ে সে গালের
গুল্‌বাগে!
চিবুকের সেই তিলটি যে তার
দিল্‌-দাগা'!
এতদিনে মোর স্বস্তি-সুখের
ভুল ভাগে।
পিয়ারী! ও তোর ঠোঁটের দু'খানি
লাল চুনী
জুড়াবে দরদ্‌,—আমি সে স্বপন-
জাল বুনি!
মজ্‌নুঁর গোরে এখনো যে তার
বুক জুড়ে'
লায়লী-অধর-'লালা'-ফুলটির
মূল জাগে!

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর সাকী!
হর্‌দম্‌ দাও!—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?

গোলাব গুলো যে লাল হয় লাজে—
মউ-ভরা
পিয়ালা কারেও পিলায়, এমন
দেখ্‌ছি নে!
পিয়াসী চামেলি বেলী যে মু'খানি
চুণ করে!
কতদূর হ'তে বুল্‌বুল্‌ আসে
দেশ চিনে'!
শিরীন্‌ শরাব বড় যে রঙীন্‌!—

কয় সাকী—
যত নেশা হোক্, রাতটি ফুরালে
রয় তা' কি?
তোমার সুরত্-সুরায় যে জন
মস্তানা,
হুঁশ হবে তার 'আখেরি-জমানা'—
শেষদিনে!

বড় মিঠা মদ! ফের্ পেয়ালায় ভর্ সাকী!
হর্‌দম্ দাও!—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮

হাফিজের অনুসরণে

আগর আঁ তুরকে শীরাজী
বেদস্ত্ আরদ দিলে মারা।
বখালে হিন্-দুয়শ্ বখ্‌শম্
সমরকন্দ ও বোখারারা ॥

শীরাজের সেই তুরাণী রূপসী
বে-দরদী,
যদি কোনদিন দরদ্ বোঝে এ সুখ-হারার,
লাল সে গালের কালো তিল্‌টির বদলে গো,
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা আর!
যেটুকু শরাব পড়ে' আছে শেষ— ঢালো সাকী!
বেহেশ্‌তেও সে জায়গা এমন আছে না কি?—
রোক্‌নাবাদের নীল নহরের
কিনারাটি,
গুল্-গলাগলি গলিটি এমন মুসল্লার?
বে-শরম এই ছুঁড়িগুলা সব চারিপাশে,
সারাটা শহর গুল্‌জার করে—ভারি হাসে!
ধৈরয মোর লুটে নেয় এরা—
করিব কি?

তাতার-দস্যু ভেঙে ফেলে যেন ঘর-দুয়ার!
পিয়ারা আমার বড় যে রূপসী!—চাহে না সে—
এমন গরীব-অভাজন তারে ভালোবাসে,
কাজ নাই তার সুর্মা-মেহেদী,
জরী-ফিতা—
চায় না পরিতে টিপ্, পুঁতিমালা খোঁপায় তার!
চলুক শরাব, রবাবে ছড়িটি টানো, সাকী!
আঁধার-ধাঁধার জওয়াব মেলে না—জানো না কি?
কেউ সে বোঝেনি, কেউ বুঝিবে না
কথাটা কি—
সারা দুনিয়ায় পাবে না খুঁজিয়া সমঝ্‌দার!
য়ুসুফের রূপ দিন দিন যে গো ফুটে' ওঠে,
কুমারী-ধরম শরম যে তার পায়ে লোটে!—
জুলায়্‌খার ঐ আর আব্রু এবার
গেল টুটে',
ইজ্জত্ রাখা ভার হ'ল সেই লজ্জিতার!
আখেরে যাদের ভালো হয়, সেই যুবারা যে
প্রাণের অধিক জ্ঞান করে এই ধরা-মাঝে—
বুড়াদের কথা, নীতির বচন!
তবে শোনো—
মন রে! তোমার প্রাণের কথা সে চমৎকার!
গাল দিলে তুমি!—সেই যে আমার ভালো কথা!
বেঁচে থাকো তুমি, এমন সুহৃদ্ পাব কোথা?
তবু মনে হয়, চিনি-গড়া ওই
চুনী দুটি
কেমনে ঢালে গো বিষ-কটু এই বচন-ধার!
গীত শেষ হ'ল—সারা হ'ল গাঁথা মোতিমালা!
এস গো হাফিজ! গাও দেখি হেন সুধা-ঢালা—
শুনিতে শুনিতে নিশীথিনী যেন
দিশাহারা,
খুলে ফেলে দেয় তারার জড়োয়া সিঁথিটি তার!

ইরাণী

যৌবনেরি মউ-বনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি,
দুপুর-বিজন ঝর্‌ণাতলায় এক্‌লা বসে চুল খুলি'।
পূর্ণিমারি ঢেউ উঠেছে রূপ-সায়রের মাঝখানে—
থির রহে না মোতির মালা, উঠ্‌ছে কানের দুল্‌ দুলি'!

ফুলের ফিতায় বিনায় বেণী ফাল্‌গুনেরি দিনটিতে,
দুষ্ট-অলক বশ মানে যে কঙ্কণেরি কিন্‌কি-তে।
হাত দু'খানি খোঁপার 'পরে, বাহুর বাঁকে জওসমের
ঝুম্‌কো দু'টি দুল্‌ছে, সে কি আলিঙ্গনের ইঙ্গিতে?

মখ্‌মলেরি বিছ্না 'পরে ঘুমায় কোলে সারঙ্গী,
নীল্‌-রঙিলা কাচের থালায় আনার-আঙুর-নারঙ্গী—
একটি ছোট টুকরা-ফালি টুকটুকে-লাল তরমুজের
রাঙা ঠোঁটে ঠেকায় শুধু, মুখে দেওয়া বারণ কি?

কালো ডানার শ্বেত-মরালী!—স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র-তনুর ডান্‌-বামে!
গোলাবফুলের তাজটি মাথায়, জাফ্‌রাণী-রং পায়জামা—
যুবতী নয়, বালক-কিশোর বস্‌ল এসে তাঞ্জামে!

রাতের বেলায় জ্বালিয়ে বাতি মুকুরে তার মুখ দ্যাখে,
কাঁচলখানি খুলেই আবার মুচ্‌কি হেসে বুক ঢাকে!
দর্পণে সে চুম দেবে তার গালের টোলে লাজ-রাঙা—
ঠোঁটেই পড়ে ঠোঁটের চুমা, তাই ত' প্রাণে দুখ থাকে।

বাসর-দোসর বরের বুকে অঘোরে ঘুম যায় না সে—
স্বপন ভেঙে হঠাৎ জেগে প্রিয়ের পানে চায় না সে ;
সুর্মা-ধোয়া দুখের শিশির গোলাব-গালে গড়ায় না—
ফুট্‌লে হাসি বঁধুর মুখে, সুখের গজল্‌ গায় না সে!

আপন প্রেমেই আপ্‌নি বিভোর, পর্‌-পিপাসা পায় না যে!
রূপের ছায়া ধর্‌বে চোখে—পুরুষ শুধুই আয়না যে!
হাওয়ায়-ওড়া ওড়্‌না-আড়ে দৃষ্টি কি তার দুরন্ত!
গুরু উরুর গুমর-ভরা জোড়-পায়েলা পা'য় বাজে!

* * *

জ্যোৎস্না-জরীন্ ঘাসের ফরাস—ছায়ারা সব কোণ খুঁজে'
'সরো'র সারির তলায় জোটে, নিঝুম রাতির মন বুঝে'!
তারার-চোখে আলোর ধাঁধা—ঠাউরে' না পায় কোন্ তিথি!
বুঁদ হ'য়ে চাঁদ গড়িয়ে পড়ে বাদ্‌শা-বাড়ীর গম্বুজে!

'নিশি'র ডাকে তখন যে তার মন্-মহলের খিল খোলা!
সেতারখানায় কি সুর হানে! দুল্‌ছে নিশার নীল দোলা!
ঝাঁপ্‌টাখানা দুল্‌ছে মাথায়, ফণীর ফণায় মণির প্রায়!
শিরায় শিরায় গানের গমক—সুরের সুরায় দিল্-ভোলা!

গানের শেষে হাতটি ধরি, হেনায়-রাঙা তুল্-তুলে—
সকল বাঁধন শিথিল তখন, নিবন্ত চোখ ঢুল-ঢুলে!
সাহস-ভরে অধর 'পরে দিলাম চুপে দিল্-মোহর—
নুইয়ে প'ল গোলাব-শাখা, ঘুমিয়ে প'ল বুল্‌বুলে!

ভারতী, পৌষ ১৩২৮

শেষ-শয্যায় নূরজহান্

স্থান—লাহোর।
কাল—দিবাবসান।

[প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে রোগশয্যায় নূরজাহান্ ; পায়ের দিকে খোলা-জানালার ধারে প্রধানা সহচরী জোহ্‌রা বসিয়া আছে। ভিতরের দিকে বড় বড় খিলানময় জাফ্‌রি-দার অতিদীর্ঘ বারান্দা। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশে বিশেষ করিয়া সাইপ্রেস (সরো) গাছগুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে দূরে জাহাঙ্গীরের সমাধি শাহ্‌দারা!]

জোহ্‌রা

সারারাত কাল ঘুমাওনি বুঝি? সারাদিন আজ জাগিলে না যে!
বেলা পড়ে' এল, শাহী-নহ্‌বত্ প্রহর-ঘণ্টা মহলে বাজে।
নট্‌কান্-রাঙা আলোটি পড়েছে মিনার-চূড়ায় শাহ্‌দারায়,
এমন সময়ে তুমি যে গো রোজ বসে' থাকো থির আঁখি-তারায়!
মুয়াজ্জেন্ ওই মস্‌জিদে ধরে সন্ধ্যা-আজান্ মগ্‌রবের,
পিলু-বারোয়াঁয় বাঁশিটি ফোঁপায়—কোথায় বিদায়-উৎসবের!

ফোয়ারায় জল ঢালিছে পাথরে—শোনা যায় যেন আরো সে কাছে!
টুক্‌টুকে-নখ নীলা কবুতর্ আলিসার 'পরে আর না নাচে!
ঘরের দেয়ালে দূর-বাগানের পাতা-ঝিল্‌মিল্ কাঁপিছে ছায়া,
দুধে'-পাথরের খিলানের গা'য় আকাশের লাল মেঘের মায়া!
ওঠো একবার! নওরাতি আজ—শেষ-নওরোজ হয়ত এই!
এদিনের মত স্মরণ-বাসর তোমার নসীবে আর যে নেই!
পাদিশা-প্রেয়সী নূরজাহান্!

জেগে আছো মাগো—তাই ত'! দেখি যে চোখের কোণায় জল গড়ায়-
গোস্তাখি মাফ্ কর হজ্‌রত। প্রাণ যে আমার ভুল করায়!
শুভদিনে আজ চোক চাহিলে না, ওক্ত যে সব বহিয়া যায়!
আজিকার দিনে খোদার দুয়ারে জানাবে না শেষ-প্রার্থনায়?
এইখানে তুমি বসিবে, গায়িব গজল্-ইলাহী—তোমারি গান,
আজ নওরাতি—জ্বালাবে না বাতি? সাজাবে না তাঁর গোলাব-দান?
ওকি হাসিমুখ!—চাহনি তোমার হঠাৎ হ'ল যে কেমনতর!
হঠাৎ অচেনা মনে হয় তোমা!—আজিকে কেন মা এমন কর'?

নূরজহান্

কেন মিছে ভয় করিস্ জোহরা? তুই যে আমার ছোট বহিন!
শাহ-বেগমের গরব কোথায়! তোরও চেয়ে আমি অধম হীন।
আজ নওরাতি?—জ্বালাস্‌নে বাতি মরণ-শিয়রে আমার ঘরে—
যত বাতি আছে জ্বালাতে বলে' দে শাহান্-শাহার সমাধি 'পরে!
মোর তরে আর নামাজ নাহি রে, পাতিস্ নে আর মুসল্লায়,
বিশ্বপতির দরবারে মোর সকল আরজ্ আজ ফুরায়!
দেহের-মনের ঈদ্‌গাহে মোর—মেহেরাবে জ্বলে হাজার বাতি,
আজ থেকে তাই অনন্ত মোর চির-মিলনের সে নওরাতি!
তুই জেগে থাক্ সেহেলি আমার—শেষ সহচরী!—মাথার পাশে,
বাদামের জলে আফিম্ মিশায়ে দিস্ বারে-বার—যাতনা নাশে!
আজ রাতে আর ঘুমাব না! আমি, ঘুমেরি মাঝারে রহিব জেগে,
তুই চেয়ে দেখ্—কবরে কখন্ বাতি নিবে যায় বাতাস লেগে!

জোহরা

ঘুমাও ঘুমাও! আর জাগাব না, মেজাজ তোমার ভালো যে নাই—
সারাদেহে এ যে আগুনের জ্বালা! উঠিতে আজিকে পার নি তাই?
বক্সীরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ-বেলা কেন?
মরিয়ম আর সখিনা-বাঁদীরে বলে' দেই—থাকে হাজির যেন।

নূরজহান্

এত করে' বলি, বুঝিস্ নে তুই! বোস্, কাছে আয়, হয়নি কিছু!
বুড়া হ'লি তবু বুদ্ধি হ'ল না, মিছে ঘুরে ম'লি আমার পিছু!
আজ যে আমার সব ঘুচে গেছে—সব শোক-দুখ, সব বালাই!
এ-বিশ বছর যার ধ্যান করি, কাল তার দেখা পেয়েছি ভাই!
মাফ্ পেয়েছি যে—ছুটি আজ থেকে, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার!
সারারাত কাল স্বপন পেয়েছি, দিনে তা' জপেছি ঘুমের ভানে,
মগ্‌রব্-বেলা ডাকিলি যখন, শান্তি নেমেছে সারাটি প্রাণে।
আর বেশীখন নয় রে জোহরা, রাতটাও বুঝি হয় না ভোর—
মিছে শোক তুই কেন বা করিস, আজ শেষ—আজ ছুটি যে মোর!
কাঁদিসনে তুই—এত সুখে তবু কান্না দেখিলে কান্না আসে!
স্নেহমমতার সব শেষ, তবু দুঃখের নেশা ঘুচিল না সে!

জোহরা

কি যে বল তুমি আলি-হজ্‌রত্! এত-বড় শোক মানুষে পায়!
কি হ'য়ে, কি বেশে, ধরা হ'তে আজ চুপে-চুপে তুমি নাও বিদায়!
সুখ কোথা রাণি?—মহারাণী মোর! হিন্দরাজের শাহ্-বেগম!
চেয়ে দেখ, ওই তাঁহারো শিয়রে আলো যেন আজ জ্বলিছে কম!
অগাধ আকাশে ওই যে হোথায় টুক্‌রা যেন সে জরীন্ ফিতা—
ওরি মত হাসি তুমিও হেসো না, ভুলে গেলে তুমি আছিলে কি তা'
আমি যে দেখেছি ওই চুলরাশ রুমাল খুলিয়া পড়িত খসে'—
একাকার হ'ত ঝিনুক-বসানো আব্‌লুসে-গড়া তখ্‌তপোষে।
চোখের পাতার রেশ্‌মী ঝালরে হামামে দাঁড়াত জলের ফোঁটা!
সুর্মা আঁকিতে হ'ত না কখনো, হাসিতে ঝরিত মুক্ত গোটা!
ওই হাতে ধরি' হাতিয়ার, ফের আঙুলে বুনেছ ফুলের ছবি!
ওই পায়ে তুমি পায়েলা পরিয়া বীর দলিয়াছ!—ভুলেছ সবি?
মরণ-ডঙ্কা কণ্ঠে বেজেছে, বেজেছে সাহানা—পরীর সুর!
চাহনি তোমার শের-মোগলের শরাবের নেশা করেছে দূর!
সেই-চোখে আজ আঁধার নামিছে, সেই-মুখে আজ স্বপন-হাসি—
এত দুখ তব সুখ হ'ল আজ! সেইগুলা ছিল দুঃখরাশি?
কারে ভুলাইছ?—কার কাছে তুমি হাসিয়া রুধিছ চোখের জল?
কায়-মনে আমি সেবিনু তোমায়, আমারে ভুলাতে কেন এ ছল?
ওই হাসি তুমি পোরো না ও মুখে, বাঁধিও না ওই চোখের বাঁধ,
পায়ে মাথা রেখে কেঁদে নিই আজ, মিটাইয়া মোর মনের সাধ।

মরেছে বটে সে ভাইঝি তোমার—আরজমন্দ ভাগ্যবতী,
অমন তখ্‌ত-তাউসে বসিয়া কাঁদে তারি লাগি' দুনিয়াপতি!
ষোলটি-বছরে-জমানো অশ্রু জমাট-পাথরে হ'তেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছাতে মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা!
দীন্‌-দুনিয়ার মালিক যে জন তাঁর নাকি বড় ন্যায়-বিচার!—
মমতাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার!

নূরজহান্‌

চুপ চুপ! ওরে অবোধ ভিখারী! বলিস নে আর অমন কথা!
আমারি মনের শেষ মলাটুকু তোরও প্রাণে দেখি জাগায় ব্যথা!
যা' ছিল আমার সব ভালো ছিল— খোদার শ্রেষ্ঠ দো'য়ার্‌ দান!
যা' ঘটেছে মোর সারাটি জীবনে, গোড়া থেকে শেষ—সব সমান!
এক তিল তার দেখিনা যে তিত!—সবই যে শিরীন্‌!—করিনা শোক,
সব পাপ-তাপ, দম্ভ-বিলাস—কামনার পথে অমৃতলোক!
জন্ম যাহার পথের মরুতে, মেটেনি প্রথম স্তনের তৃষা—
তনুটি তাহার অনলের শিখা, মনটি যে তার হারায় দিশা!
আগুনের লোভ করেছে যে-জন, আপনি সে-জন ভস্মশেষ!
মনখানি বুঝে' মাতাল যেজন—পরা'য়েছে সেই রাণীর বেশ!
আমার পিপাসা সেই নিয়েছিল—আপন পাত্র গরলে ভরি'!
ভুলায়ে রাখিল হীরার মুকুটে, নিজে তখ্‌তের পায়াটি ধরি'!
কোনো জ্ঞান মোর ছিলনা তখন—কোথায় চলেছি কিসের খোঁজে,
চিনেছিল শুধু একজন সেই, প্রেম যার আছে সেই যে বোঝে!
রংমহলের হুর-পরী-দলে নামটি দিল সে—নূরমহল!
ষোড়শীর রূপে মজেছিল সে কি? যৌবন শেষ—তবু চপল!
আমার মাথায় তাজ দেখেছিলি—দুর্‌-মর্‌জান্‌-মোতি-বাহার?
তারি শোকে তোর ধারা বয় চোকে! বেইমান্‌, দাও দোষ খোদার!
তোর দোষ নেই, আমিও বুঝিনি, দেখিনি তখন এমন করে'—
শাহ্‌-বেগমের নকল খেলায় আসলের নেশা গেছিল ধরে!'
মমতাজ!—আহা, রুহ্‌ যেন তার খোশ্‌হালে রয় আল্লা তা'লা!
গগন-সমান গম্বুজ গড়ি' খুরম্‌ সাজায় অশ্রু-ডালা!
মরণের পরে শোকের নিশানা অমর যে-জন করিতে চায়—
আপনারে তার দেয় নি বিলায়ে—প্রেমেও গর্ব! হায়রে হায়!
আমারে যে-জন ভালোবেসেছিল, নিজের মাথার মুকুট খুলে'—
হিন্দুর মত প্রতিমায় তার—অর্পিল সব, আপনা ভুলে'!
মহলের নূর ছিল যেই তার, তাহারে করিল নূরজাহান।
জীবনেই তারে জয়মালা দিল, ফিরায়ে নিল না আর সে দান!

আল্লারে মোর হাজার শোকর্—চলে' গেল আগে আমায় রেখে—
সেই দিন হ'তে বুঝেছি জোহ্‌রা, বুঝি নাই যাহা নিকটে থেকে!
যে-বাতাস তোর নাকের নিশাস তার চেয়ে বড় দখিনে-হাওয়া!
মরিয়া যেদিন বুঝাইয়া দিল, ছেড়ে দিনু সব দাবী ও দাওয়া।
রূপের গর্বে ধিক্কার হ'ল—মরিল যেদিন শের আফকন্,
'নার' গেল, 'নূর'—সেও ঘুচে গেল, নির্বিষ হ'ল এ দেহ- মন!
তার পর হ'তে এ বিশ বছর একে একে সব গিয়েছে ধুয়ে,
জীবনের যত সুখ-দুখ-ফুল ফল হ'য়ে আজ পড়িছে নুয়ে!
বোস্তান্ আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব হায়াত্—
সাপ-শয়তান বুল্‌বুল্ হ'য়ে গায়িছে সারাটি জ্যোৎস্নারাত!
যত শোভা,—সে যে বাসনারি রূপ! রূপের জগৎ কী সুন্দর!
বাসনায় বাঁশী বেজে উঠে যার, ঘুচে যায় তার ইহ ও পর!
আগুনে যেমন সব বিষ যায়, প্রেমেও তেমনি সকলই শুচি—
কামনার কালি তাহার পরশে জ্বল্-জ্বল্ করে—হীরার কুচি!
তবু একটুকু আছিল আমার কলিজার তলে ব্যথার দাগ,
কোনোমতে তারে মুছিতে পারিনি—সেইটুকু ঘোর রক্তরাগ!

জোহ্‌রা

আম্মা বেগম, কহিও না আর—ভয় ভয় করে এসব শুনে'।
এ যেন তোমার জ্বরের খেয়াল, এত জোর পাও কিসের গুণে?
আরে একি হ'ল! দেখ, দেখ!—যেন আগুন লেগেছে শাহ্‌দারায়!
এত আলো হোথা কিসে হ'ল আজ? এত বাতি আজ কারা পোড়ায়?
আহা, তুমি কেন?—উঠো না, উঠো না!—আহা-হা, আবার ঘুরিল মাথা!
কি যে চাও তুমি আমারে বল' না! কেন এতখন বকিলে যা'-তা'?
শরবৎ দিব?—ঘুমের আরক?—শামাদান তবে শিয়রে দিই?
ও-দেহে তোমার আছে আর কিবা! চোখদুটি এই মুছায়ে নিই।

নূরজ'হান্

আমার কাহিনী তুই বুঝিবি না, বুঝেছে সে কথা আর একজন ;
দুনিয়ার মাঝে দরদী যেথায়, করিবে অশ্রু বিসর্জন!
যেদিন চেয়েছি কবরে তাঁহার ব্যথায় গুমরি' গভীর রাতে,
অমনি আলো সে জ্বলেছে দ্বিগুণ—আগুনের মত ঝঞ্ঝাবাতে!
একটু সে দাগ কিছুতে মোছেনি—তখ্‌তে বসিয়া ভুলিনি তবু!
তা'ও মুছে গেছে এপারে থাকিতে—স্বপনে সে আশা করিনি কভু!
জানিস জোহ্‌রা! দর্শন দিতে বসেছি যখন দেওয়ানি-খাসে,
ঝরোকার তলে প্রজারা দাঁড়ায়—সেও দেখি আছে দাঁড়ায়ে পাশে!

সেই আলিকুলী শের-আফ্‌কন্—দৃপ্ত-সাহস, অমন বীর!
বক্ষকবাট যেমন বিশাল তেমনি ললাট, উচ্চশির!—
ম্লানমুখে সে যে রয়েছে দাঁড়ায়ে, ধূলায়-রক্তে ভরেছে বেশ!
বুক-ফাটা সে কি নীরব চাহনি!—কি যেন আরজ্‌ করিছে পেশ!
মূর্চ্ছার বশে টলিতে টলিতে ঘরে ফিরে' গেছি পাণ্ডাশ মুখে,
চীৎকার যেন গলায় চাপিয়া লাইলীরে মোর টেনেছি বুকে!
কতকাল হ'ল আর ত' দেখিনি! তবু ভুলি নাই—ভোলা কি যায়!
মরণ ধূসর মূরতি তাহার মনের মাঝারে মূর্চ্ছা পায়!
সব দুখ যবে সুখ হয়ে গেল, সব সুখ হ'ল মুক্তি-সেতু,
মরণে যখন লভিব বিরাম—সেই হ'ল শেষ দুঃখ-হেতু!
তাঁর সাথে মোর মিলনের পথে মরণেও বাদ সাধিল সেই!
এ কি এ বিষম গজব্‌ তোমার—প্রেমময়! প্রেমে মাফ্‌ কি নেই?
কাল রাতে তার জবাব পেয়েছি, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার।
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার!
চোক যদি থাকে দেখে নে জোহরা, আজিকার এই সুখের হাসি—
শিশিরে-ধোয়া সে গুলশন নয়? — নওশার লাগি' ফুলের ফাঁসি?
আলিকুলী আর আসিবে না ফিরে, আসিলেও আর চিনিবে না সে ;
জরা-যৌবন এক যার কাছে—সেই বাঁধি' ল'বে বাহুর পাশে!
এই শাদা-চুলে সিঁথির সীমায় চুমা দিবে সে যে অশেষ স্নেহে—
চিরযৌবন-রৌশন্‌ রূপ ফুটিবে আমার জীর্ণ দেহে!
জোহরা! জোহরা!—

জোহরা

কি বলিবে বল, চুপ কর কেন আম্মাজান?

নূরজহান্‌

ওই শোন্‌—ওই!

জোহরা

এশার ওক্ত—মস্‌জিদে ও যে দেয় আজান!

নূরজহান্‌

না, না, ও যে দূর বাঁশীর আওয়াজ!—শোন দেখি তুই কানটি পেতে—
মাঝে মাঝে আমি কেবলই শুনি যে— শুনি ওই সুর দিনে ও রেতে।
জ্যোৎস্নায় যেন জুড়াইয়া দেয়—ক্লান্ত নয়ন মুদিয়া আসে,
কখনো গভীর আঁধার নিশীথ, দুই চোকে দেখি শিশির ভাসে।

না, না— কাজ নেই, সেই ভালো—আমি একাই ঘুমা'ব!—সে যদি কাঁদে
কোথায়!—কোথায়! দূর—বহুদূর! মাটির বাঁধনে তা'রে কি বাঁধে?

জোহ্‌রা

আর কথা নয়—চোক জলে ভাসে! কপালে তোমার হাত বুলাই—
ঘুমাও দেখি মা একটু এখন, আমি বসে' হেথা পাখা ঢুলাই।

নূরজহান্

তবু, দেহখান—যেখানে সে থাক্— তাঁর দেহ থেকে রবে না দূরে,
দেখিস্ তাঁহার কবরের ছায়া পড়িবে আমার বুকটি জুড়ে!'
ওরা যে বোঝে না, ভাবে—কত পাপ!—কত সে পিপাসা প্রেমের নামে!
শা'জাহান তাই বিচারে বসেছে, দিবে না আমারে শুইতে বামে!
আমি ত' চাহি নি' মর্ম্মর-বাস—শাদা-ধব্‌ধবে পাথরে গাঁথা!
ধূলামাটী, সে যে জীবের জননী!—আর কার কোলে রাখিব মাথা?
এই ধরণীর দুলালী আমি যে, ধূলায়-কাদায় ভরি' আঁচল,
ঢেলা ভেঙে আমি বুনেছি ফসল—রাঙা হৃদি-ফুল, অশ্রু-ফল!
শুধু পাশটিতে, একটু সে কাছে,—তা'ও সহিল না শাহ্‌জাহান!
মমতাজ বুঝি দিব্য দিয়েছে? তাজের মহিমা হইবে ম্লান?

জোহ্‌রা

ওই দেখ দেখি, ব্যথা নাকি নেই, সব মুছে গেছে—সকল জ্বালা?
বুকের ভিতরে সব চাপা আছে, কপালে বিঁধিছে কাঁটার মালা!
আমি যে তোমার মন ভাল জানি, কেঁদেছি কত যে ও-মুখ চেয়ে—
চোক ফেটে জল দেখেছি গড়ায় আপনি তোমার গণ্ড বেয়ে!
শেষ সাধটুকু, তা'ও পূরিবে না? মানুষের বুক এত পাষাণ!—
পাথরের রূপে মজিয়া করেছে কঠিন আপন কলিজাখান!

নূরজহান্

খসে'-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ আসিলে বেয়ে—
লাল হ'য়ে গেল পাণ্ডুর রাতি তোমার দেহের আলোক পেয়ে!
চেনাবের তীর—পিপাসা-অথির কেঁদে কেঁদে বয় পাহাড়ে নদী,
তোমার আমার চেনা সে চেনার—এই গাছ-তলে বস'গো যদি!
বন্-গোলাপেরা চেয়ে আছে দেখ, হাসিমুখে নাই ভাবনাটুক,
সুন্দরী ওরা, রূপের পসরা! —তবু কোনো দিন পায়নি দুখ!
অশ্রু-শিশিরে আতরের বাস, ঝরা পাপড়িও কেমন চায়!—
ফুলের মতন হওয়া কি বারণ?—রূপ র'বে বিনা দুখের দায়!

কি এনেছ ভরি' স্ফটিক-সুরাহি?—কওসর হ'তে আবে-হায়াত্?
তুমি আগে পিও, তোমার আননে এখনো ঘোচেনি কালিমাপাত!
স্বর্গের সুরা এই সে তহুরা!—আনিয়াছ ভরি' আমারি তরে?
চুমকে-চুমুকে সব ব্যথা যাবে! সব স্মৃতি নাকি উদাস করে?
তুমি চাও না সে!—কোনো দুখ নেই?—এখনো নয়নে নেশার ঘোর!
কোন্ মদ পিয়ে মাতোয়ারা তুমি—এত অচেতন, হে প্রিয় মোর?
আমি যে পারি না সহিতে সকল, দাও দাও মোর কণ্ঠে ঢালি'—
শুধু দুখ নয়!—সুখ, সেও যাবে?—সব বুকখান করিয়া খালি!
শুধু যাবে না সে নূরজাহানের শাহী-দরবার—শের-আফ্‌কন!
যাবে তারি সাথে কুমারী-মেহের—শাহজাদা—আর সে চুম্বন?
নিষ্ঠুর তুমি!—টলিছে না হাত!—মিশালে না ফোঁটা আঁখির জল!
ব্যথা নাই তবে, সুখও নাই বুঝি? তবে কেন এলে—কেন এ ছল?
'ভালোবাসিয়াছি তোমারে পিয়ারী, তার বেশী মোর চাহি না সুখ,
'কওসর-বারি তহুরা-শরাব তুমি পান কর, জুড়াও বুক!
'আমার বলিয়া কিছুই নাহি যে—আমার পুণ্য, আমার পাপ—
'যা' করেছি ফের করিতে যে পারি, কিসের দুঃখ, কি পরিতাপ?
'তুমি পান কর, ভুলে যাও সব, কাঁদিও না আর সে সব স্মরি'—
'মাগিয়া এনেছি তোমারি লাগিয়া এ-পানি খোদার আরশ ধরি'।
'দুখ যদি সুখ না হয় সাধনে, প্রেম— সে যে শুধু পিয়াস-জ্বালা!
'কর পান কর, সব ভুলে যাও! নামাইয়া দাও ব্যথার ডালা।'
আর বলিও না! বুঝিয়াছি সব— ওরে অভাগিনী অবোধ নারী!
আজ শেষ! আজ সকল গর্ব-অভিমান দিনু চরণে ডারি'।
আমারে কুড়া'য়ে নাও ধূলি হ'তে, গেঁথে নাও বুকে মোতির সাথে—
কণ্ঠে দুলিব, ধুয়ে গেছি আজ তব নয়নের আলোক-পাতে!
মিটিয়াছে ক্ষুধা, চাহি না ও সুধা!— ফিরাইয়া দিও দয়ার দান!
আর জাগিবে না, কাঁদিবে না আর জাহাঙ্গীরের নূরজাহান!
আজ নওরাতি!—জ্বেলে দে রে বাতি, হেনা দিয়ে দিস্ দুখানি হাতে—
সুর্মায় চোক ডাগর করে'—চুমিবে সে মোর নয়নপাতে!

জোহরা

আম্মাবেগম, বাতি নিবে যায়,—জ্বালাইয়া ফের দিব কি তবে?
আকাশে দেখি যে বাদল নেমেছে!— বাতাস উঠেছে—ওমা কি হবে!
ঘুমাইলে বুঝি? ঘুমাও ঘুমাও! কাজ নাই মিছা জাগিয়া আর—
ওই যা—হোথায় আলো নিবে গেল! কবর আঁধার শাহ্‌দারার।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

বেদুঈন

এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা!
আমাদের গ্লানি হিংসা যে করে— আমাদের হাতে পাবেই সাজা!
তাঁবু আমাদের পশ্চিমে পূবে কালো করে' আছে সফেদ বালি,
শাদা হাতে যেন উল্কির দাগ—পোড়া হাঁড়ি আর চুলার কালি!
কোমরে-বাঁধা সে ভারী তলোয়ার আধা-সিধা আর আধেক-বাঁকা,
হাতে জল-তোলা দড়ির মতন দীঘল বর্শা রক্ত-মাখা!
বকর্‌-জোসম্‌-মা'দের গোষ্ঠী— জানে তারা খুবই মোদের কিরা—
শত্রুনিপাত না করে' আমরা ভিজাই না চুল, খুলি না গিরা!
হেজাজ্‌ বংশে ভেজাবে না মুখ ঘোলা-কাদা-মাখা 'দেদা'র জলে,
আমাদের উট—দুধে-ভরা-বাঁট, চরে না শুক্‌না কাঁটার দলে!
এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আম্‌রাই প্রজা আম্‌রা রাজা!
আমাদের সাথে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা!

ভোরের তারাটি ওঠে নি যখনো—পাহাড়ের তলে শিকলে-বাঁধা,
হাওয়ারা সবাই ঘুম থেকে জেগে সবে ফের শুরু করেছে কাঁদা ;
বুড়ারা ঘুমায়, জোয়ানেরা জেগে খিম্‌খিম্‌-দানা খাওয়ায় উটে,
পরে পেয়ালায় ঘোড়ারই দুধের শরাব সদ্য ফেনায়ে উঠে!
ভোরের পেয়ালা কানা-ভোর ভরি' হাতে হাতে দেয় হাসিনা-সাকী,
চোক জ্বলে' ওঠে, আকাশেরো কোলে জ্বলে ওঠে লাল পূবের চাকী!
মস্‌লা-বাটা সে পাথরের মত, চক্‌চকে-তেলা ঘোড়ার পিঠে—
মালেক, কায়েস্‌, আমি—তিন জন লাফাইয়া ঠুকি পায়ের গিঁটে।
ছোট-করে'-ছাঁটা চুলগুলি তার, গলাটি যেন সে তালের কোঁড়া—
পালক-লাগানো তীরের মতন ছুটে' যায় মোর আরব-ঘোড়া।
সাম্‌নে বালুতে দড়ি বুনে' দেয় ঝির-ঝির ধীর ভোরের হাওয়া,
পিছনে কিছু না—সব মুছে যায়, ধূলা-কুয়াশায় যায়না চাওয়া।
ডাহিনে মিলায় মোগেমির-গিরি, সিতাব্‌-কাতান-তবির-চূড়া,
'কানাবেল্‌'-বনে দাঁড়ায় সাথীরা, ধুয়ে লয় মুখে বালির গুঁড়া।
আমার ঘোড়া সে ছোটে পূরা দম—টগ্‌ বগ্‌ সেই আওয়াজ বা কি!
বন্‌ বন্‌ বেগে উড়ে যায়, যেন ছেলেদের হাতে ঘুরণ-চাকী!

মাজেল্‌-পাহাড় ওই দেখা যায়,—হোথা কেহ নাই, কেহই নাই।
ওইখানে ছিল তব্‌রেজ্‌-দলে দুধে-ধোয়া এক চমরী-গাই।
দড়ি-দড়া-খুঁটি উপাড়ি' তুলিয়া চলে' গেছে কোন্‌ ভোরের রাতে,
রুটি সেঁকিবার পাথরের টালি ফেলে গেছে শুধু তাঁবুর খাতে।

নীল শিরা যেন ডেরার নিশানা লেগে আছে ওই বালির গায়,
খমামের পাতা ঝরে' গেছে সব, মুড়া তালগাছ—হায় রে হায়।
ওগো সুন্দরী সোখাম্-কুমারী—নবারা! আমার নয়ন-তারা!
কোন্ বালিয়াড়ি-গিরির আড়ালে, সব্‌জির বাগে হইলে হারা?
উটের দোলনে দুলে' দুলে' কেঁদে, হুম্‌ড়িয়া ভেঙে বালির ঢেউ,
কোন্ দূর কালো রাত্রির দেশে চলে' গেছ তুমি—জানে না কেউ!
নিঝুম মরুর কোথা সাড়া নেই, শব্দ মিলায় পায়ের তলে—
তোমারি গোঙানি-ফোঁপানির তালে ঘুণ্টি বাজে সে উটের গলে!
বুঝি বা সে-দিন আকাশের জিন্ তুলেছিল নীল-তাঁবুর সারি—
পর্দার ফাঁকে হাত-ছানি দেয় দশ আঙুলের ঝিলিক মারি'।
হঠাৎ তাদের তলা থেকে যেন আগুনের ধোঁয়া এগিয়ে আসে,
মাথার উপরে মেঘ-শকুনেরা ডানা মেলে যেন হাওয়ায় ভাসে!
মুখখানি গুঁজে প'ড়েছিলে গিয়ে কোন্ সে কঠিন্ পাহাড়-পায়—
কত কি যে লেখা ভীষণ আঁখরে রাজাদের নাম তাহার গা'য়!
সেইখানে বুঝি ফুরিয়েছে সব, শত্রুর হাত এড়াতে গিয়ে—
চলে' গেলে তুমি রাত্রির দেশে ঐ আকাশের কিনারা দিয়ে!

দূরে দেখা যায় ওই যে দেয়াল, মিনার উঠেছে কুয়াসা ফুঁড়ে'—
খাপ-খোলা যেন খাড়া তলোয়ার—আলোটি ঝলিছে তাহার চূড়ে!—
হিন্দার বেটা অম্‌রু হোথায় পেতেছে শহর—গোলাম-খানা,
ওইখান থেকে—বাচ্ছা বাঁদীর!—আমাদের 'পরে দেয় সে হানা!
মাটির বুরুজ, পাথরের টালি, দুয়ারে শিকল, লোহার বেড়া—
ফাটকে-আটক বাস করে হোথা হাজার হাজার মানুষ-ভেড়া!
ঘরে-ঘরে করে দুষ্‌মনী ওরা, পিঠে মারে ছুরী পিছন থেকে!
বুকে বল্লম বেঁধেনি কখনো—লড়াই-এর কথা কাগজে লেখে!
কমজাত্ যত!—রক্ত রেখেছে ঠাণ্ডা দেহের পিপেয় ভরে'—
এক শরা তার্ করেনি খরচ, বুড়ো হ'য়ে শেষ শুকিয়ে মরে'!
রং-বেরঙের সাজ করে ওরা, শাদা-চোখে হয় সুর্মা-টানা!
মজলিসে বসে' মিঠে মদ খায়, পিঠে ঠেস দিয়ে তাকিয়াখানা।
রেশম পশম মুক্তার মালা ঘরে বসে' ওরা সওদা করে,
খুনের বদলে সোনার টাকায় ভোলায় ইমন্-সওদাগরে!
ভোর হ'তে সাঁঝ, সাঁঝ হ'তে ভোর, ভন্ ভন্ করে মাছির পারা,
দিল-তোলপাড় জান্-আন্-চান খুনের সোয়াদ পায় নি তারা।
বান্দামহলে সর্দারী করে হিন্দার বেটা অম্‌রু-রাজা—
আমাদের পায়ে জিঞ্জির দেবে!—শির-দাঁড়া দেখি বেজায় তাজা।

একবার পাই!—দাঁতে টুঁটি কেটে খাল খানা তার ফেলাই ফেড়ে!
হাড়-মাস করি পাখীর খোরাক, মুণ্ডুটা ফেলি বালিতে গেড়ে!

খুনে জ্বলে' ওঠে বাজারে আগুন, সাপটিয়া ধরি ঝড়ের ঝুঁটি।—
আশ্‌মান-জোড়া পেয়ালায় মোরা রৌদ্র-শরাব দুপুরে লুটি।
বালির পাথার-কিনারায় ওঠে ঢেউ সে—মোদের তাঁবুর সারি,
পলকে মিলায়, কোথায় ভেসে যায়!—দেখেছে এমন দুনিয়াদারী?
মাটির বাঁধনে বাঁধে না মোদের, পথহারা মরু-পান্থ মোরা?
বালির মালিক!—বুনিয়াদ কোথা? কোনোখানে নেই স্মৃতির ডোরা!
ঘর-বাঁধা আর মন বাঁধা আর জান-বাঁধা-রাখা কাহারো কাছে?—
ধিক্ ধিক্ ওরে হিন্দার বেটা!—মোর হাতে তোর মৃত্যু আছে!
শমশের?—সে ত' মেয়েদের হাতে পাক-দেওয়া ফিতা রেশ্‌মী দড়ি!
ঝক্‌ঝকে-মুখ বল্লম?—সে ত' ছেলেদের হাতে খেলার ছড়ি!
মরণের ভয় নেই আমাদের, মুর্দার তরে কে শোক করে?
বড় ঘৃণা হয়—মরদ কেহই মরে' উঠে' লড়ে' ফের না মরে!
'নূর' কাজ নেই! 'নার' চাই মোরা—জীবনের সার উত্তেজনা,
ফুঁসে-ওঠা শুধু জ্বল্-জ্বল্-চোখ—একদম-খাড়া সাপের ফণা!
একটি নিমেষে শেষ ক'রে দেওয়া, বোমার মতন কলিজা-ফাটা!'
এক চীৎকারে দম ছুটে' যাক!—এক লাফে শেষ রাস্তা-হাঁটা?
চুপ করে' থাকা মাটি পানে চেয়ে, একঘেয়ে বাঁচা দিনের দিন—
'আয়লা'র মাঠে সোঁতার মতন শুষে' যায়, শেষে থাকে না চিন্!
বুজ্‌দেল্ যত কমবক্তেরা!—চোরের মতন বাঁচিবি কি রে!
এই হাতে আয় গর্দান নিই, এই ছোরা আয় বসাই শিরে!
বান্দার দল! গর্ব কিসের? আমাদের চেয়ে তোরা না বড়!
বুকের রক্ত মাথায় ওঠেনা, শিরাও ফোলে না—কাঁদনে দড়!
পাঁজরে বিঁধিলে বর্শার ফলা—ভেঙে যায় যবে হাড়ের পাশে,
দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্ত গড়ায়, তবুও মোদের কান্না আসে?
জোয়ান যে-জন শত্রু জিনিয়া বেঁধে নাহি আনে দু'দশ বাঁদী,
রমণী তাহার ধিক্কার দেয়, তাঁবুর দরজা রাখে সে বাঁধি'!
হারিয়া যে-জন পলাইয়া আসে, লুঠের বখ্‌রা ফেলিয়া দিয়া—
সন্তানে তার আছাড়িয়া মারে, স্তন মুখ হ'তে কাড়িয়া নিয়া!
চোখের ভিতরে কুটার মতন শত্রুর রিষ বুকেতে পোষে—
আপনার হাত ছুরিতে কাটিয়া খুন দেখে লয় অধীর রোষে!
রাত্রে যখন পুরুষেরা ফিরে' মদের পেয়ালা ভরিয়া তোলে,
বীরের জবান শুনিয়া তাদের মাতালের মত দেহটি দোলে!

দুনিয়ার সেরা আওরাত এরা—রমণী মোদের, কন্যা, মাতা—
এদের কণ্ঠে শিকলি পরা'বে? অম্রু, তোমার কয়টা মাথা?

ওই দেখা যায়, চলিয়াছে কা'রা 'ওগারা'-বনের পথটি ধরে'—
উটের বহর দুলে' চলে, বালির উপরে ছায়াটি করে'!
নামাল জমির পা'ড় বেয়ে চলে, কখনো আড়াল, কখনো নীচু—
মালেক, কায়েস্ ওই যে হোথায়!—আরও তিন জন নিয়েছে পিছু!
এই ত' আগুন-খেলিবার বেলা, খুনের ওক্ত বাতাসে বাজে—
চরাচরময় তলোয়ার যেন আকাশে ঘুরায়ে কে ওই ভাঁজে!
খুনে-রোদ্দুর দু'চোখে আমার ঠিকরিয়া হানে আলোর ধাঁধা,
ঠেলা দেয় বুকে আগল ভাঙিতে—পাগল রক্ত মানে না বাধা!
ঝিম-ঝিম্ করে আকাশ-কিনারে অলখ-সেতার আগুন-গানে!
মায়াবী-মরুর ইবলিশ ওই আর না কাহারো শাসন মানে!—
দিকে দিকে নাচে তা-থেই, তা-থেই, বালু-দেহ ধরি', দু'বাহু তুলি',
এক পায়ে শুধু আঙুলে দাঁড়ায়ে শিস্ দেয় দেখ ডাহিনে দুলি'।
তখনি আবার লুটাইয়া পড়ে, কিছুখন রহি' পারিল না যে—
সারাটা আকাশ একখানা যেন ঝাঁঝরের মত ঝিমিকি বাজে।

'হুর্ হুর্-হু-উ—' ডাকে দূরে ওই সাথীরা আমায় বর্শা তুলি',
রক্তে আমার তুফান তুলেছে, বক্ষ আমার উঠিছে ফুলি'
আগুনের কণা দু'দিকে ছিটায়ে বাতাস ফুঁড়িয়া ছুটেছে ঘোড়া,
মাথার উপরে চাকা ঘুরে' যায়, বোঁও-বোঁও করে কানের গোড়া।
ওরা আসে ওই।—ওই যে হোথায় দাঁড়াইল নামি' বালুর 'পরে,
মেয়েরা র'য়েছে উটের উপরে পর্দায়-ঘেরা হাওদা-ঘরে।
'হিরা'য় চলেছে?—নোমানের প্রজা? গিয়েছিল কোথা বাঁদীর হাটে—
রূপ-জহরতে বোঝাই নিয়েছে, সোনা বেশী আর নেই ক' গাঁটে।
চট্‌পট্ সেরে নাও এই বেলা—আকাশে দেখি যে আঁধির ঘটা!
—হয়রান্ করে আরে বদ্‌জাত! ছিঁড়ে ফেলে দিই মুণ্ড ক'টা।
কেয়াবাত! আরে সাব্বাস ভাই। লড়াই? বাহবা!—এই ত' চাই!
খুন্-পিচকিরী চোখে মুখে দাও—জান দাও, জান নাও রে ভাই!
খাঁ-খাঁ চারিদিক, ঝাঁ ঝাঁ ঝিমি-ঝিমি—আওয়াজ যেন সে আলোয় বাজে,
চিঁ হিঁ-হিঁ হিঁ-হিঁ হিঁ—চীৎকার, আর হুঙ্কার ঘন তাহারি মাঝে!
আরে এই বার—বাস্!—বল্লম ঢুকে গেছে কেটে মাথার খুলি—
কাঠের হাতল শিহরিয়া ওঠে, শিড়-শিড় করে আঙুলগুলি।

ফাঁক হ'য়ে গেল মাথার খিলান, চক্ষু-কোটর রক্তে ভরে—
মুঠা-মুঠা যেন নার্গিস-ফুল কুটি-কুটি হ'য়ে দু'ধারে ঝুরে!
পর্দার ফাঁকে একখানা মুখ পলকে বাড়ায়ে লুকাল ফের—
চোখে জল তার, হাসিমুখ তবু!—এমন তামাসা দেখেছি ঢের।
ছাঁৎ ক'রে তবু খুনের আগুন নিবে' গেল যেন নিমেষ তরে—
চোখ-জ্বালা-করা লাল কুয়াসায় ফিকে জাফরান-রংটি ধরে!
বাহবা!—অম্‌নি মেরেছে পাঁজরে দুষমন ওই জোর্‌সে ছুরী।—
ভেঙে গেল সে ত কাঁটার মতন—লাথি খেয়ে নিজে পড়িল ঘুরি'।
ঝুঁটি ধরে' তার মাথাটি নামায়ে লইল মালেক একটি ঘায়ে—
ধড়ফড় করে ধড়টা শুধুই, ঠোকাঠুকি করে দুইটা পায়ে।
সব শেষ। আর একটা মরদ খাড়া নেই, সব ভির্মি গেছে ;
নাও দেখে নাও, জেবে ও থলিতে, ছালার ভিতরে কি সব আছে।
মদের মোশক, চামড়ার শিশি, ডোর-কাটা ওই ঘাগ্‌রিগুলা।—
ওরে আর নয়! আঁধির পাহাড় দেখা যায়—ওই উড়েছে ধূলা।
সব পয়মাল—লোকসান ভাই! দিন যে নিবায় দুপুর-রাতে—
লক্ষ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে আসে কারা ওই চিবুক হাতে!
শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই, জিন-সর্দার পাগলা ও যে,
ওর সাড়া পেয়ে আশ্‌মানে ওই দিনের মালিকও আড়াল খোঁজে!
থাক্ প'ড়ে থাক্ উটের বোঝাই, সারি সারি ওই গোলাব-দানি—
পেয়ালা ভরিতে ঘাগ্‌রি ঘোরাতে বড় মজবুত—খুব সে জানি!
তবু ফেলে চল্—দেখ না দখিনে ডাকাতের দল গর্জে' আসে,
দাপটে তাদের আলোর ফোয়ারা কালো হ'য়ে যায় ধোঁয়ার রাশে—
ছেড়ে দাও ঘোড়া , রাশ ফেলে দাও, ছুটে' যাক্ ওর যেথায় খুশী—
আরে বেল্লিক! কি হবে এখন হাওয়ার উপরে বৃথায় রুষি'!
কথা না বলিতে ছুট দিল দেখ!—জানোয়ার নয়—এরা যে পরী,
বাতাসেরও আগে আগাইয়া যায়, বিপদের পানে পিছন করি'।
গলাটি বাড়ানো—সিধা একরোখা, রক্ত-চক্ষু ঠেলিয়া ওঠে,
চার-পায়ে বাজে একটি আওয়াজ, যেন সে মাটিতে ঠেকে না মোটে!
এইবার এল!—দমকি' দমকি' বালির ধাক্কা ধমক মারে,
একখানি কালো কাফনে ঢাকিল দুনিয়ার মুখ অন্ধকারে।
বাপ, একি জ্বলে! চোখে-মুখে লাগে বালির কণা যে আগুন-দানা!
তারি মাঝে তবু ছোটে দিশাহারা, বাহাদুর দেখ—মানে না মানা।
কোন্ পথে যায় কিছু বুঝি না যে, যায়—শুধু এই সাড়াটি আছে,
আর সবাকার হাল কি যে হ'ল!—কত দূরে তারা রহিল পাছে!
আঁধির জোয়ার থেমে গিয়ে শেষে একাকার হ'ল রাত্রি-দিবা—
আকাশের কানা ছাপায়ে এখন থির হ'য়ে দেখ রয়েছে কিবা!

থেমে যায় কেন হঠাৎ এখানে? দম হারাল কি?—লুটাবে ভুঁয়ে?
ঘাড় বুক এ যে ফেনায় ভ'রেছে! এখনি সটান পড়ে বা শুয়ে!
জিতা রও বেটা!—মেরি জান্ ওহো!—বুক রাখ্ তুই আমার বুকে—
আর কোথা নয়, এক পা'ও নয়!—নহিলে আবার পড়িবি ধুঁকে'।
ঘোর কেটে যায়, আঁধিও ফুরায়—এইবার বুঝি ফর্সা হয়?
সর্-সর্ করে' পাতার উপরে বাতাস যেন না হেথায় বয়?
শুক্‌নো ডালের খড়্ খড়্, আর পাখীর পাখার শব্দ ও যে!
—ওরে শয়তান! সারা ময়দান ছুটেছিলি বটে ইহারি খোঁজে!
ওই দেখা যায় ওশারের সারি, খেজুরের বন ওই যে হোথা—
এ যে দেখি সেই ওগারা-বাগান!—এমন ছায়াটি নেই যে কোথা!
কালো-পশমের বোর্‌কা ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সব্‌জা-হুরী—
নাকে-মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরাণো সে গান হাওয়ার পূরি'।
আয়, দুইজনে মুখ দেই জলে, পান করি ওই পিয়াস-পানি—
ঝর্ণা-ঝরা ও 'দারার-জুলে'র খুব চিনি নীল আয়না খানি।
এইখানে এলে ঘুম্-ঘুম করে—দেহখানা যেন এলিয়ে যায়,
আগেকার কথা সব মনে পড়ে, কে যেন কোথায় লুকিয়ে চায়!
না না, মনে হয়—এখনি ছুটিয়া ফের বুকে কা'রো বসাই ছুরী!
ছায়া-শরবৎ লাগে না যে মিঠা, গন্ধটুকুন্ গিয়েছে চুরি।
সেই মুখ আর সেই চোক, আর চাউনি সে তার ভুল্‌ব না যে—
বাচ্ছার পানে হরিণীর মত ফিরে-ফিরে চাওয়া পথের মাঝে।
এই বনে, ঠিক ওই খানটিতে—জলের কিনারে প্রথম দেখা,
হয়রাণ হ'য়ে কেড়ে নিয়ে শেষে কত দূর ছুটে গেছিনু একা!
বুক ছিঁড়ে ফের কেড়ে নিয়ে গেল দুষমন্—তা'র তালাস করি,
এই ছোরা তার ছাতিতে বসাব,—শান দিই দশ বছর ধরি'!
বুড়া হই—তবু মরিবার আগে একবার যদি ভাগ্যে জুটে,
সারাটা জোয়ান-বয়স আমার ছুরীর মুঠাতে আসিবে ছুটে'।
অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি—আওরাত নিয়ে দিলের খেলা,
বর্শার চেয়ে ভর্সা-হারাণো চোট পেয়েছিনু তাহারি বেলা।
তারি মুখখানি মনে করে' আমি গান বেঁধেছিনু দিওয়ানা হ'য়ে—
তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথাও,— ছুরী-ছোরা? সে ত' গেছেই স'য়ে!
বড় ঘুম পায়, সেই গান গেয়ে ঘুমাই খানিক ঠাণ্ডা ঘাসে—
'দারাত-জুলে'র নামে গাঁথা সেই সুরটি পরাণ ছাইয়া আসে।

—গান—

ঠোঁটের কুঁড়ি সিরিঙ্গা-ফুল, চোখের দু'কোণ রাঙা,
দড়ির মতন মিহিন মাজা, হাসি ডালিম-ভাঙা।
রংটি যে তার খেজুর-মেতি চাইতে চমৎকার—
তাঁবুর-ডেরায়-আগুন-দেওয়া রূপের জলুস্ তার।
চম্‌কে ফিরে চাইলে পরে
রাতের আলো দিনেই ঝরে!
মুখের হাওয়ায় সুবাস হারায় ইরাক্-দেশের গুল্!
চুমার সোয়াদ—হায়রে, সে যে তুহার জলের তুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্-জুল্।

উটপাখী তার ডিম-জোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে?
নাচতে গেলে পলার মালা দুই দিকে যায় ঠুকে'।
কাঁধ বেয়ে সে খেজুর-কাঁদি—মেহেদি-রং চুল—
কোমর-বাঁধন পেরিয়ে যে যায়—পিয়াসে আকুল!
ধ'রলে কাঁকাল মুখ সে ফেরায়,
বাপের চেয়ে ভাইকে ডরায়,
কইতে কথা থম্‌কে' থামে বোল-বলা বুল্-বুল্,
গলার আওয়াজ ঠিক যেন সে তোমারি কুল্-কুল্!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্-জুল্!

গাল দু'খানি টুক্-টুকে হয় যখন শরাব পিয়ে,
বড় নরম নজর যখন আধেক বুঁজে গিয়ে—
জায়েদ্ তখন খেয়াল হারায়, দব্‌দবিয়ে রগ
নেশার আগুন ভেল্কি লাগায়—দিল্ করে ডগ্ মগ।
সবার মাঝে লাফিয়ে পড়ে'
ছিনিয়ে নে' যাই ঘোড়ায় চড়ে'—
পিঠে যখন বর্শা হানে—বুকে জড়াই ফুল!
তুহার পানেও চাইনে ফিরে', এম্‌নি সে হয় ভুল!—
দিল্-দরদী নীল-দরিয়া দারাত-জুল্-জুল্।

* * *

ঘুম ভেঙে যায়, ওকি ও হোথায়?—আঁধারে কে দেয় মশাল জ্বালি'।
রূপালি জলের ঝাপটায় ধুয়ে সাজায় আকাশে তারার ডালি।
রাত হয়ে গেছে, হাওয়ারা আবার থেকে থেকে সব ঘুমিয়ে পড়ে,
ধূ ধূ চারিধার। শাদায়-কালোয় ঢেউ তুলে' যেন বাতাসে নড়ে!

কালি-ঝুল-ভরা খেজুরের ডাল, পিছনে সোনার মদের বাটী—
নীল শামিয়ানা উপরে দুলিছে, নীচে বালি-মোড়া দরাজ পাটী!
পরীদের রাণী ঘুম থেকে উঠে' খোলা পেশোয়াজ পরে না আর—
আশ্‌মান-গাঙে সিধা ঝাঁপ দেয়, দেখ না কেমন হ'তেছে পার!
স্বপনের মত শরাবের নেশা বিলাইছে দেখ আলোর সাকী।
সারা দুনিয়াটা গুল্‌জার করে, বুঁদ হ'য়ে যায় বনের পাখী।
এত আলো, তবু চোখে বেশী লাগে ছায়াটি—কেমন প'ড়েছে ঘাসে!
এত ঘন, আর এত কালো—সে যে দোসরের মত র'য়েছে পাশে।
দূরে মাঝে মাঝে ঢালু বালুচর চক্‌-চক্‌ করে জলের মত—
পিপাসায় ভুলে' ঘুরে' উড়ে যায়, ডানা ঝেড়ে' ওই পাখীরা কত।
এত রাতে আর কাজ নেই মিছে কত দূর সেই তাঁবুতে ফিরে',
ঘোড়া হুঁশিয়ার—কান খাড়া রেখে চরিবে হেথায় আমারে ঘিরে'।

রাতের চেরাগ নিবে' গেলে হ'বে এই ময়দানে আরেক খেলা—
হুতাশী হাওয়ায় সওয়ার হ'য়ে ছুটিবে কাহারা নিশীথ-বেলা!
মরে' গিয়ে তবু গোরের আঁধারে ঘুম নাহি যায়—বেড়ায় রুখে',
দীঘল বর্শা আকাশে হানিয়া রক্ত ছুটায় তারার মুখে।
হুস-হাস্‌ করে' কালো কালো ছায়া পলক ফেলিতে নিরুদ্দেশ—
জীবনে যাহারা বাঁচিতে জানেনি, মরাও তাদের হয়নি শেষ!
সাঁচ্চা জবান, জোয়ানের বাহু, বল্লম আর ঘোড়ার রাশ,
দুষমন-লোহু, দোস্তি-শরাব, আর খুলে-রাখা থলির ফাঁস—
এই সব নিয়ে খোশ্‌নাম যার রটেনি কখনো আপন দলে,
বুজ্‌দেল আর কম্‌জোরী হয়ে লুটিল না কিছু আকাশ-তলে—
হাল দেখ তার—হাওয়ায়-ছায়ায় হায় হায় করে, ঘুম যে নাই।
মরদ্‌ না হয়ে, মুর্দা হয়ে সে সারা ময়দান ঘুরিছে তাই।

মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮

পূর্ণিমা-স্বপ্ন

মন্দ পবন বহিছে হেথায়,
সন্ধ্যা-তপন ওই ডুবে' যায়,
সোনালি মাখা'য়ে মেঘে,
ফুলেরা উঠেছে জেগে।

রজনীগন্ধা-হেনার সুবাস
বিবাহের স্মৃতি—সুখ-অধিবাস
জাগাইছে আজ মনে,
পরশিছে মুখে বাতাসের শ্বাস
বহুবিধ চুম্বনে।

পশ্চিমে ওই বরণ-বিথার—
যেন নহবত-গীতি উৎসার
অস্তাচলের বুকে ;
নয়ন আমার করে তাহা পান
মধুর স্বপন-আসব সমান!
সেই গানে টুটে বকুলের প্রাণ,
সেই সুরে ছোটে আবীরের বান
সন্ধ্যামণির মুখে।
লাল হ'য়ে উঠে গোলাপ-আনন,
ফুটি'-ফুটি' করে শেফালির মন
সোনার বোঁটায় সুখে ;
চলে' গেছি আমি স্বপনের পুরে—
জাগর-জীবন হ'তে বহুদূরে,
জগৎ-সীমার শেষে ;
নীল-ফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে আছি আমি কার মুখপানে—
হ'য়ে গেছি ভোর রূপসুধাপানে,
চেয়ে আছি অনিমেষে।

থির-বিজুরীর জ্যোতির বিভাস!
মানিক ঠিকরে—অনুপম হাস,
কথা নাহি কিছু তা'য়—
নিখিল-মর্ম-নীরব-আভাস
ভাসে আর ডুবে' যায়!
যে কথা বলিতে কথা না জুয়ায়,
মুখর কণ্ঠ মূক হয়ে যায়,
নাহি শ্রবণের অধিকার যা'য়,
নয়ন শুনায়, নয়ন বুঝায়—

সুন্দর সেই বাণী,
—তাহারি আভাস খানি
ও-রূপ মাঝারে যেন চমকায়,
স্বপন ধন্য মানি।

রূপের প্রভায় ঝলসে নয়ন—
সীমা নাই, সীমা নাই।
এক-এক করে' করিয়া চয়ন
দেখাবার নহে তাই।
সে ত' নহে শুধু দেহ-বিভঙ্গ,
কালো-আঁখি আর কেশ-তরঙ্গ,
বিম্ব-অধরে মুকুতা-সঙ্গ,
সে যে সবই রূপ!—সে যে অনঙ্গ—
দিব্য আলোক-বিভা!
শেষ-দিগন্তে পূর্ণ-প্রকাশ দিবা!

স্বপন মিলায়ে যায়,
জাগিতেছি পুনরায় ;
নীলফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে নাই আর রূপসীর পানে,
ধীরে উদিয়াছে ওই যে ওখানে,
আলোকিয়া নীলিমায়—
পূর্ণিমা-চাঁদ! স্বপন মিলায়ে যায়।

ভারতী, চৈত্র ১৩২৬

কল্পনা

কবি যারে কাব্যে লেখে, পোটো যারে পটে!
কল্পনা সে নয় শুধু, জগতেরও বটে!
দুই জনই দেখিয়াছে চোখ দিয়ে তারে—
বিস্ময়ে ব্যাকুল তাই, তাই বারে-বারে
ছন্দ আর রূপ আর সঙ্গীত-কলায়,
কতবার কতরূপে ধরিবারে চায়।

সেই সত্য, সেই রূপ এত সীমাহীন—
জীবনরে উষা হ'তে সন্ধ্যা, সারাদিন,
কত সুরে কত রঙে নারিল ফুটাতে,
কল্পনাও হার মানি' রহিল লুটাতে!
সেই সত্য এতবড়,—ক্ষুদ্র হয়ে গেল
কবির কল্পনা, তূলি শীর্ণ হ'য়ে এল!
কবি সে কাঁদিয়া মরে, শিল্পী উনমনা ;
মোরা বলি' এ'ও বেশী—এ শুধু কল্পনা।

প্রেম ও সতীধর্ম

তোমায় স্মরিলে লাজে মরি যে, পাঞ্চালি!
পঞ্চস্বামী-গর্ব যার সে কি আর সতী!
সবা'পরে সমচিত্ত—সকলেই পতি,
নির্বিকার, সমভাবে—সতীত্বের ডালি!
তাই সে ভারত-কাব্যে পৌরুষ প্রজ্বালি'
উদ্বোধিলে বীরবৃন্দে নায়িকা-মূরতি।
নহ—নারী, প্রেম তোমা করেছে প্রণতি
দূর হ'তে—তুমি তারে তর্জনী সঞ্চালি'
করেছ বিদায়। বীরের সহধর্মিণী
তুমি শুধু—নারী-ধর্ম প্রেম সে কোথায়?
তা' হ'লে পারিতে কভু, হে বরবর্ণিনি,
লভিতে সতীত্ব-খ্যাতি—কুখ্যাতির প্রায়?
কা'রেও বাস নি ভালো, হে পঞ্চরঞ্জিনী,
তোমার সতীত্ব—সে যে কেবলি বৃথায়।

তবু কবি—সত্যদর্শী ঋষি-সুত যিনি,
ব্যাস সে বিশালবুদ্ধি, প্রণমি তাঁহায়—
একটু কলঙ্ক ঢালি' সতীত্ব-প্রভায়
করিলা তোমারে তবে মানস-মোহিনী—
বেদনাকামনাময়ী মানব-গেহিনী।
অর্জুনেরে ভালোবাসা—পাপ-পসরায়
টানিতে চরণ টলে স্বরগ-সীমায়—

সেইটুকু সত্য তব জীবন-কাহিনী।
পার্থ ফিরে' চেয়েছিল বক্ষে তুলিবারে—
মৃত্যুশরাহত সেও, মমতা-দুর্বল।
কৃষ্ণসখা! গীতা-মন্ত্র ভুলি' একেবারে
লভিলে একি এ গতি?—সকলি বিফল!
এ কি চিত্র ধন্য কবি! স্বর্গের দুয়ারে
দেবতা মুছিল অশ্রু!—মানব বিহ্বল।

কর্মফল

কর্মফলে ভিন্ন গতি তোমার আমার—
হবে না মিলন বুঝি জন্মান্তে আবার?
আমারে ত্যজিবে তুমি, উচ্চতর কুলে
লভিবে জনম, প্রিয়া, সব যাবে ভুলে'।
এই যে আমারে চেয়ে অনিমিখ-আঁখি,
ঘুমাইলে পাছে ভোলো—নহ যে একাকী,
তাই নিদ্রা নাহি যাও পারো যতক্ষণ,
নিদ্রিত আমার বক্ষে রাত্রি-জাগরণ!—
সেই তুমি পরজন্মে গৃহ-বাতায়নে—
আমি ক্লান্ত পান্থ এক পড়িব নয়নে ;
সহসা সদয় হয়ে অতিথি-সৎকার
করিবে কি যেন ভেবে—কিবা চমৎকার!
বৃদ্ধ বিধি ভুলে' গেছে প্রেমের নিয়ম ;
কর্ম-বন্ধ? এ যে ঘোর অকর্ম বিষম!

মুক্তি

তোমারে বেসেছি ভালো, সেই ভালোবাসা
কত জন্ম কত যুগ করিব সাধন ;
কত ব্যথা, বিরহের অশ্রু অকারণ—
কত পাপ, কত তাপ, আশা ও নিরাশা!
তিল তিল করি' সেই প্রেম স্বার্থনাশা—

ঘুচাবে সকল দ্বন্দ্ব, টুটিবে বাঁধন ;
ভবজন্ম-কল্পবৃক্ষে শ্রীহরিচন্দন
ফুটিবে, সার্থক করি অমৃত-পিপাসা!
আমি যবে তুমি হ'ব—সাধনার শেষ—
সেইবার হ'ব শুদ্ধ বুদ্ধ-অবতার,
ঘুচিবে প্রেমের তবে পাত্র-কাল-দেশ,
ঘুচিবে বিরহ-মোহ, বৃথা অহঙ্কার।
লভিব নির্বাণ-মুক্তি ভাঙি' দীপাধার—
র'বে আলো, নাহি র'বে অনলের লেশ।

লীলা

তুমি একদিন শুভদ-শারদ প্রাতে
মালতী-শেফালী তুলে' দিলে মোর হাতে—
দু'মুঠি চাপিয়া বুকে
না দেখে হাসিনু সুখে,
—কি আলো চুমিল নিঃনীল-নয়ন-পাতে!

তুমি একদিন ফাগুন-দিনের শেষে
লালে-লাল হোরি খেলিলে আপনি হেসে!
আমি ধরিলাম ডালা,
অশোক-চাঁপার মালা,
হৃদয়ে কি জানি পুষিনু সর্বনেশে!

লুকাইলে সখা, দু'খানি আঁখির আড়ে—
তা' হেরি' আমার হিয়ার আরতি বাড়ে!
পিপাসা-পানীয়-তলে
কি গুঁড়া মিশালে ছলে—
পিয়ে পিয়ে তবু সে ঘোর নেশা কি ছাড়ে!

তুমি একদিন গভীর বরষা-রাতে
টুটাইলে ঘোর, বজ্র-ঝঞ্ঝাবাতে—

বিষ্ণুচক্র সম,
প্রিয়া-দেহ নিরুপম
কাটি' উড়াইলে মৃত্যু-কুঠারাঘাতে।

আজ সখা, তুমি চির-তুহিনের দেশে
বসায়েছ মোরে জরতী-লীলার বেশে!
তুষার-মরুর আলো—
তা'ও যে লাগিছে ভালো।
আঁধারে তবুও 'অরোরা' উঠিছে হেসে!

*　　*　　*

তবু ভাবি সখা, একি এ তোমার রীতি!
ভাবি, কেন হেন চুরি-ছল নিতি-নিতি?
একেবারে যদি বলে' ফেল'—'ভালোবাসি',
আছে তায় হানি? তাই ভেবে আমি হাসি!
এমন পাগল কভু হেরি নাই, ওরে!
এমন চপল হইলে কেমন করে'?
দাঁড়ালে না কেন স্বরূপ-অরূপ-বেশে—
একেবারে মোর প্রাণের দুয়ারে হেসে'?
আবীরে ও ফুলে, নারীর নয়নে ঢুলে',
কত খেলা তুমি খেলিলে ধরম ভুলে'!
লাজে মরে' যাই তোমার চরিত স্মরি'—
লোভে পড়ে' ভালবাসিব তোমারে, হরি?
তুমি করে' দিলে মদের দারুণ নেশা,
তা' লাগি ধরিলে আপনি শুঁড়ির পেশা!
রচিলে পেয়ালা কত না মশলাদার!
তার পর ভেঙে করে' দিলে চুর্‌মার!
তার পর যবে বিষের পিপাসা ঘোর
হুতাশে দহিল এ দেহ জনম ভোর—
তখন গোপনে আঁধারের অভিসারে
বাঁধিলে আমারে তোমার বাহুর হারে।
সঁপিলে অধরে অমৃত-শিশির চুমা,
বুকেতে বাঁধিয়া কহিলে, 'ঘুমা রে ঘুমা'।
তার পর বুঝি জেগে র'বে সারারাত?—
এ-রূপ হেরিতে হবে না নিমেষপাত!
মরি মরি সখা, বলিহারি প্রেম তোর!
তবু হাসি আমি, হে শঠ-কপট-চোর!

ভ্রান্তি-বিলাস

তোমারে বাসিব ভালো, তাই বার-বার
এত ব্যথা-দাগা-দেওয়া— এত লুকাচুরি!
তোমারে যে বাসি ভালো— স্বভাব আমার!—
আপনা-হারানো সে যে ব্যথার মাধুরী!

তুমি স্থির নও কভু!—বার বার ফিরে'
শুনিতে বাসনা—আমি ভালবাসি কি না ;
বিশ্বাস শোধন কর মোর আঁখিনীরে!
তুমি ভালবাস ফিরে'—আমি ত' চাহি না!

হায় সখা! সতী আমি—কোন্ ভ্রমবশে
তুলে দিলে শিরে মোর কলঙ্ক-পসরা?
তাই যুগ-যুগ ধরি' কি মোহ-রভসে
রচিলে মায়ার সৃষ্টি—জন্ম-মৃত্যু-জরা!

আপনার প্রেম তুমি দিলে মোর বুকে,
আপনি হইলে নিঃস্ব ভিক্ষাসুখ লাগি'!
কাঞ্চনবরণী রাধা!—তুমি কালামুখে
দ্বারে তার দাঁড়াইলে প্রেমকণা মাগি'!

সব প্রেম তারে দিয়ে শেষে অবিশ্বাস!
—সে যে তোমা করিয়াছে সর্ব-সমর্পণ!
অগ্নি-পরীক্ষারও পরে তবু বনবাস!—
বারে বারে তাই তার এ-হেন দহন!

সৃষ্টি হ'তে এতকাল এই যে পীড়ন—
এত কালি, এত ধূলা, এত পাপ তাপে,
তবু কি মরেছি আমি? নবীন জীবন
জন্মে জন্মে লভিয়াছি প্রেমের প্রতাপে!

লোকে বলে, লীলা এই! আমি সে মানি না!
তোমার বুকের 'পরে রেখেছি এ মাথা,
চেয়েছি ঘুমন্ত মুখে!— আমি কি জানি না,
তোমার মনের মনে জাগে কোন্ ব্যথা?

তোমার নিঃশ্বাসে শ্বসি' দ্যুলোক-ভূলোক
মর্মরিছে মর্মভেদী করুণ-ক্রন্দন
অশ্রু, আর যবাঙ্কুর-পাণ্ডুর আলোক
ব্যেপে' আছে দিক্ দেশ— অসীম বন্ধন!

আমারে সংহরি' লও আপনার মাঝে,
রেখো না পৃথক করে' বৃন্দাকুঞ্জবনে!
বিরহের ছল করি নটবর-সাজে
ভুঞ্জিতে মিলন-মধু— মজিলে স্বপনে!

একে-দুই কাজ নাই, দু'য়ে-এক ভালো,
—তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে!
নিবে যাক্ রাধিকার নয়নের আলো—
রাধার মরণ হোক তোমার জীবনে!

ঘুচে' যাক্ চিরতরে এ ভ্রান্তি-বিলাস—
মুক্ত হও, পূর্ণ হও, তৃপ্ত হও, স্বামি!
আমি-প্রেম, তুমি-প্রাণ—বারি ও পিয়াস
একপাত্রে রহে যেন,—দ্বন্দ্ব যাক থামি'!

আঁধারের লেখা

আঁধারে আঁখর চিনিতে নারিনু কি লিখিনু নাহি জানি—
আঁখির সমুখে ধরি নাই তারে জ্বালায়ে প্রদীপখানি।
আঁধারের কালি কালির লিখন একাকার করি' দিল,
ধরা পড়িল না—মনের আঁধারে যে কথা লুকায়ে ছিল!

আমার পরাণ গাহে যেই গান, কে দিবে তাহাতে সুর?
যমজ হৃদয় কোথা' পাব খুঁজে'?—সবই যে পৃথক দূর!
আলোকে সবার চোখের উপরে লিখিতে নারিনু তাই,
আঁধারে লুকা'য়ে কি কথা লিখিনু—সরমে মরিয়া যাই!

থাক্, পড়ে' থাক্ এ লিপি-লিখন, কাজ নাই ঠিকানায়!
আলোক জ্বালিয়া কি হবে পড়িয়া আঁধারের রচনায়?
কি কথা লিখিনু—অর্থ তাহার পড়িবে না কভু ধরা,
যাক্ উড়ে' যাক্ পথের পাথরে, বাতাসের মুখে ত্বরা!

*   *   *

যদি কোনোদিন পহুঁছিতে পারে কাহারো সে ফুলবনে,
পুঁথি মুদি' রাখি' আলসে চাহিয়া বসে কেহ বাতায়নে—
ঘরের প্রদীপ বাতাসে নিবেছে, আকাশে আসে নি শশী,
শুধু সে মধুর আঁধার-মদিরা পিয়িছে একেলা বসি'।

নহে সে যোজন—যুগ-যুগান্ত-দূর নিকষের পাতে
অলোক-আলোক আঁখরের পাঁতি ফুটিতেছে কার হাতে!
চেয়ে তারি পানে, অমৃতেরি ধ্যানে অপলক আঁখিদুটি—
প্রাণের পিপাসা-পাবক তাহাতে অচপল রহে ফুটি'!

নিম্নে নিবিড় আঁধারে লুকা'য়ে ফুটিয়াছে যেই ফুল—
দখিণ-সমীরে সৌরভ তার আলোড়িছে প্রাণমূল!
প্রভাতে না-হয়—দুই দিনে যার ঝরিবে কেশর-দল,
সে কেন এমন সোহাগ জানা'য়ে প্রাণ করে চঞ্চল!

ক্রমে ঢুলে' আসে বাতায়ন-পাশে চাহনি-ক্লান্ত আঁখি,
শিশির-স্বিন্ন তপ্ত-ললাটে করতলে দেয় রাখি'।
স্বপনের রসে ডুবিলে অবশে পিপাসা-আতুর হিয়া,
চেতন-গহনে ফুল-মধু সনে দুখ গেল মিলাইয়া!—

টুক্‌টুকে লাল, কেহ বা গোলাপী, কেহ বা শুভ্রদল!—
মদির-রভসে ওই পতঙ্গ জড়াইয়া পদতল
ঢুলিয়া পড়িছে অহিফেন-ফুলে, জোড় করি' দুই পাখা—
কত রং তা'য়—আমারি মনের বাসনার মত আঁকা!

গোলাপের মধু রহিল পড়িয়া—হ'ল না সে পান করা,
শুধু সৌরভ—রূপ তার যে গো সকল পিপাসাহরা!
কামিনী হোথায় ঝরে' যায়-যায়, ঝরাই যে তার শোভা!
মরণের ব্যথা কত সে সুরভি—মরণই যে মনোলোভা!

আকাশের তারা বকুলের মত ঝরিছে তরুর মূলে!
পুঁথির লিখন কণ্টকী-লতা—তা'ও ভরে' গেছে ফুলে!
মধু-সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
আপনারি প্রাণ দুইখান হ'য়ে—হ'ল বর, হ'ল বধূ!

একখানি তার ফুলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
আরখানি তার প্রজাপতি হ'য়ে বুক দিল ফুলটিকে!
পাপ্‌ড়ি কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু কার মুখ।
নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন! শুধু সুধাপান—শুধু সুখ!

* * *

এমনি স্বপন দেখিয়াছে রাতে—প্রভাতে তাহারি পথে
ছেঁড়া-পাতাখানি বাতাসে উলটি' পড়িবে না কোনোমতে?
কৌতুকভরে উৎসুক-আঁখি বুলাইবে হেথা-হোথা—
আঁধারের লিপি এমন আলোকে পড়িবে কি কেহ কোথা?

কামনা

সবুজ বোঁটায় সব দলগুলি দুলাইব থরে থরে,
মধু-পিপাসায় রঙের নেশায় ভুলাইব মধুকরে ;
সার্থক হবে ক্ষণ-সৌরভ অসীম অর্থভরা,
মনোবীজরাশি ছড়াইব আমি নব-নবীনের তরে।

মাটীর পৃথ্বী বিদারণ করি' শত মুখে শত রস
স্নায়ুতে-শোণিতে শুষিয়া লইব, হোক তায় অপযশ!
হৃদয়ে আমার যত সাধ আছে ফুটাইব শতদলে,
জীবন-সায়রে ফুটিয়া উঠিব অপরূপ তামরস!

আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীম রাতি.
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি!
ধরার কুসুম বার বার হাসে, বার বার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী।

সংযোজন
১৯৪২

এখনো হয়নি সাঙ্গ শ্যামলের আলিপনা এপারের শুভ্র সিকতায়,
বেদনার সিন্ধু হ'তে জল সেচি' এখনো যে ফুল-ফল রচিতেছি তায়!
মোদের কুটিরতলে শতভগ্ন-রন্ধ্রপথে সঙ্কুচিত রবি-শশিকর
বিথারি' আলোর যাদু, মলিন মাটির রূপ আরো যে গো করে মনোহর!
এখনো তোমার চোখে, প্রথম সে ফুলশেজ-বাসরের অপরূপ নিশা
চমকিয়া ওঠে কভু, এ হৃদয়ে আজো তাই রহিয়াছে অমৃতের তৃষা।
সজন এ বেলাভূমি সেদিনের মত নহে, তবু সেথা এখনো দু'জন
সকল কল্লোল মাঝে নীরব-নিকুঞ্জ গড়ি' করিতেছে নিভৃত কূজন!
জন্ম-মৃত্যু-জরা বহি' চলিয়াছি যে আঁধারে তার যদি নাহি থাকে শেষ,
সেই ভয়ে সারারাতি প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে চেয়ে থাকি মুখে নির্নিমেষ!
আজ সে পূর্ণিমা নাই, নাই সেই ফাল্গুনের ফাগে-রাঙা অসীম ভুবন,
বিভোর যাহার রূপে ভরেছিনু একদিন পসরায় রঙীন স্বপন ;
তবু সে নিশার শেষে তোমার নয়নে হেরি স্বপনের সেই ঘুমঘোর,—
এখনো জাগোনি যদি, ওগো আর জাগিয়ো না—একেবারে হোক নিশিভোর।
আমিও তাহারি মোহে সেদিনের সেই ফুল আরবার তুলে দিনু হাতে,
মনে ভাবো— সেই আমি, সেই তুমি, সেই গান শুনিতেছ সেই মধুরাতে!

নীলক্ষেত, রমনা,
২৬এ ফাল্গুন, ১৩৪৮

কবি-ভাগ্য

আমার স্বপন যাহা—ওরা তা সফল করে,
আমার কাহিনী যাহা, ইতিহাসে তাই গড়ে।
আমার বাঁশীর সুরে অতি দূর দুরান্তরে
পুরী মহাপুরী কত উঠে পড়ে থরে থরে!
বিকাশে জীবন কত মরণের মহিমায়—
আমারই জীবন নাই, আমারই মরণ নাই!
গান মোর শোনে সবে, মুখ পানে নাহি চায় ;
জানিতে চাহে না কেহ—কেন গায়, কেবা গায়।
আমি প্রদীপের আলো, নাহি মোর কায়া-ছায়া—
সে আলোকে ফেলে ছায়া জগতের যত কায়া!
নয়নের আলো আমি, আমারই নয়ন নাহি,
আমা দিয়ে দেখে সবে, আমি কোন্ দিকে চাহি?
গান আর নাম মোর এক হয়ে যায় শেষে—
আমি যত ডুবে যাই গান তত উঠে ভেসে।

সাগর ও বাঁশী

নীরব গভীর নিশীথ-রজনী—নির্জন বেলাভূমে
ধূ ধূ চারিধার, বারিধি অপার বালুর কিনারা চুমে।
জ্যোৎস্না-তুফানে তারকা লুকায় অচপল জাগে শশী,—
অসীম আকাশে তারি মুখে চেয়ে সাগর উঠিছে শ্বসি'।

বুঝিতে নারিনু, বিরাট বাসর সাগর-শশীর একি!
এ কি রহস্য অতল অপার—এ কোন্ স্বপন দেখি!
চন্দ্র-বদনে মৌন-মাধুরী, সিন্ধুর অধীরতা—
এত কলরবে তবুও প্রকাশ হয় না সে কোন্ কথা!

মনে পড়ে শুধু একখানি মুখ—বহু বহুদিন আগে
চেয়েছিল বটে এমনি করিয়া যামিনীর শেষ ভাগে ;
মুহূর্ত লাগি' পড়েছিল ধরা সাগর-শশীর ব্যথা,
চকিতে ফিরায়ে লয়েছিনু আঁখি, কহি নাই কোন কথা।

একখানি চিত্র দেখিয়া

নয়নের মণি-মুকুরে ফলিত নিখিলের রূপ-রেখা—
বিশ্ব-কবির কাব্যখানি যে ছায়া-আলোকেই লেখা ;
রস—সে যে রূপে পড়িয়াছে ধরা, কোথা' নহে নিরাকার,
অরূপ-রূপের উপাসনা—সে যে অন্ধের অনাচার!

যে-রূপ নিত্য নেহারিছে কবি—বাণীর পূজারী যারা,
স্বরূপ তাহার করিতে প্রকাশ হয়ে যায় দিশাহারা ;
প্রেক্ষণ তার উৎপ্রেক্ষায়! রূপ-কে রূপকে বাঁধি'
উপমায় গাঁথে নিরুপমা ফুল, বাণীপূজা-পরসাদী!

শ্রবণে করিতে নয়ন-সহায়, ধ্বনিরে বর্ণ-যোনি
কত না করিল শব্দ-চাতুরী কবিকুলশিরোমণি!
প্রকাশের ব্যথা চির-নবীনতা বিতরিল মহাগীতে—
ভাষায় যত সে অভাব ততই গভীরতা ইঙ্গিতে!

কিছু কথা নাই, হে কবি, তোমার তূলিকারই আজি জয়!
এ যে সুখসম হৃদয়ঙ্গম—কাব্য ইহারে কয়।
এ কোন্ আসব?—আঁখির চষকে এক চুমুকেই ভোর!
তার পরে যত করিতেছি পান, মিটে না পিপাসা ঘোর।

নিমেষে যেমন পূর্ব-গগনে পূর্ণিমা-সমুদয়,
শ্রেষ্ঠ চেতনা তড়িৎ-চকিত প্রাণ যথা পরশয়,
জনম-অন্ধ নয়ন মেলিলে হেরে সে যেমন করি'—
তেমনই বিভোর করিল তোমার অপরূপ কারিগরি!

অজানা পথের পথিক যেমতি—অন্তর-দেশবাসী—
চলিতে চলিতে সহসা দাঁড়ায় সাগর-বেলায় আসি',
মুহূর্ত আগে জানে না সমুখে রয়েছে কি বিস্ময়—
পটের মাঝারে লভিনু তেমনই অপূর্ব পরিচয়!

বিদায়-বাদল

সারা পথ মোরা কহিনি একটি কথা ;
সাঁজের আকাশে ছিল না ক' তারা,
বাদলের হাওয়া যেন পথহারা,—
ভিজা-চুল সম চোখে মুখে লাগে
তাহারি সে সজলতা!
সারাপথ মোরা কহিনি একটি কথা!

আঁধারে আলোকে পথ চেনা গেল তবু ;
ঘুরে' গেনু কত নদীতট ধরি',
জলভারে সে যে উঠিছে গুমরি'—
বুক ফুলে ওঠে, তবু করিল না
কলমর্ম্মর কভু!
ভাঙনের ধার, পথ চেনা গেল তবু।

ফোঁটা ফোঁটা জল— তেমনি খোঁপার ফুল
পথের কাদায় পড়িল ঝরিয়া ;
পাছে পায়ে ঠ্যাকে গেলাম সরিয়া,
ফিরিয়া চাহিতে হ'ল না সাহস
যদি হ'য়ে যায় ভুল!
কুড়ায়ে রাখিনি তার সে খোঁপার ফুল।

একবার শুধু থমকি দাঁড়ানু দোঁহে ;
অধরের কোণে মৃদু হাসি-রেখা—
আকাশেও দেখি ক্ষীণ শশিলেখা!
জানি না কেন যে সহসা এমন
ক্ষণিক স্বপন-মোহে
মুখোমুখি করি' থমকি' দাঁড়ানু দোঁহে।

কোমল তৃণ সে বাজিল কাঁটার মত!
আবার নামিল নয়নে আঁধার,
বিজুলী ধাঁধিল এধার-ওধার!—
মরম বিঁধিল শাণিত ফলকে,
শোণিতে ভরিল ক্ষত,
আঁখির চাহনি বাজিল বাজের মত!

ভোরের বেলায় বাদল নামিল যবে,
আঁখির ঝরণা দেখিল না কেহ—
ধারা বরিষণে তিতিল যে দেহ,
শেষ-ক্রন্দন-ধ্বনিও তখন
ডুবিল মেঘের রবে,
দুই পথে দোঁহে ছাড়াছাড়ি হ'নু যবে।

পরাজয়

এত যে দুঃখ দিলে তুমি মোরে—
করিনি তোমার নাম,
উল্কার মত জ্বলিল অক্ষি, তবু নাহি কাঁদিলাম!
কে চিনে তোমারে? কিসের করুণা?— বলি নাই, 'দয়া কর',
তব রোষ-ভয়ে করি নাই কভু নাম-জপ অবিরাম।

দুঃখের দিনে কে চাহে তোমারে?
আমি তোমা' চাহি নাই ;—
ব্যর্থ আশার গভীর আঁধারে সান্ত্বনা নাহি পাই।
হারায়েছি যাহা সে কি ফিরে'-দেওয়া তুমিও পারিতে কভু?
কিসের যাচনা? কাচের বদলে কাঞ্চন?— নাহি চাই!

আঁধারের প'রে আঁধার নেমেছে,
অতল গহ্বরতলে
নামিয়াছি আমি, ক্ষীণ জানু মোর যতদূর টেনে চলে!
পদযোড়ে শেষে গড়ায়েছি, তবু করি নাই করযোড়,—
ভ্রূকুটি তোমার করে নাই বশ— লোকে 'নাস্তিক' বলে!

তাই ভাবি, একি! আজ একি হ'ল—
নিমেষে করিলে জয়।
একটু হরষ-পরশ মাত্রে রোমাঞ্চ সমুদয়!
ব্যথা-বেদনায় করি নাই সাথী, মানি নাই প্রয়োজন—
সুখ সঁপিবারে আজি এ পরাণ তোমারি শরণ লয়।

জন্মান্তরে

আবার ত' দেখা হ'ল! ওগো, এতদিন
কোথা একা সহিয়াছ অদৃষ্ট-লাঞ্ছনা?
বারে বারে খরস্রোতা মৃত্যুতটিনীর
পারাপার করিতে কি টলে না চরণ!
কেবা দেখাইল পথ?—কোথা পেলে আলো?
মৃত্যু পারিল না চোখে ধূলামুঠি দিতে!

এস, কাছে এস ; কি দেখিছ, স্মেরাননা!
আঁখিকোণে অশ্রু আর কটাক্ষ-কৌতুক?
আমি কি চিনিতে পারি? আমি উল্কাসম—
আপনার অগ্নিবেগে ছুটে যাই সদা
গ্রহ-গ্রহান্তরে ; শুধু ওই হাসিখানি—
মনোহর মমতার ওই উষালোক
জুড়ায় প্রাণের দাহ ; জন্ম-জন্মান্তর
জাগে মনে—আপনারে আপনি যে চিনি ;
সেই মুখ, সেই হাসি!— আমি চিনিব না!

কবে-শেষ হয়েছিল দেখা? মনে আছে—
চির-বিরহের মূঢ়-আশঙ্কায় যবে
মুকুলিত আঁখি দুটি করিনু চুম্বন,
শুষ্ক মৃণালের মত দুই বাহু দিয়ে
জড়াইলে মহাভয়ে, অন্তিম কাকুতি
পাণ্ডুর অধর ভরি' উঠেছিল কেঁপে—
নীরব চাহনি, আর আঁখিকোণে সেই
দুই-বিন্দু বারি! তোমার দিবস-শেষে
তুমি গেলে চলি', বিলম্বিল মোর দিবা।
তার পর একদিন আমারো নয়নে
নামিল আঁধার ঘোর, হিম হ'ল তনু—
পড়িনু ঘুমায়ে। এ নিশান্তে আজি পুনঃ
উদিয়াছে পূর্বাকাশে সেই শুকতারা!

কহ সখি! গত জনমের যত কথা—
হয় কি স্মরণ? যদি মনে নাহি পড়ে,
বস' হেথা অলিন্দের 'পরে, চেয়ে দেখ

ওই দূর দিগন্ত-সীমায়। শুনিছ না
ঝিল্লীর ঝঙ্কার? অদূর নদীর স্রোতে
মৃদু কলগীতি?—আরো কত অভিজ্ঞান!
এইবার চাও দেখি নয়নে-নয়নে—
আকুলি' উঠে না বক্ষ? আঁখির উপরে
কাঁপিছে না কবেকার ছবি একখানি?
দেখ চেয়ে, কি সুন্দর শারদী যামিনী!
কাননের তরুশাখাগুলি মর্মরিছে
আধ'-অন্ধকারে ; দ্রৌপদীর শাড়ী যেন—
উর্ধ্বে হের, অফুরন্ত আলোক-নীলিমা!
প্রান্তরের প্রান্ত হ'তে— কান পাতি' শোন—
ভেসে আসে কিবা এক মৃদুল গুঞ্জন!
মনে হয়, পরলোক-বেলাভূমি' পরে
দোলে উর্মি— স্বপ্নাতুর, সঙ্গীত-মন্থর।
এখনি জাগিছে তাই অন্তর-অন্তরে—
শ্যামল বিটপীশাখে বিহঙ্গের মত
মোরা দুটি প্রাণী ; একটু আলোক-স্নান
নীলাকাশ তলে, দুটি গান গাওয়া শুধু
একটি প্রভাত ধরি'— তার বেশি নয়!
তারি মাঝে গাই মোরা অমৃতের গান—
শিয়রে মৃত্যুর ছায়া, চক্ষে ভাসে তবু
নন্দনের চিরন্তন আনন্দ-স্বপন!
একদিন কবে কোন্ শিশির-সন্ধ্যায়
আবার যে ঘুমাইব শেষ গান গাহি'—
জানি, মৃত্যু তারি নাম। মনে আছে তবু,
পান-শেষে চূর্ণ হয় শুধু পাত্রখানি ;
প্রেম যে আত্মার আয়ু!— ক্ষয় নাহি তার ;
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ-বর!
মৃত্যু আসি' আর বার কহিবে যখন—
সন্ধ্যা হ'য়ে আসিতেছে এপারের কূলে,
কে আসিবে মোর নায়ে, এস ত্বরা করি',—
নিয়ে যাব শীত হ'তে বসন্তের দেশে।
তখন বাহুতে বাঁধি' ওই বাহু তব
নিঃশঙ্কে দাঁড়াব আসি' বৈতরণী-কূলে,
পড়িবে দু'খানি ছায়া নদী-সিকতায়
ম্লান চন্দ্রালোকে ; শীতে মৃদু শিহরিয়া

ঢাকিব দোঁহারে দোঁহে— গ্রন্থি বাঁধি' দিব
চঞ্চল অঞ্চল আর উত্তরীয়-বাসে।
এপারের যত জ্যোৎস্না, যত রবিকর—
নিশিশেষে শয্যাতলে পুষ্পমালা সম
পড়িয়া রহিবে হেথা, সাথে যাবে শুধু
একখানি স্মৃতি-মেঘ প্রেমধনু-আঁকা!
তারি ছায়া নিরখিবে তুমি নদীজলে,
হেলিয়া তরণী হ'তে, ওগো স্মৃতিময়ী!
ঘুমায়ে পড়িব আমি, তুমি জেগে র'বে—
স্থিরদীপ্ত ধ্রুবতারা! পার হ'তে পারে ;
তার পর কি আলোকে কোথা জাগরণ!

ভারতী, ফাল্গুন ১৩২৯

কেতকী

সাপের ডেরায় কাঁটার পাহারা— মঞ্জুল বঞ্জুলে
ঢাকা যার তট— সেই তটিনীর কর্দমময় কূলে
তোমারে কেতকী দেখেছিনু আমি— অনেক দিনের কথা,
আজও যেন তাই বুঝিতে পারি সে তোমার মর্মব্যথা।

প্রাবৃট-আঁধারে বিদ্যুৎ যবে বিদারিয়া নভ-তল
ঘোর গর্জনে শিহরিয়া তোলে নিম্নে জলস্থল—
তুমি বন্দিনী রবি-বিরহিণী তাপসিনী ফুলবালা
সবুজ বাকলে ঢাকি, তনুখানি পর' যে কাঁটার মালা!

ফণী-ফণিনীরা ফুঁসিয়া উঠিছে সৌরভ-সংবাদে,
তাই সে তরুণী সারা তনুখানি নিবিড় নিচোলে বাঁধে ;
গরল-শ্বাসে মেলিতে পারে না আপন দীর্ঘ-দল—
গোরোচনা-গোরী পাণ্ডুর হ'ল—যৌবন নিষ্ফল!

* * *

আর্দ্রশীতল শ্রাবণ-সন্ধ্যা, চলিয়াছি গলি-পথে—
সহসা নাসায় সুরভি-নিশাস লাগে কেন হেন মতে!
শুনিনু অদূরে হাঁকে ফিরিওলা— 'চাই কেয়াফুল, চাই!'
মাথার ঝুড়িতে ফলের মতন ফুল সে পেয়েছে ঠাঁই।

বাদল-তিমিরে বেদনার মত গন্ধের আবেদন
সারা প্রাণ-মন নিমেষে হরিল, হয়ে গেনু অচেতন।
তবু বুকে করি' নিয়ে গেনু ফুল— পাইনু কি সন্ধান?
জনমে জনমে খুঁজে ফিরি' যারে এ তারি অভিজ্ঞান?

তাই বটে, এ যে তাহারি লিখন—সবুজ-মলাটে-মোড়া
পুঁথি একখানি, এ যেন শুভ্র সুরভি শ্লোকের তোড়া।
কেশরে-পরাগে পড়িনু সে বাণী—চুম্বনে আঘ্রাণে,
প্রাণের রাগিণী বাজিতে লাগিল বাদল-রাতের গানে।

আঁধারে আঁখর চিনিতে নারিনু, কি লিখিনু নাহি জানি—
আঁখির সমুখে ধরি নাই তারে জ্বালায়ে প্রদীপখানি!
আঁধারের কালি কালির লিখন একাকার করি' দিল,
ধরা পড়িল না—মনের আঁধারে যে কথা লুকায়ে ছিল!

আমার পরাণ গাহে যেই গান, কে দিবে তাহাতে সুর?
যমজ হৃদয় কোথা' পাব খুঁজে'?—সবই যে পৃথক দূর!
আলোকে সবার চোখের উপরে লিখিতে নারিনু তাই,
আঁধারে লুকায়ে কি কথা লিখিনু—সরমে মরিয়া যাই!

থাক্ পড়ে' থাক্, এ লিপি-লিখন, কাজ নাই ঠিকানায় ;
আলোক জ্বালিয়া কি হবে পড়িয়া আঁধারের রচনায়?
কি কথা লিখিনু—অর্থ তাহার পড়িবে না কভু ধরা,
যাক্ উড়ে' যাক্ পথের পাথরে, বাতাসের মুখে ত্বরা!

*　　　*　　　*

যদি কোনদিন পহুঁছিতে পারে কাহারো সে ফুলবনে,
পুঁথি মুদি' রাখি' আলসে চাহিয়া বসে কেহ বাতায়নে—
ঘরের প্রদীপ বাতাসে নিবেছে, আকাশে আসে নি শশী,
শুধু সে মধুর আঁধার-মদিরা পিয়িছে একেলা বসি ;

নহে সে যোজন—যুগ-যুগান্ত—দূর নিকষের পাতে
অলোক-আলোক-আঁখরের পাঁতি ফুটিতেছে কার হাতে!
চেয়ে তারি পানে, অমৃতের ধ্যানে অপলক আঁখিদুটি—
প্রাণের পিপাসা-পাবক তাহাতে অচপল রহে ফুটি'!

নিম্নে নিবিড় আঁধারে লুকায়ে ফুটিয়াছে যেই ফুল—
দখিন-সমীরে সৌরভ তার আলোড়িছে প্রাণমূল।
প্রভাতে— না হয়, দুই দিনে— যার ঝরিবে কেশর-দল,
সে কেন এমন সোহাগ জানায়ে প্রাণ করে চঞ্চল!

ক্রমে ঢুলে' আসে বাতায়নপাশে চাহনি-ক্লান্ত আঁখি
শিশির-স্বিন্ন তপ্ত-ললাট করতলে দেয় রাখি'।
স্বপনের রসে ডুবিল অবশে পিপাসা-আতুর হিয়া,
চেতন-গহনে ফুল-মধু সনে দুখ গেল মিলাইয়া!

টুকটুকে লাল, কেহ বা গোলাপী, কেহ বা শুভ্রদল—
মদির-রভসে ওই পতঙ্গ জড়াইয়া পদতল
ঢুলিয়া পড়িছে অহিফেন-ফুলে, জোড় করি' দুই পাখা—
কত রং তা'য়—আমারি মনের বাসনার মত আঁকা!

গোলাপের মধু রহিল পড়িয়া—হ'ল না সে পান করা,
শুধু সৌরভ, রূপ তার যে গো সকল পিপাসাহরা!
কামিনী হোথায় ঝরে' যায়-যায়, ঝরাই যে তার শোভা।
মরণের ব্যথা কত সে সুরভি—মরণই যে মনোলোভা!

আকাশের তারা বকুলের মত ঝরিছে তরুর মূলে,
পুঁথির লিখন কণ্টকী-লতা—তা'ও ভরে' গেছে ফুলে!
মধু-সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
আপনারি প্রাণ দুইখান হ'য়ে হ'ল বর, হ'ল বধু!

একখানি তার ফুলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
আর একখানি প্রজাপতি হ'য়ে বুক দিল ফুলটিকে!
পাপ্‌ড়ি, কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু—কার মুখ!
নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন! সুধাপান—শুধু সুখ!

* * *

এমনি স্বপন দেখিয়াছে রাতে—প্রভাতে তাহারি পথে
ছেঁড়া-পাতাখানি বাতাসে উলটি' পড়িবে না কোনমতে?
কৌতুকভরে উৎসুক-আঁখি বুলাইবে হেথা-হোথা—
আঁধারের লিপি এমন আলোকে পড়িবে কি কেহ কোথা?

বিস্মরণী

১৯২৭
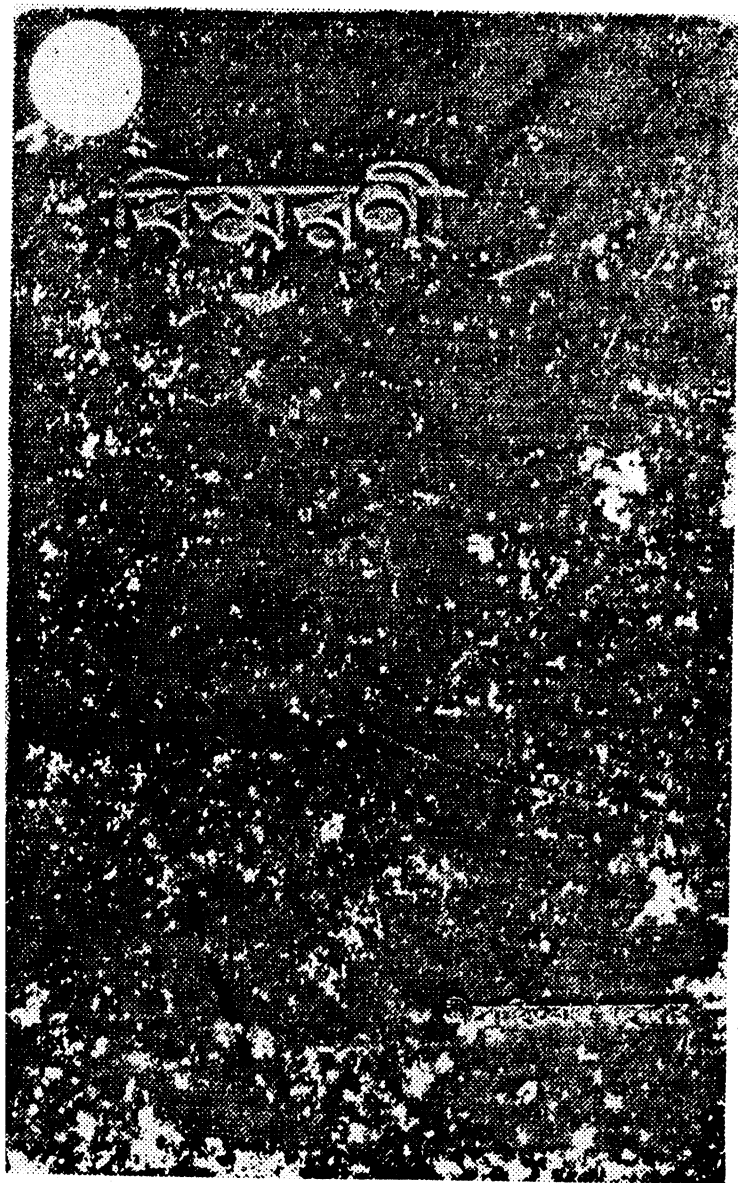
'বিস্মরণী' প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

বিস্মরণী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রণীত

প্রবাসী কার্যালয়, কলিকাতা

৯১ আপার সার্কুলার রোড

[illegible]

'বিস্মরণী' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

'বিস্মরণী' প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র
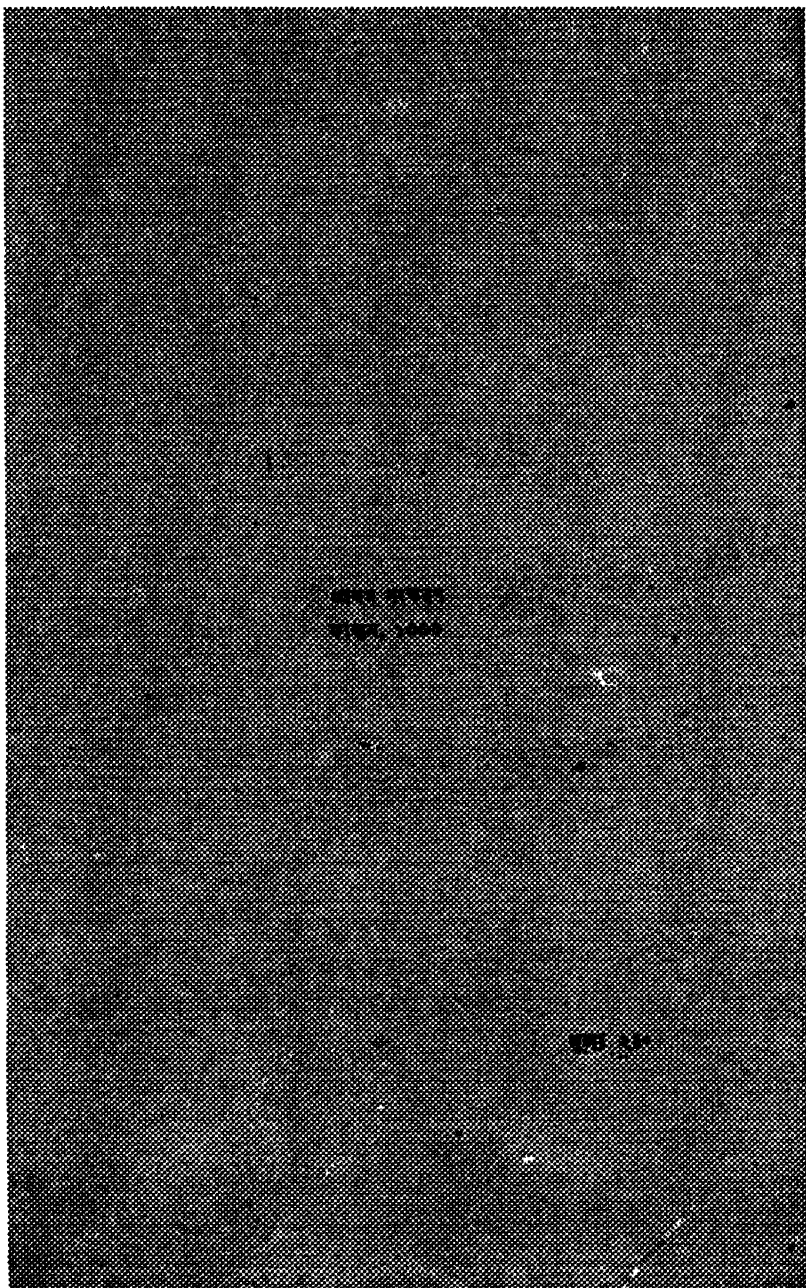
পাঁচ বৎসর পূর্বে আমার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয়, এবার 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হইল। কবি-ভাগ্য চিরদিনই মন্দ, কিন্তু এই প্রকাশ-কার্যে আমি দুইবারই যে সাহায্য পাইলাম তাহা আশার অতীত। সেবার ভূতপূর্ব 'ভারতী'-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ; এবার 'প্রবাসী'র শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদার হৃদয় ও আন্তরিক সাহিত্য-প্রীতির জন্যই কবিতাগুলিকে এমন করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিলাম। এ ঋণ পরিশোধ করিবার নয় ; যদি কবিতাগুলি প্রকাশযোগ্য হইয়া থাকে, তাবেই ঋণী ও ঋণদাতা উভয়েরই কতকটা সান্ত্বনার কারণ হইবে।

বইখানির মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের জন্য আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নিকট আমি অনেক সুপরামর্শ পাইয়াছি। তরুণ বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীমান সজনীকান্ত দাস ও কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রেস-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

'বিস্মরণী'র তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা যে সত্য নহে, ইহার প্রমাণ পাইয়া আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি। শ্রীমান্ সুরেশ আমার কাব্যগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া, এবং তাহাদের বহিরঙ্গের যথাসাধ্য প্রসাধন করিয়া, এই যে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার জন্যই তিনিই কাব্যামোদী পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদভাজন। বহুকাল পরে গত বৎসর 'বিস্মরণী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, এবং অল্পকালেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। আমার কবিতার যে এরূপ বাজার-মূল্য আছে, তাহা আমি জানিতাম না—প্রকাশকই তাহা প্রমাণ করিলেন। কবিই বৃদ্ধ ও পুরাতন হয়,—কবিতা হয় না—ইহা সত্য ; তথাপি আজিকার শর্টকার্ট,-পরিধানা নবীনা কাব্যবধূদের আসরে, আমার এই 'শ্রোণীভারাদলসগমনা', অতিদীর্ঘ-চেলাঞ্চলা ও সালঙ্কারা, পৌরাণিক কবিতা-সুন্দরীকে কেহ যে অনুরাগের চক্ষে দেখিবে, এমন আশা করি নাই। এখন বুঝিতেছি ভুল আমারই। কতক আমার নিজেরই কর্মবুদ্ধির অভাবে, কতক বা প্রকাশ-কার্যের দোষে আমার অন্যান্য কাব্যগুলি দপ্তরী-নামক 'ফর্মা'-রক্ষীর শুদ্ধান্তঃপুরে অসূর্যম্পশ্যা হইয়া আছে ; একখানির অবস্থা এমনই যে উপযুক্ত প্রচ্ছাদনের অভাবে তিনি পৌঁছিয়াও ক্রেতার মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন না ; অধিকন্তু তাহার সেই মূর্তিরও মূল্যবৃদ্ধি করা হইয়াছে! একে কবিতা, তাহার উপর সে-কবিতা, এমন পৌরাণিক,—তাহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া যদি কোন শুভানুধ্যায়ী প্রকাশক—বিজ্ঞাপন দেওয়া ত দূরের কথা—তাহাকে এমন হতশ্রী করিয়া রাখেন, তাহা হইলে ঐ বইখানির সম্বন্ধে তাঁহার এই মহাজনোচিত বৈরাগ্য অতিশয় আধ্যাত্মিক হইলেও, বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকার নিকটে গ্রন্থাকারই দায়ী। 'বিস্মরণী'র দ্বিতীয় সংস্করণের আদর দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, বাঙালীর কাব্যরসপ্রীতির বরং আধিক্য দোষ আছে, বিপরীতটি সত্য নহে।

গতবার (দ্বিতীয় সংস্করণে) নানা কারণে কবিতাগুলির মুদ্রণ-সৌষ্ঠব আশানুরূপ হয় নাই, এবার, যতদূর সম্ভব সেই ত্রুটি সংশোধন করা গিয়াছে। প্রকাশকের নির্বন্ধাতিশয্যে কবির একখানি চিত্রও তাহার ললাটে যুক্ত হইয়াছে ; শুধু তাহাই নয়, প্রত্যেক বহিখানি কবির 'স্বাক্ষর-নামাঙ্কিত' করা হইয়াছে। এইরূপ একটা ফ্যাশন আছে, জানি—আমি কোন ফ্যাশনের পক্ষপাতী নই। কিন্তু যেহেতু গ্রন্থকার অপেক্ষা প্রকাশকই পাঠক-পাঠিকার রুচির সংবাদ অধিক রাখেন, অতএব প্রকাশকের হুকুম মানিতেই হইল—এতদিন পরে এই বয়সে বে-আব্রু হইলাম।

বাগনান্ (হাবড়া) বি. এন. আর.
আষাঢ়, ১৩৫৩

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিবরেষু

একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর-পর,
মেলে নি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে'—
শাল্মলীর রক্ত-ভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে,
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব-কেশর!
নরত্ব দুর্লভ জানি সুদুর্লভ কবি কলেবর
সত্য সে কি? মনে হয়, এই মরু-সৈকত-সমীরে,
পাই যদি প্রীতি-মুক্তা অবগাহি' লবণাম্বু-নীরে,
বাণীর উদাস-দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।

চলেছিনু ক্লান্তপদে সুন্দরের তীর্থ-অভিলাষে,
সমুখে পড়িল ছায়া,—বনপথে এ কোন্ পথিক
গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান!
জিজ্ঞাসিনু, কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্যের অধিক!
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান।

মাঠের বাড়ী, কাঁচড়াপাড়া
শ্রীপঞ্চমী, ২৩শে মাঘ,
১৩৩৩

মানস-লক্ষ্মী

আমার মনের গহন বনে
পা' টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী
নারী-অপ্সরী সঙ্গোপনে!
ফুলেরি ছায়ায় বসে তার দুই চরণ মেলি',
বিজন নিভৃতে মাথা হ'তে দেয় ঘোম্‌টা ফেলি',
শুধু একবার হেসে চায় কভু
নয়ন-কোণে,
আমারি মনের গহন বনে!

সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা,
অস্ত-চাঁদের পাণ্ডু কিরণ
দেখায় দিশা।
নিঃশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে,
কত ফুল-কলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে,
ভুলে'-যাওয়া কোন ব্যথার সলিলে
মিটায় তৃষা,
সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা!

কত বিরহের বেদনা-তিমির
ঘনায় চুলে,
কত মিলনের রাঙা-উৎসব
অধর-কূলে!
তবু তার সেই আঁখি-পল্লব শিশির-হারা,
উদাস গভীর চাহনিতে ভরা নয়ন-তারা!
কবে যে কেঁদেছে, হেসেছে কখন,—
গিয়েছে ভুলে',
কত যামিনীর জমাট আঁধার
জড়ায় চুলে।

ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী?—
কত জনমের—কত মরণের
দিবস-রাতি!
কতবার তার ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে,
কভু সে আমারি চিতায় বসেছে চরণতলে,—
অজানা-আঁধারে যতনে জ্বালায়ে
বাসর-বাতি!
ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী?

আর কি কখনো এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা?
হৃদয়-সায়রে হ'য়ে গেছে তার
কলস-ভরা?
এ আলোকে যবে না হেরি' তাহারে, পরাণ কাঁদে—
মনো-বাতায়নে গোধূলি-বেলার বেণী সে বাঁধে!
গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা,
বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩০

ব্যথার আরতি

যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা!
এই অবনীর বেদনা-নিবিড় সবুজ অন্ধকারে
পথ ভুলি বারে-বারে,
কণ্টকে ফোটে রক্ত-কুসুম বাসনা-সুরভি-ঢালা!
যত দিন যায়, আঁখি না জুড়ায়—অশ্রুর পারাবার
পূর্ণ-প্রাণের পূর্ণিমা-রাতে উথলিছে অনিবার
ওই গগনের নিশীথ-নীরব নীলিমার কূলে-কূলে
দীপ উঠে দুলে' দুলে'—
তারি পানে চেয়ে সোনা মনে হয় মৃন্ময় সংসার!

যত সে কাঁদায় তত বুকে বাঁধি, তত তারে ভালবাসি—
ধরণীর এই শ্যাম মুখখানি, আঁধার অলকরাশি।
ভয়ের স্বপন এত দেখি, তবু চাহি না ত' নিশি-ভোর,
ভাঙে না যে ঘুম-ঘোর!
ঢুলে' পড়ি যবে বিষ-হাসি হাসে রূপসী সর্বনাশী!

জীবনের নিশা জ্যোৎস্নায় ভরে মৃত্যুর ম্লান রাতে—
মরম-মুরজ মূরছিয়া বাজে নির্মম করাঘাতে!
হারাই যাহারে তারি তরে হিয়া আরো করে হায়-হায়—
স্মৃতি-সুখ উথলায়!
মরণের ডালা সাজাইয়া ধরি অমরণ ফুলপাতে!

হাহা করে হাওয়া, দীপ নিবে যায়, সাথীহীন অমারাতি,
বাহিরে বিজনে হাস্নুহানায় জ্বলিছে জোনাকি-পাঁতি!
সে মহাশূন্য ভরি' ওঠে মোর নিরাশার উল্লাসে,
—কেঁদে উঠি কলহাসে!
আঁধার নয়নে চমকিয়া ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি!

যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা!
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা!
আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই!
সুখ-দুখ ভুলে যাই!—
বুঝিয়াছি কেন কুলে কালি দেয় তোমা' লাগি' কুলবালা।

স্পর্শ-রসিক

আমারে করেছে অন্ধ গন্ধ-ধূমে দেহ-ধূপাধার,
মাদক সৌরভে তার চেতনা হারায়!
বিষ-রস পান করি' স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার,
—চির-বন্দী আছি তাই স্বপন-কারায়!
অন্ধ আমি, দেহ তাই স্পর্শে হাহা করে,
ধরার ধূলায় তাই ফুল-রেণু ঝরে!
আলো—সে যে উষ্ণ শুধু, জানি কত শীতল আঁধার-
সর্ব-অঙ্গ স্নান করে চুম্বন-ধারায়!

অন্ধ আমি, দিশে দিশে গন্ধ তাই করে দিশাহারা,
চিরদিন মধু করে মধুর বঞ্চনা!
করাঙ্গুলি ক্ষত হয়—হেরি না যে কাঁটার পাহারা,
দৃষ্টিহীনে করে সবে বৃথাই গঞ্জনা!
সে বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হয়ে বাজে,
ব্যথায় বৃহৎ হয়ে সে ফুল বিরাজে!
অশ্রুজলে আর্দ্র হয় জীবনের এ মরু-সাহারা—
প্রাণের পিরীতি মোর হয় নিরঞ্জনা।

অন্ধ আমি—জাগি তাই সারারাত পরশ-পিয়াসে,
শয়ন-শিয়রে মোর জ্বলে না প্রদীপ,
হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে,
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে লক্ষ নীপ!
মিলন-রজনী মোর আঁধার শ্রাবণ—
দুই দেহ-তটে সে কি দুরন্ত প্লাবন!
অন্ধ হয় অন্ধকার!—অন্ধ আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে!
সে মুহূর্তে আমি যে গো মরণ-অধিপ!

স্নায়ুশিরা-শততন্ত্রী ঝঙ্কারিছে প্রাণের হরষে,
দীপহীন চিত্তে মোর দীপক-উল্লাস!
মিটাতে চাহিনা তৃষা নিস্তরঙ্গ অমৃত-সরসে,
চাই মৃত্যু, তাই নব-জনম-আশ্বাস!
দৃষ্টিপথে সৃষ্টি আরো হয় যে সুদূর!
—দেহ করে আলিঙ্গন, তবে সে মধুর!
আঁখি তাই মুদে আসে—তৃপ্ত যবে প্রিয়ের পরশে,
—মিলে যবে বাহুপাশে নিশ্বাসে নিশ্বাস!

দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ-ভিখারী,
দেবতারে স্পর্শ করি' করি যে প্রণাম!
ধরণীর স্পর্শ-মণি—মর্মে আছে পরশ তাহারি,
সে পরশে জড়ে-চিতে ভুলেছে সংগ্রাম।
পরশ-রসিক আমি, অন্ধ আঁখি-তারা,
আমার আকাশ তাই শশীসূর্য-হারা।
পদতলে পৃথ্বী আছে আলিঙ্গন চৌদিকে বিথারি'—
আলো নাই, আছে শুধু প্রাণের আরাম।

ভারতী, মাঘ ১৩৩৩

মোহমুদ্গর

দেহে তোর প্রাণ আছে? তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য-উপবাসী—
চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী?
রুদ্ধ অশ্রু, শুষ্ক চোখ, ভস্মশেষ জঠরাগ্নিজ্বালা—
তাহারি বিভূতি মাখি', দেহে পরি' কণ্টকাস্থিমালা,
হৃদ্‌পিণ্ডে জ্বালাইয়া হোম-হুতাশন,
মমতা-আহুতি তায় করিয়া অর্পণ,—
প্রাণ তবু হাহা করে কার লাগি', হে কঠোর তাপস উদাসী?
—চির-উপবাসী!

রজনী তিমির-ঘোরা, কুহূ-অমানিশি যাপি' প্রহরে প্রহরে,
মন্ত্র জপি' শবাসন-'পরে,—
ভরিয়া কপাল-পাত্রে অবিরল অনল তরল,
অট্টহাস্যে নিবারিয়া মমতার গলদশ্রুজল,
প্রেয়সী-নারীর মুখে হেরি' বিভীষিকা,
আপনারি বক্ষ-রক্তে পরি' জয়-টীকা,
কি লভিলে, ওহে বীর, বামমার্গী কাপালিক, নাস্তিক তান্ত্রিক?
—ধিক্ তোমা ধিক্!

ঊর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী,
নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি' নীরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
—হে কবি-বাসব?

জন্ম যদি হ'য়ে থাকে অন্ধকার শূন্য হ'তে লভি' এই কায়া,
ব্যর্থ কর অদৃষ্টের মায়া!
নামহীন ধামহীন পরিচয় বহিয়া পশ্চাতে,
সম্মুখে সে বিসর্জন অন্তহীন তমিস্রার রাতে—
দণ্ড দুই দেহ ধরি' পূর্ণ অবতার,
সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপে মহা অধিকার!
—তৃপ্তি নাই তবু তাহে? হা অভাগ্য আত্মঘাতী কাল-ক্রীড়নক
—মূর্খ মানবক!

একমাত্র সত্য এ যে!—ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যা-পারাবারে—
মুক্তি-তীর্থ মৃত্যু-কারাগারে!
আলোকে পড়িল ছায়া, কত কল্প নিরাকার থাকি'।
অনঙ্গ লভিল অঙ্গ, এড়াইয়া সংহারের আঁখি!
দেহ-দ্রুমে বিকশিল মনোজ-মন্দার।
শুক্তিগর্ভে সুদুর্লভ মুকুতা-সঞ্চার!—
অবহেলি' তবু তায়, শূন্যে বাহু প্রসারিয়া নিত্য হাহাকার!
—একি মিথ্যাচার!

আকাশের ছত্র-পটে সোমসূর্যতারকার গ্রন্থি-দীপমালা
চিরদিন এমনি উজালা!
ধরণীর চেলাঞ্চল যুগান্তেও এমনি নবীন!
অক্ষয়যৌবনা শ্যামা নৃত্যচক্রে যতিভঙ্গহীন!
বিষ্ণুনাভি-পদ্মশায়ী স্রষ্টা- প্রজাপতি,
তাঁরি আলিঙ্গনে বাঁধা বধূটি যুবতী!—
সেই হ'ল ক্ষণচ্ছায়া! তাহারি সে মাতৃ-অঙ্ক—প্রত্যক্ষ ভুবন—
অলীক স্বপন!

কোটী-জীব কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া, এ জীবন-বারিধি-বেলায়,
মোর চক্ষে অশ্রু উথলায়!
এই চিরসুন্দরের রূপ-হর্ম্যে ফিরিব আবার?
কক্ষে-কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয়-দুয়ার?
নিরালম্ব বায়ুভূত ছায়ার শরীর
ত্যজিবে কি পুনরায় অনাদি তিমির?
হৃদয়-বাঁশরীখানি বাজাব কি এই দেহ-পঞ্চবটী-তলে,
তিতি' অশ্রুজলে?

কারে চেয়ে ঠেলে দাও এ প্রসাদ-পরমান্ন, রে চিরভিখারী?
—আনন্দের ক্ষণ-অধিকারী!
মহাশূন্যে ফিরে' যেতে একি তোর প্রাণান্ত প্রয়াস!
সে যে তোর নিত্যসত্তা—সে যে তোর অন্তিম আবাস!
চির অভিশাপ সেই অন্তহীন আয়ু!
জীবন—সৌভাগ্য তোর, নাম পরমায়ু!—
আনন্দ-বিহ্বল বিধি একবার নির্বিচারে করিয়াছে দান,
ওরে ভাগ্যবান!

এস কবি, এস বীর, নির্ম্মম সাধক এস, এস হে সন্ন্যাসী!
ছিঁড়ে ফেল' অদৃষ্টের ফাঁসী।
দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি' খুঁড়ি' লও কামনার কাচমণি-হীরা।
অন্ন খুঁটি' লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর—
আমরা বর্ব্বর!

এ ধরার মর্ম্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ-ব্যথা, সন্তান-পিপাসা,
তাই র'বে ফিরিবার আশা।
দুধের বাটিটি তুলে রেখে দিবে সে যে মোর লাগি'—
মৃতবৎসা জননীর বেদনা যে নিত্য রহে জাগি'!
ক্রোড়ে তার বার বার আহ্বান-আকুল—
ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল,
তারি তরে, ওরে মূঢ়! জ্বেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ ভালবাসা
—নবজন্ম-আশা!

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৯

পান্থ

(দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশ্যে)

১

জগতের বহির্দ্বারে পরিশ্রান্ত কে তুমি পথিক?—
চলে না চরণযুগ, দাঁড়াইলে তোরণের তলে;
যেতে মন নাহি সরে, —জীবন যে মরণ-অধিক!
মিটে না পিপাসা আর ধরণীর তিক্ত হলাহলে!
নেহারিলে উর্দ্ধাকাশে জ্যোতিষ্কের জ্যোতি অনিমিখ,
শশিহীন অন্ধকারে!—অনির্বাণ শীতল অনলে
জুড়াল না তপ্তভাল,—সুপ্তি নাই!—বিশ্ব বাঁধা স্বপন-শৃঙ্খলে!

২

যুগ-যুগান্তর ভ্রমি' ক্লিষ্ট জানু, দেহ পরিক্ষীণ—
সংসারের পুরী-প্রান্তে নামাইলে বাসনার ভার;

লালসার স্থলপদ্ম মুঠিতলে বিবর্ণ মলিন,
রূপের রজতরাশি মনে হয় মৃত্তিকা অসার!
হাসি যে রঙীন ধূলা!—অশ্রু নয়, অভ্র সে কঠিন!
কীর্তির কিরীট-মণি জঞ্জাল যে পথ-পরিখার!
প্রাণ তবু জ্বলে হের ধিকি-ধিকি,—ভস্মস্তূপে যেন সে অঙ্গার!

৩

জীবনের অগ্নিহোত্রে জাগিয়াছে তাই নিরন্তর
চিরমৃত্যু-নির্বাণ-পিপাসা! বেদনার বেদগান
গভীর উদাত্ত সুরে ভরিয়াছে ও চিত্ত-কুহর—
জন্মান্তর-জলধির অতিদূর কল্লোল সমান!
মৃত্যুর নেপথ্যে শুধু পুনর্ভব!—ভাবনা দুর্ভর!
লোকে-লোকে কল্পে-কল্পে কামনার দৃপ্ত অভিযান!
জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভরা অবনীর নবনীতে এ কি বিষপান!

৪

হানিল ত্রিশূল বুকে মহাকাল?—স্বপ্নভঙ্গে তুমি
শিহরি' উঠিলে হেরি' দীর্ণ-রেখা মর্মের মর্মরে?
বেদনার চেতনায় স্তব্ধ হ'ল সারা চিত্তভূমি,
সোমসূর্য-রথচক্র—নেমিহারা—অনন্ত অম্বরে,
জাগাইল মহাত্রাস—সিন্ধুশেষে দিগন্তর চুমি'।
অস্ত গেল বর্ণচ্ছটা! অন্তহীন তুহিন-নির্ঝরে
ঢাকা প'ল ধরণীর শ্যামশোভা—বিধবা সে যৌবন সম্বরে!

৫

মানসের সরোবরে কলহংস ত্যজিল মৃণাল,
হেমপদ্ম মরে' গেল—সপ্তঋষি নিত্য ফিরে যায়!
ভাসে না সলিলে আর অপ্সরার মুক্ত কেশজাল,
পুষ্পহীন ধনু-তূণ,—মনসিজ সভয়ে লুকায়!
সন্ধ্যা আসে ম্লানমুখ, নিশীথিনী গম্ভীর ভয়াল!—
দিবসের পরিশেষে তন্দ্রা আছে—নিদ্রা নাহি তায়!
আছে ঘোর দুঃস্বপন—সাথী নাই, নয়নের লোর যে মুছায়!

৬

সেই স্বপ্ন ভাঙিবারে কি সাধনা তব, স্বপ্নহর!
কামনারে পাপ বলি', বিরচিলে তারি বিভীষিকা—
জীবন-দর্পণে তার নেহারিয়া মূরতি ভাস্বর,
আর্ত-কণ্ঠে ফুকারিলে—'নিখিলের এ

শূলহস্তা নৃমুণ্ডমালিনী!— তার প্রহারে জর্জর
কাঁদিতেছে সপ্তলোক! ভ্রান্ত পান্থ হেরি' মরীচিকা
ঘুরিতেছে দেহে-দেহে, ভালে পরি' নিত্য নব মরণের টীকা!

৭

রুধিয়া রুধির-ধর্ম, হইবারে প্রাণহীন শিলা
করেছিলে জ্ঞানযোগ, এবারের দীর্ঘ পথ-বাসে ;
নেহারিলে ক্ষুব্ধমনে জীব-যজ্ঞে প্রকৃতির লীলা,
একাকী জাগিলে, যোগী! জগতের নিদ্রা-অবকাশে!
স্বপ্ন দেখে চরাচর, শুধু তব দৃষ্টি অনাবিলা
সারারাত্রি নির্নিমেষে!—নিরখিলে ব্যথারুদ্ধ-শ্বাসে,
সদ্যঃপাতি জীবনের বেপথু সে, মরণের উদধি উচ্ছ্বাসে!

৮

নভ নীল বেদনায়! গূঢ়রক্ত হরিত-শ্যামল!
ধূসর উদাস কভু পৃথিবীর পঞ্জর-পাষাণ!
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ!
দণ্ডে ফুটি' দণ্ডে লয়—জীবাণুরা মরণ-পাগল!—
সহস্র মৃত্যুর 'পরে জীবনের উড়িছে নিশান,
মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান!

৯

ভাবনা-কুঞ্চিত ভাল, ব্যথাতুর পরিশ্রান্ত হিয়া,
ললাটের স্বেদ মুছি' নেহারিলে স্তিমিতলোচন,
মানবের জীব-যাত্রা,—হেরিছে সে স্বপ্ন মোহনিয়া,
মৃত্যুর অমৃতরূপ!—কামমুগ্ধ পশু অগণন!
স্মরি' হতভাগ্য নরে শুষ্ক আঁখি উঠে সরসিয়া—
আত্মঘাতী প্রেম তার!—জানে না সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট, মানে না বারণ!

১০

গ্রহ-তারা যে নিয়মে চিরদিন ভ্রমিছে আকাশ,
তারি বশে যৌবনের স্বেচ্ছা-বলি পরিণয় যূপে—
বিধির কৌতুক একি! নিয়তির ক্রূর পরিহাস!
জীব-চক্র ঘুরাবারে মজে নর রমণীর রূপে!
তারি লাগি' হাস্যমুখ! নেত্রে তাই বিদ্যুৎ-বিভাস!

তবু হের, চায় চোর প্রেয়সীর চোখে চুপে চুপে!
জানে মনে, আরো কত ভাগ্যহীনে মজাইবে জন্মজরা-কূপে!

১১

তাই তুমি পলাতক—রমণীরে করনি প্রণতি,
প্রকৃতির লাস্যলীলা হেরিয়াছ শান্ত কুতূহলে,
প্রেমের দিয়েছ নাম—জীবধর্ম, দেহের নিয়তি,
মোহের মঞ্জরী-ঝরা বিষ-বীজ ধরার অঞ্চলে!
হে সন্ন্যাসী, বাণী তব—বেদনার অপূর্ব মূরতি—
মূরছি' পড়িছে নিত্য অনুরক্ত মোর চিত্ততলে,
কেমন আত্মীয় তুমি বুঝি না যে, তবু ভাসি নয়নাশ্রুজলে!

১২

যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর!
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা!
মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা!
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর!
চক্ষু বুজি' অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বার বার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা!

১৩

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা!
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব লাবণি!
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ?—কে করে শোচনা!
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা!

১৪

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি' কামানল!—
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ!—নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা!—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল!
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি' ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে!
মুহূর্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি' হৃদ্‌পদ্ম-দল!
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি' এক সাথে হাসে খল-খল!

১৫

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি',
অনন্তরহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী!
নেত্র তার মৃত্যু-নীল!—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী!
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস—জানি তাহা জানি।

১৬

এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে!—
জন্ম-মৃত্যু—দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা!
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি' দেয় স্নেহের সৌরভে,
মুক্ত করি' কেশপাশ, পাদপীঠ করে সে মার্জনা!
নিঙাড়িয়া মর্ম-মধু ওষ্ঠে ধরে অতুল গৌরবে!
পরশে চন্দন-রস! মালাখানি দু'ভুজে রচনা!
আমারে তুষিবে বলি' প্রিয়া মোর ধূলি' পরে দেয় আলিপনা!

১৭

তবু সে মোহিনী! আহা, তাই বটে!—হে জ্ঞানী বৈরাগী,
এ জ্ঞান কোথায় পেলে?—মর্মে-মর্মে তুমি মহাকবি!
রুদ্ধপ্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী—
কল্পনার নিশিযোগে আঁধারিলে মনের অটবী!
অভ্রভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি'
উঠিয়াছে মেঘলোকে!—সেথা নাই নিশান্তের রবি!—
বিদ্যুৎ-গর্জন গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী!

১৮

কহ মোরে, জাতিস্মর! কবে তুমি করেছিলে পান
ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস?
পূর্বজন্ম-বিভীষিকা?—তারি ভার প্রেতের সমান
বক্ষে চাপি' স্মৃতি-বিষে করিল কি বাসনা বিবশ?
ব্যথার চাতুরী শুধু?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ?
মধু-রাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস!
ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল—বুঝিলে না অপরূপ জ্বালার হরষ!

১৯

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!
যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষার্ত রসনা
বলে ; 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো!'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো!

২০

আর যদি না-ই ফিরি—এ দুয়ারে না দিই চরণ?
অশ্রু আর হাসি মোর রেখে যাব তোমার ভবনে,
এই শোকে এই সুখ নব-দেহে করিয়া বরণ,
মন সে অমর হবে বেদনার নূতন বপনে!
পয়োধর-সুধা দানে ক্ষুধা তার করি' নিবারণ,
জীয়াইয়া তুলি' তারে পিপাসার জীবন্ত যৌবনে,
আবার জ্বালায়ে দিও বিষম বাসনা-বহ্নি বৈশাখী-চুম্বনে!

২১

অন্তহীন পন্থচারী, দেহরথে করি আনাগোনা!—
জীবন-জাহ্নবী বহে নিরবধি শ্মশানের কূলে,
নিত্যকাল কুলু-কুলু কলধ্বনি যায় তার শোনা,
কভু রৌদ্র, কভু জ্যোৎস্না, কভু ঢাকা তিমির-দুকূলে!
জ্বলে দীপ, দোলে ছায়া, উর্মিগুলি নাহি যায় গোণা,
ভেসে যাই তটতলে—এই দেখি, এই যাই ভুলে'!
স্তব্ধরাতে তারকার পানে চেয়ে আঁখি মোর ঘুমে আসে ঢলে!

২২

কোথা হ'তে আসি, কিবা কোথা যাই—কি কাজ স্মরণে?
চলিয়াছি—এই সুখ!—সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা!
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিকচক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হারা!
আমারে হারাই যদি!—যদি মরি সুচির-মরণে!
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা!
বল, বল, হে সন্ন্যাসী! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা?

২৩

এ পিপাসা সুমধুর—বল তুমি, বল, স্বপ্নহর!—
ঘুচিবে না?—মরণের শেষ নাই, বল আর-বার।
তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা!—বলিয়াছ, এ দেহ অমর!
সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার!
যূপবদ্ধ পশু আমি—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে?—না, না, সে যে মধুর উৎসার
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার!

২৪

তোমারে বেসেছি ভালো—কেন জানি, হে বীর মনীষী!
ব্যথায় বিমুখ তুমি, তবু তারে করেছ উদার!
করুণার সন্ধ্যাতারা!—মন্ত্রে তব সুশীতল নিশি
তাপশেষে মিটাইয়া দেয় বাদ গরল-সুধার!
স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, সত্য সাথে মিথ্যা যায় মিশি',
মনে হয়, সীমাহীন পরিধি যে ক্ষুদ্র এ ক্ষুধার!—
পরম-আশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ধন্য মানি এ মর্ম-বিদার!

২৫

কবির প্রলাপ শুনি' হাসিতেছ?—তাপস কঠোর!—
স্বপ্নহর! স্বপ্ন কিগো টুটিয়াছে? ধূলির ধরায়
কামনা হয়েছে ধূলি? আর কভু নয়নের লোর
বহিবে না—এড়ায়েছ চিরতরে জন্ম ও জরায়?
ওগো আত্ম-অভিমানী! এত বড় বেদনার ডোর
বুনিয়াছে যেই জন, মুক্তি তার হবে কি ত্বরায়?
দুঃখের পূজারী যেই, প্রাণের মমতা তার সহসা ফুরায়?

২৬

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি'।
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিম্বফল।
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি!

২৭

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা!
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন!
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ!
এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন!

২৮

তোমারে স্মরিনু আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায়,
হে বিরাগী! হিন্দু বলি' পরিচয় দিলে বার-বার—
তুমি চিরমৃত্যু-লোভী ; মোর ভয়—দেহের ভেলায়
কবে ডুবি, পারাপার করিতে এ জন্ম-পারাবার!
জানি না হিন্দুর কথা,—জানি শুধু, প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার!
তুমিও বলেছ তাই!—হে উদাসী! তাই তোমা করি নমস্কার।

কল্লোল, ভাদ্র ১৩৩২

কালাপাহাড়

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল!
শবভুক্ যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা!
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—একি তাণ্ডব নৃত্য-লীলা!
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?—
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড় !

বংশ যাহার বলি যোগাইল যূপে, যুগে-যুগে, ভয়-বিভল—
জাগিয়াছে তারি বীর-সন্তান হুঙ্কারে ভরি' জলস্থল!
পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়্গ তাহার থির-বিদ্যুৎ!—ধূলি-ধ্বজা তার মেঘ-সমান!

সেই আসে ওই !—বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড় !
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার !
—কালাপাহাড় !

পাষাণ-পুরীর খিল খুলে' যায়, দূর হ'তে শুনি' হুহুঙ্কার !
পূজাবেদী-মূলে হেম-তৈজস ঝঙ্কার করে আশঙ্কার !
বেগে বাহিরায় লৌহ-কীলক বিরাট দেউল-কপাট-পাটে !
আঁধার-গহ্বরে জাগে হাহাকার, বিগ্রহ-শিলা আপনি ফাটে !
পূজারী-পাণ্ডা ঝাণ্ডা নামায়ে প্রাঙ্গণ-তলে খায় আছাড় !
ওই আসে—ওই, বাজায়ে দামামা, ভীম-নির্ঘোষ কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড় !

অকাল-জলদ-উদয় যেন সে উদিয়াছে কাল !—কালাপাহাড় !
ডাকিনীরা ওই দলে দলে চলে, গলে দোলে নর-কপাল-হাড় !
রক্ত-শোষণ পাপ-বিভীষিকা, প্রাণ-শিহরণ মন্ত্র-গান,
আঁখি মুদি' ভয়ে জপ অনিবার, অন্ধ-আরতি, প্রদীপ-দান—
ঘুচাইতে আসে মহাভয়হারী দেবারি-মানব যুগাবতার—
ঘুচাবে কায়ার ছায়া-শৃঙ্খল, চূর্ণ করিবে পাষাণ-ভার !
—কালাপাহাড় !

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান !
এতদিন শুধু লাল হ'ল বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান !
আদি হ'তে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জন মহোচ্ছ্বাস !
ভয় পায় ভয় ! ভগবান ভাগে !—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড় !
ওই আসে—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড় !
—কালাপাহাড় !

কোটী-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নিঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা-চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে !
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা !
রক্ত-লোলুপ লোল-রসনায় দানিল নিজেরি অমৃত-তৃষা !
আজ তারি শেষ ! মোহ অবসান !— দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই ! তার বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড় !
—কালাপাহাড় !

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কি ভীষণ কাড়া-নাকাড় !
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার !
অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গলে' যায় যত ত্রিশূল-চূড়া !
ভৈরব রবে মূর্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া !
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘণ্টার রোলে জাগে না আর !
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়—নাম শুনে হয় বুক অসাড় !
—কালাপাহাড় !

নিজ হাতে পরি' শিকলি দু'পায় দুর্ব্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের' তার কি দুর্গতি !
কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায় ? কোথায় চক্র সুদর্শন ?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দির-বাসী অমরগণ !
ছাড়ি লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার !
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙে যায় ! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড় !

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক-ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব পুরঞ্জয় !
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্ব্বিষহ !
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ !
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড় !

ভেঙে ফেল' মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন !
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন !
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে ! মানুষের বুকে রক্ত চাই !
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার !
ভয়ঙ্করের ভয় ভেঙে যায়,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড় !

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে !
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে !
মরুর মর্ম্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা !
কল্লোলে তার বন্যার রোল !—কূল ভেঙে বুঝি ভাসায় ধরা !

ওরে ভয় নাই !—মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ূখ হার !
কাল-নিশিথিনী লুকায় বসনে !—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড় !

শুনিছ্ না ওই—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল !
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-ভাল !
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায় ! কটাক্ষে রবি অস্তমান !
খড়্গ কাহার থির-বিদ্যুৎ ! ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান !
ভয় পায় ভয় ! ভগবান ভাগে ! প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড় !
ওই আসে ! ওই বাজে দুন্দুভি—বাজায়ে দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড় !

ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩০

শব-সঙ্গীত

কল্‌জেখানায় কাবাব করে' চোখের জলে আঁজল ভরি—
আমরা যে তায় মিটাই ক্ষুধা, আমরা যে তায় পিয়াস হরি !
ঘরের উঠান শ্মশান করে' শব হয়ে এই শব-সাধনা !
নিজের মুখেই আগুন দিয়ে চিতার ধোঁয়ায় কাজল পরি!

অমানিশার মুখের 'পরে বৃষ্টিধারার ঝালর ঝরে,
সিঁথির 'পরে বিজ্‌লী-সিঁদুর, মরণ-বিয়ের বাসর-ঘরে !
বাজ যে তখন শঙ্খ বাজায়, হাওয়ার মুখে হুলুধ্বনি—
গলায়-দড়ির মতন ধরি বধূর বাহু আদরভরে !

সুখের সোয়াদ পাইনে মোটে, দুখের নেশায় ঘুর লেগেছে ;
আলোর আশা আর করিনে, অন্ধকারে সুর জেগেছে!
সদ্য-মরার মুখ যে হাসে—কোথায় আছে তেমন হাসি?
শিবের চেয়ে শবের শোভা !—শিব যে হেথায় মূর্ছা গেছে !

সুইন্‌বার্ণের অনুসরণে

তোরে লোক ভুলে যাবে ; দেয়ালের দগ্ধ মসী-রেখা—
তার চেয়ে বেশী কিছু তোর নামে নাহি র'বে লেখা
কালের দেউলে ! যথা ভোলে নর চেতনা-নিমেষে
প্রমাথী সে রিপুর রচনা—ভুলে যায় নিশাশেষে
দুঃস্বপন ; যেমতি সে অতি-পূর্ণ পাত্র হ'তে তার
স্খলিত মদিরাটুকু মদ্যপ চাহে না ফিরে আর,—
ভুলিবে তেমনি তোরে আগত ও অনাগত লোক,
তোর ছায়া ভুলে যাবে হেথাকার এই সূর্যালোক!
শুধু, যেই অগ্নিকশা হানিয়াছি আমি তোর মুখে,
তার ক্ষত—সেই মোর বিষদগ্ধ বিষম যৌতুকে,
সর্পদষ্ট মৃতসম মরিয়াও হইবি অমর—
শব হ'য়ে জাগিবি রে মৃত্যুহীন মরণ-বাসর!

আর আমি !—নেহারিবে যবে নর জ্বলদর্চিশিখা
লেলিহান, পশিবে শ্রবণে যবে শ্রুতি-বিভীষিকা
উদধির উন্মাদ কল্লোল, যবে সঙ্গীত তরল
আর্ত হৃদি আর্দ্র করি' প্রণয়ীরে করিবে চপল,
যবে ওই কৃষিহীন নীল-নভ-উর্বর-অঙ্গন
দীর্ণ করি', শীঘ্রদ্যুতি ইরম্মদ করিবে লঙ্ঘন
যোজন সমান ব্যোম !—সে আলোকে, পুলকে, ক্রন্দনে
গীতোচ্ছ্বাসে, অধরে-অধর, আর বাহুর বন্ধনে,
সীমাহীন সমুদ্রের সারাদেহ-মর্ম-শিহরণ
সেই আতট আক্ষেপে, আমারেই করিবে স্মরণ
সর্বলোক ! অর্চিবে আমার স্মৃতি নিত্য-মনোরমা,
গাঁথিবে সকল সাথে মোর নাম—অনন্য-উপমা !

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

অকাল-সন্ধ্যা

এবার হ'ল না সখি, প্রাণ ভরে' গান-গাওয়া-
দিনভোর মেঘল-আলোকে,
বুকে লাগে বার-বার বাদলের ভিজা হাওয়া,
রূপ তোর লাগিল না চোখে !

এ দিবসে নাহি তাপ, শুকাল না পাতায় শিশির,
পথে-পথে পঙ্কিল পল্বল,
স্তম্ভিত-বর্ষণ মেঘে দিকে দিকে ঘনায় তিমির,
দিবা-দেহে নিশার বল্কল !
তোমার ও রূপ-সুধা পান করি যতবার,
আঁখি মোর জড়াইয়া আসে,
তোমার ও নীলাম্বরী—মুক্তাবলী মেখলার—
তারা যেন নিশীথ-আকাশে !
মর্ত্য-পারিজাত ওই দু' অধর শোণিত-বরণ,
পিপাসার মৃত-সঞ্জীবনী—
নিবিড় চুম্বন যার—মুমূর্ষুর সূচিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী—
তা'ও আজ ম্লান, সখি, নাহি তায় জ্বালা উন্মাদন,
এ হৃদয়-মধূখ-বর্তিকা
গলিল না, জ্বলিল না প্রাণ-যজ্ঞে সঘৃত ইন্ধন,
ধূম্রনীল বাসনার শিখা !

কোথা বর্ণ, কোথা আলো, কোথা তোর ফুল্ল-তনু
পরশ-হরষ-মোহকর ?
ইন্দ্রনীল-ইন্দীবরে মদনের ফুলধনু
আরোপিত কটাক্ষ সুন্দর ?
হেম-পাত্রে সুরা হেন—নখমণি-বিখচিত
করপুটে আরক্তিম ছায়া ?
মর্মর-মসৃণ তনু স্তনভারে আনমিত,
কামনার কল্পতরু কায়া ?—
যে-রূপ নেহারি' আমি রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরে
ফুকারিব সৃজনের গান,
সর্বদেহে সঞ্চারিবে আদিম আহ্লাদভরে
বিধাতার প্রয়াস মহান্ ।
ছায়া যত কায়া হ'য়ে বিহরিবে ধরণীতে,
চেতনার পূর্ণ অবতার—
মানস-নিখিলে কোথা' অনালোক সরণিতে
করিবে না বিদেহ-বিহার !
স্পর্শে-দর্শে শ্রুতি-হর্ষে হাস্য-অশ্রু-বেয়াকুল,
জীবনে জীবন্ত পরিচয়—
কোথা সেই আদ্যাসৃষ্টি ব্রহ্ম-স্বপ্ন-সমতুল,
দ্রষ্টা যার ঋষিঋভুচয় ?

সেই রূপ ধ্যান করি' অঙ্গে মোর জাগিল যে
স্ফুরৎ-কদম্ব শিহরণ !
দেহ হতে দেহান্তরে বাঁধিলাম কি সহজে
প্রীতি-প্রেম-সেতুর বন্ধন !
পাপ-মোহ-লালসার লাল-নীল রশ্মিমালা
বরতনু ঘেরিয়া তোমারি,
লাবণ্যের ইন্দ্রধনু শোভা ধরে—নাই জ্বালা,
মুগ্ধ হ'নু আনন্দে নেহারি' !
তার পর যতবার হেরিয়াছি, সখি, তোর
নগ্ন তনু শুভ্র অশোচন,
মানস-কলঙ্ক-মসী, লোক-শিক্ষা সুকঠোর
অকাতরে করেছি মোচন ।
হৃদয়ে হৃদয় রাখি' ওষ্ঠে শুষি' সব রস
—কণ্ঠ সিক্ত গীত-রসায়নে,
ও রূপ-দীপক-রাগে দাহ করি' অপযশ,
দেহ-দীপ জ্বালানু যতনে ।
প্রেম আর পরমায়ু—এর লাগি' যত ব্যথা,
মানবের তৃষা চিরন্তন ;
দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা,
সে হৃদয়-সাগর-মন্থন ;
নীলাকাশে উষাসম গরলে অমৃত-রাগ,
মৃত্যুজয়ী জীবন-কাহিনী—
যুগান্তের নিশিভোরে নিকষে সোনার দাগ
কষি' দিল, হে মনোমোহিনি !

প্রাণভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া,
আজি এ দিনান্ত-বরষায়
নেমেছে অকাল-সন্ধ্যা, বৃথা মুখপানে চাওয়া,
ছন্দ নাই, ভাষা না যুয়ায় !
আমার প্রাণের কূলে উদিয়াছে সন্ধ্যাতারা,
মধ্যাহ্নের রবি অস্তমান,
আলোক-বিহীন দিবা হইয়াছে রূপহারা,
তুমি সখি স্বপন-সমান !
নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি কেমনে হইব পার
দুস্তর তিমির-তরঙ্গিনী ?
বনপথে-পথে শিবাদের অশিব চীৎকার,
তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী !

কভু বা করিবে নৃত্য শব্দহীন অর্ধরাতে
নিশাচরী বিজন অঙ্গনে,
ঝঙ্কারিবে অলঙ্কার মালিনী কি স্রগ্ধরাতে,
কঙ্কালের কেয়ুরে কঙ্কণে !
তার মাঝে কোথা তুমি ? হা অভাগ্য পুরোহিত !
কোথা আশা, কোথা সে পিপাসা ?
প্রাণযজ্ঞে দেহ কোথা ? কোথা রক্ত সুলোহিত ?
সঞ্জীবন শক্তি-মন্ত্র ভাষা ?

ভারতী, মাঘ ১৩২৯

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত-মগন ভুবন-ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পথিক-বধূর বেশে ।
সারাদেহে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম-কুন্তল,
কালো-অঞ্চল ছায়া হ'য়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে ।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি', বৃন্ত সে বর্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা-রূপিণী শিখা ;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমার জ্বালার হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা !
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা !

আলোকের লাগি' আঁধার-প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে',
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে-দিকে উঠি ফুটে' !
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর-রক্ত আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া অক্ষিপুটে !

*　　　　*　　　　*

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুল্‌কির ফুল গাঁথে—
অবোধ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকীর হার মাথে !
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুপ্ত দিবস-নাথে !

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাঁ-ধারে হৃদ্-স্পন্দন শুনি !
দিবা পুড়ে' মরে স্বামীর চিতায়—
আমি ছিনু তার সিঁদুর সিঁথায়,
জ্বলে' উঠে' শুনি ভর-সন্ধ্যায় ঝিল্লির ঝুনুঝুনি ;
আমি সারারাত কাল-রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি !

আমি দীপশিখা—আলোক-বালিকা—বসি যবে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে ;
নিশার দুলাল প্রেত-কবন্ধ
নৃত্য অমনি করে যে বন্ধ !
উদ্গত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা-চুম্বনে !
আমি বহ্নির তন্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে ।

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব-আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে ।
আমি কালো-চোখে পরাই কাজল,
বাসর-নিশাটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে ;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে !

অগ্নি-বৈশ্বানর

বিশ্বনরের বন্ধু যে তুমি, তাই নাম তব বৈশ্বানর !
তুমি অমর্ত্য, মর্ত্যের সাথে বাস কর তবু নিরন্তর !
নিত্য তোমার জন্ম নূতন, অরণি তোমারে প্রসব করে—
ওগো প্রমন্থ! প্রসবি' তোমায় মাতা-পিতা যে গো পুড়িয়া মরে !
তুমি হিরণ্যদন্ত, তোমার পিঙ্গল জটা, পৃষ্ঠ নীল,
তব অদ্ভুত জন্ম স্মরিয়া বিস্মিত মোর মরণ-শীল !
তুমি যবিষ্ঠ, দেব-কনিষ্ঠ, চির-নবজাত সদ্য-যুবা !
যজ্ঞ-সারথি, সোম-গোপা তুমি, তুমি মৃতাহারী ভরণ্যু বা।
ঋষিদের ঋষি, তুমি যে অসুর, পুরোধা যে তুমি অশেষ-মেধা,
তুমি হুতাশন, অপাদশীর্ষ !—প্রণমি তোমারে হে জাতবেদা !

ওগো গৃহপতি, গৃহের অতিথি, ওগো দেবদূত হব্যবহ !
মৃত দারুদেহে অমৃত-অগ্নি—কেমনে বা তুমি লুকায়ে রহ !
ওগো জল-ভ্রূণ ! বৃষসম পুন লালিত যে তুমি জলেরি কোলে,
তুমি জলচর লোহিত হংস, জলে জ্বালাময় পক্ষ দোলে !
শ্যেনসম তুমি আকাশে বিচর, মহী 'পরে তুমি ক্রুদ্ধ অহি,
বিশ্বতোমুখ ! ওগো বরেণ্য ! পাবক তুমি যে—পাতক দহি' !
উদয় হও গো উজ্জ্বল রথে, বিদ্যুৎ-বিভা হিরণ্ময় !
ওগো তেজস্বী, নিয়ে এস তব অরুণবর্ণ অশ্বচয় !
হোতা সঁপে তোমা ইন্ধন নব, গ্রহণ কর গো এই সমিধ্—
মর্ত্যের জ্ঞাতি, অমৃত-বন্ধু ! প্রণমি তোমারে বিশ্ববিদ্ !

আকাশে কৃশানু, বাতাসে অশনি, মর্ত্যে অগ্নি-বৈশ্বানর—
মহা-অরণ্য-দাহন মূর্তি স্মরি গো তোমার ভয়ঙ্কর !
শতগবীযুত পুঙ্গব যেন বাহিরাও তুমি বনের পথে,
অম্বরে ধায় ধূম-কদম্ব—কেতু সে তোমার মরুৎ-রথে !
চৌদিকে উড়ে উল্কার মালা, গ্রাস করে যত তৃণের রাশি,
পাখীরা শাখায় ভয়ে মুরছায়, পশুরা পালায় সহসা ত্রাসি' !
তব ক্ষুরধার দংষ্ট্রা-শিখায় মেদিনী-মুণ্ডে জটার ভার
ঘুচাও নিমেষে, শ্মশ্রু যেমন ঘুচায় নিপুণ ক্ষৌরকার !
সিন্ধু-সমান গর্জন কর, সিংহের মত হুহুঙ্কার !
ওগো জ্বালাকেশ ! কৃষ্ণবর্ত্মা ! প্রণমি তোমারে বারম্বার।

আদিতে আছিলে অদিতির সাথে আকাশের নীল পদ্মবনে,
ঘর্ষণে কার গগনে গগনে উজলিয়া জাগো কি নিঃস্বনে !

আস্যে তোমার জ্যোতির্হাস্য, ঘোর তমিস্রা তুমিই হর,
নিবিড়-আঁধার নিশার ওপারে দৃষ্টি তোমার প্রেরণ কর !
হে মধুজিহ্ব ! সপ্ত জিহ্বা প্রসারিয়া দাও আজি এ প্রাতে,
মিশে যাক তব পিঙ্গল জটা ওই বালারুণ-রশ্মি সাথে !
শত্রু মোদের নিপাত কর গো, বর দাও, দেব ! বৃষ্টি দাও,
আর কৃপা কর কবিরে তোমার—মন্ত্র শোধন করিয়া নাও !
ওগো ত্রিজন্মা ! ত্রিশিখ ! ত্রিতনু ! ওগো গৃহ-ভানু ! রাত্রি-রবি
পরমাত্মীয় !—প্রসীদ হে সখা! জুহূ ভরি' এই দিলাম হবি।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩১

নূরজহান ও জহাঙ্গীর

মহবৎ খাঁ নূরজহানের শত্রুতায় ভীত হইয়া সম্রাটের কাবুল যাত্রাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি সম্রাটকে বশ করিয়া এবং কতকটা বাধ্য করিয়া নূরজহানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতঃপর সম্রাজ্ঞী উক্ত আদেশপত্র হস্তে লইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

স্থান—কাবুলের পথে বাদ্‌শাহী শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

[বিস্তৃত গালিচার উপরে বাদশাহের গদী। সম্মুখে বহুমূল্য খাঞ্চায় নানাবিধ কাবুলি-মেওয়া, স্বর্ণপাত্রে শর্‌বৎ ও মদিরা। বাদ্‌শাহ নিভৃতে বিশ্রাম করিতেছেন। গালিচার একপ্রান্তে খোলা-কানাতের ফাঁক দিয়া খানিকটা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দূরে নীল আকাশের নীচে তুষার-ধবল গিরি-শ্রেণী দেখা যাইতেছে। মহবৎ খাঁ এইমাত্র প্রবেশ করিয়া বাদ্‌শাহকে নূরজহানের আগমন-চেষ্টা জানাইলেন, ও নীরবে আজ্ঞাবহ অনুচরের মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাঁহার মুখ যেমন তেজোব্যঞ্জক, তেমনি বিষণ্ণ গম্ভীর।]

জহাঙ্গীর

মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ্‌। হাতে দিয়ে পরোয়ানা—
এই বাদ্‌শাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আনা !
আমার হুকুমে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস হ'ল তারে !
বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে !
এ-কাজ করিতে দুইবার ভাবে !—তবেই হয়েছে সারা !
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ !—চোখ বুজে' ছুরী মারা !
বেহেশ্‌ত্‌ চাও ত চেয়োনা সে মুখে—নহে সে নূরজহান !
জাহান্নামের নূর বটে সেই !—সুন্দর শয়তান !

আল্লার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ সিধা,
দূর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের মুসাবিদা !
এ সব কী ফুল? গুল্-আশ্‌রফি?—ফুলে কাজ নাই আজ,
রোদ ঢেলে হোক্ লাল-গালিচায় খুন্-খারাবির সাজ।
চাহি না বরফ, শর্‌বৎ মিঠা, খরমুজা কাশ্মীরী—
দিল্ করে দাও শরাবে দরাজ—দেখাব বাদ্‌শাগিরি !...
ঠিক বটে, তার বহুৎ কসুর !—মাফ কিছুতেই নয় !
খস্রুকে খুন সেই করায়েছে—তারি কাজ নিশ্চয় !
খুরম আজিও বিদ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক,
তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ,—আমি কি আহাম্মক !
আমি রাজা, যার এত কোটী প্রজা মুখ চেয়ে মরে বাঁচে,—
আমি কিনা ফিরি যোড়-হাতে এক রমণীর পাছে পাছে !
আর কথা নয়—ঠিক, মহবৎ ! বড় তুমি হুঁশিয়ার !
এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার !...
কাল রাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজ্‌গবি !—
আমারই কেল্লা লাহোর যেন সে—তারি মত এক ছবি !
মাঝখানে তার মস্ত মিনার—আকাশে ঠেকেছে মাথা !
এত উঁচু,—তবু জমিন্ হ'তে সে সমান সোনায় গাঁথা !
নীচে চারিদিকে আলো-আব্‌ছায়া, আস্‌মানে একরাশ
কিসের আতস?—দেখি, তার সেই মিনার-চূড়াতে বাস !
হঠাৎ একটা হাতী কোথা হ'তে ছুটে এসে দেয় ঠেলা,—
থাম ভেঙে গেল, আলো নিবে গেল—এমনি তামাসা-খেলা !
জেগে উঠে তবু ভয় হ'ল মনে—এ যে বড় বিপরীত !
পাগ্‌লা হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত !
না, না, ভালো নয় ! খাঁ সাহেব, তুমি কি বল ? কেমন লাগে ?
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা ভাগে !
কথা কও না যে ! বড় বেতমিজ্ !—
আরে, আরে !—একি ! একি !
মহবৎ ! ধর ! সরাও পেয়ালা !—সেই আসে, ওই দেখি !
এয় খোদা ! এই পেয়ালার বিষ লাল করে শুধু চোখ—
ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন !—এত বিষ গুল্-রোখ্ !
জোয়ানী সাবাস !—সেই কালো-চোখ কালো-জহরের ছুরী !
ছেঁড়া-কলিজার খুন-মাখা সেই ঠোঁটের গোলাব-কুঁড়ি !
এতকাল পরে এ-রূপ কোথায় ফিরে পেল আরবার ?
আরে, আরে !—এই জান্‌খানা টেনে চিরদিন জোরবার !

* * *

মেহেরুন্নিসা ! এ বেশে এমন অসময়ে আগমন ?
হুকুম ছিল না—আদব ভুলেছ? ভালো নাই মোর মন !
শাহ্-বেগমের ইজ্জৎ কোথা ? ওড়্‌নাও গেছে ঘুচে' !
খালি পায়ে নেই জুতাটুকু ! বুঝি শরম ফেলেছ মুছে' ?

নুরজহান

কার ইজ্জৎ আলী-হজ্‌রৎ ?—হাসি পায় শুনি' কথা !
এত অভিনয় শিখিলে কোথায়—কে শিখাল চতুরতা ?
সেলিম কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহ্‌জাদা—
জহাঙ্গীরের প্রেম যত বড়, ছল নয় তার আধা !
মুখে-বুকে এক !—মোগলের মান সেই রাখিয়াছে জানি,
ইরাণের মেয়ে বিদেশী মেহের তাই ছিল অনুমানি' !—
আজ এতদিনে একি পরিচয় !—বুকে এক, মুখে আর !
নূতন পীরের নূতন মুরিদ !—বাহবা, চমৎকার !
বাদ্‌শার সাথে বেগমের দেখা!—বড় তার ইজ্জৎ !—
এখনো সমুখে দাঁড়াইয়া তাই গোলাম মহব্বৎ !
তামাসার কথা ভালো নাহি লাগে, সে সময় আজ নাই,
বুকে যাহা ছিল, মুখ ফুটে তার কিছু ক'য়ে যেতে চাই ।
শাহ্-বেগমের নাম শুনে আজ ঘৃণা হয় আপনারে !
ভিখারিণী কোনো প্রজার মতও আসি নাই দরবারে !
জীবনের প্রভু ছিল যেই মোর—মৃত্যু-মূরতি তার
ভেটিবার তরে, রমণীর এই দীনহীন অভিসার।
স্বামী বটে, তবু আজ আমি তাঁর নই যে সীমন্তিনী—
ঘরে নয়, আজ মশানে চলেছি !—কঙ্কণ-কিঙ্কণী
খুলিয়াছি তাই,—জীবনে আব্রু, মরণে পর্দা নাই !—
দুনিয়ার শেষে কার কাছে লাজ ?—ওড়্‌না পরিনি তাই ।
মরণের ঘাট পিছল নহে কি ? জানো না কি জাহাঁপনা ?—
কতটুকু পথ ? কি কাজ পরিয়া জুতা সে জরীতে বোনা ?
বেয়াদবি যদি হয়ে থাকে তবু, দাও তারো তরে সাজা,
মরণের বাড়া সাজা আছে জানি, তাই দাও তবে, রাজা !

জহাঙ্গীর

বৃথা অভিমান, মেহের !—তোমার স্বামী শুধু নই, নারী,
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে আমি, সে কথা ভুলিতে পারি ?

ঘোর অপরাধে অপরাধী তুমি— রাজ্যেরি দুষমন্
ন্যায়ের সূক্ষ্ম-বিচারে তোমার মৃত্যুই নিরূপণ !
তার লাগি' বৃথা দূষিও না মোরে—

নূরজহান

থাক্ থাক্, বুঝিয়াছি—
ওই মুখে এই মিথ্যা শুনিয়া না মরিতে মরিয়াছি !
যে-আসনে বসে' দণ্ড ধরেছে আক্বর হুমায়ুন,
তুর্কীর চূড়া বাবরের নামে দাম যার দশগুণ—
আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয় !
অসহায়া এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয় !
এত কাপুরুষ ছিল না সেলিম—মেহেরের মনোচোর !
হায় নারী, একি জীবনের ভ্রম !—এই কি পুরুষ তোর !
অপরাধ মোর যত বড় হোক, তারো চেয়ে অপরাধী
দাঁড়ায়ে সমুখে,—রাজ-বিদ্রোহী !—রাজারে রেখেছে বাঁধি' !
জল্লাদ কোথা ? শূল পোঁতে নাই ? মরা-মহিষের খালে
সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতকালে !
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি—
ভুলিতে পারি না—যে জন নফর তুমি যে গোলাম তারি !

জহাঙ্গীর

কহিও না আর ! চুপ কর ! একি পাগলের চীৎকার !
মহবৎ তবু কথাটি কহেনি, বীর সে নির্বিকার !
জানি মিছা-কথা, বন্ধু, তোমার মনে নাই কোন পাপ,
কোন কথা এর লই নাই মনে, করিও না অনুতাপ ।
কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারী—শেষ করে লও সব,
গালি দিও নাক' অকারণ মোরে, কেন মিছা কলরব ?
এসে' থাক যদি মাফ চাহিবারে, বল তবে সেই কথা,
নহিলে আরো যে কঠিন হবে সে—ব্যথার উপরে ব্যথা !

নূরজহান

হা মোর কপাল ! এতখনে বুঝি এই হ'ল পরিচয় !
মাফ চাহিবারে আসিয়াছি আমি—এতই মরণ-ভয় !
এই পরোয়ানা পায়ে দ'লে ছিঁড়ে, ফিরে' দিতে আমি চাই !—
মহবৎ ! ওই বন্দী, না তুমি বাদ্‌শা—শুনিতে পাই ?

তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর সুলতানা।
তুমি হবে তার জানের মালিক!—খুন কর—নাই মানা।
পরোয়ানা কেন?—ছুরী হানো! এই বুক পেতে দিই আমি,
নারীহত্যার পাতক তোমার—সাক্ষী তাহারি স্বামী!...

মরণের ভয় করি না যে, তাই আসিয়াছি, প্রিয়তম,
তোমারি ও-হাতে সঁপিতে এসেছি আজি এ জীবন মম!
বল শুধু তুমি—আপনার মুখে, স্বাধীন-মনের বলে—
জীবনের বোঝা নিতেছ তুলিয়া নিজেরি হাতের তলে!
বল, তুমি নও বাদ্‌শা এখন—এ দাসী বেগম নয়,
প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয়।
বল, সুখী হবে—রাখো মিছা কথা—দোহাই তোমার স্বামী!
বল শুধু মোরে, 'মেহের, তোমার মরণে বাঁচিব আমি'।
সেই আশ্বাসে আসিয়াছি ছুটে, লাইলীর মেয়ে ফেলে—
যারে কোলে নিয়ে সেদিনও লড়েছি, ঝিলামের স্রোত ঠেলে,
হাতীর উপরে,—জানে মহব্বৎ—একদিকে তারে ঢাকি',
আর দিকে ধনু, যতখন তূণে একটিও তীর বাকি।
সেও তোমা লাগি'—ভেবেছিনু বুঝি বড় প্রয়োজন মোরে,—
জানিনি তখনো, এমন বন্ধু জুটেছে কপাল-জোরে!
আজও তাই ফের জানিতে এসেছি—তোমারি কি প্রয়োজন?
বল একবার!—শুনি' সেই কথা শান্ত হউক মন।...

মনে পড়ে সেই খুশ্‌রোজ-রাতি?—সুর্মা-কেনার ছলে,
মোতি-মস্‌লিন-জহরত্‌ ফেলে চাহিলে ওড়্‌না-তলে।
হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম—"উহার নমুনা নাই,
রংমহলের রং নয় ওযে, ও-কাজল কোথা পাই?
তবু চিনে রাখ—তুমি যে সুন্দরী!—দেখ দেখি ভালো কিনা?
এর চেয়ে ভালো—মর্মরে ফোটে কালো পাথরের মিনা?
এমন নরম ছায়াখানি পড়ে 'সোরু'-তরুটির মূলে—
ঘাসের জাজিমে, জ্যোৎস্না-চাদরে—যমুনার উপকূলে?"
মুখ খুলে দিয়ে, থুঁতি তুলে ধরে', চাহিলেন রাজ-মাতা,
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে ঢুলে' নুয়ে প'ল মাথা!
তুমি চলে' গেলে, বিবশ-বিভল, পাণ্ডুর বেদনায়!
শুনিনু, সেলিম শাহজাদা সেই!—হারাইনু চেতনায়!
সেই দিন হ'তে মেহের মরেছে, সে-মরণ আজি শেষ!
এখনো আঁখিতে দেখ আছে কিনা জীবনের মোহ-লেশ?

চাও একবার !—মিনতি তোমায়—কোন ভয় নাই আর,
এখনো কি হয় খুশ্‌রোজ-খেলা, বাদ্‌শাহ্ দুনিয়ার ?
খেয়ালি-ফানুসে কত রঙ ধরে যৌবন-যাদুকর !—
লজ্জা কি তায় ? কুৎসিতও হয় মনোহর সুন্দর !
একদিন যারে ভালো লেগেছিল, বেসেছিলে তায় ভালো,
হয়তো তারেই মনে হয়েছিল—এই 'জগতের আলো' !
আজ যদি তার রূপের প্রদীপে পলিতায় পড়ে কালি,
রংমহলের দুধের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি—
নিবাইয়া দাও আপনার হাতে !—ডেকো না চেরাগ্‌চীরে !
যে-হাতে জ্বেলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে !
আঁচ লাগিবে না, তাপ নাহি তায় ! জ্বালা কোথা জুড়াবার?
দেখ—হাসিতেছি, এ হাসিতে নেশা এখনো কি লাগে আর ?

জহাঙ্গীর

ভয় করে, নারী, আজও ভয় করে !—চেয়ো না অমন করে' !
সেলিম মরেনি, মেহের মরিলে তবে ত যাইবে মরে' !
মেহের ! তোমার মোহনী সুরত্ !—পরীরাও ফিরে চায় !
আজও মনে হয়, সেই খুশ্‌রোজ ওই চোখে চমকায় !
কোথা হ'তে এলে, মরু-মঞ্জরী ! আগ্রার উদ্যানে?
ও-রূপের ছায়া পেয়ালায় পড়ে' আগুন লাগাল প্রাণে !
ছিল যে মাতাল, মদের নেশায় দিনরাত মশ্‌গুল—
পাগল করিয়া দিলে কেন তারে ?—একি নসীবের ভুল !
বাদ্‌শার ছেলে বিকাইয়া গেনু এক বস্‌রাই গুলে !
খোদার বান্দা বুত্-পরস্ত্—আখেরের ভয় ভুলে' !
কোথায় ইমান পৌরুষ গেল? কি মোহিনী জানো, নারী !
মোগলের তখ্‌ত্ ফুলদানী হ'ল ! কালো-চোখ তরবারি !
রুটী ও পেয়ালা সার হ'ল শুধু—স্বপনে কাটাই দিবা,
রাজ্যের খোঁজ মালিক রাখে না, বাড়িছে প্রলয়-বিভা ।
নফর করেছে নজরবন্দী, কাল দাঁড়াবে সে বুকে—
কার তরে আজ এ দশা আমার ? মজেছিনু কোন্ সুখে ?
সেই সুখ আজও উথলিয়া ওঠে—ওই মুখে যদি চাই !
দোজোখ্ বেহেশ্‌ত্ এক হয় দেখি, জ্ঞান-হারা হয়ে যাই !
আমি অপরাধী—এ কথাও ঠিক !—কি হ'ল ? কাঁদছ ! ছি !—
শুনিছ না কিছু !—ওই দিকে চেয়ে অমন ভাবিছ কি?

যত পাপ, 'গোনা',—দুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি—
মাফ হয়ে যাবে! শয়তান এসে দাঁড়াইবে যোড়পাণি !...
মহবৎ, তুমি পাথর বনেছ ! কোনো কথা নাই মুখে !
এত বে-দরদ !—কলিজায় দোল দেয় নাকি ওই বুকে ?
এখনো দাঁড়ায়ে কি দেখিছ বীর? আরো কি বিচার চাও ?
বলিও না কিছু—আর বলিও না !—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও !
আদেশ নহে সে, মিনতি আমার !—কি ভাবিছ মহবৎ ?

মহবৎ খাঁ

যেমন আদেশ বান্দার 'পরে—তাই হোক্ হজ্‌রত্ !

প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩০

মাধবী

শরতের রবি প্রহরে প্রহরে ঢেলেছে তপ্ত সোনা,
নীলের পাথারে শাদা-মেঘেদের সারাদিন আনাগোনা।
সন্ধ্যা তখনো হয় নাই, পথে চলেছি মাঠের পানে,
থমকি' দাঁড়ানু ডাহিনে অদূরে ইঁদারাটি যেইখানে।
উঁচু পাড় তার, তলাটি বাঁধানো, তক্‌তকে চারিধার,
একটি সে বড় বকুলের তলে একটু সে আঁধিয়ার।
সেইখানে দেখি, অপরূপ একি! তখনি লইনু চিনি'—
অস্ত-মেঘের লাল বাস পরি' দাঁড়ায়ে সৌদামিনী!
নট্‌কনা-রং শাড়ীটির ভাঁজে দেহের সকল রেখা
নত-উন্নত তনুটির তটে ছবিটির মত লেখা!
মুখটি আড়াল. খোঁপাটি আদুল—দোপাটির ফুল তায়,
গণ্ড, চিবুক, একটু সে গ্রীবা, হাতখানি—দেখা যায়।
আলোকের শিখা বেড়িয়াছে যেন শুভ্র সে ফুলতনু—
সবটুকু তার দেখা নাহি যায়—শরতের রামধনু!

তবু মনে হয়, হেরিলাম যেন সবটুকু আঁখি ভরি,'
ষোলকলা যেন নিমেষে পূরিল সপ্তমী বিভাবরী'!
না-দেখা সে মুখ আভাসে হেরিনু অন্তর-আঁখি দিয়া—
কত জীবনের পরিচয় সে যে, চির-জীবনের প্রিয়া!

তাহারি মূরতি গড়িয়া তুলিনু সকলের-গাওয়া গানে,
ধরিলাম-তায় ছায়া-আলো-আঁকা অবনীর মাঝখানে !
কালো কেশতলে ললাট-নিটোলে আঁকিনু যে ভুরু দুটি,
চেয়ে তার পানে উদ্ধত জনে চরণে পড়িল লুটি' !
অনলে-সলিলে মিলায়ে রচিনু উজল আঁখির তারা,
ওষ্ঠে বহিল বিষ-নিঃশ্বাস, অধরে পীযুষ-ধারা !
আমার মানসী মানবীর রূপে, বকুলের ছায়াতলে,
দাঁড়াইল পুন, মুখখানি আর ঢাকিল না কোন ছলে !
আজ মনে হয়, একি পরিচয় ! আঁকিনু এ কার ছবি !—
সকলে যে মুখ বাখানিল, হায়, তারে ত দেখেনি কবি !

হায় কবি, হায় ! এমনি করিয়া জীবনের যত ফাঁকি
কল্পনা-রঙে রঙিন করিয়া ঢুলায়েছ দুই আঁখি।
আধখানি দেখে' বাকি আধখানি ভরিয়া গানের সুরে,
যাহার প্রতিমা গড়িতেছ তুমি, সে যে থেকে যায় দূরে !
লাজ ভেঙে দিয়ে, মুখটি ফিরায়ে, খুলিল নয়ন-তারা,
আপন পুতলি হেরিয়া সেথায় হওনি আত্মহারা।
সারাটি রজনী দীপ জ্বেলে রেখে, বাঁধিয়া বাহুর ডোরে,
স্বপন-মগন সে-রূপ তাহার দেখনি নয়ন ভরে'।
হৃদয় যাহারে দাও নাই, তারে মনের মুকুরে ধরা !
ডুব নাহি দিয়ে, শুধু রূপ-জলে গানের গাগরি ভরা !
ভালো যারা বাসে তারাই চিনেছে, তুমি আঁকিয়াছ তারে—
সে-দিনের সেই তরুণীরে নয়—নিখিলের বনিতারে !
যার তনু ঘেরি' আরতি করিল শরতের আলো-ছায়া—
মানস-বনের মাধবী সে হ'ল ?—ফাগুনের ফুল-কায়া !

কন্যা-শরৎ

দোপাটি ফুল—চুট্‌কি পায়ের,
    সন্ধ্যামণির নাকছাবি,
গোট পরেছে অপ্‌রাজিতার,
কুন্দকলির সাতনরী-হার,
আঁচল-খুঁটে রিংটি-ভরা
    কৃষ্ণকলির লাখ চাবি !

সাদা মেঘের গামছা ভাসে
আকাশ-দীঘির ডুব-জলে,
সাঁতার দিয়ে কে ধরে তায়?—
স্বপন যে ছায় আঁখির পাতায়!
নাইতে নেমে বাড়্‌ছে বেলা,
দুপুর-রোদে রূপ জ্বলে!

মাটির পরে লুটোয় যে তার
বারানসীর সেই চেলি—
আলোয়-কালোয় ওই যে বোনা
কল্কাখানির সাঁচ্চা সোনা—
পথের ধুলোয়, বনের ফাঁকে,
হেথায় হোথায় দেয় মেলি'!

শিউলিগুলি খোঁপায় প'রে
সাঁজের প্রদীপ নেয় জ্বেলে,
ভোর-আঁধারে চুলটি খুলে'
আবার সে সব দেয় ফেলে।
লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমাতে
আল্‌পনা দেয় আপন হাতে,
রাত পোহালে জল্‌কে চলে—
সোনার ঘটে কাঁখ চাপি'!

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

শিউলির বিয়ে

বিয়ের ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার,
সবাই তারে ফেল্‌বে চিনে'—শিউলি যে নাম তার।
ডালটি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে—
স্বভাবটি তাঁর রুক্ষ যেমন, গরীব সবার চেয়ে।
বেল-মালতী, জুঁই-চামেলী—এরা সমান ঘর,
কাজেই এদের—যেমনটি চাও, জুট্‌বে তেমন বর।

শিউলি থাকে একটি টেরে গন্ধটুকুন ঢেকে,
শ্বেত-করবী দেখ্‌ত তারে পাতার আড়াল থেকে।
প্রজাপতি—ঘটক তিনি—করেন যাওয়া-আসা,
বলেন, 'বিয়ের বয়েস হ'ল, রূপে-গুণে খাসা,
পাল্‌টি-ঘরের একটি যে বর—পাড়ায় থাকে সে,
বল' যদি, দিন করি এই মাসের একুশে।
বাপ তো তোমার রাজিই আছে—সেয়ানা তুমি, তাই
গায়ে হলুদ দেওয়ার পরেও মত্‌টি নেওয়া চাই !'
শিউলি বলে, "তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও,
আমি যে আজ স্বয়ম্বরা—পাড়ায় বলে' দাও !"
শুনে' সবাই ছি ছি করে—'এমন দেখিনি !
কুলীন বলে' লজ্‌জা-সরম একটু রাখে নি !'
সন্ধেবেলায় ফুল-বাবুরা বল্‌লে মীটিঙ্‌ করে'—
শিউলিরা সব হ'লেন তবে আজ থেকে এক-ঘরে'।
হয়েছে যার গায়ে-হলুদ বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটীতে, থাক্‌বে না জাত মোটে !
শিউলি বলে, "ভয় কি বাবা ! ভাব্‌না কিসের, শুনি?
ভোর না হতেই বিদেয় হব,—না হয় ত' এখ্‌খুনি !"

* * *

দখিন-হাওয়া বল্‌লে তারে, "উড়িয়ে নে' যাই চল্‌—
গোলাপী-রং পরীর দেশে ঢাল্‌বি পরিমল ;
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বেলে
গাঁথ্‌বে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে !
শুকতারাটি ঘুমায় যখন রাত্রি-জাগার পর,
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুল্‌বি মনোহর !
আল্‌গা তোমার বোঁটার বাঁধন খুল্‌ব নাকি, সই?"—
শিউলি বলে, "কেমন করে' আকাশ-কুসুম হই !"

জ্যোৎস্না এল, জরীর চাদর ধুলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা-হাস্নুহানার গন্ধ ছুটিয়ে ;
সাদা মেঘের টোপর মাথায়, জর্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে !
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বল্‌লে, "তোমার নেই পাউডার?—দেখায় সে কি ভালো ?
রূপের স্বপন দেখ্‌বে যদি বন্ধ কর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি।

নিশুত্ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আস্‌বে নেমে পরী-কুটুম্বিনী,
বনে বসে'ই পার্‌বে হ'তে স্বপন-বিহঙ্গিনী।"—
একটি কথা কয় না দেখে' জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলি ভাবে—'চাইনে স্বপন ভুল্‌তে ধরণীরে।'

আঁধার যখন আব্‌ছা হ'ল পূব-আকাশের পানে,
পাখীর ন'বৎ উঠ্‌ল বেজে ঘুমেরি মাঝখানে,—
শিউলি শুনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন সুখটি জাগে—গায় কি চমৎকার!
গাইছে—"ওগো ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
—কোন্ জনারে সকল শোভা কর্‌বে সমর্পণ।
ধুলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি?
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি?
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে—
দেব্‌তাকে দেয় শীষটি যে তার, পুণ্য আশিস্ যে সে!
মেঘের মতন, শূন্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ-বিলাসী।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, দূর্বাদলশ্যাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম।"

শিউলি বলে, "থাম্ না তোরা, দুটি পায়ে পড়ি,
এখ্‌খুনি সব উঠবে জেগে, বল্‌বে—গলায় দড়ি!—
সইতে আমি পার্‌বো না সে,—তবু দোয়েল ভাই,
কুলীন হ'য়েও কেমন করে' এমন ঘরে যাই!
বুঝ্‌ছি প্রাণে—মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে,
দখিন-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাকব না এইখানে।
ঝিঁঝিঁর ডাকে শুনেছিলেম করুণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার!
তাই ত আমি মনে-মনেই হ'লাম স্বয়ম্বর,
এক নিমেষেই আপন হ'ল—ছিল যে-জন পর!
তবু আমার এম্‌নি কপাল!—দেখ্‌তে না পাই তাকে,
জোচ্ছনা আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে!....
বল্‌না তোরা—ভোর হ'ল কি? মিহিন্ কুয়াশায়
ছাদ্‌না-তলা দেয় কি ঢেকে ওড়্‌নাখানির প্রায়?

সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্ কলস্বর,—
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার পর ।”

*   *   *

সকালবেলার ঘুমটি ভেঙে সবাই দেখে আসি—
সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি !

বাদল-রাতের গান

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে
বৃষ্টিধারার সাথে-সাথে,
বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে—
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে ।
গভীর রাতে নিদ্রাহারা—
মনের ঘরে বেড়ায় কারা ?
চম্‌কে ওঠে বাতির আলো,
দেয়ালে সব কালো-কালো
ছায়া নাচে—হাতটি হাতে,
বাদল-বাঁশীর সাথে-সাথে !
আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্‌ছি শুয়ে বিছানাতে ।

বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
বৃষ্টি-ধারায়, বিজন বাসে ।
হারা-দিনের স্বপনগুলি
চোখের পাতা দেয় যে খুলি’ !
যা’ ছিল, যা’ হবে না আর—
সেই গানেরি সুরের বাহার
বাজায় বাঁশী বাদল-রাতে
বৃষ্টিধারার সাথে-সাথে !

বৃষ্টি পড়ে ঘরের ছাতে—
জ্যোৎস্না নামে আঁখির পাতে !
বাদল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদ ওঠে যে !—কোকিল ডাকে !

বাদল-ধারায় বাঁশী বাজে
দুপুর-রাতে প্রাণের মাঝে !

একটি সে পথ ছায়ায়-ঢাকা,
আঁধার-আলোর মায়ায় মাখা—
সেই সে পথে এক তরুণী
(এখনো তার কাঁকণ শুনি !)
ভর্‌তে আসে কলসটিরে
হাসির গাঙে, সুখের নীরে !
হঠাৎ গেল পথ হারিয়ে—
কার ঘরে সে উঠ্‌ল গিয়ে !
আজ্‌কে যে তা'র সে-মুখখানি,
অধর-ভরা মৌন-বাণী,
নিদ্রাহারা আঁখির পাতে
স্বপন দেখায় বাদল-রাতে !

বাদল মেঘের অশ্রুজলে
দেখ্‌ছি যে তার কুম্ভ ভরা !
উছ্‌লে ওঠে কক্ষতলে—
আঁক্‌ড়ে তবু বক্ষে-ধরা !
দাঁড়িয়ে ঝুঁকে শিথান 'পরে,
বৃষ্টিধারার গান সে করে !
কালো চোখে পলক যে নাই,
কালো কেশের দিশা না পাই !
কেবল অধর তেমনি আছে—
তেম্‌নি রাঙা, বুকের আঁচে !
সেই সাহসে মনের ভুলে
দিতে গেলাম মুখটি তুলে—
জান্‌লা ঠেলে দম্‌কা-হাওয়া !
ধম্‌কে বলে, "আবার চাওয়া !
সিঁদূর ও যে সিঁথির সীমায়—
পরের ঠোঁটে চুমু কি খায় !"

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে,
বৃষ্টিধারার একটানাতে,
'হ'ত' যা'—তা' আর হবে না'—
গাইছে তারি সাথে-সাথে !

আবার স্বপন ঘনিয়ে আসে
বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
গাছের মাথায় বাতাস মাতে,
গভীর দুপুর-বাদল-রাতে।
আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্‌ছি শুয়ে বিছানাতে।
বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে।

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

বাঁধন

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
দীপ মিটি-মিটি, শেষ হয় রাত,
শিশু আর পাখী আনিছে প্রভাত,
বড় হাত মোর কণ্ঠে জড়ায়,
ছোট হাতখানি
বুকে আসে—
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে।

আজি নিশা-শেষে একি সুমধুর
জাগরণ!
একি আঁখি-সুখ আহরণ!
কচি অধরের হাসির কাকলি
কোন্‌ সুখে প্রাণ তুলিছে আকুলি'
রমণীর মুখে নূতন মহিমা—
নিমেষে টুটিল
আবরণ!
আজি নিশা-শেষে এক সুমধুর
জাগরণ!

ঘুম-ভাঙা আঁখি হেরিছে স্বপন
অনিমেষে—
স্বরগ-সুধার রসাবেশে !
প্রিয়া চেয়ে আছে শিশুর বয়ানে–
শিথিল বেণীটি লুটায় শিথানে,
ঝল্‌মল্‌ করে হারখানি তার
পয়োধর-মূলে
সরে' এসে !—
মোর আঁখি আজ হেরিছে স্বপন
অনিমেষে ।

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা !
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী,
একি অপরূপ রূপের লাবনি !
সুন্দর! তব একি ভোগবতী
মরম-পরশী
রসধারা !
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা ।

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে ।
জনমে-জনমে ওই বাহুপাশ,
শিশু-কণ্ঠের ওই কলভাষ,
বাঁধিয়াছে জানি গাঁটছড়াখানি
দ্বিগুণ করিয়া
দৃঢ়-ফাঁসে—
তাই ধরা পড়ি এই ধরণীর
বাহুপাশে !

পথিক

জানি শুধু—যাব বহুদূর,
আসিয়াছি বহুদূর হ'তে !
জানিনা কোথায় কবে
পথ-চলা শেষ হবে—
লুকাইবে লোক-লোকান্তর
অন্তহীন অন্ধকার-স্রোতে ।

যত চলি তত ফিরে ফিরে
চেয়ে দেখি দূর বনরেখা—
ফেলিয়া এসেছি যারে
রাতি-শেষে আঁধিয়ারে,
স্মরি' তায় ঝরে আঁখিনীর,
আবার যে-একা—সেই একা !

পড়ে' আছে নব উষাপানে
দূর দেশ, কোথা নাহি কেহ !
তারি মাঝে তরু-ছায়া
রচিবে নূতন মায়া,
পুন কোন্ অচেনার গানে
ভুলে যাব কালিকার স্নেহ ।

শুধু চলা !—পিছনে সমুখে
পথখানি আদি-অন্তহীন !
সমুখেরে করি পিছে—
কাল ছিল, আজ মিছে !
মেতে উঠি ক্ষণিকের সুখে—
ভালোবাসি, তবু উদাসীন !

তবু এই জনম-জাঙাল
চাহি না যে শেষ করিবারে !
জানিতে চাহিনা কবে
দেহ-যাত্রা শেষ হবে—
মুছে যাবে লোক—লোকান্তর
অন্তহীন অন্ধকার-স্রোতে ।

মৃত-প্রিয়া

কাল রাতে সে স্বপ্নে আবার দাঁড়িয়েছিল এসে,
তেমনি করে'—তেমনি মলিন হেসে !
মুখখানি তার ছোট-বেলার মত—
নতুন-বিয়ের বধূর মতন নত,
শিশির-ধোয়া ফলটি যেমন—অশ্রুজলে মাজা'
গাল দু'খানি তেম্‌নি নিটোল তাজা !
দাঁড়াল সে জান্‌লাটিতে এসে,
স্বভাব-সরল বালা-বধূর বেশে ।

দুই হাতে তার মুখটি তুলে' ধরে',
দিলাম শুধু দৃষ্টি-চুমায় ভরে' ।
চোখের কোনায় ঘুমের কাজল টানা—
ঘরের ভিতর আস্‌তে যেন মানা!
ইচ্ছাটি তার—বাঁধি বাহুর ডোরে,
আমি কেবল মুখটি দিলাম দৃষ্টি-চুমায় ভরে' ।

যাবার বেলায় শেষ-বিদায়ের রূপটি সে ত নয় !—
সে যে আরো অনেক বয়স—অধিক পরিচয় !
এ যেন সেই আদর-চাওয়া নিত্য-অভিমানী—
প্রথম-প্রেমের ফুল-ফাগুনের সোহাগ সুখের রাণী !
এ যেন সেই কিশোর-কালের বৃন্দাবনের সাথী,
—ভরা-দুপুর ছিল যখন পূর্ণিমারি রাতি !
ছিল যখন বুকের মানিক বাহুর হারে গাঁথা,
গাল দু'খানি ধর্‌লে হাতে, বুজ্‌ত চোখের পাতা !
মুখখানিতে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে-ওঠা একটু অনাদরে—
ফুট্‌ত হাসি তেম্‌নি আবার একটি চুমার পরে !
এ যেন সেই দীঘির জলে সকালবেলার ফুল,
বোঁটায় যেন ভার সহে না—পাপ্‌ড়িতে আকুল !

চাঁদ ছিল না, বোধ হয় যেন শুধুই তারা জ্বলে—
স্বপন-সাঁজের আলো-ছায়ার তলে
চেয়ে মুখের পানে—
মনে হ'ল, সে বা কোথায়, আমিই বা কোন্‌খানে !

এত কাছে, এত আপন !—প্রাণের পরিচয় !
তবু যেন আমার সে নয়, নয় !
তারে যেন হারিয়ে গেছি, আর পাব না ফিরে—
সে যেন কোন্ পর্‌দেশিনী—আর-এক সাগর-তীরে,
কোন্ সে মহা রহস্য-মন্দিরে
বাস করে সে একাকিনী—বল্‌তে আছে মানা,
আমার সে যে নিতান্ত অজানা !

কইলে শুধু একটি কথা—কণ্ঠ যেমন মধুর,
তেমনি করুণ বুক-ফাটা সুর অভিমানী বধূর !—
আদর করে' হাত দু'খানি হাতের মুঠায় ভরে'
জিজ্ঞাসিলাম, "হাঁগো, তুমি এলে কেমন করে' ?"
চোখ নামিয়ে মাটির পানে চেয়ে,
বল্‌লে যেন কতই ব্যথা পেয়ে—
"এসেছি যা' করে' !"
—কান্নাতে তার কণ্ঠ এল ভরে' ।
আমি যেন কতই নিঠুর, কতই উদাসীন—
একটিবারও দেখ্‌তে তারে চাইনি এতদিন,
তারই যেন একার জ্বালা—তারি যেন মরণ !
টানতে গেলাম বুকের কাছে—হয় না যে আর স্মরণ !

হঠাৎ গেল ঘুমটি ভেঙে, রাত্রি তখন অনেক—
বাইরে এসে আকাশ পানে রইনু চেয়ে ক্ষণেক ;
মনে হ'ল, এই ছিল সে দাঁড়িয়ে আমার পাশে,
এখনও তার কথার আভাস কানে আমার আসে !
কৃষ্ণা রাতি—মাথার উপর মস্ত শামিয়ানা—
সোনার-কুচি-ছিটিয়ে-বোনা কালো কাপড়খানা !
তারি তলায় বিজন অন্ধকারে,
দুটি কথা চুপি চুপি বলিই যদি তারে—
শুনতে দেবে নাকি ?
মৃত্যুপুরীর প্রহরীদের ঢুল্‌তেছে না আঁখি,
এমন গভীর নীরব নিশুত্-রাতে ?
আকাশের ঐ একটি কোণা একটু তুলে' হাতে,
চায় যদি সে একটি পলক,
সরিয়ে দিয়ে আঁধার-অলক,

সেবারের সেই ছাদ্‌না-তলায় শুভ-দৃষ্টির মত !—
বাণীটি তার বাজ্‌বে নাকি গহন-রাতির বীণায় অনাহত?
হ'লই বা সে অনেক দূরের
একটুখানি বাঁশির সুরের—
ঝর্ণা-ঝরার—শব্দ যেন, সুদূর-পরাহত !
তারায়-তারায় পৌঁছে দেবে চোখের চিঠিখানি—
অকূল হ'তে আকুল-করা কাতর দিঠিখানি !

ওগো, তোমার পথ খুঁজে আর আস্‌তে হবে নাক',
যেথায় থাকো, ঘুমিয়ে তুমি থাকো !
স্মরণ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে,
বছর পরে বছর ঠেলে-ঠেলে,
পৌঁছব যে তোমার ঘরে আমি—
সেদিনের সেই চার-চোখেতে প্রথম-চাওয়ার স্বামী।
জানি, তুমি আর ভুলেছ সবি—
দেহ-মনের সকল কালের ছবি,
অভিনয়ের সজ্জা যত—সব ফেলেছ খুলে,
বাঁধা-বেণী এলিয়ে এলোচুলে,
মৃত্যু-সিনান শেষে এখন পর্‌লে নিয়ে টানি'—
প্রেমের যেটি আসল বয়স তারি বসনখানি !
নও গৃহিনী, নও ঘরণী—সেইটি যে গো সকল ভুলের ভুল !
সংসার ত' তারেই বলে—নিত্য-ঝরা পল্‌কা বোঁটার ফুল !
একটু আছে গন্ধ-মধু, তা'তেই করে অমর—
পরশ-মণির পরশ সে যে—বধূ-বরের অধর !

সেই ভরসার তরীখানি আঁধার অভিসারে
এপার হ'তে বাইব আমি তোমারি ঐ পারে।
তোমায় আবার আন্‌তে যাব চতুর্দোলায় চড়ি',
ফুল-শয্যা যাবে আবার চাঁদের আলোয় ভরি।
ঘোমটা-খোলা মুখখানি যে দেখেও বারম্বার,
মনে হবে নতুন-দেখা, চির-চমৎকার !
যে-কথাটি বল্‌তে বাধে—লজ্জা করে কত—
বল্‌তে তবু কতই না সাধ—সেইটি অবিরত
লজ্জা-রাঙা মুখটি তোমার দুইটি হাতে তুলে',
জিজ্ঞাসিব অধীর হয়ে, ভালোবাসার ভুলে।
সত্যিকারের সেই ক'টা দিন—চিরদিনের অতীত—
তারাই রবে সাথে সাথে—মরণ-মোহন অতিথ।

জগৎটারে রাখ্‌ব আমি দুয়ার হ'তে দূরে—
অজর হব স্মরণ-সুধায় পাত্রখানি পূরে' !
নির্ভাবনায় ঘুমাও তুমি, আমার স্বপন পাঠিয়ে দেব তোমায়,
আমায় তুমি হারাওনি ত !—সিঁদূর নিয়ে গেছ সিঁথির সীমায়

ভারতী, পৌষ ১৩৩০

মৃত্যু-শোক

এই মর্ত্ত্যের মূর্ত্তি-মেখলা
যে-রূপে বাঁধিল যারে,—
সেই অপরূপ রূপখানি যবে
মিশে যায় নিরাকারে,
সারা ধরণীর বায়ু-মণ্ডল
প্রেমিকের চোখে করে ছল্‌ছল্‌,
দিবসের ছায়া-আলোকাঞ্চল
অশ্রু মুছাতে নারে,
একটি সে রূপ না হেরি' নয়নে
বুক ভরে হাহাকারে ।

যেমনি সে হোক্—তাই সুন্দর,
কেহ নহে তার মত !
জগতে কোথাও নাই সমতুল—
তাই কাঁদি অবিরত ।
বহুর মাঝারে সেই একজন,
এক সে দেহের একটি গঠন—
তার যাহাকিছু তাহারি মতন,
—একবার হ'লে গত,
এ ছায়া-আলোকে আর গড়িবে না
কায়াখানি তার মত !

হায় দেহ !—নাই তুমি ছাড়া কেহ —
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে ।

তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিবেশ !—
দেহলীলা-অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে !

তোমারেই চিনি, হে দেহ-দেবতা !-
প্রলয়ের একাকার
তুমিই রুধিছ বহুবিধ রূপে,
তোমারে নমস্কার !
দেহে-দেহে তুমি, এত অভিনব !
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব ?
হাসি-ক্রন্দন—তব উৎসব !
পিরীতির পারাবার !
অধরে, উরসে, চরণ-সরোজে
আরতি যে অনিবার !

যাহারে হারাই তার মত নাই—
এই শুধু মনে জাগে,
তাই আমরণ স্মৃতি-মন্দিরে
নাম জপি অনুরাগে ।
দেহ নাই আর, তবু দেহ দিয়া
প্রেতলোকে তারে রেখেছি বাঁধিয়া,
রূপ অরূপের দুয়ারে কাঁদিয়া
তারি দরশন মাগে—
কায়া নাই, তবু ছায়াখানি তার
রাখি নয়নের আগে ।

দেহ নশ্বর, নহে তাঁর মত—
ভুবনেশ্বর যিনি,
তাঁরে পাওয়া যায়, যোগী-সাধকেরা
সাধনায় লয় জিনি' ।
আর তুমি, প্রেম !—দেহের কাঙ্গাল !
হারাইলে আর পাবে না নাগাল,
শতযুগ এই জনম-জাঙ্গাল

ঘুরিলেও কোন দিনই
পড়িবে না চোখে সেই রূপ-রেখা—
স্বপনের সঙ্গিনী !

যারে পাওয়া যায় কোটি বরষেও—
কি তার মূল্য আছে?
তাই মহেশের অচল বক্ষে
মহামায়া ঐ নাচে !
গলে দোলে, হের, মুণ্ডের মালা,
লোল রসনায় পিপাসার জ্বালা,
পিঠের তিমিরে মৃত-দিক্‌বালা
দশদিক্ ব্যাপিয়াছে !—
মথিয়া চিত্ত, মহা অনিত্য
নিত্যের বুকে নাচে !

যার সাথে দেখা শুধু একবার,
অসীমের সীমানায়,
জন্ম-নদীর জল-বুদ্বুদ
মৃত্যুর মোহানায় !—
জল-তরঙ্গ তটের কিনারে
আছাড়ি' পড়িয়া গড়িছে যাহারে,
তার সে ভঙ্গি ধরিতে কে পারে
স্রোতোমুখে পুনরায় ?
তাই জীব যে গো শিবেরও অধিক
দুর্লভ-কামনায় !

অসীম আঁধারে সে যে বিদ্যুৎ !
—অদ্ভুত পরকাশ !
সাগরে-গগনে ক্ষণ-আহ্বান—
সৃষ্টির উল্লাস !
তাহারি বিহনে বিদারি' শ্মশান
কাঁদে সতী-হারা শিবের বিষাণ,
তারি নখকণা তীর্থ-নিশান
—অমৃতের আশ্বাস !
পীঠে পীঠে তারি পাদপীঠ 'পরে
পাষাণের পরিহাস !

তাই মনে হয়—দিবসে নিশীথে,
তন্দ্রায় জাগরণে,
হারা-মুখ যবে ধেয়াই একেলা
বেদনার তপোবনে—
যেন চলিয়াছি তরণী বাহিয়া
অস্ত-রঙ্গীন আকাশে চাহিয়া—
যেন সে গোধূলি-আলোকে নাহিয়া,
সেকত-অঙ্গনে,
মিলিতেছে আসি নব-নব বেশে
নরনারী জনে-জনে।

তটভূমি 'পরে রয়েছে দাঁড়ায়ে
মুরতি সে অগণন,
যেন মায়াময় ছায়া-পুত্তল—
জুড়াল না দু'নয়ন !
বুঝিনু তখনি, সে কোন্ পিপাসা—
কার অকারণ দরশন-আশা
আঁখিতে পরায় অশ্রু-কুয়াসা,
—কুণ্ঠায় ভরে মন,
এ মিলন-মেলা বিরহেরি খেলা,
বৃথা এই আয়োজন !

একটি মুরতি খুঁজে খুঁজে ফিরি
জনতার মাঝখানে—
নব-মহিমায় নেহারি তাহারে,
স্বপনের সন্ধানে !
পলক ফেলিতে সে ছায়া মিলায়,
আপন শূন্য সবারে বিলায় !—
উৎসব-শোভা ম্লান হ'য়ে যায়
আলোকের অবসানে,
মরণের ফুল বড় হয়ে ফোটে
জীবনের উদ্যানে।

ঘুঘুর ডাক

দুপুর-রাতের জ্যোৎস্না যেন—দুপুর-নিঝুম রৌদ্রখানি
অলস-শিথিল বাহুর ডোরে
ছায়ার গলা জড়িয়ে ধরে',
এলিয়ে দিয়ে আলোক-তনু স্বপন দেখে কার না জানি !
বিজন-বনের বুকের ব্যথা,
তরু-লতার মনের কথা,
তপ্ত হাওয়ার হাই লেগে হয় পাতায়-পাতায় কাণাকাণি ।
দূরে—হোথায় নদীর 'পরে
নৌকা চলে পালের ভরে—
থির-নিথরের মধ্যিখানে চলনটি তার ঘুমপাড়ানি !

এমন সময় অশথ-শাখে
ওই না হোথায় ঘুঘু ডাকে?—
রূপালি-সুর উঠ্‌ল বেজে দুপুর-বীণার সোনার তারে !
আব্‌ছা' হ'ল আঁধার যে তায়,
নীল মেড়ে দেয় সবুজ পাতায়,
টুকরা-রোদের আল্‌পনাটি ফুটিয়ে কে দেয় দুধের ধারে !
বদ্‌লে গেল আলো-ছায়া,
দুপুর-দিনেই রাতের মায়া—
ঝাঁ-ঝাঁ-আকাশ জুড়িয়ে গেল হঠাৎ-ফোটা তারার হারে !

ঘুঘু ডাকে, আবার ডাকে—
ঘুমের বনে, স্বপন-শাখে!
এক নিমেষে মিলিয়ে যে যায় সহজ-চোখের শ্যাম-সোনালি !
দাঁড়িয়ে সে কোন্‌ সাগর-কূলে,
চোখের উপর হাতটি তুলে'
দিগন্তরের ধূসর সীমায় দেখ্‌ছি দিনের শেষ-দীপালি !
যে-সুখ আমার নেইক' জানা,
যে-দুখ বুকে দেয় নি হানা—
তারই পরশ করায় বুকে আঁধার-আলোর ঐ মিতালি !

রূপ-কথারি রূপের রাণী, পাথর-পুরীর প্রাচীর-তলে,
সাঁজের আলোর আব্‌ছায়াতে বন্দী-যুবার বক্ষে ঢলে !
রাত-প্রভাতের কঠিন মরণ
আপন মাথায় কর্‌লে বরণ—

তার চরণের শিকলখানি জড়িয়ে বাঁধে আপন গলে !
বিদায়-বেলার সেই যে হাসি,
নয়ন-ভরা চাউনি-রাশি—
গভীর রাতের চাঁদের মতন, নীল-আকাশের অগাধ জলে !—
সেই চাহনির কালো-ফিতায়,
সেই হাসিটির জরীর সুতায়,
দুপুর-দিনের ঘুমের শাড়ীর পাড় বুনে দেয় সুরে সুরে—
ঘুঘু ডাকে ওই যে দূরে !

ঘুঘু-ঘুঘু! ঘুঘু-ঘুঘু !—
তেপান্তরের মাঠের 'পরে মরুর হাওয়া বইছে হুহু !
পেলেম দেখা সেই বিদেশে
ছায়া-পুরীর প্রান্তে এসে—
একটি যে গাছ তারি তলায়—তারি শাখায় ডাকছে ঘুঘু !
পেলেম দেখা—চিন্‌লে না সে !
বাঁধ্‌তে গেলাম বাহুর পাশে—
পিছিয়ে দাঁড়ায়, মাঝখানে সেই মাঠ যে দেখি কর্‌ছে ধূ-ধূ !
অস্ত-পারের একটি তারা
তাকায় যেমন পলক-হারা—
তেম্‌নি করে' রইল চেয়ে মুখের পানে সে-জন শুধু !

ঘুঘু—ঘুঘু—ঘু !—
পোড়ো-বাড়ীর আঙিনাতে,
শিউলি-ঝরা শরৎ-প্রাতে,
সোনার জলের ছড়া কে দেয় ?—সেই কথা কি ঘুঘু বলে !
ঝুলে-পড়া বারান্দাতে,
ভাঙা-ছাতের আলিসাতে
চাঁদের আলোর হাহা-হাসি—ঘুঘু শুধায়—কিসের ছলে ?
শ্মশান-পথে যাবার বেলায়
বধূর দু'পায় আল্‌তা বুলায়—
কেমন শুভ-সিঁদূর দিয়ে সাজায় তারে এয়োর দলে !

ঘুঘুঘু—ঘু—ঘু !—
ঘুঘুর ডাকে অলস দুপুর
একটি পায়ের বাজায় নূপুর,
আওয়াজটি তার থিতিয়ে ওঠে গভীর নীরবতার বুকে ;

কোন্ বিধবা রুক্ষ-কেশে
জান্‌লাটিতে দাঁড়ায় এসে,
ঘুঘুর ডাকে উলুধ্বনি শুন্‌ছে সে কি স্বপন-সুখে ?
সুরটি ঝিমায় বুকের তলে—
রৌদ্র যেমন দীঘির জলে,
কান্না-চাপা গানের মত ক্ষণেক ভোলায় সকল দুখে !
চির-রোগীর পাণ্ডু ঠোঁটে
পান-খাওয়া লাল-রংটি ফোটে,
অন্নহীনের প্রেমের চুমা উপোস-করা প্রিয়ার মুখে !

ঘুঘু ডাকে?—আর ডাকে না !
সুরটি যে তার যায় না চেনা,
রৌদ্র-পাথার নিথর হ'ল, বনের ছায়া ঘনিয়ে আসে ।
ঘুঘুর ডাকের সুরের তুলি
আঁক্‌ছিল যে স্বপনগুলি—
মেঘের শাদা ননীর মত মিলায় তারা নীল আকাশে !
ঘুঘু ডাকে কেমন সুরে ?—
ডাকে সে যে অনেক দূরে !
মনের মাঝে হারিয়ে যে যাই—সে সুর এখন কোথায় ভাসে !

ভারতী, পৌষ ১৩২৯

সত্যেন্দ্র-বিয়োগে

'শরৎ-আলোর সোনার হরিণ' ছুটল না ত' গগন-পারে !
কে ভুলালো তোমায় কবি, অমানিশার অন্ধকারে ?
পারের পারিজাতের স্বপন ছাইল নয়ন-দুইখানিতে—
সারা ভুবন পেরিয়ে গেলে কোন্ অচেনার হাতছানিতে
হঠাৎ বুঝি পড়্‌ল চোখে মেঘের কোলে মরাল-সারি—
মানস সরোবরের পথে চল্‌লে উড়ে' সঙ্গে তারি ?

হায় কবি হায়, ফুলের ফসল ফুরায় নি যে ! দিন ফুরালো !
শিউলি-বকুল সবগুলি ওই হাত দু'খানি কই কুড়ালো ?

মনের বনের যে-সব কুঁড়ি ফুট্‌ল না আর গানের বোঁটায়—
দূর-বাগানের হাস্নুহানার গন্ধ হ'য়ে হাওয়ায় লোটায় !
আঁধার-রাতের হাস্নুহানা !—হাস্‌বে না আর জ্যোৎস্নারাতে !
মরণ-সাপের গরল-নিশাস জড়ায় যেন কেয়ার পাতে !

বঙ্গবাণীর প্রাণের দুলাল !—বুক-জুড়ানো কোলের ছেলে !
মায়ের আঁচল-বাঁধা প্রসাদ সবটুকু যে তুমিই পেলে !
ঘুমপাড়ানি-গানের ছড়া শিখ্‌লে তুমি ঘুম না গিয়ে—
বাংলা-বুলির বুল্‌বুলি গো !—হাজার সুরে সুর মিলিয়ে !
মায়ের মাথার সিঁথির পাটি, মায়ের হাতের পৈঁছা-খাড়ু
অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে চেয়ে, ভর্‌লে হাতে মিঠাই-নাড়ু!

তাপস তুমি! তপের বলে আন্‌লে সকল বিঘ্ন নাশি',
ছন্দ-ভাগীরথীর ধারা—উঠ্‌ল জীয়ে ভস্মরাশি !
মৌন-মৃত যাদের বাণী সংস্কৃতের পাতালপুরে—
জয়-জয়ন্তী গাইল তারা নতুন ক'রে তোমার সুরে !
শব্দ-সাগর যেথায় ছিল—মিলিয়ে দিলে সেই মোহানায়
ঘুম্‌তি সাথে পাগ্‌লা-ঝোরা, সর্‌যূ সাথে শোণ-যমুনায় .

আন্‌লে ভরে' ভাষার ঘটে সকল জাতির তীর্থ-সলিল,
ভুবন-জোড়া ভাবের হাটে পৌঁছে দিলে দাবীর দলীল !
তোমার মুখে বেণুর আওয়াজ সোনার বীণায় হার মানালো,
'কুহু-কেকা'র ফুল-ফাগুয়ার চমকে' ওঠে বিজ্‌লী-আলো !
'অভ্র-আবীর'-অঞ্জলিতে রঞ্জিলে যে চরণ তুমি—
শোভায় তাহার ধন্য হ'ল 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' !

পুরাতনের বিপুল পুরী—ভিতর-আঁধার দেব-দেউলে,
মণিকোঠার দুয়ার ঠেলে ধর্‌লে স্মরণ-দীপটি তুলে !
যুগান্তরের যবনিকায় লুকায় যে সব যুগ-সারথি—
তোমার কবি-চিত্রশালায় নিত্য তাদের ধূপ-আরতি !
কোন্ সে কালের-রাজবধূরা চুলগুলি দেয় 'ধূপের ধোঁয়ায়'—
তাদের বসন-ভূষণ-ছটায় উচ্চশিরও কুবের নোয়ায় !

বাদল-দিনের দুই পহরে আকাশ-ঘেরা মেঘের তলে,
শুন্‌ছি তোমার কাজ্‌রী-গাথা—মন-আঁধারে মাণিক জ্বলে !
কান্না-সুরে প্রাণের বেদন মধুর করে' তুল্‌ছে কারা?
কাজল-নয়ন সজল তাদের, কণ্ঠে সুখের সুর-ফোয়ারা !

বাদল-বায়ে দুলিয়ে দোলা, লুটিয়ে বেণী পিঠের 'পরে,
তোমার-দে'য়া গানের ধূয়া বছর-বছর এম্‌নি ধরে !

গৌড়-সারং বাজ্‌বে না আর?—গান-গাওয়া কি থাম্‌ল তবে !
শুক্লা-তিথির গান-দশমী অর্ধরাতেই আঁধার হবে !
সেই কথা কি জান্‌তে তুমি ?—প্রহর-শেষের মরণ-ছায়া
ঘনিয়ে আসে, দেখ্‌লে চেয়ে ?—তাই সে এমন করুণ মায়া
ফুটিয়ে দিলে চাঁদের মুখে,—সবার সেরা গর্‌বা-গানে—
প্রাণের নিশুত্‌-নিদ্‌-রাগিণী গাইলে চেয়ে তারার পানে !

ছাতিম-গাছের তলায় তলায়, পঞ্চমুখী জবার বনে,
পাপ্‌ড়ি কে আর গুণ্‌বে কবি, মন্দ-মধুর গুঞ্জরণে?
টিয়ার-পালক-সবুজ ক্ষেতে উড়্‌বে যখন শালিক-ফিঙা,
ভাদর-ভরা গাঙের কূলে ভিড়্‌বে মকরাঙ্গী ডিঙা—
মা যে তোমার নামটি ধ'রে যুগে-যুগেই ফির্‌বে ডেকে,
গানের মাঝেই মিল্‌বে সাড়া ভাগীরথীর দু'পার থেকে ।

ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৯

নব তীর্থঙ্কর

[বীর-যুবক যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেবের অপূর্ব আত্মোৎসর্গ উপলক্ষে]

মরণ দিতেছে হানা অনুদিন দুয়ারে দুয়ারে,
আমরা নয়ন মুদি' ভয়ে তারে দিই না যে সাড়া,
জীর্ণ কন্থা দিয়ে ঢাকি কম্পমান প্রাণ-পক্ষীটারে—
পঞ্জর-পিঞ্জর টুটি' কখন্‌ বা হয় দেহ-ছাড়া !
জানি, এই পূতি-পঙ্ক অন্ধকূপ হ'তে বাহিরিয়া
দাঁড়াতে শকতি নাই তরীহীন তমসার পারে—
যেথায় মিলেছে আসি', দলে-দলে মর-দেবতারা,
উষার উষ্ণীষ মাথে, লোকালোক-গিরিরে ঘিরিয়া !

প্রাণ নাই, ভাণ আছে—জন্মমৃত্যু দু'ই বিড়ম্বনা,
মরণ যে হত্যা শুধু, বেঁচে-থাকা বিধাতার গ্লানি !

শাস্ত্র আছে—শিখিয়াছি ভালোমতে করিতে বঞ্চনা
মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগে অতি সাবধানী।
দিবসে তারকা খুঁজি দীপ্ত রবিরশ্মি পরিহরি',
ধর্ম জানে পুরোহিত !—মোরা জানি তাঁহারি অর্চনা !
ভুলেছি ওঙ্কার-নাদ, আত্মার সে আদি-ব্রহ্মবাণী,
মুক্তা নাই, শুক্তি আছে—মুক্তি নয়, মন্ত্র জপ করি !

হে সুপর্ণ, হে গরুড় ! কোথা হ'তে সুধা সঞ্জীবনী
হরিয়া করিলে পান মৃত্যুবিষ-মথন পাথারে ?
আমরা শুনেছি শুধু আঘাতের আশু বজ্রধ্বনি,
আহুতির হোমশিখা হেরি নাই নিকষ-আঁধারে !
কোন্ শাস্ত্র শিখাইল অবহেলে আত্ম-বলিদান ?
মোক্ষ সেকি ? স্বর্গ-লোভ ? বলে' দাও ওগো বীরমণি
ধর্মধ্বজী নর-পশু হঠে' যাক্ কাতারে-কাতারে,
পুঁথি আর পৈতা-পূজা চিরতরে হোক্ অবসান।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

মৃত্যু ও নচিকেতা

ঔদ্দালকি-আরুণির পুত্র বালক নচিকেতা পিতৃসত্য-রক্ষার জন্য যমপুরে গমন করেন। সে সময়ে যম গৃহে না থাকায় তাঁহাকে তিন রাত্রি অনশনে থাকিতে হয়। অতঃপর, যম গৃহে ফিরিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করেন, এবং অতিথিসৎকারে বিলম্ব হওয়ায় নচিকেতাকে ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন।

নচিকেতা

বৈবস্বত! অতিথির করিবে তর্পণ
বরদানে? অন্য বর দিও না আমায়—
আমি চাই নিরখিতে চির-অগোচর
তোমার স্বরূপ-রূপ, অমৃত-বান্ধব !
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান্ !
অন্ধ আঁখি জ্বলিতেছে দৃষ্টি-পিপাসায় !
বাণী তব কর্ণে পশে প্রতিধ্বনিসম,

বৈতরণী-জলস্রোতে নাহি কলরব—
বায়ু যেন নহে শব্দবহ !—নাহি হেথা
ছায়াতপ, নেত্রে মোর কুহেলি দুলিছে !
বিশাল তোমার পুরী, দিবানিশাহীন—
তারি মাঝে ধূম্রনীল স্থির স্থাণুসম
কত কাল দাঁড়াইবে, হে মৃত্যু-দেবতা !

[নেপথ্যে পিতৃগণের গান]

হেথা স্নান করি মোরা অমৃত-সাগর-জলে—
মর্ত্ত্য-নদীর মুক্তির মোহানায়,
হেথা পান করি সুধা তারকা-তরুর-তলে,
কৃষ্ণা-তিথির জ্যোৎস্নার সীমানায় ।
এবে তরিয়াছি মোরা অশ্রুজলের লবণ-অম্বুধি,
এ যে নয়নে ঝরিছে সোম-দেবতার স্বপন-কৌমুদী !—
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্ছনায় !

হেথা ঋতু, হোরা, পল, নৃত্য-চপল নহে,
থির-আঁখি 'পরে দুলিছে না আলো-ছায়া !
হেথা দিবা নিশা দোঁহে মধুরে মিলিয়া রহে—
বিথারি' বদনে গোধূলির ম্লান মায়া !
এবে দিক্-দিগন্ত উদয়-বিলয় হয়েছে অস্ত রে !
এ যে সুখদুখহীন মরণানন্দে চেতনা সন্তরে !
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্ছনায় !

মৃত্যু

হে বালক ! বৃথা নয় তব অনুযোগ—
তবু সৌম্য ! আমি মৃত্যু, তুমি মর্ত্ত্য-জন !
এখনো নয়ন দুটি মমতা-মেদুর,
আরক্ত অধরে যেন কাঁপিছে কাকুতি !
পৃথিবীর পাণিস্পর্শে সুন্দর ললাট
সুমসৃণ, নাসিকায় এখনো শ্বসিছে
মর্ত্ত্য-শ্বাস ! রূপরসগন্ধভারাতুর
প্রাণের বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিছে গভীর
সুললিত কলভাষে ! পিতার আদেশে
আসিয়াছ যমপুরে, কেন এ কামনা ?

তপন-আতপ্ত ফুলতনু সুকুমার
উপবাসে পথশ্রমে হয়েছে কাতর—
লহ পাদ্য-অর্ঘ এই, ক্ষম অপরাধ
অতিথির বিলম্ব-সৎকারে। সুস্থ হও ;
চাহিও না, নচিকেতা, মৃত্যু-পরিচয় !
যাহা কিছু বরণীয়, শ্রেষ্ঠ, ভূমণ্ডলে,
তাই দিব, সেই বর লহ, প্রিয়তম !

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু ! কহিয়াছি কামনা আমার—
হেরিব স্বরূপ তব ! স্নিগ্ধ কি নির্মম,
করুণ কোমল, কিবা ভীষণ ভয়াল
হেরিতে বাসনা চিতে !—সহস্র জনম
জন্মিয়া মরেছি আমি, তবু মনে নাই
কেমন তোমার মুখ ! আজ প্রাণে মোর
জাগিয়াছে সেই আশা, দেখিব তোমায় !
.তামারে চিনি না, তবু দিবা-বিভাবরী
হেরিয়াছি ওই ছায়া রবি-শশি-করে—
হরিৎ, শ্যামল, পীত, লোহিতের মাঝে
উড়ে তব উত্তরীয়, পদচিহ্ন তব
গণিয়াছি কতবার জীবযাত্রাপথে !
বৈবস্বত ! করিও না অবিশ্বাস মোরে,
প্রাণে জাগে নিরন্তর তোমার মূরতি !—
পূরাও কামনা মোর—খোল' আবরণ !

মৃত্যু

কি দেখিবে নচিকেতা ?—মৃত্যুর স্বরূপ ?
মৃত্যু মহা-ভয়ঙ্কর, জানে সর্বজীব ;
জীবনের সুখশয্যাতলে দুঃস্বপন
মরণ-কল্পনা !—সেই মৃত্যু দাঁড়াইয়া
তোমার সম্মুখে, আবরিয়া সর্বদেহ
কহিতেছে সুনৃত-বচন, তাই তব
হৃদয় নির্ভয়, সাহস অপরিসীম !—
জগতের লঘুলীলা ভুলায়েছে তোমা,
হে গৌতম, নহি আমি জীবনের মিতা !

আমারে দেখিতে চাও?—প্রদোষ-আঁধারে
দারুণ ঝটিকাবর্তে ছিন্ন ক্ষণপ্রভা
হেরিয়াছ—দাঁড়াইয়া তরুণীর 'পরে
তরঙ্গ-দোলায়? মহারণ্যে পথহারা,
সহসা সম্মুখে তব হেরিয়াছ কভু—
ধাবমান অগ্নিকেতু বনস্পতি-শিরে ?
অর্ধরাত্রে, নিদ্রোত্থিত ঘোর কলরবে,
করিয়াছ অনুভব—দুলিছে মেদিনী ?
সেও তুচ্ছ! তারো চেয়ে কত ভয়ঙ্কর
মৃত্যুর আসন্ন মূর্তি কালান্ত তিমিরে !
বালক কিশোর তুমি, নবীন বয়স—
ধরণীর স্তন্যরসে স্তিমিত চেতনা,
কি বুঝিবে মরণের রীতি সুকঠোর ?
কহ মোরে, এ কামনা কেমনে পশিল
চিত্তে তব, কীট যথা প্রস্ফুট প্রসূনে!

নচিকেতা

শুনিয়াছি, মর-জ্যেষ্ঠ পিতৃলোকে তুমি—
পশেছিলে মৃত্যুপুরে তুমিই প্রথম,
তাই দেবগণ, বসাইয়া সিংহাসনে,
প্রেতরাজ্যে তোমারেই দিল অধিকার।
হে রাজন্! কহ মোরে—সে কি বিভীষিকা-
সৃষ্টির প্রথম মৃত্যু!—তুমি দেখেছিলে !
নহ মর-জ্যেষ্ঠ শুধু, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বটে—
তোমারে প্রণমে আজ অমৃত-সমাজ,
আত্মার আত্মীয় তুমি, হে সূর্যতনয় !
মৃত্যু যদি মহাভয়, দ্যুলোক-দুয়ারে
কেন আছ দাঁড়াইয়া ? কেন রাখিয়াছ
সুধাভাণ্ড করতলে ?—বৃথা ভয় তুমি
দেখাও বালকে !

বয়সে নবীন বটে,
তবু, মৃত্যু ! জেনো আমি জনম-স্থবির !
আমারে করেছে বৃদ্ধ তোমারি ভাবনা।
জাতিস্মর নহি,—তবু আবাল্য আমার
নয়নে জ্বলিছে কোন্ দিব্য দীপশিখা !
সে আলোকে জীবনের চারু চিত্রপট

বিবর্ণ মলিন ! সে আলোকে নিশিদিন
হেরিয়াছি কার যেন সুগম্ভীর ছায়া !
প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ যাহা—সে যেন স্বপন,
নদীজলে প্রতিবিম্ব সম! সত্য কহি,
হাসিও না ! ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয়
মিথ্যা নাহি জানে ।

মৃত্যু

অদ্ভুত কাহিনী বটে !
সতেজ সরস বৃন্তে এ শীর্ণ কুসুম
কেমনে ফুটিল ? পিতার ভবনে কভু
হের নাই সোম-যাগ ? বেদমন্ত্রধ্বনি,
উদ্‌গাতার উদাত্ত সে উচ্চ সামরব,
অগ্নিস্তুতি, ইন্দ্রস্তব, বৃত্রজয়গাথা
দিল না হৃদয়ে বল ?—সোমরস-পানে
দেবতা-দোসর হয় ক্ষীণজীবী নর !
এ সব জানো না বুঝি ! করিও না শোক-
লহ দীক্ষা, শিক্ষা কর অগ্নিহোত্র-বিধি
আমার সকাশে । কেমনে করিতে হয়
সে অগ্নি-চয়ন—নির্মাণ করিবে চিতি,
কোন্ মন্ত্রে হবিঃশেষ করিবে গ্রহণ—
শিখাইব সমুদয় ; হে সত্য-পিপাসু,
আমি সেই সত্য-মন্ত্র দানিব তোমায়
এইক্ষণে—না চাহিতে দিনু এই বর।
আরবার কহ, বৎস, কি তব প্রার্থনা ?

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু সুদক্ষিণ ! দাক্ষিণ্য তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা ; অগ্নিহোত্র-বিধি
যা' কহিলে বুঝিয়াছি, রহিবে স্মরণে ।
সে যে মোর নিত্যকর্ম—জন্মিয়াছি আমি
মহাঋষি-কুলে ! জানি, সে সাবিত্রীমন্ত্র
বলহীনে করে বলদান—তবু দেব !
শুধু মন্ত্রে, স্তোত্রগীতে, হবিঃশেষ-পানে
ভরে না আমার চিত্ত ; অগ্নি বৈশ্বানর

জ্বলিছেন অহরহ অন্তর-আলয়ে!
আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির
নিস্তরঙ্গ বেলাভূমে—আলোক-আঁধার,
উদয়াস্ত অতিক্রমি', পহুঁছিতে সেই
জ্যোতির্ময় দেশে—যেথা নাই দুঃস্বপন,
যেথা দেবগণ নিয়ত অমৃত-পানে
জ্যোতিষ্মান, যথাকাম করে বিচরণ !
ব্রহ্মবাক্য-পূত হ'য়ে যেথা সোমরস,
বিনা যাগযজ্ঞবিধি, বিনা আহরণ
ক্ষরিছে নিয়ত ! বৈবস্বত ! সেই লোকে
শাশ্বত অমৃত-পদ দিবে না আমায়?
দেখাও স্বরূপ তব ! জানি, যেই জন
হেরিয়াছে ওই রূপ, ছিঁড়ি' মোহপাশ
যায় সে যে ধ্রুবলোকে —যথা বৎসতরী
ছিঁড়িয়া বন্ধন-রজ্জু ধায় নিরুদ্দেশে !

জানি না কেমন তুমি, তবু মনে হয়
তুমি মনোহর ! বাহিরিয়া গোচারণে,
প্রথম-প্রাবৃটে যবে নবমেঘোদয়
হেরিয়াছি নদীপারে, চন্দ্রভাগা-তীরে—
চাহি' তার অভিরাম সুনীল বয়ানে
অকারণ অশ্রুবেগে হ'য়েছি কাতর,
মুহূর্তে জাগর-স্বপ্নে হারায়েছি জ্ঞান!
কোথায় সে পদে পৃথ্বী, রুক্ষ ক্ষেত্রতল,
গবীদের হাম্বারব নাহি পশে কানে,
মাধ্যন্দিন সবনের কথা ভুলে গেনু !
হেরি' সেই উর্ধ্বাকাশে নবঘনশ্যাম
ভুলে গেনু কেবা আমি, কোথায় বসতি,
কি নাম আমার ! জন্ম-মৃত্যু-ইতিহাস
নিমেষে পাইল লয় ! যেন সৃষ্টি-প্রাতে
ফিরে গেনু—বাজিল এ বক্ষে যেন মোর
আত্মীয়ের আদিম বিরহ !—মেঘ নয়!
যেন ওই আকাশের বিমল দর্পণে
দোলে নীল স্মৃতিখানি !—শুধাই তোমায়,
সে কি তব প্রতিচ্ছায়া ? তোমারি আভাস ?

মৃত্যু

নচিকেতা ! মৃত্যু নীল নহে, নাহি তার
বর্ণ-রূপ ! জানো না কি, করে সে হরণ
নেত্র হ'তে সর্বশোভা ?—সে যে অন্ধকার !

নচিকেতা

তাই বটে ! দিবা, নিশা—দুই ভগিনীর
একজন স্বর্ণসূত্রে করিছে বয়ন
ধরার বরণ-বাস আলোক-দুকূলে !
অপরা সে, অস্তাচল-শিখর-শায়িনী,
জেগে থাকে নির্নিমেষ—নিত্য খুলে দেয়
অসংখ্য সে তারকার সূচীমুখ দিয়ে
দিবসের সুদীর্ঘ সীবন !—অন্ধকার !
সান্দ্র স্তব্ধ সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অন্ধকার !
বুঝিয়াছি, তারি তলে তোমার আসন।
মনে পড়ে, একবার আমি, রিষ্টিশেন—
দোঁহে মিলে গিয়েছিনু পর্বত-ভ্রমণে ;
শালবনে সূর্য অস্ত যায়—বহুক্ষণ
দাঁড়াইনু দুইজনে অরণ্য-সীমায়,
মালভূমি 'পরে। দূর পশ্চিমের পানে
উঠিয়াছে অভ্রভেদী চতুঃশৈলচূড়া
তুষার-ধবল—যেন স্তম্ভ-চতুষ্টয়
ধরে' আছে আকাশের নীল চন্দ্রাতপ !
তারি তলে আলুণ্ঠিতা মুমূর্ষু উষার
হেরিলাম মৃত্যুশয্যা ! পূর্বাচল হ'তে
ছুটিয়া এসেছে সে যে সারাটি আকাশ
সবিতার আগে আগে—দেয় নাই ধরা !
এতক্ষণে, প্রণয়ীর প্রগাঢ় চুম্বনে
খুলে গেল কালো কেশ, রক্ত চেলাম্বর !
আর সে কুমারী নহে, নহে সে অহনা,
কন্যা জ্যোতির্ময়ী !—বধূবেশী সন্ধ্যা সে যে
মৃত্যু-স্বয়ম্বরা ! তখনি সে অন্ধকারে
মুছে গেল রক্তস্রোত, তবুও মানসে
বহুক্ষণ নেহারিনু শোণিত-উৎসব !
মনে হ'ল, পশ্চিমের যজ্ঞ-বেদিকায়

দেবতারা করে যাগ—দীর্ঘ অগ্নিষ্টোম,
উষা তায় নিত্যবলি, সবিতা-ঋত্বিক্
হোম করে আপনার পরাণ-বধূরে !
এ রহস্য বুঝি না যে ! তবু কহ শুনি,
সন্ধ্যা-রক্তরাগ, পশুর শোণিত-পঙ্ক—
সে কি, মৃত্যু ! তোমারি ও আঁধার ললাটে
লোহিত তিলক ?

মৃত্যু

জানো দেখি এত কথা,
তবু কৌতূহল? হে বালক ! বুঝিলাম
বিজ্ঞ তুমি, বহুদর্শী, সহজ-প্রবীণ !
তবুও চপল চিত্ত সংশয়-আকুল ?

নচিকেতা

তাই বটে—মূঢ় আমি ! তাই প্রাণে-মনে
এখনো বিরোধ। প্রাণ বলে, নহে নহে—
এক নহে মৃত্যু আর মরণ-দেবতা।
মৃত্যু—সে যে সুনিশ্চিত দেহ-পরিণাম,
তাহারি শাসনতরে দণ্ডধর তুমি,
মৃত্যু হয় কালে কালে, তুমি মহাকাল !
মনে তবু জাগে সদা সভয় ভাবনা,
তোমারেই স্মরে নর আয়ুঃশেষ-কালে।
গতাসুর শূন্যদৃষ্টি অক্ষি-তারকায়,
শমিতার সমুদ্যত অসির ফলকে,
হেরে জীব মরণের মূরতি করাল—
একি মোহ ! জীবনের একি প্রবঞ্চনা !
তথাপি তোমারে আমি করিয়াছি ধ্যান
চেতনা-গহনে, তুমি নিঃশব্দ-সঞ্চারে
স্বপন-শিয়রে মোর দাঁড়ায়েছ আসি'
সুনির্জনে—আসে যথা রাত্রি তমস্বিনী
শব্দহীন কলস্বনে, গগন-অঙ্গনে,
দু'কূল প্লাবিয়া। অতিক্ষুদ্র বীচিমালা
তরঙ্গিয়া ধরে শিরে ফেনপুষ্পসম
নিযুত নক্ষত্ররাজি, স্তব্ধ-মনোহর !

করি' সন্ধ্যা সমাপন, কুটীর ছাড়িয়া
পশিয়াছি কতদিন দেবদারু-বনে ;
বিরাট ন্যগ্রোধ এক আছে দাঁড়াইয়া,
প্রসারিয়া শাখা-বাহু শতস্তম্ভময়—
সে বিশাল পত্রঘন আতপত্র-তলে
কাননের অন্ধকার রচিয়াছে যেন
বিশ্বের রজনী মাঝে আরেক রজনী !
সেইখানে মাথা রাখি' বাহু-উপাধানে,
ওগো মৃত্যু ! হেরিয়াছি তোমার স্বপন !
অন্ধকার ভরিয়াছে অন্তর-বাহির,
স্তব্ধ চরাচর, শুধু শোনা যায় দূরে—
গভীর গর্জন-স্বনে পর্বত-নির্ঝরে
ঝরে বারিধারা—যেন বায়ুহীন ব্যোম
শিহরি উঠিছে তার 'ওম্, ওম্' রবে !
সেই ক্ষণে মনে হ'ল, আত্মার নিশীথে
সহসা জ্বলিয়া ওঠে প্রভাত-প্রদীপ !
জন্মান্ত-তিমির টুটি' কে আসি' দাঁড়ালে
আমার নয়ন-আগে ? সে কি তুমি নও ?-
কহ, দেব ! কহ মোরে, ঘুচাও ভাবনা ।

মৃত্যু

ঋষির তনয় তুমি, বাল-ব্রহ্মচারী—
এ বয়সে, করিয়াছ কঠিন সাধনা
মানস-নিগ্রহ ; তাই কৃচ্ছ্র-তপস্যায়
নিপীড়িত কামনার ক্ষোভ সুগভীর
করিয়াছে অন্যমনা, বিষয়-বিরাগী ।
নচিকেতা ! ধরণীর বিপুল সম্পদ
হেরিয়াছ? জন্ম, মৃত্যু,—দুই সীমান্তের
অন্তরালে আছে সুখ, দেবতা-দুর্লভ !
দেহের রহস্য নয় সহজ-সন্ধান !
অল্পভোগী দরিদ্রের দীন কল্পনায়
ক্ষুদ্র বটে জীবনের কামনা-পরিধি—
অতৃপ্ত-ক্ষুধার ব্যাধি, নিত্য-উপবাস
করে তার মর্ত্যসুখে ঘোর উদাসীন ;
তাই তার সর্বদুঃখ, দুরাশার আশা,
সফল করিতে চায় মৃত্যু-পরপারে—

তুমিও কোরো না সেই বৈরাগ্য-সাধনা।
তরুণ তাপস তুমি, ভোগ-আয়তন
ফুল্লতনু যৌবন-উন্মুখ!—দুই চক্ষু
নীলোৎপল—ঢল-ঢল, পীযূষ-পিয়াসী!
উদার তোমার মন, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়—
ভুঞ্জিবে সকল সুখ তুমি মহীতলে।
মহাভূমি, হস্তী, অশ্ব, হিরণ্য প্রচুর
দিব তোমা—পরমায়ু সহস্র শরৎ,
দেহে ক্লান্তি, বক্ষে বীর্য, বল বাহুযুগে;
দিব নারী অগণন—মোহিনী অপ্সরা,
রথারূঢ়া বাদিত্রবাদিনী! কর ভোগ
সমুদয়, রতি আর প্রমোদ-কৌতুকে!
অমৃত?—সে ব্যাধিতের বিকার-জল্পনা!
দেহের বিনাশ হয় কাল পূর্ণ হ'লে,
তার পর আবার জনম; শস্যসম
জন্মিয়া পাকিয়া ঝরে, জন্মে পুনরায়
পৃথ্বী'পরে মর্ত্যজন, বর্ষঋতুক্রমে!
আমি শুধু করি উৎপাটন প্রাণ তার
মুঞ্জা হ'তে ঈষিকার মত। নচিকেতা!
দেহীর সহজ ধর্ম জানে সর্বজন,
নাহি পন্থা অন্যতর, জন্মান্তে আবার
জন্মিতে হইবে ধ্রুব!—কর পরিহার
বিফল বাসনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ বর
করিতেছি অঙ্গীকার—বিত্ত আর আয়ু,
তার চেয়ে বড় কিবা, দেখ বিচারিয়া!

নচিকেতা

বিত্তে নহে তর্পণীয় চিত্ত পুরুষের!—
ওগো মৃত্যু! জীবনের ঐশ্বর্য-আড়ালে
তুমি কেন চিরদিন আছ দাঁড়াইয়া?
ধরার অমরাবতী, রুধি' বাতায়ন,
চিতা-ধূম নিবারিতে পারে?—উৎসবের
আনন্দ-বাঁশরী, মিলনের মঞ্জুগাথা
কেন বা গুমরি' ধরে বিদায়ের সুর?
ধরিয়াছ নানা ভোগ সম্মুখে আমার—
আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা? এই মোর দেহ

জরিবে না গুপ্তচর জরা সে তোমার ?
অন্তক তোমার নাম—তুমি কহিয়াছ,
প্রাণীদের প্রাণ-ধন কর উৎপাটন,
শস্য হ'তে ঈষিকার প্রায় !—কহ তবে,
কতকাল ভুঞ্জিব সে ভোগ সুদুর্লভ ?
সহস্র-শরৎ আয়ু? তার বেশি নয় ?
যম বুঝি বাঁধা আছে নিয়ম-শৃঙ্খলে?—
তাই তুমি নিয়তির কঠিন নিগড়
ঢাকিতেছ ফুলদল দিয়া ?—ধিক্ মৃত্যু !
ধিক্ প্রতারণা !—দেহ অন্তে এক পথ !
নাহি পন্থা অন্যতর?—শুনে হাসি পায় !
বৈবস্বত ! নচিকেতা জানে তোমা চেয়ে !
জানিয়াছি সেই সত্য—নহে বহুদিন,
শুনি নাই, হেরিয়াছি স্বচক্ষে আমার,
এখনো রোমাঞ্চ হয় সে কথা- স্মরিলে !
শুন মৃত্যু ! সে কাহিনী কহিব তোমায় ।

পিতামহ বাজশ্রবা বানপ্রস্থ-শেষে
প্রায়োপবেশন করি' ত্যজিলেন তনু
বিপাশার তীরে । কৃষ্ণা-দ্বাদশীর তিথি,
রজনী তৃতীয় যাম, দক্ষিণাগ্নি-শিখা
শুভশংসী—পরশিল স্তূপকাষ্ঠ-মূলে,
জ্বলিয়া উঠিল চিতা । নদী পূর্বমুখী—
মিশিয়াছে একেবারে দিক্-চক্রবালে ।
দাঁড়ায়ে অনতিদূরে আমি চেয়ে ছিনু
অন্যমনে, অন্ধকার আকাশের পটে ।
হোথায় সে মহাকায় কৃষ্ণ-তুরঙ্গমে
পিতৃলোকে পিতৃগণ দেন সাজাইয়া
তারার মুকুতা-হারে । সহসা হেরিনু
ভূমিতলে—চিতা হ'তে হতেছে উদয়
সুবৃহৎ শশিকলা, তরণীর প্রায়,
পূর্বাকাশে ! সেই ক্ষণে বিস্ময়-বিহ্বল
হেরিলাম সে কি দৃশ্য স্বপ্ন-অগোচর
দেহ-অন্তে পুণ্যবান বৃদ্ধ বাজশ্রবা
আরোহি' আলোক-যানে যান দেবলোকে !
ক্ষণ পরে চিতা ছাড়ি' কিছু ঊর্ধ্বে উঠি'

শোভিল সে চন্দ্রকলা সুদূর আকাশে
নদীসীমা-শেষে,—দিব্যচক্ষে হেরিলাম
আত্মার অমৃত-পন্থা মৃত্যু-পরিণামে !
ওগো মৃত্যু ! পারিবে না ভুলাতে আমায়—
এ বিশ্বাস ত্যজিবে না মূর্খ নচিকেতা !

মৃত্যু

হে ব্রাহ্মণ, ত্যজিও না বিশ্বাস তোমার—
নহ মূর্খ ! তোমা চেয়ে জ্ঞান-গরীয়ান
আছে নাকি আর কেহ সপ্তসিন্ধু-দেশে !
বালক ! তোমার চিত্তে সত্য উদিয়াছে
অকলুষা পূর্ণশ্রদ্ধা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার !
তুমি ভাগ্যবান, প্রসন্ন তোমার 'পরে
আত্মা প্রেমময় ! তাই ললাটে তোমার
জ্বলিয়া উঠেছে হেন শুভ্র জ্যোতিশ্ছটা !
প্রবচন, বহুশ্রুত, সুমহতী মেধা—
কিছুই পারে না তাঁরে লাভ করিবারে ;
আপনি যাহারে তিনি করেন বরণ,
সেই লভে !—ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয় !
লহ বর, যাহা ইষ্ট, ঈপ্সিত তোমার।

নচিকেতা

এইবার নয়নের মিটাও পিপাসা—
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান!

মৃত্যু

কোথা আবরণ, নচিকেতা ?—নেত্র হ'তে
আপনি খসিয়া যাবে সূক্ষ্ম মায়াজাল ;
মৃত্যুর রহস্য-কথা শুনিতে শুনিতে
শ্রবণ-উৎসুক চিত্ত হবে নির্বিকার,
মহূর্তে সংশয়-মুক্ত নেহারিবে তুমি
আমার স্বরূপ-রূপ অন্তরে বাহিরে !

শুন নচিকেতা !—হৃদয় দুর্বল যার,
মলিন, সঙ্কীর্ণমনা, স্বভাব-কৃপণ—

সেই নর যূপবদ্ধ পশুর সমান
মৃত্যুর আঘাত সহে জীবযজ্ঞভূমে।
ভয় তারে ক্ষুদ্র করে, মর্ত্ত্য-মরু মাঝে
তৃষায় হারায় দিশা মৃগ-তৃষ্ণিকায়!
বারবার পড়ি' মৃত্যুমুখে হয় তার
নিত্য অধোগতি ; দুই বদ্ধ করতলে
ধরিয়া রাখিতে চায় সর্বস্ব আপন,
তাই মূঢ় অতি-লোভে হারায় সকলি!
মৃত্যু তার মহাভয়!—আমারে হেরিলে,
সঙ্কুচিয়া সর্বদেহ, শশকের মত
রহে চক্ষু বুজি'—ভাবে বুঝি হেন মতে
এড়াইবে হিংস্র ক্রূর ব্যাধের সন্ধান!
সে-জন চাহে না এই রূপ নেহারিতে—
তোমা সম, নচিকেতা! নয়ন বিস্ফারি'।

নচিকেতা

এখনো হেরিনি তোমা—তবু মনে হয়,
সরিছে কুহেলিজাল, ধূম্রনীল দেহ
ঈষৎ দুলিছে!—রজনীর শেষ যামে,
বাঁধিছে উষার রথে শুক্লা-পয়স্বিনী
অশ্বিনীকুমার বুঝি? আর কিছুক্ষণে
উদিবে আঁখিতে মোর হিরণ্ময়ী বিভা
দিগন্ত-প্লাবিনী!

মৃত্যু

এইবার কহি শুন
আমার স্বরূপ—হে ব্রাহ্মণ! কহি তোমা
সেই বাণী, নিহিত যা' গহন গুহায়!
কহিয়াছি কিছু আগে অগ্নিহোত্র-বিধি—
সেই অগ্নি জ্বলিছেন দিব্যজ্ঞানরূপী
তোমারি অন্তরে!—ওই দেহ চিতি তার,
প্রাণ হবিঃ, আমি তার সুচির-আহুতি!
বলবান, আত্মাবান, প্রজ্ঞাবান যেই—
আপনারে আপনি সে দেয় বলিদান
জগতের যজ্ঞ-যূপে, মহোল্লাসে মাতি'!

বিশ্বপ্রাণে বিলাইয়া নিজ প্রাণধন
ভুলে' যায় হর্ষ-শোক চির-উপরতি
লভে বীর, সুমহান্ আত্মার আলয়ে—
আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম !
যেই অগ্নি সেই সোম—কহি আরবার,
ওই দেহ সোমের কলস ! যজযান
করে সোমযাগ—করে পান আপনি সে
আপনারে, আনন্দই হবিঃশেষ তার !
সে আনন্দ—সেই মৃত্যু—অমৃত-সোপান !
এই যজ্ঞ করেছিনু আমি, নচিকেতা,
তারি ফলে লভিয়াছি ধ্রুব অধিকার
যমলোকে ; এই যজ্ঞ করে যেই জন
মৃত্যুজয়ী হয় সেই নিঃশেষে মরিয়া !—
করি' স্নান যজ্ঞশেষে, সর্বগ্লানিহারা,
আশ্বিনের অভ্রসম, শুভ্র সুনির্মল,
মিশে' যায় মহানভোনীলে !

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু !
কোথা আমি? তুমি কোথা?—নয়নে আমার
নাহি আর কায়া-ছায়া ! দৃষ্টি সৃষ্টিহারা
ডুবে' যায় বর্ণহীন আলোক-পাথারে !
কর্ণে জাগে স্তব্ধতার মহামৌন-বাণী !
দেহ হ'ল স্পন্দহীন !—রোমাঞ্চ, পুলক,
স্বেদ, কম্প, শিহরণ—কিছু নাই আর !
বীতরাগ, বীতশোক, বীতমন্যু আমি !
ভয় নাই, নাই আশা !—এই কণ্ঠে মোর
ধ্বনিবে না কভু আর স্তুতি, আরাধনা,
যাচনা, মিনতি !—এই মৃত্যু !—ধন্য আমি!—
বৈবস্বত! এতক্ষণে তোমার প্রসাদে
মরিলাম চিরতরে আমি নচিকেতা।

মৃত্যু

ধন্য তুমি !—শ্রুতিমাত্রে নিমেষে ঘুচিল
দেহ-পাশ !—সিদ্ধি যেন ভাবনা-রূপিণী !

কালের সায়রে বুঝি তুমি ফুটেছিলে
অমৃত-পরাগ-ভরা মর্ত্ত্য-শতদল !—
আপন আবেগে তাই আপনি ঝরিলে !
মানিলে না যমের শাসন, পিতৃলোক
তব যোগ্য নহে !—আলো ভালো লাগিল না,
জীবনের অন্ধকার-দুয়ার খুলিয়া
এলে তাই মৃত্যুপুরে, স্বপ্নাতুর আঁখি,
সত্যের সন্ধানে ! স্বপ্নশেষে এইবার
সুষুপ্তি-সাগর,—উদিবে তাহারি কূলে
সেই জ্যোতির্লোক—চন্দ্রতারকার ভাতি
ম্লান যেথা, দ্যুতিহারা বিদ্যুৎ-বল্লরী !
অগ্নি যেথা চিত্রবৎ—নিষ্প্রভ, মলিন !
হে ব্রাহ্মণ ! হেরিলাম তোমার মাঝারে,
দেহজয়ী, কালজয়ী, মৃত্যুজয়ী সেই
পুরাণ-পুরুষে !—যাঁর মহা-মহিমায়
ঊর্দ্ধ হ'তে মহানিম্নে পশিছে আলোক,
নিম্ন হ'তে ঊর্দ্ধে উঠে আহুতির ধূম—
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে রহিয়াছে নিত্য-পরিচয় ।
অমৃতের পুত্র তুমি, হে মর্ত্ত্য-বান্ধব !
মৃত্যুপুরী তীর্থ আজ তোমার পরশে,
তোমারি প্রসাদে আমি চির-জ্যোতিষ্মান্ !

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩২

বিস্মরণী

আমারে তোমরা ভুলে' যেয়ো ভাই !
এসেছিনু পথ ভুলে'—
পান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্তিনাশার কূলে !
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পূরিবে, মনে ছিল আশা,
ভাঙা মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা
পুরানো বটের মূলে ;—
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব
কীর্তিনাশার কূলে !

* * *

নিশীথ-শিয়রে সপ্তমী-চাঁদ—
তখন কৃষ্ণা-তিথি,
কুহেলি-আকাশে কাঁদে দিক্‌বালা
হারায়ে তারার সিঁথী।
সেই কালে আমি বাহিরিনু পথে,
নদী-গিরি পার হ'নু কোন মতে,
উতরিনু শেষে স্বপনের রথে
বন-যূথিকার বীথি;
পূর্ণিমা-চাঁদ ছিল না আকাশে—
তখন কৃষ্ণা তিথি।

তারার আঁখরে কে লিখেছে লিপি
ধরার ললাট-পটে!—
ভেবেছিনু আমি পড়িব তাহারে
দ্বিধাহীন অকপটে।
যে কাহিনী কহে নিশীথ-গগন,
যার অভিনয়ে দিবস মগন,
ধরিবারে চাই সে লিপি-লিখন
বসুধার বালুতটে—
তারার আঁখরে যে-লিপি লিহরে
নভোনীলিমার পটে!

মরণ আমারে দু'হাতে বাঁধিল
মুখ-চুম্বন লাগি'—
হিম হ'য়ে গেল বুকের পাঁজর
শিশির-শয়নে জাগি'।
হেরিনু, জীবন আধেক স্বপন—
তারকার চোখে তাকায় তপন!
যে-আধা আঁধারে রয়েছে গোপন
হ'নু তার অনুরাগী,—
বুকের আগুন জুড়াইয়া গেল
হিমেল হাওয়ায় জাগি'।

তোমাদের তরে রয়েছে সমুখে
ধরার অরুণোদয়,

আমি তিমিরের তীর্থ-পথিক,
তারকার গাহি জয়!
যে আলো কাঁদিছে উর্ধ্ব ভুবনে—
তরল তুহিনে কাঁপিছে পবনে,
তারি এক কণা মনের ভবনে
করিয়াছি সঞ্চয়,
তারি হাসি হেসে রজনীর দেশে
করিনু অরুণোদয়

ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
মণি সে বিস্মরণী !
কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
বেদনার বন্ধনী ।
যা-কিছু কুড়াই হাটে আর মাঠে
ফেলে' দিয়ে যাই জনহীন বাটে,
জীবনের এই যৌবন-ঘাটে
তরিনু বৈতরণী !
গাঁথি কামনার শতনরী-হারে
মণি সে বিস্মরণী ।

সুপ্তি-সাগরে ফেন-তরঙ্গ
স্ফুরিছে জ্যোতির্ময় !
মনো-মৃদঙ্গে ধ্বনি অনাহত
নিবারিছে সংশয় !
কানে জাগে রূপ, সুর বাজে চোখে !-
বেড়াই অতীত অনাগত লোকে,
সমুখে পিছনে—সুদূরের শোকে
ভুলি নিকটের ভয়,
যে সুখ স্বপন তাহারি রভসে
জগৎ জ্যোতির্ময় !

হাসি হাহাকার না জানি সে কার—
প্রাণ করে উতরোল,
সেই কলরবে ভুলি জন-রব,
পথের কলহ-রোল ।
অজানা-জনের আঁখির পাহারা
স্বজন-সভায় করে দিশাহারা—

তাই ফিরে যায় স্নেহরস-ধারা,
কেঁদে যায় ফুল-দোল!
যত হাহাকার হাসির মতন
চিত করে উতরোল !

ভুলিবার ছলে ভরিলাম ডালা
বাছা-বাছা বনফুলে,
সৌরভে তার মৃদু ধূপবাস,
আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে !
মুকুতা-মুকুলে কার আঁখি কাঁদে !
রাঙা-অশোকের হাসি কারা সাধে !
কেবা নীল নীবি নীপহারে বাঁধে
চম্পক-অঙ্গুলে !—
রঙে সে অতুল মনোবন-ফুল !
আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে !

রূপের আরতি করিনু আঁধারে
আবেশে নয়ন মুদি'—
হেরি, দেহে-মনে বাধা নাই আর,
—উদ্বেল অম্বুধি !
যে রেখা আঁকিনু তিমির-ফলকে,
যে-ছায়া ধরিনু নিমীল-পলকে,
যে-মুখ চুমিনু অলখ-আলোকে,
দিবসের দ্বার রুধি'—
তাহারি আবেশে উথলিল সুধা-
মন্থন অম্বুধি !

ভুলে গেনু শোক, ভুলিনু ভাবনা—
মমতার পরাজয়,
রাখীটির মত রাঙা হ'য়ে ওঠে
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয় !
বাণী বিনাইয়া বাঁধি যে ছন্দ,
তারি মধুমদে পরাণ অন্ধ !
হয় ত' মনের এ মকরন্দ
সত্যের সুধা নয়—
তবু ভুলে আছি তাহারি পুলকে
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয় !

হোথা অস্ফুট উষার কিরীটে
শোভিছে হীরক-দুল্—
জানি সে আলোক-শিখার সকাশে
দুলিবে না মোর ফুল !
চাঁদের সোনা যে রূপা হয়ে আসে !
তারারা পলায় আগুনের ত্রাসে !
রথ-ঘর্ঘর ওই যে আকাশে
অরুণের—নাহি ভুল !
হোথা সে আলোক-শিখার সকাশে
ফুটিবে না মোর ফুল ।

আমি ধরেছিনু নিশীথের গান
তোমাদের শেষ-রাতে—
জ্যোৎস্না যখন মিলাইয়া যায়
গোধূলি-ধূসর প্রাতে ।
গান শেষ করে' চলে' গেল সবে,
আলোগুলি সব নিবিতেছে নভে,
দিবাও আসেনি, নিশা নাই যবে—
বাঁশিখানি ল'য়ে হাতে,
আমি বাহিরিনু বন-পথে একা,
গোধূলি-ধূসর প্রাতে ।

* * *

আমারে তোমরা ভুলে যেয়ো, ভাই !
এসেছিনু পথ ভুলে'—
নয়নে ভরিতে নিশার নিদালি
আতপ-উৎস-কূলে !
যে গান হেথায় হ'ল নাকো সারা,
সুরখানি তা'র হ'বে না যে হারা,
আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা
লইবে তাহারে তুলে'—
নব-জাগরণী গাইবে সেথায়
বিস্মরণীর কূলে !

প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২

স্মর-গরল

১৯৩৬
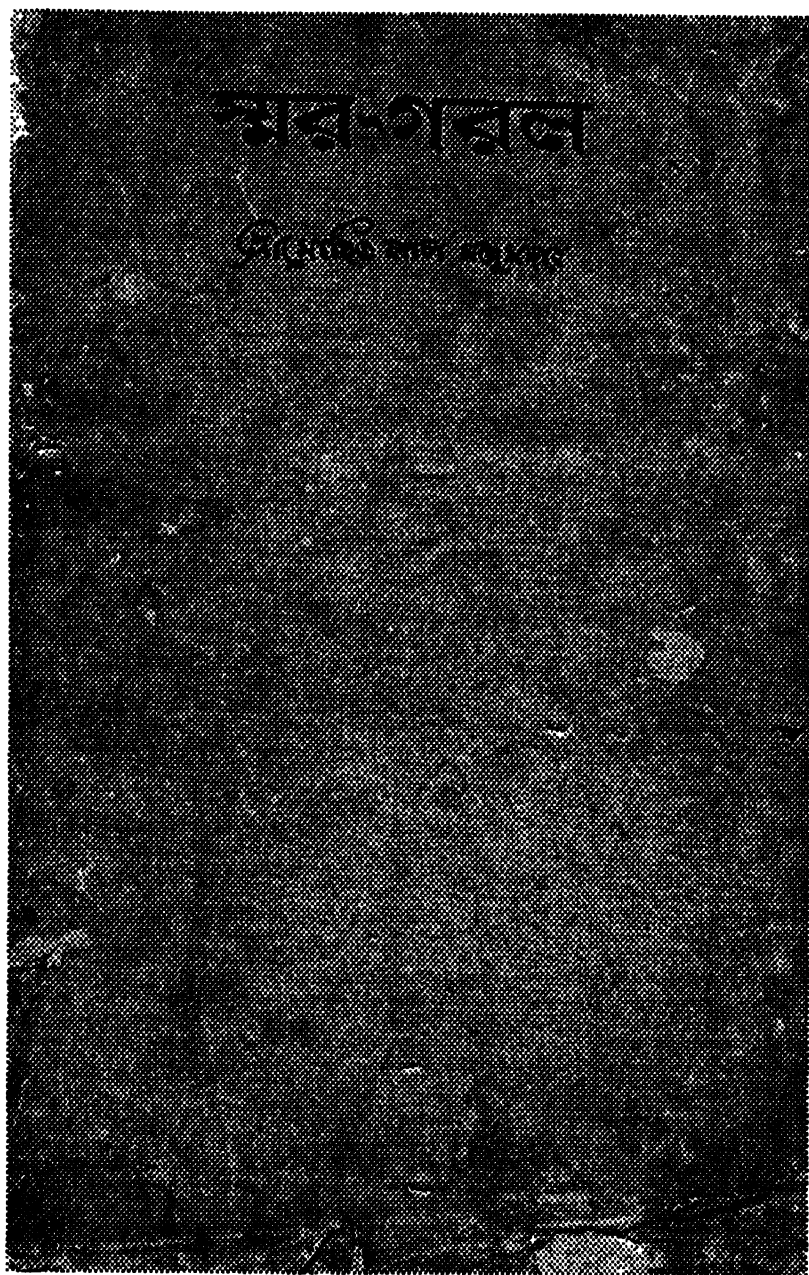
'স্মর-গরল' প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

স্মর-গরল

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস

'স্মর-গরল' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

মূল্য তিন টাকা

[প্রচ্ছদপটের মোহরটি শিল্পী শ্রীচঞ্চলদেব চট্টোপাধ্যায়-পরিকল্পিত]

'স্মর-গরল' প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র

'স্মর-গরল' ছাপা শেষ হইল, এইবার তাহার ললাটে কিছু লিখিয়া দিব। বাংলা-সাহিত্যের যে যুগ এক্ষণে চলিতেছে, তাহাতে এ-জাতীয় কবিতা—ভাষা ও ভাব দুই-ই—নিতান্ত অসাময়িক। 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২৮ সালে, অর্থাৎ পনর বৎসর পূর্বে ; 'বিস্মরণী' তাহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৩৩৩ সালে। 'স্মর-গরল' আরও দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হইতেছে। এই কবিতাগুলির প্রায় সবই 'বিস্মরণী'র অব্যবহিত পরেই রচিত, এবং অন্তত পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইতে পারিত ; হইলে হয়তো এত পুরাতন মনে হইত না। তথাপি যে প্রকাশ করিতে হইল তাহার কারণ, এই কবিতাগুলি 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী'র ক্রমানুবন্ধী—একই ধারার পরিণতি। 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী' যদি কাহারও ভাল লাগিয়া থাকে, তবে এই কবিতাগুলিও তাঁহাদের কৌতূহল উদ্রেক করিবে, ইহাই মনে করিয়া 'স্মর-গরল' প্রকাশিত করিলাম।

নতুবা, এই গদ্য-কবিতার যুগে এমন একটা অতিশয় অনাধুনিক কাব্য প্রচার করার মত মূঢ়তা আর কি হইতে পারে? বঙ্কিম-মাইকেলের কাব্য বাতিল হইয়াছে ; রবীন্দ্রনাথও গদ্য-কবিতায় আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আধুনিক যুব-জন যাহাকে জাতিচ্যুত করিয়াছে—সেই কাব্যরীতি ও সেই রস পরিবেশন করিতে আমিও কম কুণ্ঠিত নহি। একমাত্র ভরসা এই যে, 'কাল নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা'—সেই পুরাতন কথা! আমার কবিতাও যে পুরাতন!

'স্মর-গরল'-প্রকাশের সমস্ত ভার লইয়াছেন শ্রীমান্ সজনীকান্ত দাস। আমার প্রতি তাঁহার যে অকপট স্নেহ ও শ্রদ্ধা—তাহাই ইহার কারণ, না, তাঁহার সাহিত্য-প্রীতিই অকপট ও অভ্রান্ত—সে বিচার সাহিত্যিক পাঠক-সমাজ করিবেন ; আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহাশিস জানাইতেছি। এই কার্যে আরও দুই জনের সাহায্য আমি আহ্লাদসহকারে স্বীকার করিতেছি। আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান কুলচন্দ্র সেন, বি-এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং শ্রীমান সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন করিয়া ছাপার ভুল সংশোধন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা উভয়েই আমার আশীর্বাদভাজন।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'স্মরগরল' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ; তার মধ্যে ৫।৬ বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে—সে একটা দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি বলিলেই হয়। অতএব বাংলার রসিকসমাজে ইহার যে কিছু আদর হইয়াছে, এমন কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই ভূমিকা সেজন্য নহে। আমার রচনা-হিসাবেও, এই কবিতাগুলি তেমন সরল ও স্বচ্ছ নহে, এমন একটা ধারণা অনেকের আছে। 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী'র পরে 'স্মর-গরল' ;—এই কালের মধ্যে আমার কবিতা যে ক্রমেই প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক, কারণ, কবিমানসেরও একটা বয়স আছে। তাই, এই কবিতাগুলিতে যে প্রৌঢ়ত্ব আছে তাহা চেষ্টাকৃত, বা কৃচ্ছ্রসাধনার ফল নহে ; ইহারাও কষ্টকল্পনাপ্রসূত নয় ; অতিশয় স্বচ্ছন্দ এবং অদম্য আনন্দের আবেগেই এগুলি জন্মলাভ করিয়াছে। কোন আর্টই কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আনন্দসাধন ; তাহা না হইলে রচনা কোন রূপই গ্রহণ করিতে পারে না। 'স্মরগরলে'র কবিতাগুলিতে আমার নিজস্ব স্টাইল আরও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সেই স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ইংরেজীতে যাহাকে রচনার 'form' বলে, তাহাই এতদিনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই ইংরেজী কথাটা কাব্যবিচারে যে অর্থ বহন করে, বাংলায় তাহা করাইবার প্রতিশব্দ নাই। 'form' বলিতে রচনার একটি পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা বুঝায়—ভাষাও যেমন গাঢ়বন্ধ হইবে, কবিতার গঠনও তেমনই সুসম্বদ্ধ, এবং আকার সুপরিমিত হইবে। এই সকলের সমবায়ে যে একটি 'রূপ' পাঠকের চিত্তগোচর হয়, তাহাই কবিতার 'form'। এই ফর্মের একটি স্থূল দৃষ্টান্ত—সনেট-নামক কবিতা, যদি সেই সনেট খাঁটি সনেট হয়। স্থূল বলিলাম এই জন্য যে, সনেটের 'form' কতকটা কৃত্রিম—উহা একটা সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন। কিন্তু কাব্য-সাধারণের ঐ 'রূপ' প্রত্যেক কবিতায় স্বতন্ত্রভাবে তাহারই মত হইয়া ফুটিয়া উঠে। ঐ রূপের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, অথচ গুণহিসাবে সকল রচনায় উহা এক। উহাই ক্ল্যাসিকাল কবি-কর্মের একটা লক্ষণ বটে, কিন্তু সেইজন্য আমার কবিতা শুধুই ক্ল্যাসিক্যাল নহে, অর্থাৎ ঐ একটি নাম দিয়া তাহাকে বিদায় করা যাইবে না। যদিও এই 'form'-এর দৃঢ় বন্ধনে রোম্যান্টিক কাব্যের স্বধর্মহানি হয়, তথাপি কবিতামাত্রেরই ঐ 'form' না থাকিলে যাহা হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একজন অতিপ্রসিদ্ধ আধুনিক কবির উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিতে, আমার পক্ষে, অনেক কারণে বাধে। ঐ কবি একটিও 'রূপ'-সম্পন্ন কবিতা লেখেন নাই—নিছক ভাবাবেগের অতিশয় অসম্বদ্ধ ও অসংযত উচ্ছ্বাস তাঁহার কবিতায় কতকগুলি চমকপ্রদ পংক্তি সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। আমি এমন বলিতেছি না যে, কবিতায় ভাবাবেগটা কিছু নয়, ঐ সংযত সুসম্বদ্ধ সুডৌল গঠন শ্রীটাই সব ; কারণ, তাহা হইলে একটা শূন্য-বস্তুকে আকার দিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক কবিতা—ছোট বা বড় কাব্য—যে কারণে একটি রসরূপ ধারণ করে, তাহা—ঐ 'form' ; সমগ্রতার এই সুষমা যেমন তাহার গঠনে,

তেমনই তাহার প্রত্যেকটি শব্দযোজনায় যুগপৎ ফুটিয়া উঠে, কবির প্রকৃতি ও কাব্য প্রেরণার প্রকারভেদে তাহা অজ্ঞান বা সজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু তাহাই খাঁটি রসসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। যাঁহারা আবেগময় ভাববস্তুকেই কাব্যে অধিক মূল্য দেন, তাঁহারাও যদি সত্যই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, তবে ভুলিয়া যান যে, ঐ নিছক আবেগটাই মুগ্ধ করে না—মুগ্ধ করে তাহার ঐ 'form', এবং স্টাইলের অব্যর্থতা। কিন্তু সাধারণ কবিতা-পাঠক বা পদ্য-পিপাসু যাঁহারা, তাঁহারা ঐ আবেগের দমকা-উচ্ছ্বাস, ছন্দের উদ্দাম নৃত্য এবং দুই চারিটা রঙ্গীন শব্দ থাকিলেই কাব্যের চরম রসাস্বাদ করিয়া সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন। তেমন কবিতারও প্রয়োজন আছে ; উচ্চাঙ্গের কালোয়াতী সংগীতে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের জন্য লোকসংগীতের আয়োজন থাকা চাই বই কি।

উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা আমার কবিতার সম্পর্কেই বলি নাই, প্রসঙ্গতঃ সাধারণ কাব্য-বিচারের দিক দিয়াই বলিয়াছি। আমি আমার কবিতারও ঐ 'form'-এর কথা বলিতেছিলাম ; কাব্যরসের উচ্ছলতা, গভীরতা বা স্বাভাবিকতার সঙ্গে 'form'-এর সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া যদি রস মাটি হইয়া থাকে, তবে ঐ 'form'-টাও মিথ্যা হইয়াছে। কিন্তু সে বিচার আমিও যেমন করিতে পারি না, তেমনই একালের কাব্যরসিক সমালোচক যে করিতে পারিবেন, এমন ভরসা আমার নাই। কারণ, অতি-আধুনিক রুচি দুই বিপরীত প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে—হয়, কাঁচা হৃদয়াবেগের অশিক্ষিত উন্মাদনা ; নয়, সর্বআবেগ-বর্জিত অতিশিক্ষিত মস্তিষ্কের মানসিক ব্যায়াম : এখন তাহাতেও মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয়, স্নায়ুমণ্ডলীর সূচিকাগাত প্রিয়তর হইয়াছে। আমার ঐ কবিতায় যদি কোন রস থাকেও তাহা আধুনিক রস-পণ্ডিতের গ্রাহ্য বা উপাদেয় না হইবারই কথা। তৎসত্ত্বেও আমি আমার কবিতার ঐ 'form'-টার দাবী সর্বাগ্রে করিব—রসের বিচারে তাহা যেমনই হোক। এই যে 'form'-এর কথা বলিতেছি, যদি কেহ এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আমার 'বিস্মরণী'র সহিত 'স্মর-গরল' এবং 'স্মর-গরলে'র সহিত 'হেমন্ত-গোধূলি'র ভাষা ও রচনা-ভঙ্গী তুলনা করিয়া দেখিতে বলি। আমার মনে হয়, 'হেমন্ত-গোধূলি'তে আমার কবিতার 'form' শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা যে-কোন পাত্রে রস ঢালাঢালি করিয়া, ফেলিয়া ছড়াইয়া পান করিতেই অভ্যস্ত, তাঁহারা আমার এই কথা শুনিয়া নিশ্চয় অবাক হইবেন, হয়তো একটু মুচকি হাসিয়া পরস্পরে দৃষ্টি-বিনিময় করিবেন,—ভাবিবেন, আমি নিজের শেষ কবিতাগুলির জন্য একটা বড় কিছু দাবী করিতেছি। সেটা তাঁহাদেরই ভুল, আমি এখানে কাব্যবিচারে 'form'-এর কথাটাই বলিতেছি, কবিত্বের কথা নয়। আমার নিজের কবিত্ব-খ্যাতির জন্য আমি যে কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, তাহা সত্যবাদী মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নিজের কাব্যের সমালোচনা নিজে করিলেই ভাল হইত ; কারণ বাংলা দেশে এখন বিবাহের মত শ্রাদ্ধটাও নিজেই করিয়া লইতে হয়। ইহাও জানি যে, আমার কবিতার সমালোচনা—অন্তত আমি বাঁচিয়া থাকিতে—আর কেহ করিবে না, তাহার কারণ অনেক। অথচ আমার কবিতা যে কেহ পড়েন না তাহাও নহে ; যদি বা নাও পড়েন, তবু পড়াইবার জন্য, এই 'স্মর-গরলে'রই কিয়দংশ উচ্চপরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পাঠ্য করা হইয়াছে। ইহাতে আমি যেমন ব্যক্তিগত ভাবে সম্মানিত বোধ করিতেছি, তেমনই একটু শঙ্কিতও হইয়াছি ; কারণ ছাত্র ও অধ্যাপকের সঙ্গে এবার আমার কবিতাও পরীক্ষার্থিনী হইল। এইরূপ "বলাদাকৃষ্যমাণা"

হইয়া তিনি যে কিরূপ মুখভঙ্গি করিবেন, তাহাই ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছি। এই কারণে, আর কিছু না পারি, ঐ কবিতাগুলির সম্বন্ধে অতিশয় সাধারণ ভাবে দুই একটি কথা, আমার পক্ষ হইতে, নিবেদন করিব।

· আমার মনে আছে, একদা এক বিদুষী মহিলা 'স্মর-গরলে'র সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই হইতে আমার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনিও মন্তব্য করিয়াছিলেন, এ যুগে এ কাব্যের রসগ্রহণ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ, তাহার কারণও অনেক। তিনি যথাসাধ্য প্রশংসাই করিয়াছিলেন, হয়তো দুই একটি অতিশয়োক্তিও করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অনেকগুলি কবিতার ভাষা ও ভাববস্তু এমনই সুরুচি ও সুনীতিবিরুদ্ধ যে, তিনি কবির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই এমন ধৈর্য হারাইয়াছিলেন যে, কাব্য ছাড়িয়া কবির চরিত্রের প্রতিও কটাক্ষ করিতে বিরত হন নাই। আবার, স্থানে স্থানে অর্থসঙ্গতির অভাবও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াও তিনি যে কেন এত কঠোর হইয়াছিলেন তাহার কারণ বুঝি। প্রথমতঃ, তিনি য়ুরোপীয় (জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয়) কাব্য-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইলেও, ভারতীয় সাহিত্যের—সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু তত্ত্বচিন্তার—সহিত সুপরিচিত নহেন ; তাঁহার য়ুরোপীয় দৃষ্টি ও শিক্ষা-সংস্কারের দ্বারাই তিনি 'স্মর-গরলে'র ভাবধারা নির্ণয় করিয়াছিলেন ; সেই সংস্কারও ইংরেজী নীতিজ্ঞান বা খৃস্টীয় শুচি-বায়ুর দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত। দ্বিতীয়তঃ, ক্ল্যাসিকাল কাব্যরীতির প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী বলিয়া, 'স্মর-গরলে'র ক্ল্যাসিকাল 'form'-এর অন্তরালে রোমান্টিক ভাবাবেগের প্রশ্রয় তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। অর্থসঙ্গতির অভাব, অথবা ভাববিরোধ লক্ষ্য করিয়াছেন এইজন্য যে, ঐ ভাষা ও ভাবের আকরগুলা তাঁহার জানা নাই—হিন্দু-ভাব-চিন্তার যে প্রসিদ্ধ বাক্‌পদ্ধতি আছে, তাহার সহিত পরিচয় নাই। আমার কবিতায় কবিত্বের দোষ-গুণ যেমনই থাকুক, রচনার অর্থ-সঙ্গতিও যদি না থাকে, তবে আমাকেই তাহার জবাবদিহি করিতে হয় ; অর্থাৎ টীকা-ভাষ্য লিখিতে হয়। কবিতা লিখিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছি।

তাই দুই-একটি কথা মাত্র বলিব। অনেকের বিশ্বাস, আমার কবিতাগুলির আদর্শ খাঁটি বিলাতী। একজন খাঁটি বাঙালী কবি সেদিন আমার 'মিলনোৎকণ্ঠা' কবিতাটিকে জারজ বলিয়াছিলেন। কেন বলিয়াছিলেন তাহাও বুঝিতে পারি। বাংলা কবিতা যদি এই অর্থে বিলাতী হয় যে, তাহার শিল্পরীতি, অলঙ্কার, রূপায়ণ প্রভৃতি ইংরেজী কাব্যকলার অনুরূপ, তবে তাহা মিথ্যা হইবে না। কিন্তু আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যাবতীয় রূপকর্ম ইংরেজী কাব্যকলার অনুসারী ; বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ কাব্য-প্রেরণাকে সেই রূপায়ণ-রীতির অধীন করিয়াই বাংলায় নবসাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য একরূপ বর্জন করিয়াছিলেন। অতএব, আমার কবিতার বহিরঙ্গ বিলাতী কাব্যকলার অনুরূপ হইলেও, তাহা 'adaptation'—তাহাও একরূপ সৃষ্টিকর্ম, তাহাতে কোন অগৌরব নাই। কিন্তু কবিতার প্রেরণাও আমি য়ুরোপীয় কাব্য হইতে লাভ করিয়াছি, একথা সর্বৈব সত্য নহে। বরং, যে কবিতাগুলিতে ভাব-বস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাহা সম্পূর্ণ নিজস্ব, অর্থাৎ আমার বাঙালী-সংস্কৃতি বা রক্তগত প্রেরণার ফল। যাঁহারা ভারতীয় দর্শন ও বাংলার বিশিষ্ট ভাবসাধনাকে কাব্যপ্রেরণার বিষয়ীভূত দেখিতে (দার্শনিক তত্ত্ব বা সাধনতত্ত্বরূপে নয়) অসম্মত নহেন, তাঁহারা 'নারী-স্তোত্র' বা 'বুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতার ভাববস্তু দুর্নীতিপূর্ণ বা বিজাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া ভুল করিবেন না ; ইহাই মনে রাখিবেন যে, এমন কোন ভাব, এমন কোন চিন্তা

নাই যাহা কোন-না-কোন রূপে এই ভারতের, তথা বাংলার জল-মাটিতে বিকশিত হয় নাই; কেবল, তাহার সকলগুলি কাব্যসাহিত্যের উদ্যানে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 'স্মর-গরলে'র কবিতাগুলিতে যে একটি সুর বেশি করিয়া বাজিয়াছে, তাহাও এই বাংলার জল-মাটিতে নিহিত আছে—সে সুর 'বৈষ্ণব' নয়, অপর সাধনার সুর। যেহেতু গত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাংলা কাব্যে ঐ 'বৈষ্ণব' সুরই প্রধান হইয়া আছে, এবং অপর সুরটি জীবন-রসে রসায়িত হইয়া খাঁটি কাব্যের সুর হইয়া উঠে নাই, সেজন্য আমার কবিতা, ইংরাজীওয়ালা নীতিবাগীশের কাছেও যেমন, 'ললিতলবঙ্গলতা'-বিলাসীদের কাছেও তেমনই, উপাদেয় হইতে পারে নাই। 'স্মর-গরলে'র ভূমিকার ছলে ইহার বেশি বলিবার উপায় নাই—বলাও শোভন নহে। সর্বশেষে, যদি ইংরেজ কবির সেই বচন উদ্ধৃত করিয়া বলি—'I shall dine late but the dining-room will be well-lighted, the guests few and select", তাহা হইলে কেহ অপরাধ লইবেন না।

দোলপূর্ণিমা
১৩৫৪

মোহিতলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

বন্ধুবরেষু

এ নহে সে দ্রাক্ষারস, আসব শীতল—
যৌবন-যামিনীযোগে দোঁহে মুগ্ধ-প্রাণ
পিয়েছিনু এক-সুখে, একটি সে গান
গুঞ্জরি' স্খলিত-ভাষে, দুরাশা-চপল!
এক দিন আছিল যা সফেন-তরল,
আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস! সে মধুর ঘ্রাণ
আছে কি না দেখ দেখি? পাত্র-শেষ পান-
তবু কি সহিবে কণ্ঠে স্মর-গরল?

গরল?—এ গ্লানি মিথ্যা জানি, তবু তারে
ঐ নামে আজো হায় বাসি যে মধুল!—
পিপাসার জ্বালা যত, বারি স প্রচুর
অধর সরস করে নয়ন-আসারে!
সেই জ্বালা নিবে আসে দেহ-দীপাধারে—
আমি গাই, তুমি শোন তারি শেষ-সুর!

মাঠের বাড়ি, কাঁচরাপাড়া
রাস-পূর্ণিমা, ১৩৪৩

স্মর-গরল

আমি মদনের রচিনু দেউল—দেহের দেহ্‌লী 'পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ-ফুল সাজাইনু থরে থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ—
পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তায় আঁকিনু যতন-ভরে।

মধু-ঋতু সাথে মাধবের সখা দাঁড়াল দুয়ারে মোর,
অনঙ্গ পুন অঙ্গ ধরিল—বর-বেশে এল চোর!
ধ্বজ পতাকায় অম্বর ছায়,
রাগ-রাগিণীরা বন্দনা গায়,
নাচে চারিভিতে কলা-বধূদল—পায়ে বাজে পাঁয়জোর।

হেরিনু তাহার কলঙ্ক শোভে কুঞ্চিত কালো কেশে,
মধুর অধরে মঞ্জু পিপাসা মিলাইয়া যায় হেসে !
অঙ্গদে ফুরে বিদ্যুদ্দাম,
ধনুখানি তার আজও উদ্দাম—
বুকে আছে তবু বিভূতির রেখা দাহনের অবশেষে !

নব-তনু তার নেহারি' নেহারি' আঁখি হ'ল অনিমেষ,
সারা যৌবন জপিনু তাহার অপরূপ যোগী-বেশ !
হর-নয়নের বহ্নির কণা
দেহ হতে তার আজও ঘুচিল না—
তাই মদনের হাসি-মুখে একি বেদনার উন্মেষ !

সেই সে মূরতি ধেয়াইনু যবে স্বপন-সোপানে বসি'—
একে একে মোর মনের নিশীথে উল্কারা গেল খসি'।
বাঁশীতে বাজিল ব্যথার সোহিনী,
রতি হ'ল রাধা চির-বিরহিণী,
কেলি-কদম্ব-মূলে বিরাজিল উদাসীর বারাণসী !

স্মর-গরলের জ্বালা হ'ল তার বুকের নীলাম্বরী—
মোর কাম-বধূ বিধিমতে জাগে বিয়োগের বিভাবরী।
নীবি বাঁধা বটে মণি-মেখলায়,
আঁখির কাজলে বিজুলী খেলায়,
ফুল-বিছানায় তবু সে যে মোর চিতানল-সহচরী !

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট ! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলা-রভসে নহি আমি উৎসুক।
মোর কামকলা—কেলি উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস,
আমি যে বধূরে কোলে ক'রে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ !

দুই ভুরু মাঝে বিন্দুসমান আলো জ্বলে অনিমিখ !
রূপোন্মাদের তৃতীয় নয়নে হারায় দিক্-বিদিক !
পরশ-লালসে মদালস তনু—
ভেঙে কুটি-কুটি করি ফুল-ধনু,
তারি টঙ্কার-ঝঙ্কারে রচি রতি-বিলাপের ঋক্ !

আপনারি দেহ-শবাসনে বসি' শ্মশানের বিভীষিকা
নিবারিয়া জ্বালি' অমার আঁধারে অলকার দীপশিখা !
অঙ্গারে আর অস্থিমালায়
অতি অপরূপ রূপ উথলায়,
হেরি, দিকে দিকে খুলে যায় চোখে জীবনের যবনিকা !

দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা !
এই সুগঠন দেহ-উদূখলে
কঠিন মর্ম্ম দলি' কুতূহলে,
আমি নিদাঘের দাবদাহে রচি হিন্দোল-মূর্ছনা !

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ !
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না !
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত !

আর সে বিষাণে প্রলয়-নিনাদ তুলিবে না শঙ্কর—
রূপলক্ষ্মী যে বিরূপাক্ষের ভরিয়াছে অন্তর !
দেহ-লাবণ্যে হোমানল জ্বালা—
কর-কমলের জপ-বীজমালা
শ্মশানেশ্বরে করেছে উতলা—সুধা-বিষ-জর্জর !

মিলনোৎকণ্ঠা

বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার—
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার !
কাজলের রেখা আঁকা-আঁখিপাতে,
'কাজল-লতা'টি ধরে' আছে হাতে,
করমূলে বাঁধা লাল সূতা সেই—অলঙ্কার !
শুনেছি সে রূপ চমৎকার !

পরেছে বসন—বুঝি লাল চেলী, ডালিম-ফুলী ?
দুরু-দুরু-হিয়া—মণি-হার তার উঠিছে দুলি' ।
এয়োরা যখন শঙ্খ বাজায়
বধূ চমকিয়া ইতি-উতি চায়,
আকুল কবরী, রুখু-ভুখু চুল পড়িছে খুলি'—
হিয়া দুরু-দুরু উঠিছে দুলি' ।

কত দিবানিশি কাটানু স্বপনে—সেই সে মুখ
দেখি নি কখনো, তবু সে আমার ভরেছে বুক !
প্রাণের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল—
সকালে শেফালী, বিকালে বকুল,
ফুটিয়াছে নীপ—বরষা-আসারে ভরসা-সুখ,
সে মুখ আমার ভরেছে বুক ।

এত দিনে বুঝি বিরহ-যামিনী হয়েছে ভোর—
বাঁশী বাজে ওই—এবার নয়নে লেগেছে ঘোর !
হাতে হাতে সেই বাঁধি' মালাখানি
আর কতখনে পরশিব পাণি ?
এসেছে কি আজি সে সুখ-লগন জীবনে মোর—
স্বপন-রজনী হয়েছে ভোর ?

পাতি' ফুল-শেজ বসিব দু' জনে কথা না বলি',
চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন-কুসুম-কলি।
সে রূপ নেহারি' আঁখি অনিমেষ—
প্রদীপ জ্বালায়ে হবে রাতি শেষ!
ভুলে যাব গান, ফুলের মধুও ভুলিবে অলি—
শুধু চেয়ে র'ব কথা না বলি'।

বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ—চোখের চাহনি চমৎকার!
আর কত দেরি গোধূলি-লগন?—
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,
শুধু সেই চেলী উজলি' তুলিবে অন্ধকার—
সেই আঁখি-তারা চমৎকার!

রূপ-মোহ

আমার অন্তর-লক্ষ্মী দেহ-আত্মা-মানসের
শেষ-তীর্থে শুচি-স্নান করি'
দাঁড়াইল মুক্ত-লজ্জা, সজ্জা শুধু সিক্ত কেশ—
মুক্তাস্রাবী তিমির-নির্ঝর!
সিত হ'ল সিঁথিমূল, মৃগমদ-চন্দনের
পত্রলেখা উরস-উপরি
নাহি আর,—সর্ববরাগহারা এবে, তাই তার
রূপরেখা অনিন্দ্য-সুন্দর!
মৃত্যু সাথে জীবনের নিত্য শুভ-সন্ধিক্ষণে
যে আলোক চকিতে মিলায়
গোধূলির ম্লান মুখে, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তের
শেষ আভা ঈষৎ লোহিত
ভাতিল অধরে তার—উষার তুষারে যেন—
কুণ্ঠাহীন মৌন-মহিমায়!
হেরি' তায় মূরছিনু, মর্মগ্রন্থি ছিঁড়ে গেল—
মন তবু হ'ল যে মোহিত।

অর্ধ-স্বচ্ছ নীলাম্বরে তারার অন্তিম রশ্মি,
আধা-অশ্রু আধা-জ্যোতির্ময়,
হেরিনু ললাটতলে—বড় দূর !—আছে তবু
একটুকু অতীত মমতা ;
না, সে বুঝি অশ্রু নয়, স্নান-শেষ নীর-বিন্দু
পক্ষ্মতলে লগ্ন হয়ে রয়—
একি মূর্তি উদাসিনী !—সর্ব অঙ্গ বেড়ি' তবু
লাবণ্যের একি নিষ্ঠুরতা !

মনে হ'ল, একি সেই ?—কণ্ঠে যার পরাইনু
সর্বসুখ-বিনিময় পণে
কল্পনার পঞ্চনরী (ধুক্ ধুক্ করে বুকে
পাঁচখানি ধুক্‌ধুকি তার)—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি অঙ্গরাগ
মিলাইনু যার প্রসাধনে
প্রাণের সঙ্গীত-রসে—এক পাত্রে ধরেছিনু
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপচার !
যার বেণীবন্ধ হতে মায়ার দর্পণখানি
সন্তর্পণে খুলি' লয়ে হাতে
হেরিলাম মুখচ্ছবি রন্ধ্রহীন অন্ধকারে,
দুর্বিষহ হর্ষে শিহরিয়া—
আমারি নয়নে যেন তার দুটি আঁখিতারা
ফুটে আছে অসীম তৃষাতে,
বুঝি না, দোঁহার মাঝে কেবা নিদ্রা যায়, কেবা
জাগে কার চেতনা হরিয়া !
যার গুরু উরুতটে একদা পূর্ণিমা-নিশি
পরায়েছে চারু চন্দ্রহার
সরায়ে শিথিল নীবি, বধূ যবে সংজ্ঞাহারা
আদরের মধুর লগনে,—
সেই মোর প্রাণেশ্বরী আজ মোরে চিনিল না !
সর্ব স্মৃতি পরিচয়-ভার
নিমেষে মোচন করি' চাহিল সে আনমনে
অন্তরীক্ষে, সুদূর গগনে !

বুকে ক'রে ছিনু তারে—সারা নিশি নিদ্রাহীন,
স্পর্শ সুখে মুগ্ধ অচেতন,

আমারি স্বপনে তার নিমীলিত আঁখিপুট
বার বার দিয়েছিনু ভরি'
জ্যোৎস্না-পাণ্ডু যামিনীর গণ্ডে যথা উল্কা-চিহ্ন—
মুখে তার আঁকিনু চুম্বন
আপনার অগ্নিবেগে—সে সোহাগে সখী মোর
সচকিয়া উঠে নি শিহরি' ?
প্রেমের আকুতি যবে ফুরিল অধরে তার
কম্প্রকণ্ঠে, স্তিমিত প্রদীপে,
আড়ি পাতি' বাতায়নে আছিল যামিনী চুপে—
শুনে তায় হেসেছিল নাকি ?
আমি তো জানি নি কিছু ! কার ছায়া এত কাল
আগুলিয়া শয়ন-সমীপে
নেহারিনু অনিমিখ ? নারী কিংবা অপ্সরা সে ?—
আঁখি তার রেখেছিল ঢাকি' !
এই কি স্বরূপ তার ! এ নহে বাসর-বধূ,
সীমন্তিনী, ভবন-সারিকা—
সেই মুখে একি হাসি !—আরতির দীপ-ভাতি
প্রতিমার নিথর বয়ানে !
সহসা স্মরিনু সেই গঙ্গাতীরে শান্তনুর
স্বপ্ন-শেষ-প্রেম মরীচিকা—
দেবী সে, প্রেয়সী নয় !—এ যে তাই আরো রূপ !
একি মোহ স্নেহ-অবসানে ?

বিভাবরী

আজি তার যৌবনের জ্যোৎস্না-ত্রয়োদশী-
রাত্রি জাগে রজনী রূপসী ।
সোনার প্রদীপখানি জ্বলিছে শিয়রে,
তারার মল্লিকামালা, জুঁই থরে থরে
ভরিয়াছে ফুলশয্যা তার,
খুলিয়াছে কবরীর গজমোতি-হার ।

সোনার চুম্‌কি-দেওয়া নীল বারাণসী
পরিয়াছে রজনী রূপসী।
সে যে শ্যামা, তবু তার লাবণি হিরণ,
রূপে তার ডুবে আছে কৌস্তুভ-কিরণ!
আলোকের পালঙ্ক-শায়িনী
মৌনবতী রাজবালা—ছায়া-মায়াবিনী!

বালা-বধূ উষা নাকি রবির প্রেয়সী—
কার প্রিয়া রজনী রূপসী?
নয়নে পড়ে না তার জোছ্‌না-পলক,
কেবা জানে কিবা তার প্রাণের পুলক?
ছড়াইছে ধরণীর' পর
মুঠি-মুঠি শুভ্র রেণু কুসুম-কেশর।

আলোকের সভাতলে নহে সে উর্বশী—
সুগভীরা রজনী রূপসী।
যে মানস-যৌবনের বেদনা বিপুল
নিখিলের সর্ব শোভা সুষমার মূল,
সেই গাঢ় গূঢ়তর ছায়া
বেড়িয়াছে রজনীর নীল-পাণ্ডু কায়া!

তাই তার এত রূপ—লয়ে তারা শশী
হাসে হের রজনী রূপসী।
সে আলোকে আঁখি মেলি' দেখিনু স্বপন-
চেতনার পরপারে আছে যে ভুবন,
রাত্রি বুঝি রূপলক্ষ্মী তার,
মানস-নন্দিনী সে যে আদি বিধাতার!

জাগিছে বাসর একা তরুণী ষোড়শী
উদাসিনী রজনী রূপসী।
অঙ্গ হতে মুছিয়াছে চন্দন কুঙ্কুম,
নূপুরে বাজে না আর ঝিল্লি ঝুম্‌-ঝুম্‌,
হের, সিঁথি-ছায়াপথ 'পরে
একখানি মণি নাই—সে যে ধূ ধূ করে!

প্রগল্‌ভ দিবার সে যে অধিক-বয়সী—
ধ্যান-রতা রজনী রূপসী।
কি রহস্য ধেয়াইছে দিগন্ত-শয়নে
জ্যোতির্ময়ী তমস্বিনী বিনিদ্র নয়নে ?—
মুখে তার মোহিনী মহিমা,
আঁধারে খুঁজিছে যেন আলোকের সীমা !

নিশুতির নিস্তরঙ্গ শোভার সরসী
নেহারিছে রজনী রূপসী।
মনে হয় এই বার খুলিবে কাঁচলি—
স্ফটিকের দীপখানি তুলিছে উজলি'।
আঁখি হ'ল স্বপন-মদির,
খুলিতে রূপের বাঁধ হৃদয় অধীর।

হেরি পুন, পৃথিবীর শবাসনে বসি'
হাসে যেন ষোড়সী রূপসী !
মহাকাল-জায়া ও যে শবরী শর্বরী—
পান করে আপনারি সংজ্ঞা অপহরি',
ত্রিলোকের মৃত্যু-সুধারস—
আলোকের হাহা-রবে হাসে দিক দশ !

আজি এই রজনীর জ্যোৎস্না-ত্রয়োদশী
যাপি একা বাতায়নে বসি'।
কল্পনা যে হার মানে—হিমসিক্ত কেশে
ঢলে' পড়ি রজনীর সে রূপ-আবেশে !
অবশেষে গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
একটি যে নাম জপি—সে যে 'বিভাবরী' !

রতি ও আরতি

আমি কবি, অন্তহীন রূপের পূজারী—
আমারো যে আছে প্রিয়া, হৃদয়ের চিরতৃষাহারী,
এ কথা বুঝাই কারে, বুঝাতে কি পারি ?

কে রূপসী আলুলিয়া কেশপাশ তরল তিমিরে,
না রাখি' চরণ-চিহ্ন পীত-পাণ্ডু সিকতায় সন্ধ্যাকালে ফিরে সিন্ধুতীরে !—
মৃদু-মন্দ জলোচ্ছ্বাস অলক্ষিতে বেলা-বালুকায়
দুগ্ধফেন-শুভ্রধারে পদে পদে এঁকে দেয় আলিপনা বুদ্বুদ-মালায় ;
মাঝে মাঝে শুক্তিস্তরে ঝলসিয়া উঠে তার চরণ-নখর,
আনমিয়া তনু যবে আঙুলে পরশ করে শীকর-নিকর—
খসি' পড়ে কটি হতে সুবিচিত্র ঝিনুক-মেখলা,
অমনি দিগন্তে হোথা সলিল-শয়নতলে হেসে উঠে নব শশিকলা !

—হেন রূপ যে করে সন্ধান,
সে কেমনে ভালবাসে ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, আঁখিকোণে কাজলের টান !
সে কেমনে রুধি' বাতায়ন,
শিয়রে প্রদীপ জ্বালি' চেয়ে থাকে সতৃষ্ণ-নয়ন ?—
রোমাবলী-সম কেশ শোভে যেথা গ্রীবা-তটে কবরীর মূলে,
পাশে তার এক-বিন্দু আলো যেন কনকের দুলখানি দুলে ;
পদনখ হতে তার অলক-অবধি
একটি সে নারীদেহে তরঙ্গিয়া উঠে যেই লাবণ্যের নদী—
তাহারি মাঝারে
মনের মাণিকখানি হারাইয়া বসে' থাকে তটের কিনারে !
এ রহস্য বুঝাতে কি পারি—
হৃদয় হরিল তার কি কুহকে সামান্যা সে প্রণয়িনী নারী ?

রজনীর অন্ধকারে যে-পিপাসা স্বপ্ন রচি' ঊর্ধ্বাকাশে জ্বলে বহ্নিহীন,
ভস্মাবৃত ছায়াপথে কভু বা বিলীন—
সে পিপাসা জাগে যদি মর্ত্য-মরু-মৃগতৃষ্ণিকায়,
তখন সে বারিহীন সিন্ধু-সিকতায়
নৃত্য করে মায়াবিনী স্বপ্ন-নিশাচরী—
বায়ুর দর্পণে তার ছায়া কাঁপে, ঘন-নীল দীর্ঘ নীলাম্বরী
দেখা যায় বালু-প্রান্তে—নদী যেন সুনীল-সলিলা !
রূপসীর সেই নৃত্যলীলা
মৃত্যু হানে !—নিশীথের স্নিগ্ধ তারাহারে
যে আঁখি জুড়ায়, সে কি ধরণীর বালুকা-পাথারে
চেয়ে থাকে মধ্যাহ্নের মরীচি-মালায় ?—
কাজলের লাগি সে যে মৃৎ-পাত্রে প্রদীপ জ্বালায় !

বল দেখি, কমলের বঁধু অলি, না সে ওই আকাশের রবি ?—
রূপ যে স্বপন তার—কামনার ধন নয়, বাসনার ছবি !
রূপসীর করে পূজা প্রেয়সীরে ভালবাসে কবি ।
রূপ নহে সেই রস, রতি নয়—সে শুধু আরতি,
মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি !
সে তো নহে ভোগ-প্রায়োজন,
সে নয় প্রাণের ক্ষুধা—প্রেম নয়, নয় সে তো দেহ-পদ্মে মধু-আস্বাদন!—
দুঁহু দোঁহা ভুঞ্জে শুধু, দুই-আমি এক-আমি হয়,
আত্মরস-রসাতলে স্বর্গ-মর্ত্য-নিখিলের লয় !
আঁখির অমৃত-বর্তি বলি যারে, চাহি' তার মুখে সেইক্ষণে
আঁখি যে মুদিয়া আসে, চেতনা হারায়ে যায় প্রাণের গহনে—
তাই তার রূপে কি বা কাজ ?
'কালা কিম্বা গোরা'—ভুলি, তনু-মন সমর্পিতে নাহি পাই লাজ ।

তবু তার রূপ চাই? কবিচিত্তে রূপের পিপাসা
মিটে না প্রীতির রসে—রূপ আগে, পরে ভালবাসা ?
—এ হেন সংশয়
জাগে মনে সবাকার, তবু সে কি সত্য মনে হয় ?
যে প্রতিভা শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে রূপ দেয় চঞ্চলে তরলে,
ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে,
সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে,
তার প্রিয়া রূপহীনা—হেন অপবাদ কভু তারে কি সম্ভবে !

যেই আমি আমা হতে মুক্তি চাই কল্পনার নিশীথ-স্বপনে,
সেই আমি বাঁধি পুন আপনারে চেতনার জাগ্রৎ ভুবনে ।
আমারি ঐশ্বর্য তাই হেরি আমি তার দেহমাঝে,
তাই সে সুন্দর হেন, সাজিয়াছে মোর দেওয়া ফুল্ল ফুলসাজে ।
যে-আঁখি ধরিতে চায় অসীমের সৃষ্টি-সীমা একটি পলকে !
সে-আঁখি যে রুদ্ধ হয় তার সেই অতি ক্ষুদ্র ললাট-ফলকে !
একমাত্র তারে হেরি, আর যেন কেহ কোথা নাই !—
অধরে বাসন্তী উষা, সিন্দূরে বালার্ক-ভাতি,
নেত্রে তার নীলাকাশ দেখিবারে পাই !

দেবদাসী

ওগো দেব! তুমি চাহ না আমারে,
চাহ মোর বরতনু ?
কুটিল নয়নে কাজলের ফাঁদ,
নিতি নব-নব কবরীর ছাঁদ,
গ্রীবা কটিমূলে, ভুজ-ভঙ্গীতে
অতনুর ফুলধনু ?

বহিব কি শুধু বুকের উপরে
কঠিন কনক-গিরি ?
সলিল-তরল মুকুতার হার
উছলি' উঠিবে শুধু অনিবার—
উপলের তলে বহিবে না কভু
নির্ঝর ঝিরিঝিরি ?

তব দেউলের দ্বারে বন্দিনী
উৎসব-দাসী আমি !
আমি সে নটিনী, তুমি নটনাথ,
তোমার নয়নে অসি খর-ঘাত—
ছন্দে ও লয়ে তাল কাটে কিনা
নেহারিছ দিন-যামি !

চূড়া-কেশে বাঁধা কুসুম-কেশর
মলিন হ'ল যে ভালে !
বক্ষে শুকায় স্বেদ-চন্দন,
একি নিকরুণ নীবি-বন্ধন !
বলয়ে-নূপুরে কেঁদে উঠে দেহ
সঙ্গীত-সুর-তালে !

ছিঁড়ি' মমতার মৃণাল-তন্তু,
সরায়ে সরসী-জল—
দূর করি কাঁটা,—মধু পাসরিয়া,
পরাণের গূঢ় পরাগ হরিয়া,
চয়ন করিলে নয়নের লাগি'
ফুল-শোভা সুবিমল !

বাঁশী-সঙ্কেতে বরিলে যাহারে
বাসরের সঙ্গিনী,
আমি যে তাহার লীলা-শতদল,
ভরি করপুট, লভি পদতল,
খসে যাই চুপে—ফিরেও চাহে না
রাস-রস-রঙ্গিণী !

আমি দেবদাসী, দেবী নই আমি—
দাবি নাই সুধাপানে ;
আমি নারী নই—নরের গেহিনী,
আমি সবাকার মানস-মোহিনী,
আমি দেবতার ভোগের প্রসাদ
ভক্তের পূজা-দানে !

নয়ন অন্ধ, শ্রবণ বধির—
নৃত্য-পুত্তলিকা !
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ,
নেচে ওঠে মোর সকল অঙ্গ,
প্রাণ নাই, তবু গান গাই আমি—
সৃষ্টির প্রহেলিকা !

তবু মনে হয়, কে যেন আমারে
ডেকেছিল কত বার—
নদীর কিনারে তরুতল-ছায়ে
মাটির উপরে আসন বিছায়ে ;
পিপাসার জল, দুটি স্বাদু ফল
সম্বল ছিল তার !

বাঁশের বাঁশীতে প্রভাতী রাগিণী
গেয়েছিল দূর হ'তে ;
শরতের দিন, বাদলের রাতি,
শিশুর অধরে স্বরগের ভাতি,—
কত কুলুকুলু কত মর্মর
সে গীতলহরী-স্রোতে !

শুনি পুনরায়, মন্থর মৃদু
বাঁশীতে ভরিছে শ্বাস। ।
আকাশে ফুটিল একটি যে তারা
শেষ-বিদায়ের অশ্রুর পারা—
নীল-লোহিতের নিমীলিত চোখে
নিশীথের আশ্বাস !

নাট-দেউলের নটিনী যে আমি,
তোমারি দুয়ারে বাঁধা !
মমতার মোহ, প্রণয়ের পাপ
হানিবে আমারে সুকঠিন শাপ,
কটির মেখলা মূক হয়ে যাবে
নূপুরে বাজিবে বাধা !

যবে সে ক্ষণিক ধূপের ধোঁয়ায়
তোমারে আড়াল করে,—
পলকে লুটাই আপনার পায়,
নয়নের কূলে কুহেলি ঘনায়,
প্রাণের ভিতরে হাহা করে প্রাণ
ধরণীর ধূলি-তরে ।

হেরি চমকিয়া—তোমারি সে ছায়া
বেড়িয়া রত্নবেদী
আরতির কালে করিছে নৃত্য,
মথিয়া পরাণ, মথিয়া চিত্ত—
একি ইঙ্গিত জাগে সঙ্গীতে
করুণ মর্মভেদী !

ফুৎকারে যেন সহসা নিবায়
শতাধিক দীপমালা !
আলোকের পিছে হেরি সেই ছায়া—
বিরাট বিপুল অসীমের কায়া !
মনে হয়, যেন কেহ কোথা নাই
নীরব নাট্যশালা !

পূজা শেষ হয়, আরতি ফুরায়—
তখনি দাঁড়াই ফিরে ;
অলকের মণি ঝলকিয়া উঠে,
বুকের কলস ছলকিয়া উঠে,
গুরু উরু দোলে, নাচি তালে তালে
মুখরিত মঞ্জীরে !

এই ভালবাস ?—আমার জীবনে
এই কি তোমার কাজ ?
র'ব অচেতন রূপেরি শাসনে,
তুমি বসি' র'বে আপন আসনে—
নেহারিবে শুধু চারু কারুকলা
শত বরণের সাজ ?

দিবে কি আমারে চির-যৌবন—
হরিবে কি মোর জরা ?
কণ্ঠে আমার ফুরাবে না সুর ?
পড়িবে না খসি' পায়ের নূপুর ?
র'বে কি রূপের মোহ-মঞ্জরী
চিরদিন মধুভরা ?

চিরদিন তুমি চাহিবে এমনি
অপলক অচপল ?
ওগো সুন্দর সুঠাম পাষাণ !
তব দেউলের চূড়ার নিশান
কভু টলিবে না ? টুটিবে না মোর
নিয়তির শৃঙ্খল ?

নারীস্তোত্র

তোমার চরিত, নারী, কত জনে কত যে বাখানে—
অযুতাঙ্ক নাটকের এক নটী—তুমি নিপুণিকা !
কত নিন্দা, কত স্তুতি !—স্বপনের সীমান্ত-সন্ধানে
ছুটিয়াছে পিছে-পিছে ধরিবারে রূপ-মরীচিকা
কত কবি, কত ঋষি হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা
চির-শাস্তি মানবের—তনু তব নরকের দ্বার !
'শয়তানে'র মোহমন্ত্র, তুমি তার সহজ-সাধিকা—
আদি-মাতা 'ইভ' সেই শিখাইল সহচরে তার
রসাল ফলের স্বাদ, হ'ল যাহে চিরতরে স্বর্গ-বহিষ্কার !

দুষ্টমতি বিধাতার সৃষ্টি তুমি—সুর-তিলোত্তমা ?
অসুরের সর্বনাশ—স্বর্গনাশ—তোমারি কারণে !
রিপুর দর্পণে তুমি নর-চক্ষে দেবী নিরুপমা,
পুরুষের পুরুষার্থ হরি' লও—রহে না স্মরণে !
তুমি তন্বী জ্যোতির্লতা ! নৃত্য কর নীল-নবঘনে—
কভু বজ্র, কভু বারি, নাহি তব ছলনার শেষ !
অনিন্দ্য-সুন্দর ফুল, বৃন্ত বাঁধা বিষধর সনে !
সে রূপ নেহারি' আঁখি নিদ্রাকুল, তবু নির্নিমেষ ;
চরণে লুটায় নর, তবু তার বুকে সে কি বিষম বিদ্বেষ !

এ ধরার মরুমাঝে তুমি কি গো প্রস্তর-প্রতিমা—
পুরাতন মিশরের প্রশ্নময়ী মূরতি ভৈরবী ?
অধরে অদ্ভুত হাসি—মানবের প্রতিভার সীমা,
প্রজ্ঞা ও পৌরুষ-দম্ভ, অমৃতের আস্ফালন—সবি
উপহাসি' চিরদিন আছ মূক ধিক্কারের ছবি
যুগান্তের বালুকা-শ্মশানে ! কত রাজ্য অবসান,
অস্ত, গেল অন্ধকারে কত নব-অভ্যুদয়-রবি !—
তুমি চির-প্রহেলিকা, আজও তার নাই সমাধান,
দেব, দৈত্য, নর—কেহ পায় নাই কভু তব রহস্য-সন্ধান !

ভূগর্ভের অগ্নি তুমি, ধরা-দেহে নিগূঢ়-সঞ্চার—
তোমারি অলক্ষ্য তাপে ঋতুলক্ষ্মী পুষ্পফলবতী ;
তুমি উৎস জ্বালামুখী, অকস্মাৎ অনল-উদ্গার—
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস তোমারি সে প্রকট মূরতি !

গৃহকোণে দীপ তুমি—আঁধারের মধুর আরতি,
বনে তুমি দাবানল—দিগন্তের দাহন-উৎসব !
হোম-ধূমারুণ-আঁখি বধূ তুমি, ব্রীড়া মূর্তিমতী !
তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা, নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ-গৌরব—
অধর পিপাসা-পাণ্ডু, নয়নে আরক্ত রাগ আসব-সম্ভব !

তাই প্রেম-বৃন্দাবনে তুমি কভু হৃদয়-রাধিকা—
ঘাট হতে চল পথে, নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি',
পরাণ তাহারি সাথে—তুমি সখী পরাণ-অধিকা,
নওল-কিশোরী প্রিয়া, পরকীয়া-বধূ বরনারী !
রুদ্রের ঘরণী কভু, সতী তুমি, দক্ষের ঝিয়ারী—
দশমহাবিদ্যা-রূপা—ধূমাবতী, ষোড়শী, কমলা !
তুমি শক্তি সংহারের, শিব নমে চরণে তোমারি—
অসুরনাশিনী চণ্ডী, কালী তুমি কপালকুণ্ডলা !
তুমি মায়া মাহেশ্বরী, ত্রিসন্ধ্যা-সাবিত্রী তুমি লোহিতকুন্তলা !

তুমি নারী, নর-বধূ, তুমি তার দেহ-সহচরী—
কল্পনার কাম-স্বর্গে তাই তুমি মোহিনী অপ্সরা ;
তুমি দেবী, সুধাসিন্ধু-মন্থ-শেষ কল্যাণ-ঈশ্বরী,
ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী রমা তুমি, বিষ্ণু-স্বয়ম্বরা !
অবিদ্যারূপিণী, ধনি, ধ'রে আছ মিথ্যার পসরা,
উড়িছে ঘাগরি তব দিকে দিকে বিবিধ-বরণ !
যৌবন-সঙ্কটে তুমি প্রাণেশ্বরী পীন-পয়োধরা—
জায়া-স্বসৃ-মাতারূপে কর যার মরণ বারণ,
মদন-সদনে তারে বাহুপাশে বাঁধি' আয়ু করিছ হরণ !

তাই দ্বন্দ্ব চিরন্তন, অন্তহীন কলহ সংশয়—
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড তাই বাম করে !
তুমি সত্য , তুমি মিথ্যা, তুমি ভয়, তুমিই অভয়—
প্রলাপ বকিছে কবি, যোগী শুধু অট্টহাস্য করে ।
শাস্ত্র আর সংহিতায় বাঁধা তুমি নিয়ম-নিগড়ে !—
সৃষ্টির প্রাণের স্ফূর্তি, বন্ধহারা আনন্দরূপিণী,
মৃত্তিকার সোমলতা, সুধাভাণ্ড মৃত্যুর অধরে—
সেই তুমি—আদিরস-উৎস-ধারা মুক্ত প্রবাহিনী !
তোমারে বাঁধিবে কেবা?—বিধি পরায়েছে যার চরণে কিঙ্কিণী !

দুই নয়, এক সে যে !—নহে বিষ, নহে সে অমৃত !—
জীবন মরণ নাই, আছে শুধু সৃষ্টির উল্লাস ।
নাই মন, নাই মোহ ; আছে শুধু ছন্দ অনিন্দিত
আনন্দের ; নাই ভয়, নাই কোন স্বর্গের আশ্বাস !
ধরিত্রীর এই ধর্ম, তুমি তার মর্মের উচ্ছ্বাস ;
প্রলয় হয়েছে লয়, তুমি চির-সৃষ্টির সুষমা ;
তুমি কামনার কায়া, বিভু-হৃদি-পদ্মের পলাশ ;
চিন্ময়ী মৃন্ময়ী তুমি, শরীরিণী শোভা নিরুপমা—
রাসরসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়ম-হারা পীরিতি পরমা ।

বেদনার বিষহরী ! মৃত্যু—তব মঞ্জীর মেখলা—
নেচে ওঠে তালে তালে, গাও যবে জীবনের গান !
অসীম ব্যথার ভারে তবু তব হৃদয় উতলা
মমতার মহোৎসবে আত্মবলি করিবারে দান !
নয়নের বারি তব কামনারি অভিষেক-স্নান—
যত দুঃখ, যত শোক—তত সত্য এ ভব-ভবন !
সন্তান মরিছে বুকে, তখনি যে নব গর্ভাধান !
রক্ত-রাঙা বেদনার আলিম্পনে ভরিছ ভুবন—
বেদনা সে ?—কে বলিবে সুখ নয় অসহ্য সে প্রীতির দহন !

তোমারে চিনিতে নারি' পুরুষের অশান্ত ক্রন্দন—
ধরণীর ঘরণীরে স্বরগের দেবী-সমতুল
হেরিবারে চায় নর—চক্ষে ভাসে অলীক নন্দন,
আকাশ-কুসুম হয়ে ফুটে তাই মাটির মুকুল ।
তপনেরে তুচ্ছ করি' তারকার লাগি' সে আকুল !
ওই দেহ-রূপ-হ্রদে—টলমল রসের সায়রে—
জুড়াল না জ্বালা তার, ঘুচিল না জীবনের ভুল ?
সে চায় অমৃত-দীপ চিরনিশা-যাপনের তরে—
দেহহীন দেবতাত্মা !—দেবী চায় স্বরগের শয়ন-শিয়রে !

মিলনে মলিন তাই, তাই তুমি বিরহে শ্রেয়সী—
দুর্লভ প্রেমের ধ্যানে কত গীত গুমরি' ধ্বনিছে !
পায় নাই যারে কভু, সেই তার পরাণ-প্রেয়সী—
ইতালীর মহাকবি, তুমি তার প্রিয়া 'বিয়াত্রিচে' !
কত স্বর্গ-নরকের পথে পথে ধায় তার পিছে,

চরণ টলিছে মুহু, মুরছিয়া পড়ে বারবার।
উন্মাদ হেরিল শেষে—সান্ত্বনার বঞ্চনা সে মিছে—
উর্ধ্ব-স্বর্গে স্বর্ণজ্যোতি-কিরীটিনী মূরতি প্রিয়ার !
অমর সে মহাকাব্য, অমরীর স্তবগানে মোহিত সংসার !

আরও এক রাজকবি রচিয়াছে মর্মর-অক্ষরে
বিরহের মঞ্জু শ্লোক মমতাজ-মহিষীরে স্মরি' ;
আজও তার দীর্ঘশ্বাস হাহা করে কবর-গহ্বরে—
কবে প্রিয়া বেঁচে ছিল ?—চিরদিন রহিয়াছে মরি' !
মিলনে মিটে নি তৃষা, তাই দীর্ঘ বিরহ-শর্বরী
জপিয়াছে নাম তার ! চিনেছিল কভু কি তাহারে—
একান্ত সে ধরণীর বৃন্ত'পরে আনন্দ-মঞ্জরী ?
তবে কেন আঁখি ধায় পিছে-পিছে মৃত্যু-পরপারে—
জীবনের জয়মালা রাখে কেন মরণের শ্বেত শবাধারে ?

হায় নর! কে বলেছে নারী তব মানসের মিতা ?
উন্মাদ তাপস তুমি, সে তো নয় স্বেচ্ছা-তপস্বিনী !
তুমি শিল্পী, হেরিয়াছ নারী-মুখে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'—
দেহের সীমার শেষে তটহীন রূপ-মন্দাকিনী !
ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীরে জানি আমি—সে ব্রহ্মবাদিনী
ভুলেছিল নারীধর্ম—মুখে তার পুরুষ-ভাষণ !
তুমিই করেছ তারে মূঢ়, মূক, নিয়ম-চারিণী—
অম্বপালী যাচে তাই যোড়করে বুদ্ধের শাসন !
যুগে যুগে কত নারী হেন মতে ত্যজিয়াছে নারীর আসন !

পতিতা সে ? দেহ তার শুচি নয়?—পুরুষের মন
চায় রুক্ষ শমী-শাখা, গূঢ়তাপ যজ্ঞের সমিধ !
পর্যাপ্ত-স্তবক-নম্রা বসন্তের লতিকা শোভন
চায় বটে,—আপন মন্দিরে শুধু, ধূর্ত স্থানবিদ্ !
মুক্তবায়ু-বিহারিণী কেড়ে লয় নয়নের নিদ,
মুক্তির বিমল মুক্তা চায় না সে ডুবিয়া অতলে—
পাপ-ভীরু কৃপণের লক্ষ্য শুধু পুণ্যের কুশীদ !
রমণীর দেহ-মণিপদ্মে যেই আলোক উথলে—
জন্মান্ধের কিবা তায়?—স্পর্শ করে মৃদ্ভাণ্ড শুধু করতলে।

তাই তনু তুচ্ছ করি' ফিরে তার অন্তর তপাসি'—
বরাঙ্গে যেথায় নিত্য বিরাজিছে দেবতা সুন্দর
প্রাণের প্রত্যক্ষরূপে, হেরিল না যেথায় উদাসী

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু-আঁকা সেই শোভার নির্ঝর !
মাটির প্রতিমা বটে, মাটি বিনা সবই যে নশ্বর—
দেহই অমৃত-ঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান !
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মা-ভয়-বন্ধন-জর্জর
ভ্রমিছে প্রলয়-পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্বাণ-তীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান !

হের, ওই চলিয়াছে পথে নারী যৌবন-উন্মনা—
অপাঙ্গ লালসা-লোল, স্মিত হাসি স্ফুরিছে অধরে ;
অধীর মঞ্জীর, তবু শ্রোণীভারে অলস-গমনা,
বসনের তলে দুটি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।
কাংস্যঘটে গঙ্গাজল—সদ্যস্নাতা ফিরে যায় ঘরে,
তপ্ততনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত যামিনীর,
নাই লজ্জা, নাই খেদ ; মুক্তগতি মৃদুলীলাভরে
যায় চলি'—শুভ্রপক্ষ মরালী সে, ত্যজি' পঙ্ক-নীর !
অকুণ্ঠিত আনন্দের নির্ভয় মূরতি ও যে ভ্রষ্টা কামিনীর।

সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী—কালস্রোতে কমল-আসনা—
মুহূর্তে ধরিল রূপ মোর মুগ্ধ নয়নের আগে ;
হেরিনু সে বিশ্বধাত্রী, সবে করে তারি উপাসনা,
জন্ম-মৃত্যু বাঁধা আছে পায়ে তার অন্ধ অনুরাগে !
সে যে চির-উদাসিনী, তবু তার হৃদয়-পরাগে
কামনার মধু-গন্ধ, দেহ-দীপে করিছে আরতি
সুন্দরের—মূর্তি যার আত্মহারা কাম-সুখে জাগে।
প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ও যে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।

সেই এক-মূর্তি নারী !—গৃহলক্ষ্মী, জায়া ও জননী—
সেই ভোগসুখ-তরে সেই নিত্য আত্মবলিদান !
দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান !
হৃদয়ের ক্ষুধা তার মানে না যে ন্যায়ের বিধান,
যত দুঃখ তত সুখ, নাই পুণ্য-পাপের ভাবনা ;
সর্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ !
নিঃশেষে বিলায়ে দেহ হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
যে তার সর্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা !

নমি সেই মানবীরে—দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা ;
চিনেছি তোমারে, নারী, অয়ি মুগ্ধা মর্ত্য-মায়াবিনী !
বহিতেছ হাসিমুখে পুরুষের পাপের পসরা—
তোমারে নরকে সঁপি' হতভাগ্য স্বর্গ লবে জিনি' !
মানসমোহিনী অয়ি, মানবের দেহ-প্রসবিনী,
কবে স্বর্গ ঘুচে যাবে?—ঘুচে যাবে আত্মার প্রমাদ ?
তোমারি মাঝারে হেরি' নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিণী
লভিবে নির্বৃতি নর, ফুরাইবে নিত্য-বিসম্বাদ—
মৃত্যু-মুক্তি হবে কবে ?—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ ?

রুদ্র-বোধন

বজ্র কোথায় লুকাইয়া আছে নির্মেঘ নীল গগন-তলে ?
ধূর্জটি ! যোগমগন তোমার নয়নে কোথায় অনল জ্বলে ?
এ যে চারি দিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব !
এর মাঝে কোথা ফেলিবে চরণ, হে ভৈরব ?
শ্মশান-বাহিনী নদী চলে ওই কল্লোল-হীন অশ্রুজলে—
বজ্র তবুও লুকাইয়া আছে পাথর-নিথর গগন-তলে !

চিতার ভস্ম ভালবাস, তাই ধূর্জটি ! তুমি শ্মশান-চর,
চারি দিকে শব, তারি মাঝে শিব ! আসন তোমার স্বতন্তর!
ধুতুরার বিষে ঘূর্ণিত আঁখি, কণ্ঠ নীল !
জটায় গঙ্গা বীচি-বিভঙ্গে নৃত্যশীল'
পিনাক তোমার ধুলায় লুটায়—কোথা গজাজিন, দিগম্বর ?
কবে ধ্যান ভাঙি' দাঁড়ায়ে উঠিবে 'হর হর'-বোলে হে শঙ্কর !

সংহার-সুখে কবে, মহাকাল ! আধেক মুদিবে অক্ষিতারা,
সারাদেহময় আলোড়ি' ছুটিবে অধরে রুদ্ধ হাস্য-ধারা !
তাণ্ডব-তালে ফেলিয়া চরণ—তুলিয়া ধরি',
বামে ও ডাহিনে আকাশ ছানিয়া দু বাহু ভরি'—
নিমেষে নিমেষে শত রবি-শশী উড়ায়ে অসীমে কক্ষহারা,
কবে মহাকাল ! ঊর্ধ্ব-পলকে আধেক মুদিবে অক্ষিতারা ?

কোটি বরষের জরা-জর্জর ধরাবধূ হবে স্বয়ম্বরা—
হরি' লবে বুঝি মালাখানি তার ছয়ঋতু-ফুলে বয়ন-করা।
ঘুচে যাবে তার যৌবন-ছলা উন্মাদিনী,
পলিত অলকে দু আঁখি ঢাকিবে পলকে ধনী,
অঙ্গ শিথিল—লোল পয়োধর না বাঁধি' বসনে বসুন্ধরা—
সুন্দরী নয়, সতীবেশে হবে দিগম্বরের স্বয়ম্বরা!

আর সে রূপসী পরিবে না রাতে তারা-ঝল্‌মল্‌ যামিনী-চেলী,
দিনে দহিবে না পুরুষের মন, আলোক-সিনানে বক্ষ মেলি'।
ঘুচে যাবে রূপ, ঘুচে যাবে তার অঙ্গরাগ,
ঘুচে যাবে কায়া—কামনার এই ব্যর্থ যাগ,
ঘুরিবে না আর মর-মরুপথে প্রাণের দেবতা পাথর ঠেলি'—
দাঁড়াবে সমুখে কঠিন কুলটা ভ্রূকুটি-ভীষণ দশন মেলি'?

জাগো মহাকাল! রুদ্র-দেবতা! বর্ণ-বিহীন বিভূতিময়!
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ! কর সৃষ্টি লয়!
ফেটে যাক নীল নভোবুদ্বুদ—রঙের হাট!
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক্—রূপের ঠাট!
সুন্দরে হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দয়!
নিত্য-মরণ হরিয়া দাও গো নিত্য-জীবন শূন্যময়।

সৃষ্টির ভরা ভারী হয়ে এল, ভেঙে যায় বুঝি রূপের চাপে!
তবু রূপ চাই স্নায়ু চিরে চিরে, আয়ু যে ফুরায় তাহারি দাপে!
রূপ নয় আর প্রিয়েরি লাগিয়া প্রেমের ছলা,
সে যে নিজ তরে কামনা-নটীর নৃত্যকলা!
সে তো নহে আর হৃদয়েরি দান—তারে পেতে হয় অশেষ পাপে!
মিথ্যার ভারে ভারী হ'ল ধরা, চূর্ণ কর গো চরণ-চাপে!

এই মিথ্যারে মন্থন করি', কালকূট পুন করিবে পান—
কবে অমৃতের শুভ্র ফেনায় নীল-অম্বুধি করিবে স্নান?
এ যে চারিদিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব,
কোথা অনুচর?—কারে নিয়ে হবে মহোৎসব?
কারে জাগাইবে? কোন্ মৃতজনে জীয়াইয়া তুলি' করিবে দান
মহা-মারণের মন্ত্র ভীষণ, কারে কালকূট করাবে পান?

মন্বন্তরে মারী-মুখে বুঝি দূর হবে যত আবর্জনা ?
শুষ্ক শবের মূর্ধ্বজে ধূপ-দীপ করি' হবে পূজার্চনা ?
নর-পশুদের হিহি-হাহাকার মন্ত্ররব,
নারী-শিশুদের ছিন্নকণ্ঠে গীতোৎসব,
উদ্বন্ধনে করিবে নৃত্য শূন্য-মঞ্চে রসিক জনা,—
ঘূর্ণাঝড়ের চামর ঢুলায়ে হবে কি তোমার পূজার্চনা ?

* * *

ভেবে নাহি পাই, কবে কোন ঠাঁই ঊষর ধরার উরস-মুখে—
শৈল-চুচুক বিদারি' ছুটিবে আগুনের স্রোত সকল বুকে !
তারি মাঝে দিক্-পিশাচেরা করে ডমরু-নাদ,
রবি মুছে যায়, কালো হয়ে যায় আকাশের চাঁদ! !—
কবে সেই দিন উদিবে হেথায়—মমতাবিহীন মরণ-সুখে
নর-কঙ্কাল উঠিবে হাসিয়া লোহপান করি' লৌহ-বুকে !

বসন্ত-বিদায়

আমার সকল কামনা ফোটে নি এখনো—ফোটে নি গানের শাখে,
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে ।
সিঁথিটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে ।

আমি গোলাপের বুকে রেখেছিনু ঢেকে কস্তুরী-কর্পূর,
আফিম-ফুলের কৌটায় ছিল ললাটের সিন্দূর,—
নয়ন-নিমেষে গেল তারা ঝরি',
লয়ে ফাগুনের চূত-মঞ্জরী
অলকে পরিনু—অলি-গুঞ্জনে অলীক ভাবনাতুর ।

শেষে লাল হয়ে ওঠে বন-বনান্ত পলাশে ও কিংশুকে,
দিকে দিকে পিক কুহু কুহরিল মহুয়ার মধু মুখে ;
তরুশাখে-শাখে লতা-হিন্দোল,
পাতায় পাতায় ফুল-হিল্লোল,
সন্ধ্যা-আকাশে সাজিল কাহারা রক্ত চীনাংশুকে !

ওগো, এখনি হবে কি রঙের বাসর, ফুলের দীপালি শেষ ?
নিশার নেশা যে এখনো লাগে নি—নয়নে ঘুমের লেশ !
কাজল-আঁকা এ আঁখির কোণায়
এখনি অরুণ-আভাটি ঘনায়—
রিনি-রিনি করে সকল শিরায় রজনীর রসাবেশ !

আমার কবরী এখনো হয় নি শিথিল—শিথানে পড়ে নি খুলে,
মুকুরে যে হাসি দেখেছি অধরে, সে হাসি যাই নি ভুলে।
ধূপের ধোঁয়ায় দিছি মিলাইয়া
দেহের দহনে সুরভি এ হিয়া—
প্রাণের গহনে জ্বলে নি যে দীপ বেদনার বেদীমূলে !

ওগো, মধু-যামিনীর জ্যোৎস্না-কামিনী এখনো যে কানে-কানে
সুধাইছে মোরে সুধার কাহিনী—সে কথা সেও না জানে !
সুখের স্বপনে সুমধুর ব্যথা
কেন জেগে রয়—সেই রূপকথা
শুনিবারে চায়, কেবলি তাকায় আমারি মুখের পানে !

আমি মরণেরে, তার নীল-তনু ঘেরি' জীবনের পীত-বাস
পরায়ে, সাধাব হৃদয়-রাধারে—কত না করেছি আশ !
হাসিয়া উঠিবে গোরোচনা-গোরী—
আবীরের ধূলি মুঠা মুঠা ভরি',
শ্যাম-মুখ তার রাঙায়ে রচিবে মরণের মধুমাস !

ওগো, সে কামনা মোর জ্বলে' নিবে গেল শিমূলের শাখে শাখে,
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে।
সিঁথিটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।

চাঁদের বাসর

তারকার মুখে শুনিনু বারতা সন্ধ্যারাতে—
আজি রজনীতে চাঁদের বিবাহ চিত্রা-সাথে ;
তাই উতরিল রূপসীরা বুঝি তরণী ভরি'—
অস্তাচলের ঘাটে ওঠে যত আলোর পরী ?
রঙের সানাই বাজিছে তখন ইমন-রাগে,
পরতে পরতে গোলাপী সোনালী সুর সে জাগে ।
এত চুপিচুপি এয়োরা সাজায় বরণ-ডালা—
সিঁদুরের ঝাঁপি খুলে তুলে রাখে গোধূলি-বালা !
এক কোণে হোথা বাখানে কেহ বা কনে'র সিঁথি,
পরখিছে কেহ ঝাঁপটার মণি-মুকুতা-বীথি ।
কেহ বা শাঁখটি অধরে তুলিতে আঁচল সরে—
জরির কল্কা পায়জোরে পড়ি' কি শোভা ধরে !
চুল হতে দুল ছিনাইছে কেহ হেলায়ে গ্রীবা—
হীরাখানি তার ঝকমকি' পুন উঠিছে কিবা !
দিবস-বিগমে দিগঙ্গনারা কি সুখে মাতে—
তারকার মুখে শুনিনু সে কথা সন্ধ্যারাতে ।

বিবাহ দেখি নি, দেখিনু বাসরে বসেছে বর—
গাঁটছড়া-বাঁধা বধূর মু'খানি কি সুন্দর !
তারার চোখেও তারাটি যে কাঁপে, কাঁপিছে বুক—
চাহি' চাঁদ-মুখে জল ভরে চোখে, ধরে না সুখ !
আজ কারো নয়, আর কেহ নয়—চিত্রা চাঁদে
বহু রজনীর বিরহ বহিয়া বক্ষে বাঁধে !
শতেক রূপসী আছে পাশে বসি'—হেরিছে তারা
হাজার তারার একটি তারারে পলকহারা !
চাঁদ রোজই হাসে, এত হাসি তবু দেখেছে কেহ—
আর কারো লাগি' উথলে এ হেন জ্যোৎস্না-স্নেহ ?
ইহারি হরষে বরষে বরষে ভুবন-বনে
ফুল-যৌবন একবার জাগে শুভক্ষণে ।
উষা-অপ্সরী ইহারি স্বপন স্মরণ করি'
কুহেলি-ধূসর যবনিকাখানি রাখে যে ধরি'—
আধো-ঘুমঘোর ভাঙে না কিছুতে, যত সে ডাকে
চূত-মধু-পানে মাতাল কোকিল সকল শাখে !

আজ মনে পড়ে, এমনি আরেক বিবাহ-রাতি
কবে কেটে গেছে—নবযৌবন-জ্যোৎস্নাভাতি।
আমিও জেগেছি এমনি বাসর বাঁশরী-তানে,
বামে বসি' বধূ এমনি হেনেছে চাহনি-বাণে!
এমনি সে আলো, ফুলে ফুলময় শয়নখানি—
চোখে-চোখে চাহি' অধরে এমনি ছিল না বাণী!
কত সে রূপসী রতনে-ভূষণে নয়ন ধাঁধি'
আদর-সুধায় পাত্র ভরিয়া পিয়ালো সাধি'!
ভাবি' সেই কথা ভরিছে নয়ন অশ্রু-ভারে,
আরেক রজনী উঠে রণরণি' প্রাণের তারে।
কত উন্মনা মদিরেক্ষণা ওড়না তুলি'
চমকি' মিলায়, আকাশে উড়ায়ে জ্যোৎস্না-ধূলি!
হেরি সেই মুখ—এখনো পড়ে নি অধরে যার
প্রথম চুমাটি, কেঁপে ওঠে তাই বেসর তার!
তাই ভুলে যাই যে কথা শুনিনু সন্ধ্যারাতে—
ভুলে যাই, আজ চাঁদের বিবাহ চিত্রা-সাথে!

নিশি-ভোর

তুমি এলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
মুকুলে মুকুলে ফুলের স্বপন
হয় নি ভোর।
কৃষ্ণা-তিথির কালো-টুপি-পরা
আধেক চাঁদ
ঝাউবীথি-শিরে দাঁড়ায়ে হেরিছে
ছায়ার ছাঁদ!
দুয়ারে আমার দাঁড়ায়ে অতিথি—
দেখি নি ভালো,
মাটির উপরে ছায়াখানি তার
আলোয়-কালো

দেখি নাই তার নয়নে ছিল কি
নীলিম ক্ষুধা,
মৃদুবিহসিত অধর-আধারে
রঙীন সুধা !
রজনীগন্ধা-ফুলের শাখাটি
শিথিল করে
ছিল বুঝি !—তার সুবাস লভিনু
তন্দ্রাভরে !
নখে মাটি খুঁটি' বাজালে নূপুর—
অধীর-থির,
আমি শুনেছিনু ঝিঁঝির ঝুমুরে
সে মঞ্জীর !
ছায়ারি নেশায় জেগেছিনু সেই
জ্যোৎস্না-রাতি—
ওগো ছায়াময়ী, সে ছায়া তোমারি
রূপের ভাতি !

তুমি গেলে, যবে উষার আবীরে
ভোরের তারা
চক্ষু আবরি' শিশিরে শিশিরে-
কাঁদিয়া সারা ।
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফোটা-ফুলে ফুলে মধু পান করে
মধুপ চোর ।
নদী-পরপারে, আকাশে রাঙায়
রবির আঁখি—
নিমেষে মিলায় অজানার মোহ
যা ছিল বাকি !
যতদূর দেখি—কোথা সেই ছায়া
সজল-কালো ?
তার পাশে সেই ধুতুরা-ধবল
অফুট আলো ?
কোথা সেই রূপ ?—চোখ দিয়ে যারে
যায় না ধরা,
যে রূপ রাতের স্বপন-সভায়
স্বয়ম্বরা !

কোথা সেই তুমি? দেখেছিনু যারে
　　দেখারও আগে!
সে ছায়া মিলাল—কায়াখানি দেখি
　　সমুখে জাগে!
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
　　কুঞ্জে মোর
ফুটিল মুকুল—ফুলের স্বপন
　　হ'ল যে ভোর!

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

দিনশেষে

লাল হয়ে ওই নীল নভ-তল সোনালী হয় যে শেষে—
যেন নেবু-রঙ ওড়না খসিছে রজনীর কালো কেশে!
　　সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুময়,
　　দিনশেষে তবু কেন মনে হয়—
　　এখনো যেটুকু রয়েছে সময়
　　　　লই মোরা ভালবেসে,
এস, কাছে এস, চুম্বন করি সুগন্ধ কালো কেশে।

দিন যে ফুরাল, রবে না এ আলো, আসিছে নিশুতি-রাতি—
সে আঁধারে সখি, কেহ যে হবে না কাহারো বাসর-সাথী!
　　নিশীথ-আকাশে আসিবে যে তারা,
　　চির-তিমিরের প্রহরী তাহারা,
　　চোখে-চোখে শুধু করিবে ইসারা
　　　　সে কি কৌতুকে মাতি'—
এত প্রেম, প্রাণ—সব নির্বাণ। শেষে এল সেই রাতি!

এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু—কত রঙ, কত রূপ!—
হায় সখি, হায়! ও রাঙা অধর করে যেন বিদ্রূপ!
　　শত যুগ ধরি' রূপসী বসুধা
　　মিটাইতে নারে অসীম যে ক্ষুধা—

এক যৌবনে ফুরাবে সে সুধা ?
—তারি পরে যম-যূপ !
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ, এত রূপ !

রূপ যে অশেষ! যুগ-যুগান্ত এমনি অটুট র'বে,
হেথাকার ফুল এমনি ফুটিবে মৃদু মধুসৌরভে !
আমাদের মত কত বিহঙ্গ,
কত বিচিত্র ক্ষণ-পতঙ্গ
লভি' তার সেই রূপের সঙ্গ
বসন্ত-উৎসবে,
লইবে বিদায়, ধরণীর ফুল এমনি ফুটিয়া র'বে !

তবু সেইটুকু মধু-পার্বণ হেলা করি' কেটে যায় !
মধু-হ্রদ হতে একটি কণিকা শুষিতে সে ভয় পায় !
উষালোকে হেরে সন্ধ্যার ছায়া,
দিবস-দুপুরে কত প্রেত-কায়া !—
হায় সখি, এ কি নিদারুণ মায়া,
একি বাধা পায়-পায় !
চির-নিশীথের একটি সে দিবা ভয়ে ভয়ে কেটে যায় !

অসীম ক্ষুধার একটু সে সুধা যে করে পুলকে পান,
সে যে জীবনের বনে বনে পায় সুমধুর সন্ধান !—
মাটি ফেটে ফোটে নামহারা ফুল,
লতার বিতানে দোলে এলোচুল,
পাতায় পাতায় লিপি সে অতুল—
বায়ু-মর্মর গান !
সারা জীবনেও হেন মধুবনে ফুরায় কি সন্ধান ?

দিনশেষে তাই নয়নে আমার উথলে অশ্রুজল,
কবরী খুলিয়া ওই কেশপাশে মুছাও কপোলতল।
বক্ষে আমার রাখ হাতখানি,
গুঞ্জর' কানে পরমা সে বাণী—
'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি
তবু নহে নিষ্ফল—
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোরা এক ফোঁটা আঁখি-জল'।

এই যে তুলিনু মুখখানি হাতে—চাও দেখি মুখে মোর,
আর একবার—শেষবার—চোখে লাগুক নেশার ঘোর !
ভুলে যাও ব্যথা—বৃথা কলঙ্ক !—
সলিলের তলে আছে যে পঙ্ক ;
তুমি খুলে ধর মধু-করঙ্ক
আপন গন্ধে ভোর,
কালো হয়ে আসে নীল বনরেখা, রাখ এ মিনতি মোর !

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৫

জ্যোৎস্না-গোধূলি

আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে—
জীবনের শেষে আলো মিলাইতে না মিলালো,
অন্ধকারে চেনা পথ হবে না ভুলিতে !
এই আলো, এই ছায়া রচিবে আরেক মায়া,
এই ছবি আঁকা হবে আরেক তুলিতে !—
আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে।

রবি ডোবে লাল মেঘে ফুলঝুরি খেলি'—
রঙীন দীপালী-শেষে দিন যায় ম্লান হেসে,
তখনো রয়েছি চেয়ে দুই আঁখি মেলি' ;
মনে হয় এইবার নামে বুঝি আঁধিয়ার—
হেনকালে ফুটে উঠে আলোর চামেলি !

কখন যে আঁধারের হ'নু খেয়া-পার—
এক তীর পরিহরি' অন্য তীরে অবতরি'
হেরিলাম শুভ্র হাসি রাত্রি-বিধাতার ;
জীবন বিদায় নিল, মৃত্যু হেসে সুধাইল
'ভাল আছ ?'—সে কথা যে নাহি মনে আর !

চাহিয়ে ধরার পানে হেরিব আবার—
আলো আছে, রঙ নাই— এক শোভা সব ঠাঁই !
ফুলের সুবাস আছে, রূপ একাকার !
হেরিব আকাশতলে চন্দ্রকান্ত-মণি জ্বলে,
তৃণে তৃণে ঝরে তাই ঘুমের নীহার !

বড় ভয় বাসি আমি আঁধারে ঢুলিতে ;
ঘুমাইতে যদি হয় আলো যেন তবু রয়—
স্বপনেও চোখ যেন ঢাকে না ঠুলিতে ।
দিবা হতে নিশালোকে যাব আমি খোলা-চোখে-
আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে !

নির্বাণ

এখন যে এসেছে নিদাঘ—
ঝরিয়া পড়িছে ফুলদল,
ধূলি-পাংশু ফাগুনের ফাগ
উড়িছে বাতাসে অবিরল !

শুষ্ক হ'ল আনাভি রসনা—
মরীচিকা মরুৎ-মুকুরে !
জীবনের বিফল বাসনা
প্রেত হয়ে ঘোরে দূরে-দূরে !

জ্বর তাপে হৃদয়ের জতু
গলে' গলে' হ'ল অবশেষ,
সারাদেহে বেদনা-বেপথু,
আঁখি-তারা ম্লান অনিমেষ ।

নিশীথের স্বপ্ন-বিভীষিকা,
দিবসের সুদীর্ঘ দাহন,
ভয়ঙ্কর বজ্রানল-শিখা
বৈশাখের ঝটিকা-বাহন,

প্রাণগ্রন্থি করিছে শিথিল—
নিবিড় আঁধারে অচেতন
করিবে না?—এ বিশ্ব-নিখিল
হবে না কি নিদ্রা-নিকেতন ?

ঘুমাইব আমি অকাতরে—
নভ-তল রবিরশ্মিহীন !
জলধারা এ দেহ-পাথরে
অঝোরে ঝরিবে নিশিদিন !

* * *

জাগায়ো না হে বঁধু আমারে,
বাজায়ো না ও দুটি নূপুর !
এসো না প্রাবৃট-অভিসারে,
ডাকিয়ো না বাঁশীতে, নিঠুর !

উল্লাসে নাচিবে যবে শিখী,
কদম ফুটিবে বনে-বনে—
এ বুকে দিও না পুন লিখি'
পীরিতির রীতিটি গোপনে !

জানি এবে, হে বর-নাগর,
তোমার সে নাগর-দোলায়—
হাসি চেয়ে আঁখিতে সাগর
কূলে কূলে নিতি উথলায় !

শরতের সোনার জুয়ার
আসিবে ? আসুক পুন ফিরে ;
শীত-রাতে রুধিয়া দুয়ার
জেগে-থাকা কুটির-তিমিরে—

তারও লাগি' ডরে না হৃদয়,
ডরি সে ফাগুন-ফুলদোল—
সেই আঁখি—চাহনি নিদয়,
শোণিতে ক্ষণিক কলরোল !

সাজাতে চাহি না তার চিতা
জীবনের নিদাঘ-শ্মশানে !
মধু-শেষ মুখের সে তিতা
সারাপ্রাণে অরুচি যে আনে !

প্রীতি নাই, আছে শুধু স্মৃতি,
ব্যথা আছে, নাহি সে কামনা–
বাদলের ধারাজলে তিতি'
নিবে যাক প্রাণ-বহ্নিকণা !

নতুন আলো

একলা জাগি, শীতের রাতে রুদ্ধ বাতায়ন ;
ঘুম আসে না—ঘুমায় ধরা, ঘুমায় ত্রিভুবন !
বাতাস ধরে নিশ্বাস চাপি',
শূন্য-প্রাণে প্রহর যাপি—
শ্রান্তদেহ, ক্লান্ত আয়ু, শুষ্ক দু নয়ন,
—রুদ্ধ বাতায়ন ।

পূর্ণিমারি প্লাবন, তবু—জ্যোৎস্না-শ্রাবণ রাতি !
আকাশ-শেজে জ্বলছে হেথায় বিপুল বাসর-বাতি !
আমার যে আর নেই পিপাসা,
নেই যে আশা, নেই নিরাশা—
চাই নে আলো, চাই নে আঁধার, চাই নে সুখের সাথী—
ভয়ে কাটাই রাতি ।

মহাভয়ের ভাবনা যে আজ রুদ্ধ করে শ্বাস—
এমনি করে' জাগা-ই কিগো অমর-সভায় বাস ?
দেহের সকল বাঁধন খোলা,
ফুরিয়ে যাবে প্রাণের দোলা,
রইবে শুধু চোখের আলো—শীতের জ্যোৎস্নাকাশ !
—হারাই যেন শ্বাস !

হঠাৎ বনে উঠলো ডেকে ঘুম-হারা কোন্ পাখী—
চম্‌কে উঠি, রাত ফুরালো ? ঢুলবে এবার আঁখি ?
চেয়ে দেখি দুয়ার-ফাঁকে,
চাঁদ উঁকি দেয় মেঘের বাঁকে—
আব্‌ছা-আলোয় ভুল করে' তাই ডাকছে থাকি' থাকি'
ঘুমহারা কোন্ পাখী।

রাত তখনও অনেক বাকি—চাঁদ যে মাথার উপর,
আকাশ-মরুর সবটা জুড়ে জ্যোৎস্না তখন দুপর !
এ যেন এক রঙীন আঁধার—
আর এক ফাঁকি চোখের ধাঁধার !
হাঁপিয়ে উঠি—মুখের উপর ঢাক্‌না যেন রূপোর !
—জ্যোৎস্না তখন দুপর।

অন্ধকারেও রইতে নারি—তেলের প্রদীপ জ্বেলে,
বদ্ধ ঘরে জাগছি একা, বালিশ 'পরে হেলে।
ভাবি আবার—এমনি যদি
পার হয়ে সে মরণ-নদী,
অনন্তকাল একলা জাগি, এমনি দু চোখ মেলে—
স্মৃতির প্রদীপ জ্বেলে !

এ কি আলোর অট্টহাসি অন্ধকারের তীরে !
এ কি অসীম সোনার দেয়াল লোহার প্রাসাদ ঘিরে !
দাও ছেড়ে দাও ! ঘুমাই খানিক,
ছিল যা মোর বুকের মাণিক—
দিলাম ছুঁড়ে পায়ে তোমার, চাই না সে আর ফিরে
—এপারের এই তীরে।

দিনের আলোয় দেখেছিলাম জ্যোৎস্না-ভরা নিশা—
স্বপন-সুখের রসাতলে হারিয়েছিলাম দিশা।
অন্ধকারের অন্তরালে
বাদল-মেঘে দিন ফুরালে—
এঁকেছিলাম ইন্দ্রধনু মিটিয়ে মনের তৃষা,
হারিয়েছিলাম দিশা।

তাই কি আমার রাতের 'পরে দিনের অভিশাপ ?
এমনি করে' বইতে হবে মিথ্যা-মায়ার পাপ ?
সারারাতের পৌর্ণমাসী
গগন ভরে' হাসছে হাসি—
আমার যে গো নয়ন-পাতে মধ্যদিনের তাপ !
—হায় কি অভিশাপ !

*   *   *

এতক্ষণে রাত পোহাল ?—পাখীরা ওই ডাকে,
ভোরের হাওয়া বইছে ওকি জানালাগুলার ফাঁকে ?
এবার বুঝি ঘুমিয়ে পড়ি !—
পূব-আকাশে রঙের ছড়ি
টানছে বোধ হয়, আসছে উষা—আলপনা তাই আঁকে,
—পাখীরা ওই ডাকে।

জানলা-দুয়ার দাও খুলে দাও ! জ্যোৎস্না গেছে উবে' !
জগজ্জ্যোতি আলোর-আলো ফুটছে যে ওই পূবে!
জীবনহরণ, মৃত্যুহরণ,
আঁধারভেদী, দুখের বরণ—
কৌস্তুভেরি কিরণ-গাঙে তারারা যায় ডুবে
—জ্যোৎস্না গেছে উবে'।

চরাচরের শেষ সীমানায়, আলো-ছায়ার পারে,
নীল যেখানে উদাস-ধূসর ধুতরো-ফুলের হারে !—
সেইখানে ওই বেদের মেয়ে
নিত্যি আসে হঠাৎ ধেয়ে—
চোখ-ঢাকা চুল সরিয়ে পিঠে, চমক লাগায় কারে !
—নীলাম্বুধির পারে !

আদি-কালের কবির চোখে যে রূপ চমৎকার
বাণী হয়ে উঠল বেজে কণ্ঠে বারম্বার—
আজও যে তাই উঠছে ফুটে
শীর্ণ আমার পরাণ-পুটে,
গহন-গভীর চেতন-তলে উদাত্ত ওঙ্কার
—চির-চমৎকার !

শুনছি না তো—দেখছি যেন মন্ত্র দু চোখ ভরে' !
নয়ন যে মোর শ্রবণ হ'ল জ্যোতিঃ-সিনান করে' !
বচনে যা দেয় না ধরা,
লোচনে হয় স্বয়ম্বরা—
সেই ভারতীর অভয়-আশিস পড়ছে হোথায় ঝরে',
—পেলাম দু চোখ ভরে' !

ঘুচবে এবার ছায়ার মায়া—মুছবে চোখের কালি ?
ছড়িয়ে যাব ধরার ধুলায় স্বপন-ফুলের ডালি ?
এই জীবনের রাত্রিশেষে
জাগব কি ওই উষার দেশে ?
ওই যেখানে নীলের ডাঙায় মুক্তা-রঙের বালি !
—শ্বেত-করবীর ডালি !

এ পারে আর রইব জেগে—নাই সে আশা নাই !
প্রহর ধরে' রাত জেগেছি, ঘুমাই এখন, ভাই !
জেনেছি, কোন্ সাগর-কূলে
আলোক-লতা উঠছে দুলে—
পেয়েছি সেই জ্যোতির আভাস—আর কিছু না চাই,
—ঘুমাই এখন, ভাই !

শেষ-শিক্ষা

ভালবাসা লভি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয়—
তার চেয়ে অভিশাপ আছে কিছু ?—ভাবিয়া না পাই,
জীবনের পথশেষে মনে আজ হতেছে উদয়—
ভাল যে বাসে নি কারে তার চেয়ে দুঃখী আর নাই !
কৈশোরের আদি হতে যত কথা মনে পড়ে আজ—
দেখি, এ ধরণী ছিল মোর তরে আকুল সদাই

ভরিবারে চুপি চুপি এই মোর দুই মুঠি-মাঝ
তাহারি অশেষ স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, অমূল্য-রতন !
আমারে ভুলাতে সে যে ধরিয়াছে বহুবিধ সাজ !

বিফল হয়েছে তার এত যত্ন, এত আয়োজন—
আদর সোহাগ হাসি মমতার সেবা সুনিপুণ,
সারাটি যামিনী জাগি' নিদ্রাহারা আঁখির বেদন—

সকলি হয়েছে বৃথা ! দিই নাই, তবু বহুগুণ
না চাহিতে পেয়েছিনু ; কত জন চাহি' মুখপানে
আছিল আশায় বসি'—পাণ্ডু ওষ্ঠে মিনতি করুণ !

অপাঙ্গে চাহি নি কভু সেই মূক আকুল আহ্বানে !
পলাতক হিয়া মোর খুঁজিয়াছে একান্ত নির্জন
আপন কল্পনা-কুঞ্জ, বুনিয়াছে বসি' সেইখানে

বাণীর বসনখানি—বিলাসের মায়া-আস্তরণ !
হেসেছি কেঁদেছি শুধু স্বপনের সখা-সখী সাথে,
সত্য যাহা—প্রাণের দুয়ারে তার প্রবেশ বারণ !

* * *

যৌবন-রজনী-শেষ আজি এই করুণ প্রভাতে
বসন্ত এসেছে পুন, হেরিতেছি মাধবী-মঞ্জরী
ভরিয়াছে বনস্থলী, হেমকান্তি কিরণ-সম্পাতে

বিবাহের চেলীখানি পরিয়াছে বসুধা-সুন্দরী ;
অজস্র আরক্ত-পীত গাঁদাফুল এখনো বিদায়
লয় নি অঙ্গন হতে—রূপে তার চক্ষু আসে ভরি'।

তবু সে মলিন শীর্ণ, তারি মত চেয়ে আছি হায়,
আজি এ বসন্ত-দিনে—রিক্ত-মধু, যাপি অলিহীন
সারাটি প্রহর একা, বিদায়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

আর কি আসিবে ফিরে—আর এক বসন্তের দিন
সেই যারা অর্ঘ-থালি সুনিটোল ললাটে পরশি'
সন্তর্পণে নিবেদিয়া, দুরু-দুরু হৃদয় নবীন,

চেয়েছিল মুখপানে ?—কলামাত্র-অবশেষ শশী
যেমন মলিন হেসে দিক্-প্রান্তে যায় অবতরি',
তেমনি লুকাল তারা—চিত্রার্পিত আমি ছিনু বসি'।

ধর্ম যাহা ধরণীর আমি তায় আছিনু পাসরি' ;
আমারো যে নিমন্ত্রণ হয়েছিল পূর্ণিমা-উৎসবে,
যৌবনের নিধুবনে নাম ধরি' ডেকেছে বাঁশরী !

চমকি' চকিতে উঠি' দ্বার খুলি' সেই বাঁশী-রবে,
চন্দ্রালোক-পুলকিত নভ-তলে মেলিয়া নয়ন
খুঁজি নাই কভু কারে—কেন, হায়, কে আমারে ক'বে

আত্মার নিশীথ-রাতে প্রেম বুঝি স্বপ্ন-সঞ্চরণ—
বাঁশীখানি বেজে ওঠে অচৈতন্য প্রাণের অতলে ?
প্রেম কি 'নিশির ডাক'—গাঢ় ঘুমে গূঢ় জাগরণ ?

বিস্ফারিত অন্ধ আঁখি, তবু পথ চিনিয়া সে চলে,
বাহিরের ডাক শুনি' স্বপনে সে হয়েছে বাহির—
পথের পথিক-বালা নিজ মালা দেয় তার গলে !

কারো লগ্ন ভ্রষ্ট হয়—স্বপ্নভঙ্গে ব্যথায় অধীর ;
কারো স্বপ্ন ভাঙে না যে, সেই নর চির-ভাগ্যবান,
স্বপ্নশেষে আসে তার মহানিদ্রা মরণ-তিমির !

তাই বুঝি সত্য হবে : শুনি নাই প্রেমের আহ্বান,
প্রাণেরে পাড়ায়ে ঘুম স্বপনেরে দিয়েছিনু ফাঁকি,
বাজে নাই দেহ-বীণে আত্মহারা কামনার গান ।

আজ নিদ্রা অবসান—স্বপ্ন শুধু রহিয়াছে বাকি,
গাহিতেছি মনে মনে অপরাধ-ভঞ্জনের শ্লোক ;
বাসি নি যাহারে ভাল তার হাতে কবিতার রাখী

বাঁধিনু সুদূর হতে ; থাকে যদি কোথা পরলোক,
পরজন্ম,—সেইখানে একবার বাঁধি' বাহুপাশে
মুছাতে পারিব কারো অশ্রুভার-অবনত চোখ ?

*　　*　　*

পায় নাই ভালবাসা কেহ কভু এ মর্ত্য-আবাসে—
মিথ্যা কথা! ধরণী যে প্রেম, প্রীতি, স্নেহের নিলয় !
বাসে নাই ভাল কারে যে অভাগা—তারি দীর্ঘশ্বাসে

দিনান্তে ডুবিছে রবি, ঘেরি' আসে আঁধার নিদয়
আসন্ন রজনীমুখে ; প্রাণ যার ছিল উদাসীন
জীবনে বঞ্চিত সেই—তার চেয়ে দুঃখী কেহ নয় !

প্রেম ও জীবন

('চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত'—গোবিন্দদাস)

আজ রাতে ঘুম নাই, ফাগুনের দোল-পূর্ণিমা যে !
রজনী পরেছে শাড়ী নীলাম্বরী জ্যোৎস্না-বারাণসী,
দু চারি তারার কুঁড়ি জড়াইয়া ওড়নার ভাঁজে
শাড়ীর সে কালো পাড় লুটায়েছে বনান্ত পরশি' !
নয়নে লেগেছে আজ অবনীর বৃন্দাবনী মায়া ;
যে জীবন-যৌবনের ক্ষয় নাই, খেদ নাহি যা'য়—
হাসি-অশ্রু দুই-ই এক—একই শোভা—গোলাপে শিশির !
—আজিকার আলো আর ছায়া
মিলায় মধুর করি' তারি রস প্রাণের সীমায়,
জীবন-বসন্ত শেষ, শেষ নাই পূর্ণিমা-নিশির !

ভেসে আসে হা-হা হাসি, রহি' রহি' গীতবাদ্য-রোল—
জনপদ-যুবজন মাতিয়াছে মদন-উৎসবে ;
সে শব্দতরঙ্গ যেন দূর হতে হানিছে হিল্লোল
হেথাকার স্তব্ধ তটে, রাত্রি ওঠে রোমাঞ্চিয়া নভে !
জীবনের জয়গাথা গাহে মুগ্ধ মৃত্যুভয়হীন
অধীর যৌবনমদে ; রাধা-শ্যামে আজি হোরী-খেলা—
বনে বনে শীর্ণ শাখা শ্যাম-রূপে উঠিছে শিহরি',
মরণের বদন মলিন !—
জরা কেহ মানিবে না, আজি সমবয়সীর মেলা—
পল্লীপথে হুলাহুলি, উথলিছে প্রমোদলহরী !

রজনী গভীর হ'ল ; এ নির্জন নিরালা কুটীরে
একা জাগি, সমুখে সে যত দূর দৃষ্টি মোর ধায়—
জ্যোৎস্নাম্বরা তৃণভূমি, মাঝে মাঝে শ্বসিছে সমীরে
তন্দ্রাহত ছায়া-তরু, দূরে দূরে প্রহরীর প্রায় ।

চাহিনু আকাশ পানে, মনে হ'ল এ কোন্ স্বপন
রচিছে নিশুতি-রাতি ?—হোলিখেলা পলকে হারাই !
রাধার ফাগের থারি কোথা গেল, কে লইল হরি' ?
শূন্য করি' সারা বৃন্দাবন
শ্যামরূপ-হ্রদে বুঝি ডুবিয়াছে উন্মাদিনী রাই—
নীল জলে জ্বলে রূপ, ভেসে ওঠে সোনার গাগরী !

ঢুলে আসে আঁখি-পাতা, যামিনীর মায়া-যবনিকা
খুলে গেল ক্ষণতরে, ঘনতর অন্ধকারে ঘেরি'
ভুলাইল দেশকাল ; নিমীলিত নেত্র-কনীনিকা
স্ফুরিল অরূপ-রসে, নেপথ্যের নট-লীলা হেরি' !
ভুলে গেনু নীলাকাশে হেমকান্ত কৌস্তুভ-আভাস—
শ্যাম-দেহে লীনাঙ্গিনী রাধিকার বরণ-মাধুরী ;
মনে হ'ল, ঊর্ধ্বে ওই অকম্পিত চন্দ্রাতপ-তলে
—স্তব্ধ যেথা নিশার নিশাস,
যেন কারা মেলিয়াছে অভিজ্ঞান-তারকা-অঙ্গুরী
অতীতের, মৃত্যুর ময়ূরকণ্ঠী উত্তরীয় গলে !

সহসা পশিল কানে শতাব্দীর সঙ্গীত-মর্মর—
আলোকের কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিল কি শত পিকরব !
শুনিনু গাহিছে গাথা—পুরাতন ব্যথার নির্ঝর—
চিরযুগজীবী কবি, বাঙলার বাউল বৈষ্ণব ।
সেই সুর !—যার রসে যুগ যুগ গোঙাইল কাঁদি'
জীবন-পূর্ণিমা-নিশি, হেরি' রূপ মনোহারিকার !
'নয়ন না তিরপিত' ঘুচিল না সুচির বিরহ—
বক্ষে চাপি' বাহুপাশে বাঁধি' !
সেই সুর !—ভাষা যার বাণী-কণ্ঠে গজমোতি-হার—
'প্রেম সে চপল, থির এ জীবন দুরন্ত অসহ' !

সেই রূপ, সেই প্রেম, সেই লীলা-লাবণ্য-লালসে
মূর্ছি' আছে চরাচর—ভাল নহে শুধু ভালবাসা !
সে সুধা-সাগর-বারি উছলিছে যাহার কলসে—
ধরণীর এই ঘাটে বুঝি তার নাই যাওয়া-আসা !
এমন পূর্ণিমা-রাতে মৃত্যু বুঝি বার্তা বহি' আনে
জীবনের বাতায়নে—'ফুটিয়াছে স্বপন-দুর্লভ
সুন্দরের পারিজাত কোন্ বনে, কোন্ নদীপার !'

—শুনি' পুন সঙ্গিনীর পানে
চায় যবে, জ্বালা করে বল্লভের নয়ন-পল্লব,
পীরিতির খর-তাপে ফোটে রূপ মৃগতৃষ্ণিকার।

হে চিরযৌবন কবি! লভিয়াছ অমর-জীবন
কবিতার কল্পলোকে, নাই সেথা জরা, মৃত্যুভয়!
প্রেমের বৈকুণ্ঠপুরে আজও তাই পূর্ণিমা-যাপন
কর সবে,—কীর্তনের সুরে শুনি সুন্দরের জয়!
যে রূপের পিপাসায় প্রেম হ'ল জীবন-অধিক,
এক দিন এই পথে তার নেশা ঘুচে নাই, কবি?
রাত্রিশেষে এই শশী ডুবে নাই দিক-চক্রবালে?
সশরীর হে স্বর্গ-পথিক,
পশ্চাতে চাহ নি কভু?—আর কারো ম্লান মুখচ্ছবি
তব দেহচ্ছায়াতুর, হের নাই অপরাহ্নকালে?

সেই কথা জাগে মনে, তাই হায় পারি না ভুলিতে—
প্রেম সে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল!
যৌবন-বসন্তশেষে ফাগুনের সে ফুল তুলিতে
হেরি সবি রঙ-ছুট, প্রেমেরও যে মিনতি বিফল!
তবু জানি, মধুমাসে এই দেহ মাধবী-বল্লরী
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে!
শেষে রচি ঝরাফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ!
—বৃন্দাবন চির পরিহরি'
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ-পরশে,
কালিন্দীর কূল ছাড়ি' রাধিকার চলে না চরণ!

আজি এই রজনীর রূপমধু-পিয়াসে বিহ্বল—
মরণেরে মনে হয় রমণীয়, মদির-মধুর!
শুনি যেন সমীরণে মৃদু শ্বাস স্বনিছে কেবল—
হায়, প্রেম ক্ষণপ্রভা, এ জীবন আঁধার-বিধুর!
জীবনের চেয়ে ভাল সে প্রেমের ক্ষণিক পুলক,
অচেতন হয়ে ডুবি সুপ্তিহীন স্বপ্ন-রসাতলে।
হেনকালে ওই শুন—মর্মভেদী একি পরিহাস!—
বৃক্ষশাখে ডাকিছে তক্ষক!
জীবনের মত প্রেম উবে যায় যাদুমন্ত্র-বলে,
ভাসে শুধু এক সুর—সুখহীন, একান্ত উদাস।

বুদ্ধ

জরা-মৃত্যু—বিভীষিকা, জীব-জন্ম তাহার নিদান—
সেই ব্যাধি, মহাদুঃখ দূর করি' মানবে নির্ভয়
করেছিলে হে তাপস, পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী !
বিষের ঔষধ বিষ পিয়াইলে, ভিষক-প্রধান !
ধরার পীড়িত জনে,—কামনার অঙ্কুশ দুর্জয়
ভাঙিলে কৌশলে বীর, কামনার অঙ্কুর বিনাশি'।

হেরি মূর্তি মঠে মঠে দেশে দেশে শিলা-ধাতুময়—
অধরে মূর্ছিত হাসি, অবনত আঁখির পল্লবে
মুদিত উর্ধ্বগ দৃষ্টি ; ঋজু দেহ, স্কন্ধ, গ্রীবামূল—
অনিন্দ্য আসন-ভঙ্গী! চিত্ততলে সে কি অসংশয়
জয়োল্লাস—জগতের মহাবৈরী-নিধন-উৎসবে !
নির্বাণ মমতাবহ্নি,—সে কি তৃপ্তি, নাহি তার তুল !

বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ—একি দৃশ্য অলোকসম্ভব !
প্রকৃতির নৃত্য নাই, মুখ তার গুণ্ঠনে আবরি'
সরিয়া দাঁড়ায় নটী, কুলবধূ লজ্জায় মলিন !
মহাকাল আছে স্তব্ধ !—পুরুষের পৌরুষ-গৌরব
মানবের ইতিহাস যুগ-যুগ রহিয়াছে ভরি'—
সর্ব ভয়, সর্ব আশা, সর্ব সুখে সে যে উদাসীন !

সেই বার্তা ওই মুখে আজও হেরি, বিস্ময়-বিহ্বল—
একটি মানুষ কবে একবার হয়েছে নাস্তিক !
নিবারি' নরক-ভয়, তুচ্ছ করি' স্বর্গ-সুখ-লোভ,
ধ্যানে বসি' দৃঢ়াসনে জরা-মৃত্যু করেছে নিষ্ফল !
তার মুক্তি—সুখ নয়, জীব-জন্মে দুঃখ মর্মান্তিক,
তাহারি নিবৃত্তি শুধু—দূর করি' বাসনা-বিক্ষোভ।

সে দুঃখ-দমন মন্ত্র একদিন শ্রমণ গৌতম
বিতরিল সারনাথে, তার পর আর্ত নর-নারী—
সকল আশার শেষ, মমতার সুচির নির্বাণ,
তৃষ্ণা, রতি, অরতির উচ্ছেদের পন্থা অনুত্তম
লভিতে আসিল ধেয়ে !—ত্রৈলোক্যের মুক্তির ভিখারী
আপামর সর্বজনে শান্তিবারি করিল প্রদান !

শ্রাবস্তির জেতবনে শ্রেষ্ঠী-শিষ্য কোটি কার্ষাপণ
স্বর্ণমুদ্রা রাখি' ভূমে রচি দিল সৌধ-সঙ্ঘারাম ;
মগধের রাজগৃহে মহারাজ সেন-বিম্বিসার
পাদ্য-অর্ঘ দিয়া নিজে নিবেদিল বুদ্ধে 'বেণুবন' ;
বেসালির বেশ্যা মহাভিক্ষুপদে করিয়া প্রণাম
কৃতার্থ হইল সঁপি 'আম্রবন'—বিপুল বিহার !

অশীতি-সহস্র মঠ নিরমিল নৃপতি অশোক
'বুদ্ধের শরণ' লাগি' ; ভিক্ষুদের কাষায়-চীবর
পৃথ্বীরে করিল পাণ্ডু ! প্রিয়দর্শী, দেবতার প্রিয়,
অরণ্যে গুহায় শৈলে স্তম্ভগাত্রে ধর্ম্মসূত্র-শ্লোক
প্রকৃতি-শাসন তরে লিখাইল, মহা মহীশ্বর—
রাজ-পুণ্যে শ্রমণ গৌতম হ'ল বিশ্ব-বরণীয় !

তার পর?—প্রাণ ছিল উপবাসী বর্ষ-পঞ্চশত,
(জীবনের পথ শেষ হয় না কি উপসম্পদায়?)
দশ শত বর্ষ সেই বুভুক্ষার করিল পারণ—
মানুষ দেবতা হয়ে আরম্ভিল পিশাচের ব্রত !
মন্দিরে, মঠের ভিতে, তোরণের স্তম্ভ-পীঠিকায়
উন্মদ মিথুন মূর্তি—যতী পূজে রতির চরণ !

আত্মার অন্তিম দীপ্তি প্রকাশিল দেহ-রসাতলে,
আয়ুক্ষয় সাধনায় ধরা প'ল মহা আয়ুর্বেদ !
কামযজ্ঞে দেহ সঁপি' হ'ল তায় হবিঃশেষ-পান—
মিথ্যারে মন্থন করি' তার সেই তীব্র হলাহলে
কণ্ঠ নীল ! ললাটের নেত্রে তবু হ'ল না নিষেধ
যোগীর অদ্বৈত দৃষ্টি—তার পর ভারত শ্মশান !

বৈশাখী-পূর্ণিমারাত্রে এক দিন নিরঞ্জনা-তীরে
প্রহরে প্রহরে শুনি' তব কণ্ঠে গম্ভীর 'উদান'—
সেই যে পড়িল খসি' 'মার'-হস্তে বাসনার বাঁশী,
সে আর তেমন সুরে সাধিল না ধরা-বধূটিরে ;
আর সে কামনালক্ষ্মী উদিল না পূর্ণ করি' প্রাণ,
তন্ত্রে-মন্ত্রে শিহরিয়া হাসিল সে উদাসীন হাসি ।

দাঁড়ায়ে প্রসাদ-শিরে হেরি' তব রূপ মনোহর
মুগ্ধা কিসা গোতমীর কণ্ঠে সে কি প্রাণের উচ্ছ্বাস !—
'হেন পুত্র যার ঘরে, কি বা তার সুখ নাহি জানি,
কত সুখী তার প্রিয়া !' শুনি' সেই বাণী সকাতর,
চকিতে উদিল মনে—'সেই সুখী যে-জন উদাসী !'
দীক্ষা-গুরু বলি' তারে পাঠাইলে মুক্তামালাখানি !

নারী তায় পরি' গলে, সারারাত আধেক স্বপনে
জাগিল বাসর একা—রাজপুত্র বসিয়াছে ভালো !
তুমি কিন্তু সেই দিন সত্য-সুখ বাসনা-নির্বাণ
লভিতে ত্যজিলে গৃহ ; পশি' নিজ শয়ন-ভবনে
পত্নীপুত্র-মুখ হতে নিবাইয়া শিয়রের আলো,
না বলি' বিদায়-বাণী, চিরতরে করিলে প্রস্থান ।

প্রেমের লাঞ্ছনা সেই, মমতার সেই অপমান
জয়ী হ'ল ! পণ শুনি দেবতারা কাঁপিল তরাসে—
'শীর্ণ হোক স্নায়ু-শিরা, রক্ত শুষ্ক, অস্থি ক্ষয় হোক,
এ আসন ত্যজিব না, না লভিয়া পূর্ণ পরা-জ্ঞান !'
কর্ম-বন্ধ, ভব-ভয় ভেদ করি' প্রাণান্ত প্রয়াসে
দাঁড়াইলে বোধিমূলে, দূরে ফেলি' কামনা-নির্মোক !

সেইমূর্তি আজও হেরি, শুনি সেই মানুষের কথা—
ভাঙিতে চাহিল যেই দেবতারো দেবত্ব-শৃঙ্খল !
তার বেশি আর কিছু তোমা মাঝে হেরি না যে আজ !
'মার' কি মেনেছে বশ ? ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা ?
তোমার সে আত্ম-জয়ে ফুরায়েছে মৃত্যুর সম্বল ?
ফোটে না কি রাধা-পদ্ম কৃষ্ণ-অশ্রুসায়রের মাঝ ?

অচল সে ধর্ম-চক্র মৃগদাব ঋষিপতনের,
যুগান্ত-সঞ্চিত ধূলি ঢাকিয়াছে শত চৈত্য-স্তূপ ;
শুধু তুমি, ভূতসাক্ষী ভগবান শাক্য তথাগত !
মানস-মন্দিরে কভু দেখা দাও জগত-জনের ।
তোমারি মহিমা স্মরি, স্মরি তব অমিতাভ-রূপ—
তোমারি উদ্দেশে মাথা শ্রদ্ধাভরে করি অবনত ।

তবু সে নির্বাণ-ধর্ম বহুদিন হয়েছে নির্বাণ,
আছে শুধু ক্ষীণ-মর্ম মৈত্রী আর অহিংসার নীতি !
যে রাজ্য বিস্তার করি' মন-মাঝে শাসিলে একেলা
বিশাল মানবগোষ্ঠী ; —করাইলে আত্ম-বলিদান
শূন্য-সুখ তরে শুধু, ঘুচাইয়া প্রাণের পীরিতি—
সে কি নহে দুর্বলেরে লয়ে সেই সবলের খেলা !

বোধিদ্রুমতলে বসি' যেই স্বপ্ন দেখিলে, সন্ন্যাসী,
তোমারি সে,—সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তুমি দ্রষ্টা তার ;
বিশ্বজনে সেই স্বপ্ন দেখাবারে করিলে প্রয়াস—
রুদ্ধ করি' আঁখিজল, ম্লান করি' অধরের হাসি !
প্রাণ-হত্যা করিবারে কেবা তোমা দিল অধিকার ?—
তার চেয়ে ক্রূর সে কি—তৈমুরের লক্ষ জীব-নাশ ?

মানবের সর্ব কীর্তি কালগর্ভে নিমেষে মিলায়—
ধর্মরাজচক্রবর্তী ! তব রাজ্য তেমনি বিলীন !
হিংসা-প্রেম-খরস্রোতা প্রকৃতির প্রাণ-কল্লোলিনী
বহে শুধু নিত্যকাল, জন্মমৃত্যু-লহরী-লীলায় !
তুষারে ফুটিছে ফুল ! মিথ্যা-সুখে হাস্য অমলিন !—
দুঃখ সত্য,—অমৃত সমান তবু তাহার কাহিনী !

আজ আর নাহি ভয় ; দুঃখ সুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জন্মিতেও ভয় নাহি পাই—
স্বর্গলোভ করি না যে, নরকের নাহি যে নিশানা !
কৈশোর যৌবন জরা—জীবনের যত কিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই, যাহা পাই অমূল্য যে তাই !
ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা ।

ওই যে ফুটেছে ফুল বৃতিপাশে, বিচিত্র-বরণ,
হরিৎ ব্রততী-শিরে—ঊর্ধ্বে নীল আয়ত আকাশ—
প্রভাতের হিমবিন্দু মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি-পানে
হৃদয়ে ভরিছে মধু !—তার সেই জীবন মরণ
ফুরাইবে ক্ষণপরে, কেন বৃথা করি হা-হুতাশ
আদি-অন্ত-ভাবনায় ?—কেন ফিরি অদৃষ্ট-সন্ধানে ?

আছে কাঁটা? হায়, সে যে বৃন্তমূল করেছে কঠিন—
মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে দুর্লভ !
কীট ?—সে তো চিন্তা শূল—মর্মকোষে পরাগের ব্যাধি—
শীর্ণ দল, তিক্তমধু, পুষ্পপুট রাগরক্তহীন !
চারি পাশে বিকশিত স্নেহশ্যাম চিকণ পল্লব—
এত শোভা !—তবু সে শিহরি' উঠে মৃত্যুভয়ে কাঁদি' !

দেহ মিথ্যা, প্রাণ মিথ্যা, একমাত্র দুঃখ সত্য হবে ?
বাসনায় আছে বিষ?—আছে সাথে বিষঘ্ন ওষধি !
অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা !
কামেরই সে ভিন্ন রূপ—নাম তার জানে বটে সবে ;
প্রাণের রহস্য তবু এক সেই !—জন্মান্ত অবধি
তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা !

সেই প্রেম !—জন্ম-জন্ম তারি লাগি' ফিরিছে সবাই !
এই দেহ-পাত্র ভরি' যেই দিন উঠিবে উছলি'—
ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ, মৃত্যুভয় রবে না যে আর !
বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি' রবে না সদাই ;
সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা-তিথি উঠিবে উজলি'—
'মার' দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি' বাঁশীখানি তার !

কবি-বরণ

(রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে)

আমারও পড়েছে ডাক আজিকার উৎসব-সভায়,
কবিতার অর্ঘে, কবি, করিবারে তোমার বন্দনা—
জানি না কি দুঃসাহসে গাঁথি' মালা অতসী-জবায়
দুলাইব ওই কণ্ঠে—পারিজাতও পায় যে গঞ্জনা !
তোমারে বরণ করি' লয়েছিনু, সে যে বহুদিন—
কৈশোর-সীমায় সেই দুরাশার কুয়াসা-রঙীন
তারকিত চন্দ্রাতপতলে ! তখন ছিল না ভাষা,
শুধু তব বাণী-রূপ—অনবদ্য অনির্বচনীয়—
নেত্র ভরি' লয়েছিনু ; দূর হতে তব উত্তরীয়
হেরিয়াছি কতবার—করি নাই পরেশের আশা !

আজিও তেমনি আমি সুনিভৃত এ মন-ভবনে
একান্তে আসন পাতি' ভেবেছিনু আনন্দ-চন্দন
পরাইয়া দিব ভালে ; রাখীটি বাঁধিয়া সঙ্গোপনে
দিব যবে, এই ভাবি' উপজিবে সঘন স্পন্দন—
ভারতীর পাণিস্পর্শ-পূত তব ওই করমূল !
চরণ বন্দনা করি' বিরচিব মনোমত ভুল
দ্বিধাহীন অসঙ্কোচে, মানিব না কোন ভয় লাজ !
আমারে ঘেরিয়া কত অপরূপ গীতি-বিহঙ্গম
কূজিবে যৌবন-বনে, জরামৃত্যু করি' অতিক্রম
উতরিব সেই দেশে, তুমি যেথা চির-ঋতুরাজ!

সেই কবি তুমি মোর, সেই গান আজো অবিরাম
শুনি আমি এ জীবন-যমুনার প্রতনু সলিলে ;
ভুলি নাই ধরিত্রীরে সেই মোর প্রথম প্রণাম,
যৌবনের মায়াবতী জাগে আজো ম্লান আঁখিনীলে !
সে গানে এখনো শুনি, ডাকে যেন মোর নাম ধরি'—
হারায়েছি যারে সেই বনপথ-যাত্রা-সহচরী
সখী মোর! মন্ত্র-স্তব্ধ দ্বিপ্রহর জ্যোৎস্না-রজনীতে
আজো করে আমন্ত্রণ—খেলিবারে সে দিনের মত
ছায়া-ধরাধরি খেলা ; অন্ধকারে আজো তন্দ্রাহত
সে গানে চমকি' জাগি' হেরি দীপ জ্বলিছে নিশীথে !

যে সুরে সাধিল গীত একদা সে অজয়ের কূলে
আঙিনায় একা বসি', হেরি' মেঘে-মেদুর অম্বর,
যে রস অমৃত-বিষে মুরছিয়া মরমের মূলে
দ্বিজ-কবি করেছিল এ জাতিরে গানে জাতিস্মর—
সেই রসে, সেই সুরে, এতকাল পরে তুমি, কবি,
যুক্তবেণী মুক্ত করি' বহাইবে হৃদয়-জাহ্নবী
বাঙলার ; এই জল, এই মাটি, এই ছায়ালোক
গুঞ্জরিল সুন্দরের স্বপ্নময় স্নেহের কাহিনী ।
এ জীবনে এত শোভা !—নহে শুধু শ্মশান-বাহিনী—
এ নদীর উভ-কূলে বারাণসী, ভূলোকে দ্যুলোক !

মোদের কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখেছি তাহারে—
গ্রামান্তের বনরেখা-অন্তরালে, সায়াহ্ন-ধূসর
সীমন্ত-গুণ্ঠনবাসে ঢাকি' আঁখি, তিতি' অশ্রুধারে
খুঁজিয়া যে লয় নিতি বিস্মৃতির তিমির-বাসর ।

তুমি তারে ফিরাইলে অস্ত হতে উদয়ের পানে—
সে মুখে পড়িল আলো, তব গীত-অভিষেক-স্নানে
মোহভঙ্গে দাঁড়াইল দেশলক্ষ্মী রাজ-রাজেশ্বরী !
স্যমন্তক-মণি শিরে, অঙ্গে বাস হরিত-হিরণ,
বাণীর মঞ্জীর-বাঁধা দুইখানি রাতুল চরণ,
ধরি' আছে বক্ষে তবু করপদ্মে নীবার-মঞ্জরী !

সেই রূপ-ধ্যানশেষে করি আমি তোমারে বরণ
হে বরেণ্য বঙ্গকবি, জাতি-দেশ-ভাষার দিশারী !
আজ তুমি বিশ্বকবি—সেই গর্ব জানি অকারণ,
যা' দিয়েছ বিশ্বে তুমি, আমি তার নহি যে ভিখারী।
নিখিলের নীলাকাশে আছে শুধু মহা মরুপথ,
নাই সেথা স্নেহ-শ্যাম ছায়া-তরু, নীড়ের জগৎ।
রচিয়াছ যেই নীড় সুনিবিড় হর্ষে শিহরিয়া,
ভুঞ্জিয়াছি শুধু মোরা যে নবান্ন অমৃত-সমান,
যে আনন্দ-অধিকারে বিদেশীর বৃথা অভিমান—
তারি গর্বে সমর্পিনু এই অর্ঘ অঞ্জলি ভরিয়া।

বিদায়-বাসনা

এত দিনে সখি, মনে হয়,
আর নয় হেথা—বৃথা ব'সে থাকা আর নয়,
এবার বিদায় নিতে হয় !

কি হবে জাগিয়া শশিহীন নিশা ?
আয়ুহারা বায়ু হারাইছে দিশা,
আঁধার আকাশ তারাময় !—
এবার বিদায় নিতে হয়।

প্রতিপদ-শশী দশমীতে হ'ল সুধাকর—
আলোক-পুলকে কলঙ্ক-মসী-মনোহর !

যৌবন-বনে মায়াময় ছায়া
প্রতি দেহে রচি' কুসুমের কায়া
মোহিল মানস-মধুকর—
এই জীবনের যত-কিছু হ'ল মনোহর !

যে-ফুল ফুটিল পঙ্ক-সলিল শেহালায়,
তারি মধু মোরা ভরিয়াছিলাম পেয়ালায় ;
যে গানের সুরে নাহি কোন ছল,
তাহাই সাধিনু, আঁখি ছল-ছল,
আমাদের বীণ-বেহালায়,
পঙ্কজ-মধু ভরিয়াছিলাম পেয়ালায় !

যাপিনু দু জনে জ্যোৎস্না-যামিনী দুরাশায়,
চাঁদেরে বেড়িল রামধনু-রঙ কুয়াশায় !
চাহি' তার পানে মদির-নয়ন
করিনু কত না স্বপন-চয়ন
সুখ-পূর্ণিমা-পিয়াসায়,
জ্যোৎস্না-যামিনী যাপিনু দুজনে দুরাশায় !

শেষে, হেসে ওঠে সেই পূর্ণিমা-কোজাগর,
আলোর প্লাবনে ভেসে গেল ইহ-চরাচর !
ভরি' ওঠে মধু ফুলে ফুলে ফুলে,
ভরি' ওঠে প্রাণ কূলে কূলে কূলে
ক্ষুধাহর হ'ল সুধাকর !
এল যৌবন-পূর্ণিমা-নিশি কোজাগর !

একটি সে তিথি, তার পর সখি, সব শেষ,
একে একে খুলে ফেলিতে হইবে রাজ-বেশ ।
কি হবে আঁখিতে আঁকিয়া কাজল,
ওড়নায় ঢাকি' জরির আঁচল,
ভাল ক'রে বাঁধি' এলোকেশ ?—
একটি সে তিথি, তার পর সখি, সব শেষ !

যত নিশি যায় তত যে বাড়িছে আঁধিয়ার,
পাণ্ডুর মুখে সে শোভা চাঁদের নাহি আর !
গভীর নিশীথে সে যে প্রেত-সম
আকাশের কোণে হাসে ক্ষীণতম—

কিবা সুখে বুক বাঁধি আর ?
যত নিশি যায় তত যে বাড়িছে আঁধিয়ার !
সারা হ'ল সখি, এবারের মত সব গান—
পূর্ণিমা-নিশি অবসান !
কি হবে জাগিয়া শশিহীন নিশা ?
মিটাবে কি প্রাণে আলোকের তৃষা
আঁধার-আকাশ তারাময় !
এবার বিদায় নিতে হয় ।

শেষ আরতি

মুকুতার সিঁথি খুলে রাখ, আজ বাঁধিও না কুন্তল,
কাজ নাই সখি, আঁখির কিনারে কুহকের কজ্জল !
সম্বরি' বেশ, বক্ষের বাস,
ঘুচাও মনের মহা মোহ-পাশ—
আজ রাখ সখি, মুকুলে মুদিয়া কমলের শত দল,
ত্যজ মঞ্জীর, মেখলা নীবির—মৃগমদ, কজ্জল ।

নত-নয়নের পক্ষ্ম-তিমিরে স্তিমিত আঁখির তারা
আজি এ নিশুতি-রাতিরে করুক প্রভাতী-প্রহরহারা !
শিয়রের দীপ একা অগোচরে
যে-হাসি নেহারে ওই মুখ 'পরে—
আজি এ বাসরে আপনা বিসরি' বিলাও সে হাসিধারা,
তাহারি রভসে যামিনী আমার হবে যে প্রহরহারা !

মনে পড়ে, সেই কৈশোর-শেষ চৈত্র-চাঁদিনী-রাতে
দিবসের খেয়া পার হয়ে এলে এ পারের বালুকাতে !
কায়া আর ছায়া—হয়ে গেল ভুল,
পদনখ হতে অলকের ফুল
অতি অপরূপ শোভায় শোভিল জ্যোৎস্নার সম্পাতে—
প্রথম যেদিন হেরিনু তোমায় চৈত্র-চাঁদিনী-রাতে ।

মৌনবতী সে রাজকন্যারে আর কেহ চিনিল না—
শুধু মোর লাগি' সে মূক অধরে মনোহর মন্ত্রণা !
তনুর প্রভায় অতনুরে নাশি'
মোরে চিরতরে করিলে উদাসী—
ব্রত-অসিধারে বারিল আমারে কুমারী সে কল্পনা !
সে মূক অধরে মুখরিল সে কি মনোহর যন্ত্রণা !

কামনার ফণী ফণা বিথারিল ফেনহীন উচ্ছ্বাসে—
কণ্ঠ বেড়িয়া শিহরিল সে যে বাঁশরীর শ্বাসে শ্বাসে
অধরের মধু, আঁখির গরল,
উছসিয়া উঠে যত সে তরল,
তত যে আমার পিপাসা নিবারি উপোসথ-উল্লাসে—
উচ্ছ্রিত ফণা মূর্ছিত হ'ল বাঁশরীর শ্বাসে শ্বাসে !

ললাটের তারা সিন্দূর হয়ে শোভিল না চন্দনে,
সন্ধ্যার দীপে ভরিলে না স্নেহ মোহ গৃহ-বাতায়নে ।
শুধু শিথিলিয়া বক্ষের বাস
পূর্ণ পীবর রূপের আভাস
ধরিলে সমুখে—রচিনু রাগিণী তাহারি স্বস্ত্যয়নে ;
সন্ধ্যার দীপে ভরিলে না স্নেহ মোর গৃহ-বাতায়নে !

অয়ি সুন্দরী ভুবনেশ্বরী ! আমি যে তোমারে চিনি—
আমার জগতে তবু তুমি হায় বাণী-রাগ-রঙ্গিণী !
পরশ-হরষ-পিয়াসী এ-জনে
নিশি জাগাইলে গীত-গুঞ্জনে—
হেরিনু তোমারে মনোমন্দিরে রূপরেখা-বন্দিনী !
আমারে লইয়া এ কি লীলা তব? আমি যে তোমারে চিনি !

চির-বিনিদ্র অগ্নিহোত্রী কাল সে আবহমান—
রবি শশী তারা—শত আঁখি মেলি' যে রূপ করিছে পান,
যে মূরতি-রতি-রস-বিহ্বলা
এ তিন-ভুবন স্খলদঞ্চলা—
মেরু হতে মেরু পৃথ্বী-শরীর পুলকে বেপথুমান,
প্রাণের পানীয় সেই সুরাসার আমি যে করেছি পান !

আকাশে আলোর অলকানন্দা—আজ বুঝি কোজাগরী ?
চৈত্র-নিশীথে বলেছিলে আজ ধরা দিবে, সুন্দরী !
এ রাতি ফুরালে জানি এইবার
ধরারে ঘেরিবে কুহেলি-আঁধার—
ম্লান দীপালোকে পড়িবে না চোখে তব রূপ-শর্বরী,
আজি এ নিশীথে শেষ কর মোর জীবনের কোজাগরী ।

ভুলি' দেশ কাল, এই কেশজাল-তিমির অন্তরালে
অধরে অধর সঁপিয়া স্বপিব চির ইহ-পরকালে ।
শেষ-আরতির দীপ হাতে তুলি'
হের, কাঁপে মোর পাঁচ-অঙ্গুলি,
স্তবের মন্ত্র হয় না মধুর সুরের ইন্দ্রজালে—
শিথানের সাথী করে' লও মোরে চির ইহ-পরকালে !

প্রেম ও ফুল

She has lost me. I have gained her ;
Her soul's mine and thus grown perfect.
I shall pass my life's remainder.

—*R. Browning.*

হেথায় কেহই কহিবে না কোনো কথা,
কারো সাথে কারো নাই যে রে পরিচয় !
নিদারুণ এই জীবনের নীরবতা—
প্রণয় সে নয় নাম যার পরিণয় !

শুধু চেয়ে-থাকা অনিমেষ আঁখি তুলে
তারাটির পানে সারাটি গোধূলি-বেলা,
শুধু ব'সে-থাকা বিজন সাগর-কূলে—
আপনারি মনে ভালবাসা-বাসি খেলা !

তুমিও বাতাসে জ্বালিও না দীপটিরে—
কতকাল রবে অঞ্চলতলে ঝাঁপি' ?
বক্ষ তাপিবে,—নিবারি' আঁখির নীরে
ওগো কতকাল রাখিবি তাহারে চাপি'?

প্রথম পর্ব

১

বয়স তখন এমন বেশী নয়—
সতরো কি আঠারোই হবে,
পল্লীবধূর লজ্জা তবু হয়,
পাশ কাটিয়ে ঘোমটা টানে সবে।

লজ্জা তাদের যতই না সে হোক,
আমার কিন্তু বেশি তাদের চেয়ে—
মাটির 'পরে নুইয়ে যেত চোখ
পাছে দেখে ঘোমটা থেকে চেয়ে।

বাল্য-সখী—যাদের সাথে কত
বকুলতলায় ফুল সে কাড়াকাড়ি,
ছোট্ট মেয়ে—ছোট বোনের মত
গাল দেখত সে 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী !'—

তারাই এমন মস্ত বড় .যেন,
চোখের পানে চাইতে কেমন ঠেকে !
ভাবি এমন লুকোচুরি কেন ?
সরল চোখের চাউনি কেন বেঁকে ?

এমন সময় হঠাৎ দেখা হ'ল—
ষষ্ঠীতলায় ভাইটি কোলে ক'রে,
কপাল-ঘেরা কালো চুলের থোলো—
দাঁড়িয়ে আছে নীলাম্বরী প'রে।

সকালবেলা, চৈত্রমাসের শেষ—
আঁধার ভোরের 'আগুন-খেলা' দেখে'
ফিরছি তখন, ভজন-গানের রেশ
কানে আমার জাগছে থেকে থেকে।

সেই দিকেতে চাঁপার খোঁজে এসে
আর এক ফুলের পেলেম পরিচয়—
সবুজ পাতায় একটি উঠে হেসে—
আর একটি সে গাছের ভূষণ নয় !

ফুলের মতন,—ফুল কি যেমন-তেমন !
সকল ফুলের রূপটি তাহার মাঝে,
তুলির মুখে কে টেনেছে এমন
পাপড়ি-রেখা, চিবুক-ঠোঁটের ভাঁজে !

হাওয়ায়-কাঁপা গাছের পাতার ফাঁকে
একটি সে গোল সোনার মতন আলো
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মুখে নাকে—
গভীর গোলাপ-রঙটি ফোটায় ভালো !

কিন্তু তারে ছোট হতেই জানি,
জয়ন্তী সে—মুখুজ্জেদের মেয়ে,
সুন্দরী সে, সবার মতই মানি—
এমন ক'রে থাকি নি তো চেয়ে !

ঠোঁটের এবং জোড়া-ভুরুর মিল
নতুন তো নয়—আগেও ছিল না কি ?
চোখের পাতায় পদ্মদুটি নীল
অতল দীঘির আভাস দিল তা কি ?

দেখেছি তায় অনেক অনেক দিন,
এমন দেখা দেখি নি তো আগে !
এ কোন্ সুরে বাজল প্রাণের বীণ—
চোখে আমার এ কোন্ স্বপন জাগে !

২

বললে—কুলীন তারা,
আমরা ছোট ঘর,
বিয়ের নেইক তাড়া
আগে জুটুক বর ।

তিনটি বছর পরে,
অনেক সাধনায়
নিয়ে এলেম ঘরে,
ফাগুন তখন যায়।
সিঁথি কেমন রাঙা
রক্তচেলীর বেশ!
ডালটি থেকে ভাঙা—
গোলাপ-তোলা শেষ!

—যেমন আকাশ থেকে
রঙটি পটে তুলে
নিজের নামটি লেখে
পোটো তাহার মূলে।

লক্ষ্মী এলেন ঘরে,
নিত্য বসত তাঁর—
এখন কোজাগরে
নেইক তিথি বার!

বসন্তেরি ফুল
ফুটবে সারা বছর!
অমানিশাও ভুল—
নিত্যি চাঁদের বাসর!

ফুলশয্যার রাতে
সেই যে আলাপন,
হাতটি নিয়ে হাতে
প্রেমের গুঞ্জরণ—

'তোমায় ভালবাসি—
বাসবে আমায় ফিরে?
পরাও ফুলের ফাঁসি
গলাটি মোর ঘিরে।'

—যেমন বলিয়াছি,
অমনি আপন হাতে
গলার মালাগাছি
পরায় প্রণাম সাথে !

হিঁদুর মেয়েই এমন
ফুলের মতন ফোটে,
ঠাকুর হোক না যেমন—
পায়ের উপর লোটে !

ধন্য আমার জাতি,
ধন্য আমার দেশ !
প্রাণ যে ওঠে মাতি'—
সুখের নাহি শেষ !

৩

বছর পরে বছর ঘুরে গেল
একে একে তিনটি কেমন ক'রে,
চৈত্রশেষে বোশেখ ফিরে এল—
বনের রাঙা শিমুল গেল ঝ'রে।

ভাবছি ব'সে, ভাবি এখন প্রায়ই
একলাটি এই সন্ধেবেলাটিতে—
স্বপন যখন স্বপন আর সে নাই-ই,
কি হয় তারে টাঙিয়ে ঘরের ভিতে !

বধুর আমার চোখের ভ্রমরদুটি
কেমন যেন ছবির মতই আঁকা !
পদ্মদুটি তেম্‌নি আছে ফুটি',
ভুরুও নয় একটু বেশি বাঁকা !

ধরণ-ধারণ বড়ই সাদাসিধে,
যা কিছু দাও সবই মনের মতন,
কিছুতে তার হৃদয় নাহি বিঁধে,
আপন ব'লে কিছুতে নেই যতন !

সাজার চেয়ে পরকে সাজাবারে
কেমন যেন অধিক আকিঞ্চন,
পৌঁছে দিতে শয়নঘরের দ্বারে—
লাজুক ক'নের সেই যে আপন জন !

নেই যে বিষাদ, নেই যে অভিমান,
হাসিটি তার যখনই চাও আছে,
অনাদরেও আদরসম জ্ঞান,
যেমন ডাকি, দাঁড়ায়ে এসে কাছে !

কেমন ক'রে এমন ছবি নিয়ে
এমনতর করি পুতুল-খেলা ?
আঘাত 'পরেও আঘাত যারে দিয়ে
ঘোচানো দায় অটল অবহেলা !

সত্য সে কি এমন সরল হবে ?
হৃদয়হীনা ?—স্বভাব-উদাসীন ?
শূন্যমনা ?—কে আমারে ক'বে ?
পাই নে কিছু ভেবেও নিশিদিন ।

বুকের কাছে ঘুমিয়ে যখন পড়ে—
আলুথালু কালোচুলের থোলো,
অধর-পাতা কেমন যেন নড়ে,
চোখের পাতা সজল হ'ল-হ'ল !

ঘুমের দেশে স্বপন-পুরীর মাঝে
আত্মাবধূ রাত্রে জেগে উঠে ?
মানস-বীণে কি সুর তখন বাজে !
দিনের বেলায় সোনার পরশ টুটে ?

চুপে চুপে পরাই বাহুর ডোর,
ধীরে অধর পরশ করাই মুখে—
ঘুমের সাথে জড়ায় নেশার ঘোর,
শিউরে উঠে দু হাত চাপে বুকে !

ফুটিয়াছে জলে বিকচ কমল-ফুল,
অরুণ-বরণ সকরুণ ঢল-ঢল—
মধু-সৌরভে আকুল ভ্রমরকুল
গুণ্ গুণ্ করে—'মধু দিবি কি না বল্' ।

ফুটিয়াছে বনে রূপসী গোলাপ-বালা—
জ্যোৎস্না-নিশীথে সমীরে অধীর হিয়া,
আনন-আলোকে সারাটি কানন আলা,
পিপাসী পাপিয়া ডাকে তারে—'পিয়া পিয়া' !

সরসী-শয়নে ছিল যেই হাসিমুখে—
দেবতার পায়ে ছিঁড়ি দিল তায় তুলি' !
ফুটেছিল যেই কাননে সোহাগ-সুখে—
আতরে দানিল দলিত সে দলগুলি :

৪

চুপটি ক'রে একলাটি নির্জনে
ব'সে ব'সে কেনই এত ভাবি !
ভাবনা এ সব নিজের মনে মনে,
মন রে আমার ! সুখ সে কোথায় পাবি ?

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,
ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তা-মাণিক সন্ধানে কি যায় ?

আধেক আঁখি—আধেক কর্ণ রুধি',
মুখের হাসি মুখের কথায় ভোর—
হয় না যে জন, সে জন চক্ষু মুদি'
জীবনটারে করুক আঁধার ঘোর !

মন হ'ল, নারীর হৃদয়-মূলে
স্বভাব-শোভার পাতায় আড়াল-করা
কোন্ বাসনার কুসুমখানি দুলে
—কোন্ পুরুষের চিত্তে পড়ে ধর ?

জগৎজোড়া এই যে প্রেমের কথা
এর কি কোনো অর্থ আছে কিছু ?
সবাই বোঝে নিজের বুকের ব্যথা,
সবাই ছোটে আপন পিছু-পিছু।
হৃদয় পাওয়া হৃদয়-বিনিময়ে—
কিছুতে যে হবার সে নয়, নয় !
যেটুকু লাভ প্রেমের পরিচয়ে,
সে যে কেবল আপন মনেই হয়।

তোমার টাকায় আমার মুখের ছাপ
যে কয়টিতে দেখতে আমি পাই—
তাইতে করি তোমার প্রেমের মাপ
তোমার আসল রূপোর মূল্য নাই।

তুমি তোমার মুক্তামালা খুলে
আমার সোনার সিঁথির দেবে পণ-
আমার গলায় মুক্তামালা দুলে,
তোমার মাথায় সোনার আভরণ !

তাই তো ভাবি, এমন মিলন-মূলে
নেই যে কোথাও সমান পরিচয়—
পাশাপাশি দুইটি মনের ভুলে
একটানা সে ভুলের অভিনয় !

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,
ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তা-মণির সন্ধানে কি যায় ?

৫

আজকে আমার মনের বাতায়নে
দখিন-হাওয়া বইছে ঝিরি-ঝিরি,
কাননে ওই আলোক ছায়ার সনে
খেলছে খেলা গন্ধলতায় ঘিরি'।

আজকে আমার মনের গগন-গায়
হাসছে যেন পূর্ণিমারি চাঁদ,
জোয়ার-টানে আকুল জ্যোৎস্নায়
ভেসে গেছে হৃদয়-নদীর বাঁধ।

আজকে আমার চোখের যত জল
উপ্‌চে উঠে শীতল করে বুক ;
অশ্রু যেন হাসির মধুর ছল,
ব্যথাও যেন গভীরতর সুখ !

কান্না যেন গানের মতন সুরে
ছাপিয়ে ওঠে হৃদয়-কিনারায়,
চিত্ত-বীণার সকল তন্ত্রী জুড়ে
কাঁপছে আশা মধুর দুরাশায় !

যেমন আছ—তেমনি এস, এস !
বস আমার হৃদয়-সিংহাসনে !
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো—
যা আছে থাক্ তোমার মনে-মনে।

বল শুধু, 'বাসি তোমায় ভালো'—
বুকে যা থাক্, মুখে হ'লেই হবে !
তোমার চোখে আমার চোখের আলো
সব্‌টু' দেব, দুঃখ নাহি র'বে।

আমার মনের গোলাপ-বনের মালা
পরিয়ে দেব তোমার কপাল ঘিরে,
আমার হাতের প্রীতির বরণ-ডালা
পরশ ক'রে আমায় দেবে ফিরে।

তোমায় আমার সাধের বেদী 'পরে
বসাই এস পাষাণ-গড়া দেবী !
থির-অধরের সাদা হাসি তরে
রক্ত-সিঁদুর দিয়ে চরণ সেবি ।

আমি আমায় তোমার ভিতর দিয়ে
বাসব সে কি গভীর ভালবাসা !
শূন্য কলস নিজেই ভ'রে নিয়ে
কণ্ঠে তাহার তুলব কল-ভাষা ।

তোমার কোন দুঃখ যে নাই, নারি !
ফুলের মতন উদাস হাসি হাস'—
কি সুখ তোমার বুঝতে নাহি পারি,
—কাউকে যদি ভালই নাহি বাস' ।

জন্ম হতেই অন্ধ যাহার আঁখি
আলোক লাগি' তাহার কিসের শোক ?
প্রভাত যতই করুক ডাকাডাকি,
কখ্‌খনো সে খুলবে না তার চোখ !

যেমন আছ তেমনি এস, এস!
বস আমার হৃদয়-সিংহাসনে !
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো,
যা থাকে থাক্‌ তোমার মনে-মনে ।

শীত-কুয়াশায় ফুটিয়াছে গাঁদাফুল,
তুষার-শীতল কঠিন তাহার দল—
ঝরিল না দেখি' সকলেই করে ভুল,
ম'রে গেছে, তবু করে যে ফোটার ছল !

সুখের হাসি যে দেখিলেই চেনা যায়,
বড় সে চপল, এই নাই, এই আছে—
সুচিকণ, কচি, বাতাসে দোদুল-কায়
পাতায় যেমন প্রভাতের আলো নাচে !

ও যে হাসি, হায়, সোনার-বরণ দলে—
তুষার-কঠিন, সবটুকু মধু-ঝরা ।
ও যে হাসি, হায়, অধর-পাথর তলে
মরণে-অমর—রয়েছে সমাধি করা !

দ্বিতীয় পর্ব

১

গ্রামের পথে চৈত্রশেষের ভোরে
ফিরছি আবার আগুন-খেলার পর,
চাঁপাগাছটি আগেই গেছে ম'রে—
ভেঙে গেছে ফুলের খেলাঘর !

তেমন ক'রে প্রাণ কি আজও নাচে !—
মনের কথা থাক্ না মনেই চাপা ;
সন্ন্যাসীদের গান সে আজও আছে,
গাছের ডালে নেই সে সোনার চাঁপা

দশটি বছর সে এক দুঃস্বপন !—
 গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে প'ল সাথী ।
আমার শুধুই অকাল জাগরণ,
 পোহায় না যে দীর্ঘ অমারাতি ।

চাইলে পরেই যায় যে জিনিস পাওয়া—
 বিকায় সে তো বেচা-কেনার হাটে,
সমাজ মেটায় যে-সব দাবি-দাওয়া,
 সে যে শুধুই দেহের বেলায় খাটে !

বড় যা—তা পাওয়ার অধিকার
 এ জগতে নাই রে কারো নাই !
পাওয়া তো নয়, দেওয়ার অহঙ্কার
 রাখে যে জন—তারি যে জিৎ, ভাই !

জীবনে ওই একটা সাধন আছে—
 নয় যা ফাঁকি, গিল্‌টি, ঝুটা, নকল ;
পাওয়া হারে দেওয়ার সুখের কাছে—
 একটু সে নয়—দিতে হবে সকল !

কিসের দাবি, দুঃখ কিসের ভাবি—
 ভালই যদি বেসেছিলেম তারে?
থাকত যদি ভালবাসার চাবি,
 ভাঙতে হ'ত বন্ধ কপাটটারে?

কেবল সোহাগ অভিমানের পালা
 কাঙালপনা সেই যে নিরন্তর—
তার মাঝে কেউ আপন প্রাণের জ্বালা
 জুড়াতে পায় একটু অবসর ?

হাত পেতে যে সদাই থাকে ব'সে—
 নিজের ক্ষুধায় অন্ধ হয়েই আছে,
পিপাসা যার কণ্ঠ-তালু শোষে,
 কি চায় নারী তেমন নরের কাছে ?

বুকের তাপে শুকায় নয়ন-বারি,
গোপন শ্বাসে আগুন যে তার বাড়ে ;
দগ্ধ প্রাণের ভস্ম অপসারি'
নিবায় কে সেই ঘুমন্ত অঙ্গারে ?

মনে পড়ে সে এক শ্রাবণ-দিনে
তিস্তা-নদী হতেছিলেম পার,
সে কি ভীষণ! কে তায় তখন চিনে?
একূল-ওকূল ঝাপ্‌সা একাকার !

নৌকা হ'ল হঠাৎ বেসামাল,
চেঁচিয়ে ওঠে মাল্লা-মাঝির দল ;
কেউ বা কাঁদে, কেউ বা পাড়ে গাল,
একটি প্রাণী—স্থির সে অচঞ্চল !

সে মুখ আমার পড়ছে আজও মনে—
ঠোঁটের পাশে তেমনি হাসির রেখা,
ভয় যেন নেই কোথাও মনের কোণে,
চোখের তলে নেই যে কিছুই লেখা !

পরের মায়া, প্রাণের মায়া—কিছুই
নেই বুঝি তার, ভেবেছিলেম সেদিন ;
হায় রে মানুষ! আপন পিছু-পিছুই
ছুটিস ব'লে এমন নয়ন-বিহীন !

সে বার সবাই বেঁচে গেলেম খুবই,
এখন বুঝি, গেলেই ভাল হ'ত ;
বিপদ সে নয়—দুখের ভরা-ডুবি !
—বেঁচে যেতেম চিরদিনের মত !

দেশে এসে অনেক দিনের পর
ঘুরে বেড়াই চৈত্রশেষের ভোরে ;
ভেঙে গেছে ষষ্ঠীতলার ঘর,
চাঁপা, সে তো আগেই গেছে ম'রে ।

২

কেমন ক'রে মিটল সকল ধাঁধা,
ফুরিয়ে গেল সুখের অভিনয়,
ঘুচল বাঁধন, মিথ্যা সাধন-সাধা—
সে কথা যে মোটেই বেশি নয়।

*　　　*　　　*

চাকরি করি—দেশে দেশান্তরে
ঘুরে ঘুরে বেঁধে বেড়াই ঘর,
কখনো সে বিরাট তেপান্তরে,
কখনো বা ভাঙন-ধরা চর।

দুইটি প্রাণী—নেইক ছাড়াছাড়ি,
ছেড়ে আমায় থাকবে না সে কভু,
কোথাও নয়, হোক না মায়ের বাড়ি—
নিতে এলেও চায় না যেতে তবু!

যত্ন-সেবার একটু বিরাম নেই,
ভাবনা—কিসে থাকব আমি সুখে;
যে দেখে তায় অবাক যে হয় সে-ই—
প্রশংসা না ধরে সবার মুখে।

রোগ যদি হয়—দিনে রাতে সমান
রইবে জেগে স্বামীর শিয়রটিতে,
অনাহারেও মুখখানি অম্লান,
ঘুমের পরশ নেই সে চাহনিতে।

এমনি ক'রেই কাটতেছিল দিন—
সেবার যেন হঠাৎ কেমন ক'রে
দুই দিনে তার গণ্ড হ'ল ক্ষীণ,
চোখের পাতায় ঘুম যে আসে ভ'রে!

জানি যে তার দুঃখ কিছুই নাই,
—বজ্রসমান কঠিন মনের তল!
প্রাণের ব্যথার নেই যে কোনোই ঠাঁই—
বৃথাই যে তার চোখের জলের ছল!

'হঠাৎ কিসের অসুখ হ'ল, রাণি ?'
—জিজ্ঞাসিলে মুখ সে কঠিন করে,
কয় না কথা—হাত দিয়ে হাতখানি
ধরলে, যেন চোখে আগুন ঝরে !

অবাক হয়ে মুখের পানে চাই,
ভাবি, এ কি ! এ রূপ কোথায় পেলে !
ছবির মুখে হাসি যে আর নাই !
এ কোন্ প্রাণী উঠছে পাথর ঠেলে !

দু দিন যেতেই মূর্চ্ছা হ'ল সুরু,
সদাই চোখের চাউনি কেমনতর !
বুকের ভিতর সদাই দুরু-দুরু,
কেমন যেন ভয়েই জড়সড় !

সেদিন দেখি, সন্ধেবেলায় ঘরে—
বাক্স খোলা, নিজে লুটায় পাশে,
চোখের তারায় পলক নাহি পড়ে,
—আধেক-ঢাকা-খোলা-চুলের রাশে।

হাতের মুঠায় একখানি কার চিঠি,
মেঝের উপর খোলা আর-একখানি—
সদ্য-লেখা লাইন দু-চারিটি !
কার সে লেখা ? দেখে' অবাক মানি।

লিখতে জানে, পড়তে জানে সে যে—
তার তো কোন পাই নি পরিচয়,
এত দিন সে ছিল অবুঝ সেজে !—
কেনই বা ?—এ আরেক যে বিস্ময় !

চিঠির বালাই ছিল না তার মোটে,—
কেই বা লেখে, কেই বা জবাব দ্যায় ?
বিদেশে তার বন্ধু যদি জোটে,
চোখের আড়াল হ'লেই ভুলে যায়।

মায়ের খবর দিতাম নিজেই তারে—
বাপ মরেছে, বাপের ভিটে ছাড়ি'
মা-ভাই এখন মামারই সংসারে,
আমার গ্রামেই তার যে মামার বাড়ি।

চিঠি দুখান সরিয়ে তুলে রেখে
মাথাটি তার নিলেম কোলের 'পর,
একটু জ্ঞান হয়, আবার যে যায় বেঁকে—
এমনি করে কাটল চার প্রহর।

সকালবেলায় সকল কথা শুনে
কহেন ডেকে প্রবীণ চিকিৎসক—
'কঠিন ব্যাধি—রুদ্ধ মনাগুনে
চরম যে আজ, দেখছি মারাত্মক !

'চিঠি দুখান দেখতে হবে আগে—
এখনকার এই রোগের নিদান তাই ;
পড়তে যদি তোমার ব্যথা লাগে,
তবে না হয় আমায় দিও, ভাই।'

দুখান চিঠি নিজেই একে একে
প'ড়ে গেলেম স্বপন-দেখার মত,
আমার সে মুখ কে বা তখন দ্যাখে—
চিঠির মালিক আছেন মূর্ছাহত।

"দিয়েছিলে একটি অধিকার
চিরবিদায় ক্ষণে—
মাথায় নিয়ে আমার গলার হার,
একটি সে চুম্বনে।

করিয়ে নিলে পণ সে দারুণ অতি—
জন্মে না দিই দেখা ;
একটি চিঠির পেলেম অনুমতি
—মরণ-সময় লেখা !

এবার তোমার স্বামী-সুখের মাঝে
ঘুচল দুঃস্বপন ;
নারি, তোমার একটু ব্যথা বাজে ?
—হায়, কি কঠিন পণ !

ঝাপ্‌সা হয়েও মিলায় না এই চোখে
তোমার চেলীর ছায়া !
মাপ যেন পাই ইহ-পরলোকে,
ওগো পরের জায়া !"

*　　　*　　　*

"মাপ যে খোঁজে ভালবাসার পাপে
মুক্তি কি তার হাতে-হাতেই হয় ?
মুক্ত তুমি ?—কাহার অভিশাপে
নারীই শুধু পাপের বোঝা বয় ?

স্বর্গ আমার সাজিয়ে আছি ব'সে—
সে সুখ দেখে নরক মানে হার !
মাপ চেয়েছ মনেরি আপশোষে—
অর্থ যে তার বুঝছি পরিষ্কার !

তাই হবে গো !—করছি তোমায় মাপ,
তুমি পুরুষ, আমি যে ভাই, নারী !-
একা আমার সইবে দোঁহার পাপ,
হবে না সে একটু বেশি ভারি !"

আঁধারেই ফুটি' আঁধারে যে ফুল ঝরে,
মুকুলে তাহার বিষ, না সে পরিমল ?
তারা মিটি-মিটি হাসে যে নীলাম্বরে—
তা'রা জানে তার পীরিতির কিবা ফল।

জীবন-যামিনী একা জাগে বনমালা,
অরুণ-আলোর পরশে মরণ তার!
ভরি' ওঠে বুকে গোপনে মধু'র জ্বালা,
অসাড় পরাগে আঁধারের হাহাকার !

পাপড়ি যে লাল !—বুঝি বা চেলাঞ্চল !
এ কি বধূ-বেশ ?—হায় হায় অভাগিনী !
মরম-শোণিতে রাঙা হ'ল হৃদি-তল—
নিশার শাসনে কে লবে তোমারে চিনি' ?

৩

তিনটি দিনের পর
সংজ্ঞা এল ফিরে—
তখনও খুব জ্বর,
মুখটি ফেরায় ধীরে।

আমার পানে চেয়ে
সে কি চোখের জল
গাল দুখানি বেয়ে
ঝরল অবিরল !

বাতাস করি শুধু,
মাথায় বুলাই হাত ;
প্রাণের ভিতর ধূ ধূ—
বাইরে আঁধার রাত।

মুখটা যতই ফেরাই
তত্তই সে তাই খোঁজে,
চোখ যদি না সরাই
—চক্ষু নাহি বোজে !

চাউনি সে কি সরল—
সদ্য-ফোটা ফুল !
আহা ! যেন সজল
কমল-সমতুল !

এতকালের চেনা
সে মুখ এ তো নয় !
চুকিয়ে সকল দেনা
এ কোন্ পরিচয় !

হাসির মুখোস-পরা
কোথায় বা সেই নারী ?
পড়ল আবার ধরা
কিশোর-বয়স তারি ?—

আবার আঁচলখানি
উড়িয়ে আপন মতে
বেড়ায় অসাবধানী
বকুল-বনের পথে ?

গামছা চাপি' দাঁতে
দিচ্ছে বুঝি সাঁতার—
সন্ধ্যা দুপুর প্রাতে
দীঘির অথই পাথার ?

পুতুল-বিয়ের তরে
গাঁথছে পুঁতির মালা ?-
বরের টোপর করে,
ক'নের বাজু-বালা ।

বুকের সে বিষ আজও
জমতে আছে দেরি ;
নেই কোনো ভয় লাজও—
মূর্তি আনন্দেরি !

চোখের পানে চেয়ে
তাই তো মনে হয়,
সে যেন কার মেয়ে !—
বধূ সে নয়, নয় !

বিকালবেলায় দেখে
আবার পেলেম ভয়—
কানের কাছে ডেকে
দেখি —চেতন নয় !

কর্ণ যেন বধির,
নীরব সে নির্বাক ;
চক্ষু দুটিই অথির
—অধর ঈষৎ ফাঁক ।

আবার পাগলপারা
নামটি ধ'রে ডাকি—
একটু ঠোঁটের সাড়া,
থির হ'ল সে আঁখি !

৪

নিয়ে গেলেম গৌরী-নদীর ঘাটে,
তখন জ্যোৎস্না-রাতি—
পঞ্চমী-চাঁদ পড়ছে হেলে মাঠে,
অল্প ক'জন সাথী ।

পেতে দিলেম বিজন বাসর তার
বালুর শয্যাতলে,
আধেক-আলো, আধেক-অন্ধকার
মিলায় নদীর জলে ।

মাথার সিঁদুর, বিয়ের চেলীখানি
পরিয়ে নিয়েছিনু,
আলতা যে খুব চওড়া ক'রে টানি'
দু পায় দিয়েছিনু !

ভেবেছিলেম, সতীর সজ্জা যত
—দেহের বাকি বালাই,
শ্মশান-শিখায় আজকে মনের মত
ভাল ক'রেই জ্বালাই ।

হঠাৎ এখন চেয়ে মুখের পানে
মনটা কেমন হ'ল,
বক্ষ আমার দারুণ ব্যথায় হানে—
ভুল যে ধরা প'ল !

কি করেছি ! মড়ার উপর এ কি—
এ যে খাঁড়ার ঘা !
শেষ-আগুনে শোবার আগেও দেখি
—তেমনি জ্বলে গা !

তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেম তুলে
নদীর কিনারায়,
অঞ্জলি-জল দিলেম সিঁথির মূলে—
সিঁদুর ধুয়ে যায় ।

পড়ল খুলে বিপুল খোঁপার রাশি—
বিউনি বুকের 'পর,
ঠোঁটের কোণে ফুটল যেন হাসি—
ম'রেও কি সুন্দর !

ওপারে ওই ঘন বনের আড়ে
চাঁদ যে ডোবে-ডোবে—
এই আঁধারে চোখের নেশা বাড়ে
হায় রে কিসের লোভে ?

আজকে আবার তেমনি কালো চুলে
কপালে সেই ছায়া !
নিশার আঁধার—মরণ-আঁধার-কূলে
এ কি রূপের মায়া !

ম'রেও তবু ছাড়বি না কি ছলা ?
—এখনিও হাতছানি !
বোকার বুকে বিঁধিয়ে রূপের ফলা
এ কি রে শয়তানী !

একটি চুমা দিব কি ওই মুখে ?
—আমি যে ভাই, নিলাজ !
অনেক দুঃখ দিয়েছি ওই বুকে
সইবে এটাও—দি' আজ ?

যত্নে, যেন শিশুর দেহের ভার—
বুকে নিলেম তুলে ;
শুইয়ে চিতায়—তখন অন্ধকার—
চেলী দিলেম খুলে !

জ্বল্‌ল আগুন ধোঁয়ায় আকাশ ভরি',
বাতাস উতরোল ;
বালির উপর দিলেম গড়াগড়ি,
—উচ্চে হরিবোল !

৫

আমার ভাগ্যে ফুল যে হ'ল বাজ—
বল কিসের পাপে ?
ফাঁকি ছিল আমার হৃদয়-মাঝ ?
—বিধির অভিশাপে ?

জানি না সে ; জেনেই বা কি হয় ?
ফিরবে কি আর জীবন
ভুল কি ঘোচে ?—মর্মে গাঁথা রয়—
ভুলেই ভরা ভুবন !

সেই ভুলেরই ব্যথার ফুলবনে
কাটল আমার রাতি ;
পাইনি যাহা অশান্ত যৌবনে—
স্বপনে আজ গাঁথি ।

নেই কে বলে ?—অসীম অন্ধকারে
গন্ধ যে তার পাই !
দহন-শেষে সুদূর গহন-পারে
তারার ভাতি নাই ?

এখন বুঝি, এই আমার ভাল,
—হারাই নি তো তারে
পায় নি সে-ই, শূন্য-হাতেই গেল—
পেয়েও পেলে না রে !

ধুইয়ে গেল আঁখিজলের ধারে
আমার সকল গ্লানি,
ভ'রে নিলেম শূন্য হৃদয়টারে
চিতার ভস্ম আনি' !

সারাজীবন হারিয়ে বেড়াই যদি—
পাই নি কভু তারে ?
পাওয়া সে নয় ?—ধেয়ান নিরবধি
মধুর হাহাকারে !

আঁধার রাতে একলা যখন জাগি,
দাঁড়ায় দুয়ার-পাশে—
বলি, 'ওগো এখনও কার লাগি'
ঠোঁট দুখানি হাসে ?

ঘুচল না কি এত ক'রেও তবু
কান্না-পাওয়ার ভয় ?
চিতায় পুড়েও এয়োর জ্বালা কভু
জুড়িয়ে যাবার নয় !

ভয় কি, সখি? মাথার কাপড় খুলে
দেখই না একবার—
সিঁদুর সে আর নেই যে সিঁথির মূলে,
সব যে পরিষ্কার !'

যেমন বলা, তেমনি দু চোখ তুলে
চাইলে—সে কি মধুর !
নিজেই হঠাৎ মাথার কাপড় খুলে
দেখায় সিঁথির সিঁদুর ।

মিলায় ছায়া, মায়া ঘনায় মনে,
বুঝি বা না বুঝি—
কাটাই রাতি স্বপন-জাগরণে,
আবেশে চোখ বুজি' ।

অনেক দেখা অনেক দুখের শেষে
বুঝেছি এই সার—
মিথ্যা যে হয় সত্য—ভালবেসে !
—প্রেম যে চমৎকার !

যৌবনেতে ছিল মধুর মোহ,
বেসেছিলেম ভালো,
ছিল তখন প্রাণের সমারোহ—
দু-চোখ ভরা আলো !

সেই আলোকে চিনে নিলেম বধূ
বসন্তশেষ-প্রাতে,
যেমন সে হোক—ফুরায়নি তো মধু
সারা জীবনটাতে ।

জীবনে নয়, মরণ হতেই তার
সেই যে পরিচয়—
পরম সে যে ! সকল অহঙ্কার
তাইতে হ'ল ক্ষয় !

তার পরে এই বছর পরে বছর
আমার চাঁপাগাছে
ফুরায়নি ফুল,—অরূপ-রূপের নিঝর
আলো ক'রেই আছে !

সেই কিশোরীর জোড়া-ভুরুর নীচে
নীল সে নয়নতারা,
কোঁকড়া-কালো চুলের রাশি পিছে
হয় নি কভু হারা !

তারই বুকের ব্যথার দেবতারে
নিত্য পূজা করি,
ব্যথার ব্যথী হয়েই পেলেম তারে
জীবন-মরণ ভরি' ।

কাননে কাননে ফুটে উঠে ফুলহাসি—
সে কি সুমধুর রঙীন নেশারি ভুল ?
সৌরভ তার বাতাসে বিনায় ফাঁসি,
উছসিয়া উঠে হৃদয়ের উপকূল !

ফুলের ব্যথা যে সন্ধ্যারি মেঘ-মায়া—
নিমেষে মিলায় রজনীর আঁধিয়ারে ;
নদীজলে তার পড়েছিল যেই ছায়া—
স্বপনে কেন সে দেখা দেয় বারে বারে ?

প্রেম আর ফুল—দুয়েরি সে হাহাকার
অতি অপরূপ ছলনা যে ধরণীর !
মিথ্যাই যে রে জীবনের মণিহার—
এক দেখি তাই হাসি আর আঁখি-নীর !

সনেট-সমূহ

পয়ার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী !
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী?
আন বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী
উদার উদাত্তগীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে—
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম-নিবাসিনী !

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ;
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে !
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্বণ ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে ;

কবিধাত্রী

পুরাতন বাস্তুভিটা, অতি উচ্চ শিখরে তাহার
প্রভাতে সন্ধ্যায় বসি' রচি গান ; বিজন-বিধুর
চেয়ে থাকি মুগ্ধনেত্রে, নভ-তলে যেথায় সুদূর—
মিশে গেছে অরণ্যের অনন্ত পল্লব-পারাবার !
নতোন্নত তরুশির—নীলে ও শ্যামলে একাকার !—
তারি 'পরে ফেলে ছায়া নবমেঘ গম্ভীর মেদুর।
অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী, তাল, শিমুলের ক্বচিৎ সিঁদুর,
বেণুশীর্ষ, আম্র আর পনসের ঘনপত্র-ভার
ঢেকে আছে ধরণীরে। ঊর্ধ্বে শূন্য মহানীলাম্বর,
নিম্নে হরিতের মেলা ; সারাবেলা বিহঙ্গের গান,
রহি' রহি' বায়ুমুখে কাননের উদাস মর্মর,
নীরব উদয় অস্ত, মধ্যদিন নিশীথ-সমান !—
এই মৌনী প্রকৃতির সুনিবিড় অরণ্য-বাসর,
এই মোর 'কবিধাত্রী'—জনহীন সবুজ শ্মশান !

আমার নয়নে শুধু বর্ণ আর বিপুল প্রসার—
নিস্তব্ধ রূপের ছায়া, মেঘ-মায়া সন্ধ্যায় প্রভাতে ;
দৃষ্টি মোর ডুবে যায় নীর-হীন নীরদ-শোভাতে—
ধরণীর চতুঃসীমা-ভরা ওই বিটপী-বিথার !
কানে নয়—প্রাণে জাগে সুগম্ভীর ধ্বনি অনিবার,
বসি যবে মহামৌনী সুবিরাট কানন-সভাতে—
সুদূর-কালের স্রোত মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গ-আঘাতে
আছাড়িয়া পড়ে বুকে—অতীতের স্তব্ধ হাহাকার !
দাঁড়ায় আমারে ঘিরে মোর সেই পিতৃপিতামহ—
বৃহৎ-কালের সাক্ষী, বহু যুগ-যুগান্ত স্বপন
ভরি' দেয় আঁখিপাতা ! জন্মমৃত্যু-ভাবনা দুঃসহ
ভুলে যাই, চিত্তে মোর কল্পনার নীল -আলেপন
স্নিগ্ধ করে সর্ব ব্যথা ; পুরাতন এ বন-ভবন
বহিছে কত না স্মৃতি, তার ধ্যান করি অহরহ !

জ্যোৎস্নারাতে, ভগ্ন পূজা-মণ্ডপের খিলান-প্রাচীরে
যে গভীর কালো ছায়া প্রেতসম উঠিছে গুমরি',
হেরি' তারে মনে হয়, আজও সেই উৎসব-বাঁশরী
বাজিছে করুণ সুরে, আধ-আলো অন্ধকার-তীরে—

সেদিনের প্রতিবিম্ব কাঁপে মোর নয়নের নীরে ।
গৃহে আসি' কবে কোন্ নববধূ নূপুর ঝিমরি'
রেখেছিল পা দুখানি যে ইষ্টক-ফলক উপরি—
সে ওই রয়েছে পড়ি' এক কোণে ভবন-বাহিরে !
স্মৃতির সমাধি' পরে ব'সে দেখি সেদিনের ছবি,
এদিনের কলরব পশে না যে আমার শ্রবণে ;
চেয়ে থাকি—যেই দিকে অস্ত গেছে গৌরবের রবি,
গাঁথি যে তারার মালা অন্ধকারে নিশীথে-স্বপনে !
যে সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি।

ত্রিস্রোতা

রসাতলে ভোগবতী, মর্তে গঙ্গা, স্বর্গে মন্দাকিনী—
এক বিষ্ণুপদী-ধারা—ক্যাস্রোত বহে নিরন্তর ;
জানি না পাতালে তার কুলু-কুলু কিবা কলস্বর,
আকাশ-তরঙ্গে তার ভাসে কি না সুবর্ণ-নলিনী !
জানি শুধু জাহ্নবীরে—পুণ্য-তোয়া প্রাণ-প্রবাহিণী,
ত্রি-ধারায় সেও বহে জীবনের কাহিনী সুন্দর,
ধরাবক্ষে ত্রি-গুণিত স্ফটিকাক্ষ-মালা মনোহর,
যজুঃ সাম ঋক্-মন্ত্র গাহে নিত্য সে কল-নাদিনী !

অতীত-কল্পনাময়ী যমুনার নীল জলধারা—
রাখালের বাঁশী বাজে ব্রজবনে তারি তীরে তীরে ;
ভবিষ্যের সরস্বতী বালুতলে হয় নি তো হারা—
আশার অমৃত-বাণী বহিতেছে হৃদয় গভীরে ;
প্রত্যক্ষ-কালের গতি ভাগীরথী উন্মাদিনী-পারা
নৃত্য করে ঊর্মিভঙ্গে চন্দ্রচূড় মহাকাল-শিরে !

বঙ্গলক্ষ্মী

ইতিহাসে খুঁজি তোমা, স্বপ্ন-সুষমায়
গ'ড়ে তুলি অপরূপ মোহিনী মূরতি—
মনোময়ী প্রতিমায় করি যে আরতি
বর্ষে বর্ষে, কোজাগরী-লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় !
জ্যোৎস্না-রাতে পদচিহ্ন রাখিলে কোথায়—
খুঁজিয়াছি তরী বেয়ে সারা-ভাগীরথী ;
হেরি শুধু ভাঙা-ঘাট বিজন বসতি—
প্রয়াণের পথ-রেখা নদী-সিকতায় !
গেছে রূপ, ছায়া তবু ভাসে যেন চোখে ;
হেমন্তের মায়া-মৃগ—স্বর্ণ-মরীচিকা—
ধায় আজো শস্য-শীর্ষে ; চম্পকে অশোকে
বসন্ত বিদায় মাগে ; আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব মেঘালোকে—
কবির অমর শ্লোকে লভে জয়টীকা !
উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীত-রৌদ্রে দীর্ঘ জ্বরজ্বালা !
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালির-মালা—
অর্চিবে কমল তুলি' কমলাসনায় ?
তুমি লক্ষ্মী ছিলে কবে ?—আছ কল্পনায় ;
নাই ঝাঁপি, আছে শুধু নৈবেদ্যের থালা
নিত্যপূজা-অভিনয়ে—বৃথা দেয় বালা
গৃহদ্বারে আলিপনা প্রতি পূর্ণিমায় !
ছিলে যবে, হে জননী, সারা দেশ ভরি'—
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী-রূপে ;
আজ তুমি গৃহে নাই, তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্তিখানি গড়ি।
লক্ষ্মীরে চাহি না বটে দীপে আর ধূপে—
বঙ্গলক্ষ্মী ?—সেও যে রে ছায়া-ধরাধরি !

আহ্বান

শিব-নাম জপ করি' কাল-রাত্রি পার হয়ে যাও—
হে পুরুষ ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার ।
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী !—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও ?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও ?
সব মরা !—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীন বর-বপু ঊর্ধ্বস্বরে করিছে চীৎকার !
কেহ নাই !—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও !

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষার অজস্র ফণা ; অর্ধ্ব-মগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায় !
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায় ;
নগ্ন বক্ষে, পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি আড়ষ্ট, আনীল !

জন্মাষ্টমী

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—হেন বার্তা কবে ভগবান
কহিলেন কুরুক্ষেত্রে, তারি স্মৃতি জপে আজও যারা
তারাই কি গণে মাস, বর্ষ, তিথি,—যাপে নিদ্রাহারা
ভাদ্র-রাতি কৃষ্ণা-অষ্টমীর ! কত যুগ অবসান—
আর কোনো পুণ্য-ক্ষণ ধরণীর মুখ চির-ম্লান
দেয় নি লাবণ্যে ভরি' ?—ভেদি' কভু আঁধারের কারা,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কোনো ভাগে উদয়ের তারা
রচে নি ঊষার ভূষা,—জলধি করে নি কলগান ?

সে আশাও আজ বৃথা !—নবযুগে নাহি অবতার ।
এবার সহস্রশীর্ষ পুরুষের—সারা মর্ত্য জুড়ি'—
আরব্ধ যে মহাযাগ, নাহি তায় তিথি, দিন, ক্ষণ ।
কে দিবে কাহারে মুক্তি ? নাহি চাই কৃপা দেবতার-
স্বর্গ হ'তে কে নামিবে ? এই মর-মৃত্তিকার পুরী
ধন্য করি' নবজন্মে, নর নিজে হবে নারায়ণ !

রুপার্ট ব্রুক

(1914 and Other Poems by Rupert Brooke)

কবিতা পড়িতেছিনু, ইংরাজী সে সনেট দুচারি—
আরো কিছু গীতি-কথা ; জানি নাই, কখন সে ভাষা
হইল আমার বাণী, বহিল সে আমারি পিপাসা !
যে সরল সত্য-মন্ত্রে জীবনের আমিও পূজারী—
তারি ছন্দ, তারি সুর, অনবদ্য প্রকাশ তাহারি
মর্মরি' উঠিল মর্মে,—এক আশা, এক ভালবাসা !
মনে হ'ল, যে-বিহঙ্গ স্বপ্নে মোর বেঁধেছিল বাসা
অন্ধকারে, সে আজি অরুণালোকে উঠিছে ফুকারি' ।
প্রতি শব্দ অর্থবান, প্রতি পংক্তি ব্যথায় বিধুর—
শ্লোকে-শ্লোকে অতিরুদ্ধ হৃদয়ের সিন্ধু-কলোচ্ছ্বাস ;
অসীমার অভিসারে পদধ্বনি যেন সে সুদূর,
কণ্ঠে তবু এ কি গীত !—ধরণীর এ মর্ত্য-আবাস
এত ভাল লেগেছিল ! প্রেমে প্রাণ এত ভরপূর !
এত আলো—নিবাইতে নারে তারে মৃত্যুর নিশ্বাস !
বহিতেছে মৃত্যু-ঝড় ; মহামারী-রূপে মহাকাল
অযুত জীবন-দীপ নিবাইছে ফুৎকারে ফুৎকারে !
ছিন্নমস্তা 'য়ুরোপা'র কণ্ঠসুত শোণিত-উৎসারে
কি ভীষণ কলধ্বনি ! না, সে বুঝি মত্ত প্রেতপাল
ছড়াইছে দিকে দিকে বহুজীর্ণ আপন কঙ্কাল—
কৃপণ জীবন যাহা করেছিল জড় স্তূপাকারে
সঞ্চয়, শতাব্দী ধরি' ! ভরি' উঠে দারুণ ধিক্কারে
সারাচিত্ত, টুটে যায় জীবনের মিথ্যা মোহজাল ।

সেই ঘৃণা, অবিশ্বাস, অট্টহাসি, হাহাকার-মাঝে
ধ্বনিল কি শুভ-গীত—কবিকণ্ঠে সুন্দর-বন্দনা !
আপনার হৃদ্‌পিণ্ড, রক্তজবা, ছিঁড়িয়া অঞ্জলি
দানিল সে হাসিমুখে—রাজ-কর মৃত্যু-মহারাজে !
মরণ মরিল লাজে, তাই হেন অমৃত-মূর্ছনা—
জীবনেরি জয়গানে ভরি' উঠে নব পদাবলী !

'যে বিধাতা গড়িয়াছে আমা সবে নিজ প্রয়োজনে
যুগ-যোগ্য করি' লয়ে', বরিয়াছে মোদের যৌবন,
হরিয়াছে সুখ-নিদ্রা—চক্ষে দীপ্তি, অব্যর্থ-সাধন
দুই বাহু দিল যেই, ঝাঁপাইতে দ্বিধাশূন্য মনে
নীল নির্মলতা মাঝে—নমি আজ তাঁহার চরণে।'
'লভেছি অভয় মোরা, যাহা কিছু নিত্য চিরন্তন
তারি সাথে—বায়ু, উষা, মানুষের হাসি ও ক্রন্দন,
নিশীথ, বিহঙ্গ-গীতি, মেঘেদের গমন গগনে।'
'করি না যুদ্ধের ভয়, চলিয়াছি শুভযাত্রা করি' !
গোপন কবচে মোরা মৃত্যু-বাণ করিব নিষ্ফল !
অরক্ষায় সুরক্ষিত ! মানুষ যেতেছে যেথা মরি'
দলে দলে, সব চেয়ে ভীতিশূন্য সেই রণস্থল !
আর, যদি প্রাণ এই ক্ষুদ্র দেহ যায় পরিহরি'—
লভিব পরম স্বস্তি হারাইয়া চরম সম্বল।'

'এই সব প্রাণ ছিল জীবনেরি দুঃখ-সুখে গড়া,
অপরূপ অশ্রুজলে স্নান-শুচি, হরষ-চপল !
বয়সে বেড়েছে স্নেহ ! ধরণীর রঙের পসরা
একদা এদেরও ছিল—উষা, আর সান্ধ্য নভ-তল।
এরা ভুঞ্জিয়াছে গীত, গতি-রাগ, নিদ্রা, জাগরণ,
চকিত বিস্ময়-সুখ, ভালবাসা, বন্ধুতা-গৌরব,
বিজনে বসিয়া-থাকা, সুকোমল স্পর্শ-শিহরণ
রেশমে, কপোলে, ফুলে ; ফুরায়েছে আজি সেই সব
আছে হ্রদ হিম-দেশে—সারাদিন ক্ষ্যাপা বায়ুসনে
হাসে হা-হা করি', হাসে বুকে নীলাকাশ। পরক্ষণে
সে চঞ্চল রূপচ্ছায়া, ঊর্মি-নৃত্য—শীত সুকঠিন
স্তব্ধ করি' দেয় শুধু, একটি ইঙ্গিতে ; রেখে যায়
নিস্তরঙ্গ শুভ্র-ভাতি, পুঞ্জীকৃত প্রভা ছায়াহীন—
একটি বিস্তার শুধু, দীপ্ত শান্তি, গভীর নিশায় !'

হে প্রেমিক, আয়ুহীন ! এ জীবন এত কি সুন্দর ?
সত্যকার তৃষাভরে যে করেছে সেই সুধা পান,
মৃত্যুর আঁধারে সে কি পাইয়াছে পূর্ণিমা-সন্ধান ?
বৈতরণী-তীরে বসি' ভুঞ্জে সে কি মলয় মন্থর ?
এ কি প্রেম প্রাণময় ! জগতে এই যুগান্তর—
নির্দয় প্রলয় বন্যা—সাঁতারিয়া, তুমি বীর্যবান
উতরিলে সেই স্রোতে—তারকারা করি' যাহে স্নান
নীরবে চাহিয়া থাকে পৃথ্বীপানে, ভরিয়া অম্বর !
প্রাণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে, মরণের বরযাত্রী তুমি !
হে গাণ্ডীবী, বিস্ফারি' বিশাল বক্ষ করিলে যোজনা
ধনুকে অমোঘ শর, ভেদ করি' কঠিন শ্মশান
বহাইলে ভোগবতী—পূত হ'ল সারা প্রেতভূমি !
মমতার মোম দিয়ে বধূ-মুখ করিলে মার্জনা
প্রকৃতির,—নর-চক্ষে করিলে যে নবদৃষ্টি দান !

তাই আজ, ওগো বন্ধু, ধরণীর দূর প্রান্তভাগে
তোমারে সম্ভাষ করে ভিন্নভাষী আর এক কবি ।
তব কাব্য দুগ্ধ যেন, ঈষদুষ্ণ, দোহন-সুরভি—
পান করি' প্রাণে তার কি আনন্দ, কি ভরসা জাগে !
শতযুগ-জরাভার যেই জাতি নিশ্চিন্ত বিরাগে
বহে আজও, তারি মাঝে ভগ্ন জীর্ণ এ জীবন লভি'
গাহি গান ভয়ে ভয়ে ; আজি মোর ভবন-বলভি
স্পন্দিছে এ কোন্ ছন্দে, প্রাণ মোর এ কি মুক্তি মাগে !
হেরি মূর্তি নগ্ন-শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, কুণ্ঠালেশহীন—
মসৃণ মর্মরে যেন গড়িয়াছে যুনানী ভাস্কর !
পৃথ্বী 'পরে পদাঙ্গুলি, দেহ তবু আকাশে উড্ডীন—
মর্ত্যের সে বার্তাবহ স্বর্গপানে বাড়াইছে কর !
গুল্‌ফ-মূলে কাঁপে পাখা—অন্তরীক্ষে এখনি বিলীন !—
গানের কিরীটখানি ফেলে গেছে ধরণীর 'পর !

বিবেকানন্দ

কালরাত্রি পোহাইল ?—পূর্বাভাস অসীম উষার
দেখা যায় প্রাচী-প্রান্তে ! মুমূর্ষু এ জাতির শিয়রে
জেগে বসে ছিল যেই, মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে
উচ্চারিয়া বার বার—সে যে তুমি, হে চিরকুমার !
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-বীর, বীর-বীর্য, প্রেমিক উদার,
ইহ-পরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সঙ্কট সমরে—
হে সংযমী, যমভয়-ভীত জনে অন্তিম প্রহরে
দানিলে অভয়-দীক্ষা, ব্রহ্মবিদ ! চারিত্রে তোমার !

তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা তীর্থশেষে ফিরি'
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী দূর গিরি-চূড়া—
দেবতা নিবসে যথা—চন্দ্রমৌলী, তুষার-ধবল !
পাদমূলে বহে বারি পিপাসার, শির রহে ঘিরি'
চিরস্তব্ধ তারাস্তোম, বক্ষে তার বজ্র হয় গুঁড়া !
জানে, আর হেরিবে না, জানে তবু—সে গিরি অচল ।

সত্যেন্দ্রনাথ

এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে
মৃত্যু আসি দাঁড়াইল, তোমারে লইতে একদিন—
চেয়েছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন,
মুদিলে মেঘের রবে আঁখিদুটি ম্লান হাসি হেসে ?
বেদনার অর্ঘ রচি' নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ ?
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে ?

বাহিরে বিদ্যুৎ-ঘটা, নবমেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যৈষ্ঠী-মধু শীতল সুরভি ;
হৃদয়ে গুমরে গীতি—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হাহাস্বর,
আর্দ্র বায়ুশ্বাসে কাঁদে সুনির্জ্জন ভবন-বলভি !—
'আর নয়!' কহে দেবী, বীণা হতে ছিনাইয়া কর,
'এবার আমার পালা !—আমি গাই, তুমি শোন, কবি !'

শরৎচন্দ্র

('বিরাজ-বৌ' ও 'শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব'-পাঠে)

তখন যৌবন-দিন, বিকশিত চিত্ত-শতদলে
সুপবিত্র প্রীতিরাগ, পূজ্য-পূজা লাগি' সে অধীর—
সেই কালে—অবারিত ছিল যবে আশিস বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা—পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে !
সে কি চিত্ত-চমৎকার !—পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সুবিচিত্র কথা সেই 'বিরাজে'র—হৃদয়-রুচির !
সামান্য সে রমণীর অসামান্য প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু -উদধি উথলে !
এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর
দেখালে দরদী কবি !—বিরহের ঘন-ঘোর নিশা,
বিদ্যুৎ-চকিত দীপ্তি তিমিরে দেখায় তবু দিশা—
প্রেমের পুরুষ-মূর্তি নীলকণ্ঠ-সম 'নীলাম্বর' !
কুলহীনা রমণীর নেত্রে সেই সন্ধ্যাদীপ-তৃষা—
কলঙ্কিনী-সতী-শোকে পতি তার ধ্যানী মহেশ্বর !

কে জানিত তার আগে, সর্বশেষে মন্দির-সোপানে
ধূলায় ধূসর যেই পড়ে ছিল প্রাণের ভুখারি
এক পাশে, অজ্ঞাত অখ্যাত সেই বাণীর পূজারী
জীবজন্ম রসাতলে ডুবেছিল অমৃত-সন্ধানে !
ঘৃণা ভয় বিসর্জিয়া আকণ্ঠ গরল-ফেন-পানে
লভিল আরেক আঁখি ভস্মলিপ্ত ললাটে তাহারি !
শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা-বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে!
তাই তার সাধনায় ভয়ঙ্করী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায় !
যা কিছু কুৎসিত, হেয়, তারে তার চিত্ত-প্রবাহিণী
করাইল পুণ্য-স্নান, মুহূর্তে সে কালিমা মিলায় !
চাহি নি যাহার পানে ভুলে কভু, তারে আজ চিনি—
মূল্য তার ধরা প'ল হৃদয়ের নিকষ-শিলায় !

আজ তব জন্ম-মাসে, শরতের প্রসন্ন আকাশ
কি নির্মল, গাঢ়-নীল, লঘু-শুভ্র মেঘ-অন্তরালে !
ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে, হের, জল ভরে তরু-আলবালে,
তবু রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—এ যে রাখী পূর্ণিমার মাস !

ঘাসেও ফুটেছে ফুল, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে কাশ ;
স্বচ্ছ সরসীর জলে পঙ্ক হ'তে উঠিয়া মৃণালে
ফুটিছে পূজার পদ্ম !—তার মর্ম তুমিই শিখালে,
দিকে-দিকে হেরি আজ তোমারি সে বীণার বিকাশ
বঙ্কিম বসন্ত-বিধু, রবি—সে ত সর্ব-ঋতুময়,
তুমি চন্দ্র শরতের ; রশ্মি তব মর্মান্ত -হরষ
এই পৃথ্বী-মৃত্তিকার ! তব করে লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ তৃণ—অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ !
চণ্ডালেরো গৃহে তব কিরণের পূর্ণ-পরিচয়—
মানুষের সর্বগ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও সরস ।

এক আশা

আমি একা । এ ধরার ধূলির আসরে
মিলিয়াছে কত কোটি ! সারা দিনমান
ব্যাপ্ত করি' উদয়াস্ত, জন্ম-জয়গান
উৎসারিছে নিরবধি প্রাণপূর্ণ স্বরে !
হর্ষ-শোক, হিংসা-প্রেম—দ্বন্দ্ব-অবসরে
মহাকবি-বিরচিত চরিত মহান,
মৃত্তিকার পৃথ্বীতল করি' স্পন্দমান
ফুটায় রোমাঞ্চ-রশ্মি নিশীথ-অম্বরে ।
আমি হেথা অনাহূত অচেনা অতিথি,
কোথা হতে এই সূর্য-চন্দ্রাতপ-তলে
আসিনু কেমনে ?—প্রাণের পাথেয়হীন,
চক্ষে শুধু স্বপ্ন, আর বক্ষে ভগ্ন বীণ—
ভাবিতে লজ্জায় মরি ! জীব-রঙ্গস্থলে
বিজনে ভ্রমিনু শুধু চারু চিত্রবীথি !

কিবা এই অভিশাপ ! দুই মুঠি ভরি'
কিছুই ধরিতে নারি । সুস্থ দেহমাঝে
যে ব্যথা শোণিত-ছন্দে হৃদ্‌যন্ত্রে বাজে,
সুপক্ক ফলের মত নখ-অগ্রে ধরি'

'শরৎচন্দ্র' কবিতার শেষ স্তবক দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত।

দশনে দংশিতে যারে একাকার করি
রসে-শাঁসে,—ধরণীর রসিক-সমাজে
সেই ব্যথা, সেই সুখ না লভিয়া, লাজে
সম্বরি' আপন দৈন্য যেতে হবে সরি' ?
জানি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে-ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি !
যে চাহে বুঝিতে শুধু মরণের রীতি,
নাই প্রেম, আছে শুধু নিয়ম-জিজ্ঞাসা—
দেহী হয়ে সে যে বৃথা দেহভার বহে !

তাই ভাবি, এ ধরার উদার অঙ্গনে
কি করিনু? চিরদিন একি হেলাফেলা !
দূর হতে হেরি' জন্ম-মরণের মেলা
মজিনু স্বপনে শুধু ! এ বাহুবন্ধনে
বাঁধি নাই কোন জনে ; ভেরীর নিঃস্বনে
ছুটি নাই খুলিয়া দুয়ার ; সন্ধ্যাবেলা
একটি তারার পানে চাহিয়া একেলা
হারা-মুখ স্মরি নাই অশান্ত ক্রন্দনে ।
সম্মুখে বহিয়া যায় মর্ত্য-তরঙ্গিণী
আবর্ত-অধীর, জন্ম-মৃত্যু দুই তট
ভাঙিয়া গড়িছে পুন নূতনের গানে—
ভয়াতুর চেয়ে আছি সেই বারি পানে,
ভরিতে নারিনু মোর শত ছিদ্র ঘট ।—
সতী আত্মা ?—হায়, সে যে ঘোর কলঙ্কিনী!

ফুরায়ে আসিছে বেলা ; অপরাহ্ণ দিন—
ঝাউবন ছায়াভরা মুমূর্ষু আলোকে ;
হেরিতেছি ক্ষান্তকণ্ঠ পাখীর পালকে
আগামিনী যামিনীর আভাস মলিন ।
উপোষিত আঁখিযুগে রূপরেখা ক্ষীণ—
জুড়ায় দিনের দাহ আমার ভূলোকে ।
গেঁথেছিনু যেই গাথা প্রাণহীন শ্লোকে,
জীবনের বিপণিতে তাও মূল্যহীন ।

আজ মনে পড়ে সেই প্রভাতের কথা—
বালারুণ-রশ্মিরাগ দেবদারু-শিরে
পল্লবে প্রবালে পুষ্পে অযত্ন-সঞ্চয়
প্রাণের পুলক-মণি !—সে নিত্য-বিস্ময়
কখন হারায়ে গেছি ! দিনান্ত-সমীরে
বনের মর্মরে শুনি মনেরি বারতা !

এমনি কাটিল বেলা । আমি ধরিত্রীর
ক্ষীণ-প্রাণ শীর্ণ শিশু,—বসি' এক ধারে
দুইটি ডাগর আঁখি ভরি' জলভারে
চেয়ে আছি, আশাহীন তৃষায় অধীর ।
জননী দাঁড়ায়ে হোথা—স্তনস্রাবী ক্ষীর
পিয়িছে উল্লাসে মাতি' কাতারে কাতারে,
প্রবল দুরন্ত যারা ; হাস্য-অশ্রুধারে
উথলে অবোধ প্রীতি, নয়ন মদির !
আমি শুধু চেয়ে আছি,—নারিনু ধরিতে
ধরণীর সুধাপাত্র ! শুধু এক আশা !—
বঞ্চিত সন্তান তরে কিছু কি বাঁধিয়া
রাখে নি আঁচলে মাতা ? সস্নেহে সাধিয়া
ধরিবে না মুঠি মোর—সর্ব দুঃখনাশা
একটু প্রসাদকণা গোপনে ভরিতে ?

সে নহে যশের আশা !—কালের সাগরে
অম্বুমুখে ক্ষণবিম্ব বুদ্বুদ-বিলাস !
আমি চাই নিজ প্রাণে পূর্ণ-অভিলাষ—
হৃদিপুষ্প ভরি' যাবে পরাগে কেশরে ।
জীবনের সর্বশেষ, পূর্ণিমা-বাসরে
বাতায়নে ধরা দিবে সারাটি আকাশ !
রবে না আড়াল কোথা,—সুবর্ণ-সঙ্কাশ
নেহারিব পূর্ণশশী দিকে দিগন্তরে !
শয়ন-শিয়রে মোর নিশি কোজাগরী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে—খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপলক্ষ্মী ! নয়ন-গণ্ডূষে
সে লাবণ্য-সিন্ধু ল'ব এক কালে শুষে' !
যে অমৃত পিপাসায় করি নি লুণ্ঠন—
হেরিব, গোপ্লন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি' !

শ্রবাণ-শর্বরী

আজ রাতে রুদ্ধ কর সব ওই দ্বার-বাতায়ন,
কাঁদিছে আঁধার ধরা বায়ুশ্বাসে মেঘ-গরজনে—
দামিনী ঝলকে মুহু, অবিশ্রান্ত ধারা-বরিষণে
ঝাপটে ভিজিয়া গেল বার-বার শিথান-শয়ন !
প্রদীপের তলে বসি', যূঁথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথ' তারে চিকণিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে—
বিরহের শ্লোক যত, আর মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে—
কুসুমের 'পরে ন্যস্ত ওই দুটি ভ্রমর-নয়ন !

কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্বরী—
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারে হৃদয় বিধুর !
কত রাধা বায়ু-রবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনা আঁকিয়াছে বদন বঁধুর !—
আজি সে কাহিনী মোর নয়নের নিদ লবে হরি',
বিরহ-কল্পনা-সুখে হবে এই মিলন মধুর !

প্রগতি, শ্রাবণ ১৩৩৪

বন-ভোজন

দিবা-বধূ পরিয়াছে বাকলের শাড়ী, কড়িহার ;
আর্দ্রচুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী—
তপন-প্রেয়সী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
সিঁদুর মুছিয়া পরে কালাগুরু ললাটে তাহার !
আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
যত বৃদ্ধ বনস্পতি ; তাই যত্নে অঞ্চল সম্বরি'
কটিতটে, সুবৃহৎ থালিকায় পায়সাম্বু ভরি'
ফিরিছে নিকটে দূরে, গুণ্ঠন খসিছে বার-বার ।

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বন-ভোজন !
নিদাঘার্ত, তরুরাজি উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন !
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কি বর্ণে বিলীন !
হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন !

চৈত্র-রাতে

আসিয়াছে চৈত্র-রাতি, সাথে তার জ্যোৎস্না-যাদুকরী—
স্বপন আছে, নিদ্রা নাই ! যৌবনের সেই রূপকথা
চমকিয়া স্মরি শুধু, চমকিয়া উঠে পান্থ যথা
মৃদু-গন্ধে—দূর বনে ফোটে বুঝি নেবুর মঞ্জরী !
স্মরণের কুঞ্জে কুঞ্জে মন আজ করে মাধুকরী—
ঝরা-ফুলে বসে অলি, শুষ্ক শাখে শোভে কল্পলতা !
অপূর্ব সে উপন্যাস !—মনে হয়, আমি নাই তথা,
সে কাহিনী যার, তারে আমিও যে গিয়েছি পাসরি' !

জানি সে যে কত বড় ! স্মরি যবে সেই পূর্বরাগ,
সেই ক্ষণ-মূর্ছাবেশ হেরি' শুধু পদচিহ্ন বাটে !—
কে বলিবে, একদিন আমি ছিনু এত ধনে ধনী !
মর্মর-অলিন্দে বসি' জ্যোৎস্নালোকে যাহার সোহাগ—
(অধরে পড়েছে আলো, ছায়াখানি নয়নে ললাটে !)
সম্রাট-প্রেয়সী নয়—সে যে ছিল আমারি রমণী !

পৌর্ণমাসী

আজ দীর্ঘ পৌর্ণমাসী যাপিয়াছি বিজন-বাসরে
সুন্দরের কোজাগর, নিদ্রাহারা নিদাঘ-শর্বরী !
পরিণাম-রমণীয় দিবসের দীপ্তি অনুসরি'
উঠেছিল পূর্ণশশী মেঘমুক্ত গাঢ় নীলাম্বরে !

বিধু পিয়াইল যবে জ্যোৎস্না-সীধু যামিনী-অধরে—
খুলে ছিঁড়ে খ'সে গেল তারকার সিঁথি সাতনরী !
তার পর সম্বরিল নীবি-বাস চমকি' শিহরি'—
হেরিয়াছি সেই রঙ্গ রূপসীর, প্রহরে প্রহরে ।

শেষ হ'ল সুধাপান,—ম্লান হাসি আরও যে মধুর !
পাণ্ডুর কপোলতলে পূর্বাশার আসন্ন আভাস,
একটি অশ্রুর মুক্তা দোলে হের, নয়নে বধূর—
পূর্ণ-সুখ পূর্ণিমার মুখে সে কি মাধুরী উদাস' !
অস্ত গেল নিশানাথ, বনে বনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দিগন্তে ছড়ায়ে প'ল বিধবার কৌটার সিঁদুর !

নিশুতি

রজনী গভীর হ'ল, কৃষ্ণপক্ষ-দ্বিতীয়ার শশী
উঠিয়াছে উর্দ্ধ-নভে—স্রোতোহীন নীলের পাথারে !
মন্ত্রস্তব্ধ চরাচর, তরুশ্রেণী কাতারে কাতারে
দাঁড়াইয়া তন্দ্রাতুর—নিস্তরঙ্গ তিমির-সরসী !
মনে হয়, ধরা যেন শুক্লাম্বরা বিধবা রূপসী—
এলাইয়া রুক্ষ কেশ, অসহ্য সে বেদনার ভারে
প'ড়ে আছে সংজ্ঞাহারা, রজনীর নিশুতি-আগারে—
ধূ-ধূ করে রূপ-মরু দিশাহীন দিগন্ত পরশি' !

এ কি কান্তি ভয়ঙ্করী! এর চেয়ে ভাল অন্ধকার—
প্রাণহীনা ধরিত্রীর সকরুণ লজ্জা-নিবারণ ।
এ যে মৌন-অট্টহাস, মরণের জ্যোৎস্না-জাগরণ !
যৌবন—দেহের ব্যাধি, রূপ যেন তাহারি বিকার !
মনে হয়, খুলে গেছে প্রকৃতির মুখ-আবরণ—
দিবসের লীলাশেষে নিশাকালে এ কি হাহাকার !

নিশান্তে

নিশা অবসান হ'ল ; যত পাখী আছিল যেখানে
ডাকিতেছে একসাথে, আনন্দের কি কলকূজন !—
দিকে দিকে মৌন-স্তব্ধ অপ্সরার নূপুর-নিক্কণ
স্ফটিক-আকাশে যেন সচকিত প্রতিধ্বনি হানে !
বাতায়নে দাঁড়াইনু শয্যা ত্যজি' উষার আহ্বানে ;
শিশুর ক্ষীরাম্বু-গন্ধী অধরের হাসি অতুলন
হেরিলাম দিবামুখে—প্রভাতের প্রথম কিরণ,
নিষ্কলঙ্ক, বর্ণহীন—শুধু-আলো, নিশা-অবসানে !

সে যেন বিষ্ণুর বুকে নীলকান্ত কৌস্তুভ-আভাস !
সৃষ্টির আহ্লাদ যেন, জগতের নিগূঢ় চেতনা !
পরিব্যাপ্ত বিভা শুধু! জড়-বক্ষে প্রাণের বিকাশ !
মৃত্যুময়ী ধরণীর শিরে যেন আশিস সান্ত্বনা !
সেই নির্বিশেষ জ্যোতি ভরিয়াছে সকল আকাশ—
ভরিয়াছে মোর নেত্র সেই প্রভা স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা !

বিদায়

আ[illegible] [illegible]খি, সাঙ্গ হ'ল আমাদের মিলন-বাসর ;
বাদলের কৃষ্ণাতিথি, আর্দ্র বায়ু উঠিতেছে শ্বসি',
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর
চুরি ক'রে এসেছিনু, ভেটিবারে নাহি অবসর—
জান সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুখের প্রেয়সী !
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দশী,
বিনা-ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর !

যদি পুন দেখা হয় চন্দ্র-কান্ত চৈত্র-রজনীতে,
ফুলে ফুলে ভরি দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী-দুকূল,
গাব গান প্রাণ-ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে !
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল—
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর সঙ্গীতে,
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল !

হেমন্ত-গোধূলি

১৯৪১
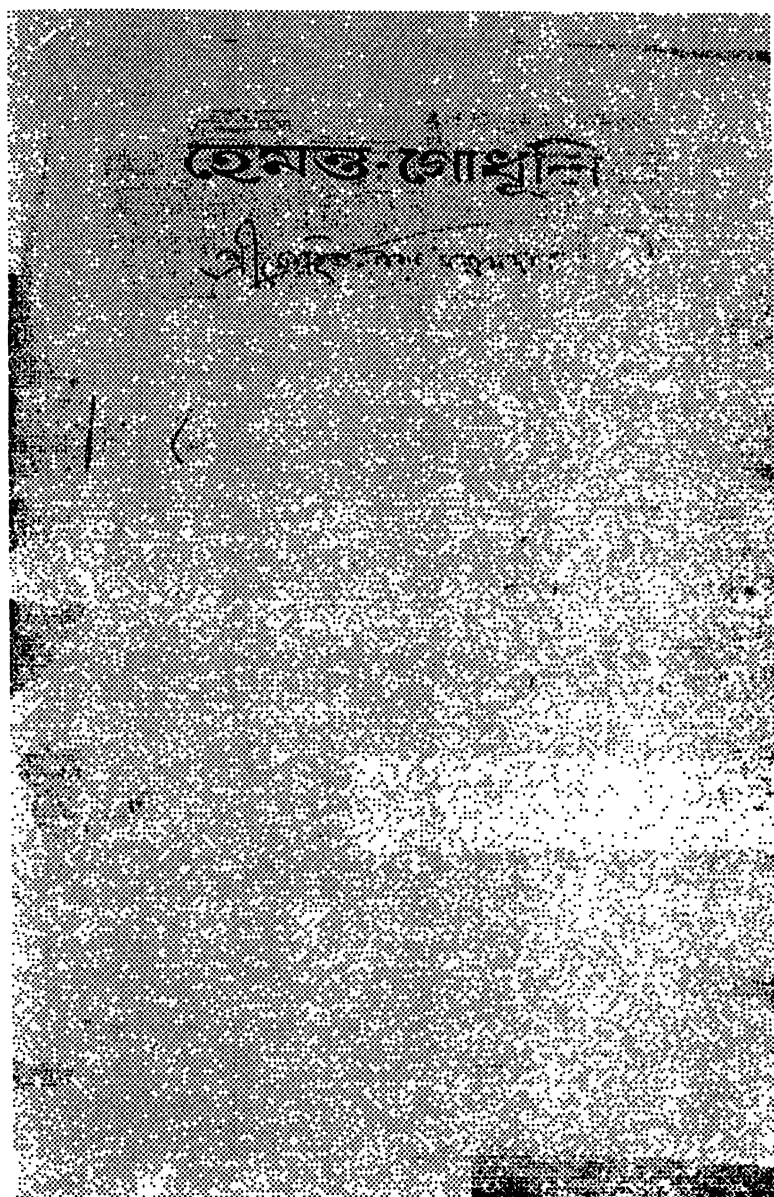
'হেমন্ত-গোধূলি' প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

হেমন্ত-গোধূলি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৪১

'হেমন্ত-গোধূলি' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

আমার চতুর্থ কবিতা-সংগ্রহ 'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশিত হইল। যে সকল কবিতা পূর্বে লিখিত হইলেও প্রকাশিত অথবা সুপ্রচারিত হয় নাই, এবং আরও যেগুলি প্রায় সর্বশেষের রচনা, সেইগুলিকে এই পুস্তকে সঞ্চয় করিলাম। আমার কবিতা একালেও যাঁহাদের ভালো লাগে তাঁহাদের জন্য, এবং যদি কোনক্রমে পরবর্তী কালে পৌঁছিতে পারে সেই আশায়, এ গুলিকে আর ফেলিয়া রাখিলাম না। ইহাই এ কাব্য-প্রকাশের কৈফিয়ৎ—কারণ, ইহার একটিও 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নয়।

এবারে আমি এই সঙ্গে কতকগুলি বিদেশী কবিতার অনুবাদও মুদ্রিত করিলাম ; এগুলির অধিকাংশ বহুপূর্বে রচিত ও বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার এরূপ অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা অল্প নয় ; ইচ্ছা ছিল, সবগুলিকে একখানি পৃথক পুস্তকে সংগ্রহ করি। নানা কারণে তাহা এ পর্যন্ত সম্ভব না হওয়ায়, এবং বর্তমানে কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ায়, আমি নিজের ও পরের কবিতা একই মলাটে একই বাঁধনে বাঁধিয়া দিলাম। অনুবাদগুলির চয়নে লোভ দমন করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ অনেক বাদ দিয়াছি। বলা বাহুল্য, যে কবিতাগুলি ইংরেজী নয়, সেগুলিরও অনুবাদ ইংরেজীরই মারফতে।

এই কবিতাগুলির সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার অনুবাদ যেমন মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ নয়, তেমনই, ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়। অর্থ অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্য দিলেও, আমি মূলের বাণীচ্ছন্দকে যতদূর সম্ভব বাংলায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা আমারই, এবং তাহা বাংলা বলিয়া যেটুকু রূপান্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্য এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনাহিসাবেই অধিক—এরূপ দাবী আমি করিব না ; পাঠকগণকে কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে বলি—এগুলি বাংলা এবং কবিতা হইয়াছে কিনা ; তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে ইহাদের কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস, সবগুলি সমান না হইলেও, কতকগুলি—অনুবাদ এবং কবিতা, দুই-ই হইয়াছে। 'শুভক্ষণ' নামক যে কবিতাটি গ্রন্থের পূর্বভাগে স্থান পাইয়াছে, তাহা William Morris-এর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তির অনুপ্রেরণায় রচিত—ঠিক অনুবাদ নয় বলিয়া তাহাকে ঐ স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

এ বাজারেও গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব যথাসাধ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশক যে যত্ন করিয়াছেন, তার জন্য তিনি মার ধন্যবাদভাজন। আমার পুরাতন ছাত্র এবং তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থপ্রকাশে যে আগ্রহ ও সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকেও আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

কলিকাতা।
২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮

স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

স্মরণে

বন্ধু, তোমারে ভুলি নাই আজও, যদিও দু'দিন তরে
দেখা হয়েছিল মর্ত্য-মরুর পথহীন প্রান্তরে,—
দিগন্তরের কপিশ আকাশে ছিল না কিছুই আঁকা,
সহসা হেরিনু বিটপীর শিরে আধখানি চাঁদ বাঁকা!

সন্ধ্যা-মেদুর ছায়াখানি যেথা ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সাথে
মিলাইয়াছিল, দেখা হ'ল দোঁহে সে মোহের মোহানাতে ;
শুধালে না কিছু—জনমান্তর-সৌহৃদ যেন স্মরি'
আপন আসনে আগন্তুকেরে বসাইলে হাত ধরি'!

তিনটি সন্ধ্যা, দুইটি উষার মাধুরী-মদিরা পিয়ে
মোর হেমন্তে বসন্ত এল স্বপন-পসরা নিয়ে ,
পরম আদরে সে ফুল-মুকুল তুলি' লয়ে সবগুলি
তুমি 'ভারতী'র অঙ্কে রাখিলে, কাঁপিল না অঙ্গুলি।

তার পর হ'তে ঘাট হ'তে ঘাটে ফিরিনু পসরা নিয়ে,
গোধূলি-আঁধারে সে আঁখি উদার গেল পুন মিলাইয়ে।
স্তব্ধ গভীর নিস্তরঙ্গ বিস্মরণীর নীর—
তারি তীরে তীরে ঘনাইল ছায়া তারাময়ী রজনীর।

পূর্ব-গগনে চেয়ে থাকা মিছে শুকতারকার লাগি'—
জানি, এ রজনী পোহাবে না হেথা, কেন আর বৃথা জাগি!
শেষ গানগুলি গুছাইতে গিয়ে সহসা পড়িল মনে—
প্রথম মালাটি দিতে গিয়ে তবু দিই নাই কোন্ জনে।

হাতে তুলি' দিতে নারিনু আজিও, ক্ষোভ নাহি তবু তায়—
গভীর নিশীথে এপারের কথা ওপারেও শোনা যায়!
ডেকে বলি তাই—বন্ধু! তোমারে পথশেষে স্মরিলাম,
গানের খাতার শেষ-পাতাটিতে লিখিনু তোমারি নাম।

কলিকাতা।
২রা শ্রাবণ, ১৩৪৮

হেমন্ত-গোধূলি

আজিকে শুক্লা হেমন্ত-বিভাবরী,
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী!

তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
ফুল-মালঞ্চে হৈমবতীর বেশে ;
জলে-ভেজা ফুল জাতি-যুথী নয় এরা—
    তপনের তাপে উঠিবে না কভু হেসে—

ফুটেছিল যারা যৌবন-বৈশাখে
রৌদ্র-মদিরা পান করি' শাখে-শাখে,
যত তাপ তত সরস যাদের তনু,
    হাসিতে যাহারা হাহাকার চেপে রাখে—

তারা নাই আজ, ভয় নাই—এস তুমি!
বরিষার শেষে শীতল আজি এ ভূমি ;
উদিবে এখনি কার্তিকী-পূর্ণিমা
    হিম-নিষিক্ত ধরণীর মুখ চুমি'।

নীরস ধূসর মাটির বিছানা পরে
বিছায়েছি, হের, ফুলশোভা থরে থরে—
তাপহীন যত বাসনার বল্লরী
    মুঞ্জরি' উঠে শিহরি' শীতের জ্বরে।

সারারাত করি' অশ্রু-শিশির পান
ভোরের বেলায় সব তৃষা অবসান ;
কুহেলি-আকাশে হেলিয়া পড়ে যে রবি
    তাহার সোহাগে জাগে না এদের প্রাণ।

তব নয়নের গোধূলি-আলোর তলে
ইহাদের মুখে অপরূপ আভা ঝলে,
অয়ি হেমন্ত-সন্ধ্যার অপ্সরী!
    দাঁড়াও ক্ষণেক বেণী-বাঁধা কুন্তলে।

*   *   *

নিবে আসে যবে আকাশে দিনের আলো
অস্ত-কিনারে কে দেবী, দীপালি জ্বালো?
স্বপনের ভারে ভেরে আসে আঁখি পাতা—
    তিমিরের পটে এত রং কেবা ঢালো!

বৈশাখী-রোদ, শ্রাবণের শ্যাম-ছায়া
সরস করে নি যাহাদের কম-কায়া,
নব-ফাল্গুনে রবে না যাদের চিন্
    —ফুলশেজ 'পরে স্মরিবে না স্মর-জায়া,

হিমে জর-জর তনুলতা উপবাসী—
সেই তারা আজ তপনেরে উপহাসি'
    ধরিয়াছে হের রূপের বরণ-ডালা,
    —মধুহীন মুখে চুম্বন রাশি রাশি!

দুঃখের সুখ জাগাবে না কারো প্রাণে—
এরা শুধু আঁখি জুড়াইয়া দিতে জানে,
    —হোক্ বা না হোক্ মুখরিত বনতল
    পিক-কুহুতান অলি-গুঞ্জর-গানে।

শুক্লা-দশমী, হেমন্ত-বিভাবরী—
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী!
হের গো হেথায় ফুল-মালঞ্চ মাঝে
    অস্তরাগের মায়া উঠে মুঞ্জরি'।

তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
তুহিন-মোহিনী হৈমবতীর বেশে!
নীরব নিথর রঙের পাথার শুধু
    বিথারিয়া দাও নয়ন-নির্ণিমেষে।

স্বপ্ন-সঙ্গিনী

১

হে অপ্সরী! এক দিন ছন্দের টংকারে
স্মর-ধনু ভঙ্গ করি', দেবগণে জিনি',
লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বিনী
স্বয়ম্বর-মালা ; কি রহস্য কব কারে ?–
স্বর্গ-নটী হ'ল বধূ ! আকুল ঝংকারে
সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
না ফুরাতে সপ্তপদী কেন যে, বুঝি নি-
কার লাগি' পুষ্পাসব ভরিলে ভৃঙ্গারে !

আমার কামনা-ধূমে হয় নি ত' ম্লান
তোমার অলকশোভী মন্দার -মঞ্জরী,
তনু তব উঠে নাই আবেশে শিহরি'—
উচ্ছ্বাস-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান ;
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান
সেবিতে ও রূপানল সারা বিভাবরী !

২

এই মোর অপরাধ?—পুষ্পাসব-পানে
ঘূর্ণিত আঁখিরে তব আমার পিপাসা
করে নি অরুণতর ; সুপেলব নাসা,
স্ফুরিত সঘন-শ্বাসে ক্ষোভে অভিমানে—
পারে নি জাগাতে মোর উদাসীন প্রাণে
সুচির সন্তাপ ; মঞ্জীরের মঞ্জু ভাষা
উতলা করেছে শুধু, সর্ব সুখ-আশা
অঞ্জলি ভরিয়া আমি ঢেলেছিনু গানে।

ভাল যদি লাগিবে না রূপের আরতি,
অনঙ্গের পরাভব—হায় গো অপ্সরা !
স্মরধনু-ভঙ্গ-পণে কেন স্বয়ম্বরা
হ'লে তুমি ? রূপমুগ্ধ মর্ত্যের সন্ততি,
জানো না কি, রতিপদে করে না প্রণতি ?-
তাই শুধু ক্ষণতরে দিয়েছিলে ধরা !

৩

আদিকাল হ'তে সকরুণ সে কাহিনী
ফিরিয়াছে কবি-কণ্ঠে—স্বর্গের অপ্সরা
কবে কোন্ মর্ত্ত্যজনে দিয়েছিল ধরা
অন্ধ অনুরাগে ! তার পর সে মোহিনী,
যৌবন-নিশার সেই স্বপন-সঙ্গিনী,
সহসা উষার সাথে মিলাইল ত্বরা
অন্তরীক্ষে,—পুরূরবা সারা বসুন্ধরা
কাঁদিয়া খুঁজিছে তারে দিবস-যামিনী !

হায় নর ! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন !
উর্বশী চাহে না প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে যে দৃপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন !
ফাগুনের শেষে তাই সে বসন্ত-পিক
পলায়েছে ; মরু-পথে, হে মৃত্যু-পথিক,
কে রচিবে পুন সেই প্রফুল্ল নন্দন ?

অকাল-বসন্ত

অসময়ে ডাক দিলে, হায় বন্ধু, একি পরিহাস !
ফাগুন হয়েছে গত, জানো না কি এ যে চৈত্রমাস ?
বাতাসে শিশির কোথা ? ফুলেদের মুখে হাসি নাই,
কোকিল পলায়ে গেছে, গোলাপ যে বলে—যাই যাই !
অশ্বত্থ অশোক বট বিল্ব আর আমলকী-বনে
আছে বটে কিছু শোভা—পঞ্চবটী জাগে তাই মনে ;
সুদীর্ঘ দিবার দাহে বসুন্ধরা উঠিছে নিঃশ্বসি'—
এ সময়ে গান নয়, প্রাণে জাগে শিব-চতুর্দশী !

ক্ষমিও আমারে বন্ধু, যদি এই উৎসব-বাসরে
আনন্দের পসরাটি কোনোমতে কবিও পাসরে ।
একদিন এ জীবনে পূর্ণিমার ছিল না পঞ্জিকা,
নিত্য-জ্যোৎস্না ছিল নিশা—হেমন্তেও শারদ-চন্দ্রিকা !
শ্রাবণে ফাগুন-রাতি উদিয়াছে বহু বহু বার,
শীত-রৌদ্রে গাঁথিয়াছি চম্পা আর চামেলির হার ।

জীবনের সে যৌবন—মরু-পথে সেই মরূদ্যান—
পার হয়ে আসিয়াছি, আজ শুধু করি তারি ধ্যান।
তোমাদের আমন্ত্রণে কি মন্ত্রণা দিব আজ কানে ?—
ক্ষমিও আমারে, বন্ধু, পঞ্জিকাও আজি হার মানে !

তবুও হতেছে মনে, ভুল আর হয়েছে কোথাও,
পঞ্জিকার ভুল নাই—আকাশের চাঁদেরে শুধাও।
চেয়ে দেখ, মুখে তার আজ যেন হাসি কিছু ম্লান—
দ্বিধায় মন্থর-গতি, পৌর্ণমাসী সদ্য-অবসান।
আজি হ'তে কৃষ্ণা-তিথি—আঁধারের প্রতিপদ আজ,
হাসিটি তেমনি আছে, তবু সে হাসিতে পায় লাজ।
পঞ্জিকা করে নি ভুল—কঠোর সে নিয়তির মত !
আমরাই রাখি ধ'রে যে পূর্ণিমা হয়ে গেছে গত ;
যৌবন-যামিনীশেষে কুড়াইয়া রাখি ঝরা-ফুল,
অতীত বসন্ত-দিন ফিরাইয়া আনিতে আকুল !
অমার আঁধারে জ্বালি সারি-সারি তৈলহীন বাতি,
সে আলো নিবিয়া যায়, না ফুরাতে প্রহরেক রাতি !
বসন্তের ঝরা-পাতা ঝরা-ফুলে আছে যে বারতা,
আজিকার দিনে, বন্ধু, তারি মাঝে খুঁজি পূর্ব-কথা।

বসন্ত, মাধবী, মধু, ঋতুরাজ, পহেলি ফাগুন,
হিন্দোল, ফাগুয়া, হোলি, মদনের পুষ্পধনু-তূণ—
চিরকাল আছে জানি মানুষের জীবনে ও গানে,
একবার একদিনও কেবা তাহা মানে নাই প্রাণে ?
বৈরাগ্য-শতক বড় নয়, জানি—সে ত পরাজয় !
মিথ্যা নয়—তপোবনে আকালিক বসন্ত-উদয়।

আজও দেখি, সেই ঋতু ধরণীর উৎসব-অঙ্গনে—
অঙ্কুরে পল্লবে পুষ্পে সেই শোভা কান্তারে গহনে !
দক্ষিণ—মৃত্যুর দিক, দাঁড়াইয়া আজ তারি মুখে
অমৃত-মধুর বায়ু ভুঞ্জিতেছে চরাচর সুখে !
দু'দিনের এই সুখ, দু'দিনের এ সুন্দর ভুল—
এরি লাগি' সৃষ্টি-পদ্ম অহরহ মেলিছে মুকুল !
শীতের জরার শেষে বসন্তের এ নব-যৌবন
করুক সবারে সুখী—সম্বরিনু আমিও লেখন।

ফুল ও পাখি

১

বসন্তের ফুল, আর বসন্তের পাখি—
একটি সে ঝরে' যায় খর সূর্যতাপে
দু'টি পৌর্ণমাসী শুধু শাখা-বৃন্তে যাপে
মধুর মাধবী-নিশা ; বিস্ফারিয়া আঁখি
ক্ষণেক দাঁড়ায় কাল, তবু তারে ফাঁকি
দিতে নারে দু'দণ্ডের বেশি ! প্রাণ কাঁপে
থরথরি'—রূপ-মধু-সৌরভের পাপে
লভে মৃত্যু, ধূলিতলে শীর্ণ তনু ঢাকি' !

ফুলের পেলব প্রাণ পলকে ফুরায়,
বর্ষসাথে আয়ুঃশেষ ! সে যে শুধু রূপ—
ছায়া-আলোকের খেলা, বর্ণরেখা-স্তূপ
কুজ্ঝটি-অম্বরে ! সে যে ফেনবিম্ব-প্রায়
সবুজ সায়রে ফুটি' তখনি মিলায় !
মধু-শেষে ভোলে তারে মানস-মধুপ ।

২

বসন্তের পাখি, সে যে মৃত্যু নাহি জানে—
উড়ে যায় দেশান্তরে ঋতু অনুসরি' ;
সে জানে কালের ছন্দ—পক্ষ মুক্ত করি'
ধায় নব-জীবনের মাধুরী-সন্ধানে ।
পুষ্পসম রহে না সে মৃত্তিকার ধ্যানে
মমতার বৃন্তবন্ধে আপনা সম্বরি' ;
রূপ নয়, দেহ নয়,—ঊর্ধ্বাকাশ ভরি'
ভাবের অবাক্-ধারা ঢালে গানে গানে ।

গন্ধ আর বর্ণ যার প্রাণের পসরা,
মর্মমূলে বহে শুধু মৃত্তিকার রস—
নিমেষে ফুরায় তার আয়ুর হরষ ;
ধরার ধূলার ফাঁদে দেয় না যে ধরা—
দেশ-কাল নাই তার, নাই ফোটা-ঝরা,
অনন্ত বসন্ত তার—অনন্ত বরষ !

৩

সেই মত আমি কবি একদা হেথায়
ধরণীর ধূলিতলে বিছায়ে আপনা
রূপ-মধু-সৌরভের স্বপন-সাধনা
করিনু মাধবী-মাসে ; ইন্দ্রিয়-গীতায়
রচিনু তনুর স্তুতি, প্রাণ-সবিতায়
অঞ্জলিয়া দিনু অর্ঘ—প্রীতি নির্ভাবনা,
নিষ্ফল ফুলের মত অচির-শোভনা
সুন্দরের কামনারে গাঁথি' কবিতায় ।

বসন্তের পাখি নই—বসন্তের ফুল,
ফুটে' ঝরে' গেছি তাই নীরস নিদাঘে—
ক্ষণিকের হোলি-খেলা ফাগুনের ফাগে,
মরণের হাসি-ভরা জীবনের ভুল !
মোর কথা নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন-সমতুল—
ডুবে গেছি বিস্মৃতির অতল তড়াগে ।

বিধাতার বর

আগুনে জ্বলিছে ঘৃত-ইন্ধন, আলো তার ভালো লাগে—
সুখী নরনারী সেবি' সে অনল মৃদু উত্তাপ মাগে ।
সমিধের মেদ যত হীন-সার, তত উজ্জ্বল আলো,
সোনার শিখায় প্রাণ পুড়ে যায়—দেহ অঙ্গার-কালো !
দহনের লাগি' দেহ যার যাচে কামের যজ্ঞ-হবি—
দীপ্তির তলে অঙ্গার জ্বলে—লোকে তারে কয় কবি !

লাল-ক্লেদময় গলিত পঙ্ক কৃমি-কীটসঙ্কুল—
তারি অন্তরে পশে সুগভীর রসপায়ী যার মূল,
মজ্জাবিহীন ক্ষীণ তনু যার—স্রোতোবেগ নাহি সহে—
তারি মুখে ফুটি' শোভা-শতদল মধুর মাধুরী বহে !
জীবন যাহার অতি দুর্বহ—দীন দুর্বল সবি—
রসাতলে বসি' গড়িছে স্বর্গ—সেই জন বটে কবি !

অবাধ অগাধ সিন্ধু-মাঝারে শত শুক্তির বাস,
কঠিন কবচে ঠেকায় সকলে প্রবল জলোচ্ছাস ;
ব্যাধি-বালুকণা পশিল কেমনে কোন্ সে রন্ধ্র দিয়া
একটির বুকে—স্ফোটকে ফলিল মুক্তা সে মোহনিয়া।
সুস্থ নহে যে সবার মতন সহজ জীবন লভি'—
অন্তরে যার অসুখ অপার—সেইজন হয় কবি।

কত জ্যোতিষ্ক জ্বলে' নিবে যায় দিশাহীন মহাকাশে
রশ্মি তাদের কতকাল পরে ধরণীতে পরকাশে !
কেমন আছিল কেহ সে জানে না, ছিল যবে হেরি নাই—
আজ কি বা তার—জ্যোতি-পরিচয় আমরা পাই, না পাই ?
কবিও ক্বচিৎ জীয়ে যশ পায়—স্মৃতি যবে ছায়াময়,
মৃত-তারকার মত রটে তার প্রতিভার পরিচয় !

তুলনা যাহার ইন্ধন হ'তে নির্বাণ শশী-রবি—
মানুষ না হয়ে বিধাতার বরে সেইজন হয় কবি !

অশান্ত

জানি, আমি জানি, শতেক যোজন উন্নত গিরিচূড়ে
কঠিন শীতল হিমানীর দেশে ধ্যানের কেতন উড়ে।
নাহি সেথা বারি, পিপাসাও নাহি—শোণিতের জ্বর-জ্বালা,
শীতে ও নিদাঘে ফোটে একই ফুল—আকাশে তারার মালা।
হৃদয়-ভ্রান্তি নাহি যে সেথায়, প্রেমের ভাবনা, ভয়—
নাহি অতীতের স্মৃতির অতিথি, অনুতাপ সংশয়।
হে শান্ত, তুমি সেইখানে বসি' রচিতেছ যেই গীতা,
আপনার মাঝে আপনি মগন তুমি অমৃতের মিতা—
মানুষের তরে নহে সেই গান, জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
এই দেহে বাঁধা আমার আমি-রে সে যে বিদ্রূপ হানে।
যে জন জীবনে যাপে নি কখনো দীর্ঘ দুখের নিশা,
চোখের সলিলে মিটে নি যাহার শুষ্ক তালুর তৃষা,
সুখের শয়নে, টুটে নি কখনো যাহার স্বপন-ঘোর,
অথবা ত্যাগের কঠোর সাধনে কেটেছে সকল ডোর—

সেই অমানুষ ভাবের ফানুসে আকাশে জ্বালায় আলো,
তার পদতলে মাটির পৃথ্বী আঁধারে দেখায় কালো।
ক্ষুৎ-পিপাসার সব অধিকার ব্যর্থ যাহার তপে—
শূন্য-সুখের ধেয়ানে সে জন শান্তি-মন্ত্র জপে।
সে যবে বাজায় জয়-দুন্দুভি মর্ত্য-জীবের কানে,
আপন মহিমা ঘোষণা করে সে অতি-বিনয়ের ভানে—
সেই অপমানে আমার চক্ষে বজ্র-বহ্নি জ্বলে,
বৈশাখী-দিবা ধূ ধূ করি' উঠে শিখাহীন কালানলে।
আমি চলি পথে ধূলির জগতে—তপ্ত বালুর 'পরে
শুকায় সরিৎ, ঊর্ধ্বে তড়িৎ অট্টহাস্য করে।
ক্রূর কণ্টক কঙ্কর দলি' চলি যার সন্ধানে—
গালি দেই কভু, কভু ডাকি তারে সকাতর আহ্বানে।
ভালবাসি যারে তাহার লাগিয়া নিমেষে পরাণ সঁপি,
অরি যেই জন তাহারে স্মরিয়া মারণ-মন্ত্র জপি।
মোর ধমনীতে হৃদয়-শোণিতে অশান্ত কলরোল,
অধরে আঁখিতে হাসি-ক্রন্দন একসাথে উল্লোল!
শান্তি কে চায়?—শিশুও চাহে না থির হয়ে শুয়ে থাকা,
যত দাও দোল তত উতরোল—বক্ষে যায় না রাখা!
জন্ম হইতে মৃত্যু-অবধি অশান্তি-সুখ লাগি'—
ভাবের স্বর্গ চাহে না মানুষ—অভাবের অনুরাগী।

হে শান্ত, তুমি আমারে দেখায়ে পান কর যেই বারি,
জানি সে মিথ্যা অভিনয় তব, তুষার-বর্ম্মচারী!
আমি জানি, তব চিত্রিত ওই পাত্রই মনোহর,
তোমার কণ্ঠে পিপাসা কোথায়, প্রেমহীন যাদুকর?
মোদের পিপাসা তামাসা নহে সে, মরুচর নর-নারী
অশান্ত মোরা খুঁজিয়া বেড়াই সেই ঝরণার বারি—
উথলিয়া উঠে উৎস যাহার ধরার বক্ষ হ'তে,
অঞ্জলি ভরি' ভিজাই ওষ্ঠ তাহারি উষ্ণ স্রোতে।
সংজ্ঞাহরণ মরণ-মরুৎ বহে যবে মরু'পর,
মূর্চ্ছার বশে হেরি বটে কভু অপরূপ নির্ঝর;
শান্তির আশে ছুটি তার পাশে, বুঝি না সে কার মায়া—
আমারে লোভাতে কেবা রচে সেই তীর, নীর, তরু-ছায়া
বুঝি ক্ষণপরে—সে নহে শান্তি, মৃত্যু তাহার নাম—
আমি অশান্ত, চাহি না জীবনে সে চিরশান্তি-ধাম।

দুঃখের কবি

'দুঃখের কবি'—শুনে হাসি পায়—সোনার পাথর-বাটি !
কল্পনা তার এমনি সূক্ষ্ম—মাটিরে বলে সে মাটি !
শুনাইতে চায় কঠিন সত্য—
অতি সে নিষ্ঠুর চরম তত্ত্ব,
একটু বেহুঁস হয়েছ যেমনি, অমনি লাগায় চাঁটি ;
কাব্যের খাঁটি রস সে বিলায়—মাটিরে বলে যে মাটি !

দুঃখের লাগি' হয় যে বিবাগী, সুখ যে মিথ্যা কয়,
সে জন সুখীরে করে পরিহাস—এ যে বড় বিস্ময় !
অশ্রু লুকাতে করে যে হাস্য,
অন্ন-অভাবে চাতুর্মাস্য—
সে যদি দুঃখ না করে স্বীকার, নাহি মানে পরাজয়,
ভণ্ড বলিয়া গালি দিবে তারে?—এ যে বড় বিস্ময় !

কাঁটার উপরে বক্ষ রাখিয়া গান গায় যেই পাখি—
কে বলেছে তার হয় নাক' সুখ—সেই আনন্দ ফাঁকি ?
সুখ-সন্ধান জীবনেরি পেশা—
সুখেরি লাগিয়া দুঃখের নেশা !
তা' যদি না হ'ত, এক লহমায় চুরমার হ'ত নাকি
সৃষ্টির এই রসের পেয়ালা—ধরা পড়িত না ফাঁকি ?

হায় গো বন্ধু, সত্যসন্ধ—দুঃখের নেশাখোর !
বুঝিবে কি তুমি—এই জগতের সকলেই সুখ-চোর !
যার গানে আছে যত আনন্দ,
নৃত্য-চটুল চপল ছন্দ—
হয়ত' সে দুখী সব চেয়ে, তার দুঃখের নাহি ওর,
ফাঁসীর কয়েদী ওজনে বাড়িছে—ধন্য সে সুখ-চোর !

শুধু দুঃখের পসরা বহিয়া পথে যে হাঁকিয়া ফেরে—
বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো দেয় দেয়ালে দেয়ালে মেরে,
দুঃখের ভরা ভারি নয় তারি,
হোক যত বড় দুখের ব্যাপারী,—
ঢাকের বাদ্যে হয় ভূকম্প, বাঁশি যায় বটে হেরে,
তবু সে দুঃখ তারি বড় নয়—পথে যে হাঁকিয়া ফেরে ।

মিথ্যার মোহে যদি কেহ কভু সত্যই সুখ পায়,
তপ্ত বলিয়া ভান করে' কেহ পান্তা জুড়াতে চায়—
ল'য়ে গোপালের পাষাণ-পুতলি
বন্ধ্যার স্নেহ উঠে যে উথলি'—
তার সেই সুখে কার না বক্ষ অশ্রুতে ভেসে যায় ?
কঠোর সত্য স্মরণ করায়ে কে তারে শাসিতে চায় !

অথই দুঃখ-পাথারে ফুটেছে আনন্দ-শতদল,
অমানিশীথেও পূর্ণিমা-সুখে উথলে সিন্ধু-জল !
সুচির বিরহ, মিলন ক্ষণিক—
তাই চেয়ে থাকে আঁখি অনিমিখ,
হৃদয়ের খাক্ ফাগ করে' করি মধু-উৎসব ছল—
হেন সুখ যার সে কেন ফেলিবে দুঃখের আঁখিজল ?

মিথ্যার মূলে দুঃখই আছে—সুখ যে দুখেরি ফুল !
ফুল ছিঁড়ে ফেলে' মূল হেরি' তার কেন হেন শোকাকুল ?
জ্বালা আর নেশা—একেরই ধর্ম,
দুঃখ-সুখের একই যে মর্ম !
কবি চায় নেশা, জ্ঞানী ভয় পায় পাছে ক'রে ফেলে ভুল—
বিষের জ্বালায় অকবি অধীর, কবি যে হরষাকুল !

সে যে উন্মাদ—সর্ব অঙ্গে কত না চিতার ছাই !
কণ্ঠে গরল, তবু করোটির আসবে অরুচি নাই !
তারি ভালে যবে হেরি শশিলেখা,
ঢুলু ঢুলু চোখে রাগারুণ-রেখা,
শিয়রে গঙ্গা—অঙ্গারে রচে শয্যা সে এক ঠাঁই,
হৈমবতীর বিম্ব-অধরে চাহিতে কুণ্ঠা নাই !—

তখনি যে বুঝি, সুখ কারে বলে—দুঃখের কিবা নাম,
কোন্ সে আগুনে পুড়িয়াও তবু মনোহর হ'ল কাম!
বাঁশির রন্ধ্রে ভরে যেই শ্বাস—
জানি সে বুকের কোন্ উচ্ছ্বাস ;
নিজে নেশা করি' অপরে মাতায়—কতখানি তার দাম,
জানি, ভাল জানি—চাহি না, বন্ধু, শুনিবারে তার নাম ।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫

প্রশ্ন

[কোনও প্রায়োপবেশন-ব্রতী দেশপ্রেমিক বীর-যুবার উদ্দেশে]

১

কোথায় চলেছ, কোন্ পথ ধরি'—ভেবেছ কি বলীয়ান ?
হে মোর দেশের যুবক্-প্রাণের প্রতীক মূর্তিমান !
পতাকা তোমার উড়িয়াছে দেখি পথে-পথে ঘাটে-ঘাটে,
মৃত্যু-সরণি-তরণ তরণী ভিড়ায়েছ রাজপাটে !
তোমার চক্ষে দীপিছে অনল জঠর-অনলজয়ী !—
দীন জীবনের হীন প্রতারণা, মিথ্যার ভার বহি',
পশুসম আর বাঁচিবে না, তাই করিয়াছ প্রাণ পণ
ছাড়িতে এ-দেহ কারা-পিঞ্জর—অপূর্ব মহারণ !
মমতারে তুমি মুগ্ধ করেছ, বুদ্ধিরে বিব্রত,
মরীচিকা হেরি' মরু-পথে তবু হও নি পিপাসা-হত !
তবু চলিয়াছ কোন্ পথে তুমি, ভেবেছ কি বলীয়ান—
হে মোর দেশের যুবক্-প্রাণের প্রতীক মূর্তিমান ?

২

জানি, অসহ্য—মিথ্যার পণে তিলেক বাঁচিয়া থাকা,
জানি, তার চেয়ে শতগুণে ভাল মৃত্যুর মান রাখা ।
যুগে যুগে তাই লভিয়াছে ত্রাণ এইরূপে কত জনা—
ইচ্ছা-মৃত্যু—মানুষের সে যে অতি বড় বীরপনা !
আদিযুগ হ'তে চিরযুগ যেই গহ্বর-সম্মুখে
দাঁড়ায়ে নয়ন মুদিয়াছে জীব ত্রাস-কম্পিত বুকে,
অন্ধকারের অতলে খুঁজেছে আলোকের ক্ষীণশিখা,
অসীম শূন্যে ঝুলায়েছে কত মায়াময় মরীচিকা—
যাহারে ছলিতে আপনা ছলিছে, ভুলিবার লাগি' বৃথা
জীবনের রাতি উৎসবে মাতি' করেছে দীপান্বিতা—
জানি সে জীবের কত বড় জয়—যে তারে করে না ভয়,
—জীবন-গ্রন্থি অবহেলে টুটি' সব সংশয় লয় !

৩

তবু বল, বীর, কি লাভ তাহায়?—মৃত্যু কি হারি মানে
এই জগতের বলি-যূপে তার এ হেন আত্মদানে ?
মুহূর্ত লাগি' পিঙ্গল হয় যজ্ঞের হোমানল,
তার পর সেই চির-অভাগ্য পশুদের কোলাহল ।

জীবনের ভয় জীবনেই রয়, মৃত্যুর পরপারে—
ভয়-নির্ভয়—কিবা আসে যায় অসীম সে একাকারে ?
তবু শমনের এহেন দমনে গৌরব করে নর—
মৃত্যুজয়ীর উদ্দেশে নমে যোড় করি' দুই কর।
সে যে মরণেরি জয়জয়কার, ভেবে হাসে মহাকাল—
মৃত্যুজিতের কণ্ঠে গরল, শ্মশানেরি হাড়-মাল !
যে মরিল সে কি লভিল অমৃত ?—ক্ষয়হীন তার যশ !
সে যশ-পসরা বহিবে—যাহারা বিষম ভয়ের বশ !

৪

না না, এ যে বৃথা ! এ হেন মরণে জীবনের কিবা ফল ?
কত সাধু সতী দেখায়েছে হেথা এমনি মনের বল।
অপরের কথা ভাবে নি যাহারা—নিজেরি মরণ-ব্রত
সাধিয়াছে শুধু অভিমান-বশে, নিজেদেরি মনোমত—
বাখানি তাদের সে পণ কঠিন, নিষ্ঠার একশেষ,
তবু যে শিহরি হেরি' তার মাঝে সেই সন্ন্যাসী-বেশ
মরণে যাহারা জিনিল হেলায় অগ্নিকুণ্ডে পশি'
বল্মীক-তলে দেহ ঢাকি' যারা নিবাইল রবি-শশী—
জীবনেরে তারা ফাঁকি দিতে করে কঠিন মরণ-পণ,
মৃত্যুর নামে অমৃতের লাগি' মিথ্যা আকিঞ্চন।
তাদের মরণে, মৃত্যুর নহে—জীবনেরি পরাজয়,
জীবন-মুক্তি লভিতে যাহারা জীবন করিল ক্ষয়।

৫

সে মরণে মোরা মানিব কি আজ হইতে মরণ-জয়ী ?—
জানি যে, অমৃত বহিছে গোপনে এ মহী জীবনময়ী !
জানি, মৃত্যুর শেষ আছে, শুধু জীবনেরি শেষ নাই ;
তুমি আমি মরি, মরে না মানুষ—আমারি সে কামনাই
অমর হইয়া রহে মরলোকে ; পরলোকে অমরতা
কতকাল আর ভুলাইবে নরে ?—প্রেমহীন মিছা কথা !
আমি বেঁচে আছি যুগ-যুগ এই চির-প্রসূতির ঘরে,
ফিরেও আসি না—মরি না যে কভু ! এ বিরাট কলেবরে
জন্ম-মৃত্যু—শ্বাস-প্রশ্বাস ! আমি নহি একা আমি,—
মহামানবের অনন্ত আয়ু বহিতেছে দিন-যামী
আমারি এ আয়ু সৃষ্টির স্রোতে, আমি কভু মরি না যে !
ভুলে' যাও, বীর, মৃত্যুর কথা জীবনের সব কাজে।

৬

তাই যদি হয়, মৃত্যুও যদি জীবনেরি অভিযান—
আর কোনো নামে দিও নাক' তারে সমধিক সম্মান।
জীবনের ভয়ে ভীত যেই জন, মমতা-কৃপণ যারা—
নাহি সে সাহস, আছে তবু সাধ ধরণীর ক্ষীরধারা
ভুঞ্জিতে শুধু অনায়াস-সুখে—স্বপনে ও জাগরণে
হেরে মৃত্যুর বিভীষিকা সেই অগণিত পশুগণে।
সেই বিভীষিকা—হরিতে শ্যামলে, সুদূর নীলের শেষে—
নিখিল-মানবে করেছে উতলা, ছায়া-ধূমাবতী বেশে।
তাই জীবনের এত যে যতন, অফুরাণ আয়োজন—
কেহ বুঝিল না, মরণেরি কথা ভাবিল সর্বজন!
যারা কাপুরুষ তারাও সহসা ঝাঁপায় মরণ-মুখে,
সে-মরণে মোরা করি গো বরণ হায় কি গর্ব-সুখে!

৭

বীরের মরণ তারে বলি—যার মরণে মৃত্যুভয়
ভুলেও ভাবি না, হেরি জীবনেরি গূঢ়তর অভিনয়।
সে মরণ যেন মহাজীবনের স্ফূর্তির ফুৎকার!
আনন্দ-ঘন প্রাণ-পুরুষের হাস্যের উৎসার!
যেন জীবনের পরম-চেতনা বিদ্যুৎ-স্পন্দনে
ঝিলমিল মুহু, মৃত্যুর অমা-রাত্রির অঙ্গনে!
যেন মর্ত্যের নন্দন-বনে ঘন-কিশলয় শাখে
হরিচন্দন ফুটিল সহসা একসাথে, লাখে-লাখে!
সে কি উল্লাস! সে কি প্রেমময় প্রাণময় আহ্লাদ!
সে যে দধীচির এক জীবনেই শত জনমের স্বাদ!
সে মরণে কোথা শব-কঙ্কাল?—অস্থি অশনিময়
গগনে গগনে গরজিয়া ঘোষে—'আছি আছি, নাহি ভয়'!

৮

শুধাই এখন—বল, বীর! তুমি কোন্ পথে আগুয়ান্—
জীবনের, না সে মরণেরি পথে দুঃখের অবসান?
সে কি মুছিবারে অপমান-গ্লানি মৃত্যুর আশ্রয়?
না সে জীবনের মুক্তধারার গতিবেগ-সঞ্চয়?
দাঁড়াও সমুখে, দেখি মুখ তব আলোকে তুলিয়া ধরি'—
তোমার অধরে ঝরে কোন্ হাসি, আঁখিতে কি উঠে ভরি'!
ও রূপ নেহারি' স্বজাতি তোমার হবে কি জাতিস্মর?
আপনা চিনিবে? মরণে জিনিবে?—তাহারি অধীশ্বর

না হয়ে, শুধুই প্রান্তর-পথে করিবে না ছুটাছুটি
যত আলেয়ার আলোকের পিছে, জীবনে লইয়া ছুটি ?
মৃত্যুই শুধু হবে না ত' বড় ?—ভেবে দেখ, বলীয়ান্,
হে মোর দেশের যুবন্-প্রাণের প্রতীক মূর্তিমান !

বনস্পতি

মেঘময় ধূমল আকাশ—
স্পন্দহীন নভো-যবনিকা,
যেন অন্ধ আঁখির আভাস,
—নেত্র আছে, নাই কনীনিকা !

তারি তলে বৃদ্ধ বনস্পতি
—অতি দীর্ঘ দেহ পত্রময়,
দাঁড়াইয়া মহামৌনব্রতী
গণিতেছে আসন্ন প্রলয় ।

রুদ্ধ শ্বাস, নাহি শিহরণ—
বজ্র বুঝি পড়িবে মাথায়,
সর্বাঙ্গের সবুজ বরণ
ক্ষণে ক্ষণে কালো হয়ে যায় !

স্তব্ধ হ'ল মর্মের মর্মর,
কি দারুণ মানস-নিগ্রহ !
তরু বুঝি হ'ল জাতিস্মর,
জড় আজি সচেত-বিগ্রহ !

যে বাণী বিহরে শুধু বুকে,
অন্তরের অন্তিম সীমায়—
সে ওই প্রকাশে যেন মুখে
নিরাশার উগ্র গরিমায় !

ধ্বনিতেছে গগনে গগনে
দণ্ডধারী দানবের জয়,
ম্লানচ্ছায়া ধরণীর বনে
বনস্পতি নির্বাক নির্ভয় ।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৩

কাল-বৈশাখী

মধ্যদিনের রক্ত-নয়ন অন্ধ করিল কে !
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে !
কানন-আনন পাণ্ডুর করি'
জল-স্থলের নিঃশ্বাস হরি'
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে !

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহারা সারি-সারি নিস্পন্দ ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি' তুলিয়াছে প্রাণ ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ ?

হেরি যে হোথায় আকাশ-কটাহে ধূম্র-মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীম-কুণ্ডল জটা !
অথবা ও কি রে সচল-অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মি-ছটা !

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার,
সুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু বব—নাসা গর্জন ঝঞ্ঝার !
পিঙ্গল হ'ল গল-তলদেশ,
ধূলি-ধূসরিত উন্মাদ-বেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার !

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক হ'তে দিক-অন্তে—
দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর রিদারিছে নভ দন্তে !
বাজে ঘন ঘন রণ-দুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি',
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে !

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হ'ল কার ভিন্ন ?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন ?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘ-কজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হ'ল ছিন্ন ।

হের, ফিরে চলে সে রণ-বাহিনী বাজায়ে বিজয়-শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্মল হ'ল—ধৌত ধরার পঙ্ক ।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে,
নদী উথলিছে কুলুকুলু ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিঃশ্বাসে নিঃশঙ্ক ।

* * *

নব বর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে,
হোক্ সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে ।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার-জানালা উঠে ঝন্‌ঝনি',
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে ।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি' রস, মধু ভরি' বুকে মৃত্তি'র,
যে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি' টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি—তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি' ধরার ধরে না হর্ষ,
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ ।
নীল-অঞ্জন-গিরিনিভ কায়া,
নিশীথ-নীরব ঘন-ঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নব-বিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ ।

অন্তিম

বৃথা যজ্ঞ! বহুকাল প্রতীক্ষিয়া অধীর বিধাতা
মানিল না কোন মন্ত্র—আত্মগ্লানি-মোচনের শ্লোক ;
আত্মা যার বিকায়েছে পাপ-ঋণে, হোমাগ্নি-আলোক
নাশিবে তাহার তমঃ? তুমি হবে তার পরিত্রাতা ?
"বৃত্র-শত্রু হত হোক"—বৃত্র-যজ্ঞে গায়িছে উদগাতা,
অসুর শিহরি' উঠে, হবির্গন্ধে হৃষ্ট দেবলোক !
বিধি শোনে বিপরীত—'শত্রু-বৃত্র হোক—হত হোক',
পূর্ণ করে সে কামনা, চূর্ণ হয় ঋত্বিকের মাথা !

নষ্ট হ'ল পুরোডাশ—যত্নে গড়া মধু ও গোধূমে,
লেহিয়া যজ্ঞের হবিঃ সারমেয় ভ্রমিছে নির্ভয় ;
আকাশে নাহি যে অশ্রু, পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প-ধূমে
আবিল রবির তেজ, গ্রহতারা গণিছে প্রলয়।
মহামৃত্যু-অন্ধকার ধীরে ধীরে নামে যজ্ঞভূমে,
দিগন্তে চমকে শুধু ম্লান-দীপ্তি বিদ্যুৎ-বলয়।

রবির প্রতি

হে রবি, তোমার তাপে এই নিত্য-আর্দ্র ভূমিতলে
উষ্ণ হ'ল খাল বিল, আর যত পঙ্কিল পল্বল ;
বাড়ে শুধু লালা ক্লেদ, শেহালায় ভরে' গেল জল,
মরেছে কল্মী-লতা, সুষুনি শুকায় দলে দলে।
জন্মে শুধু ডিম্ব-কীট, তাই হ'তে ফুটি' পলে পলে
উড়িছে পতঙ্গকুল—ক্ষীণজীবী উন্মত্ত চঞ্চল,
আসন্ধ্যা-প্রভাত করি' বায়ুভরে নৃত্য কোলাহল
নিঃশেষে মরিবে সবে তুমি যবে যাবে অস্তাচলে !

তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠে পিক !—
কে শোনে তাদের গান ?—মাছিদের কল্লোলে হারায় !
এমনি দুর্ভাগ্য দেশ !—তুমি রবি, তবুও হা ধিক !
তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায় !

মধু-উদ্বোধন

(কবি মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-তর্পণ উপলক্ষে)

বঙ্গে জন্ম যাহাদের, তারাই তোমারে—
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
স্মরণ করিছে আজি । এক যেই আশা
আসন্ন মৃত্যুর মুখে সর্বনাশ সহি'
ত্যজিতে পার নি তবু—নিদয় বিধাতা
অবশেষে লজ্জা মানি' পূরাইল বুঝি !
বর্ষে বর্ষে তাই তব মৃত্যুদিনে মোরা
তিষ্ঠি' ক্ষণকাল সেই সমাধি-প্রাঙ্গণে
স্মরি তব কীর্তিকথা।
বহে আর্দ্র বায়ু,
আকাশ ধূসর মেঘে, ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে
শীতল মহীর তল ; মহানিদ্রাবৃত
মায়ের মাটির ক্রোড়ে, হে কবি, তখন
পশে কি শ্রবণে তব, সেই মার বুকে
স্তন্যপান করে যারা তাদের কাকলি ?
হের, বিধি পূরায়েছে শেষ সাধ তব,
তোমার সমাধি-লিপি বহে যেই ভাষা
সে ভাষা উৎকীর্ণ আজি অক্ষয় অক্ষরে
মন্দাকিনী-স্বর্ণসিকতায় ! উরিলেন
হংসারূঢ়া বাগীশ্বরী, ব্রহ্মার মানসী—
বঙ্গভারতীর বেশে, তব তপোবলে !
সেই পুণ্যে অবশেষে একদা হেথায়
বিকশিল পুঞ্জে পুঞ্জে মনোজ-মঞ্জরী
কবিতা-লতায় ! মণিহর্ম্যে—নটেশ-মন্দিরে—
নৃত্যপরা অপ্সরার মঞ্জীর মেখলা,
আতপ্ত দেহের তাপে, ঝঙ্কারিল তবু
সুন্দরের মোহাবেশে অসীমার গীতি !

তাই আজ ফিরে চাই সেই উৎস পানে,
পড়ি সবিস্ময়ে তোমার সমাধি-লিপি ;
কবি, কোন্ ভবিষ্যৎ-আশায় তোমার
হিয়া কেঁপেছিল, জানি,—যে জীবনে তুমি
জীয়াইলে বঙ্গভাষা, কাব্য-ধারা তার

হবে না যে রুদ্ধ কভু শৈবালে শিলায় ;
আনন্দে করিবে পান গৌড়জন তাহে
সুধা নিরবধি। চলিতে থমকি' তাই
দাঁড়াইবে পথে, স্মরিবে তোমার নাম,
আকুল আগ্রহভরে চাহিবে জানিতে
এ শ্যামা জন্মদা তোমা জন্ম দিল কোথা—
ভগ্নদেবালয়-শোভা কোন্ নদীতীরে,
সুপ্রাচীন বট বিল্ব অশ্বত্থ যেথায়
সন্ধ্যার আঁধারে ধরে গম্ভীর মূরতি ;
প্রদোষ সমীর যেথা শঙ্খঘণ্টারোলে
রোমাঞ্চিয়া উঠে নভস্তলে ; ফুলদোল,
দোল, রাস, কোজাগর, শারদ-পার্বণ—
নিত্যোৎসব-মুখরিত কোন্ সেই গ্রাম ?
পবিত্রিলে কোন্ কুল, কোন্ ভাগ্যবান
পিতা সেই, কোন মাতা ধরিলা জঠরে ?

আজ, কবি, নহে শুধু সেই পরিচয়,
তারো বেশি চাই মোরা রাখিতে স্মরণে ;
নহে শুধু নাম ধাম জাতি কুল গ্রাম,
শুধু স্মৃতি—কোন্ যুগে ছিল এক কবি,
যাহার গানের সুরে প্রথম সেদিন
জেগেছিল অকস্মাৎ গভীর নিঃস্বনে
ধূলিম্লান ছিন্নতন্ত্রী একস্বরা বীণা
বঙ্গভারতীর !—নহে শুধু সেই কথা।
জানি, তব শঙ্খধ্বনি-পথে ভ্রমিয়াছে
বহুদূর কবিতার কল্প-ভাগীরথী—
মুক্তবেণী পশিয়াছে সাগর-সঙ্গমে।
আজ তার সুবিস্তার নিথর সলিলে
ফেনপুষ্পবিভূষণ লোল লহরীর
নাহি সে উচ্ছল শোভা—স্তব্ধ কলনাদ।
মৃত্তিকার পানপাত্রে ভুঞ্জিয়াছি মোরা
হৃদিহীন সুখস্বর্গে দেবতার মত
ভাবের অমৃতরস, দেহ গেছে মরি'।
কামনার কামধেনু করিয়া দোহন,
কণ্ঠে পরি' পারিজাত, স্বপন-বিলাসী,
হেরিয়াছি মুগ্ধনেত্রে চরণ-চারণ—

ছন্দের উর্বশী-লীলা কাব্যের কুট্টিমে।
বক্ষে আর নাহি সেই প্রাণের স্পন্দন,
নাহি সে জীবন-যজ্ঞে বাসনার হবিঃ—
নিমেষে আপন-হারা আহুতি প্রেমের।
কবিতা গিয়াছে মরি', বাণীর শ্মশানে
দগ্ধ অস্থি-কঙ্কালের কুৎসিত কলহ
করিছে শ্মশান চর!
আজ তাই তোমা—
হে বাণীর বীরপুত্র প্রাণমন্ত্রবিদ!
আহ্বানি আমরা সবে; ধ্যান করি সেই
প্রভাতকিরণময় আনন উদার,
বিশাল ললাটতলে আকর্ণ লোচন,
শিশুর সারল্য যেন সরল নাসায়,
অধরে প্রসন্ন হাসি; শুধু সে গভীর
গম্ভীর ভাবনাখানি প্রকাশ চিবুকে।
তোমার কবিতা চেয়ে, হে কবি মহান্,
তুমি যে অনেক বড়! বঙ্গ-সরস্বতী
মাগিল সে দিন শুধু প্রাণ-পদ্মাসন
পুরুষের, তাই তব পুরুষ-প্রতিভা,
অদম্য সাহস আর উর্জস্বল প্রেম—
এই দুই তন্ত্রী বাঁধি' দুরন্ত বীণায়
বাজাইল তন্দ্রাহরা মেঘমন্দ্র-রাগ—
প্রাণের প্রাবল্য শুধু, কল্পনার রথে
যৌবনের অভিযান শঙ্কালেশহীন!
অসীম সাগর আর অনন্ত আকাশ,
পৃথিবীর ঊর্ধ্ব, অধঃ, দিগন্ত সুদূর,
প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড, আর বিরাট বিরূপ—
তারি মাঝে অতি ক্ষুদ্র, দেহদশাধীন,
ভাগ্যহত মানবের ক্ষণস্ফূর্ত প্রাণ
মৃত্যুর অমোঘ শর তুচ্ছ করি' প্রেমে
ঘোষণা করিবে নিজ দুর্জয় মহিমা।
জীবনের দান—ধরিতে হইবে সব
মুঠিতলে, দুই হস্ত আনন্দে প্রসারি';
নাই লজ্জা, নাই ক্ষোভ; পৌরুষ-পাবকে
জীবন যে সর্ব-শুচি, পাপ তাপ মোহ
অপরূপ কান্তি ধরে চিতাগ্নির মুখে—

যবে সেই আপিঙ্গল ছিন্ন-ধূম শিখা
নিষ্কলঙ্ক করি' তায়, নীল শূন্যমাঝে
মেলি' দেয় একখানি প্রকম্পিত প্রভা !
মহাকাল-করধৃত অদৃষ্ট-ত্রিশূল
হানিবে ললাটে বক্ষে দারুণ আঘাত,
তবু টলিবে না জানু ; রক্তসিক্ত পদে
হাস্য-অশ্রু—ফুল-ফল—দ্রুত ছিঁড়ি' লয়ে
বাহিয়া চলিবে এই জীবন-জাঙ্গাল,
আপনারি চিত্তদীপে দীপান্বিত করি'
আঁধার গহ্বরময় এ অবনীতল ।
মানিবে না দেব-রোষ, মাগিবে না বর—
দেব-অনুগ্রহ, করিবে না পুণ্যলোভ
ঘৃণিত কুশীদজীবী কৃপণের মত ।

এই বাণী—নরত্বের এই নব ঋক্
একদিন তুমি কবি, হৃদয় বিস্ফারি'
উচ্চারি' অকুতোভয়ে জলদি-নির্ঘোষে,
সচকিত করেছিলে এ বঙ্গসমাজ ।
পরলোক-ভয়ভীত ক্ষীণজীবী যারা,
শুনি' সেই বন্ধহারা মুক্তিমন্ত্র-বাণী,
উন্মীলি' নয়নযুগ চেয়েছিল পুনঃ
আপন অতীত আর ভবিষ্যৎ পানে
সুনির্ভয়ে ; নভস্পর্শী মহিমা-শিখর
লঙ্ঘিতে পঙ্গুর দলে জেগেছিল আশা ।
স্ফীত হ'ল বক্ষ তার—শ্বাসযন্ত্রযোগে
ধরিতে সে গীত-শ্বাস দীর্ঘযতিযুত,
সাগরতরঙ্গসম অবিরাম-গতি,
অহীন-অক্ষরা—ধ্বনি যার মহাপ্রাণ
রণি' উঠে পিনাকীর পিনাক-টঙ্কারে !

আজ পুনরায় সেই দীক্ষা চাহি মোরা
তোমার সকাশে—চাই প্রাণ, চাই প্রেম !
এই ক্ষুদ্র রুদ্ধ রুক্ষ জীবনের গ্লানি
নিমেষে মোচন করি' সিন্ধুবারিস্রোতে,
পান করি' আকাশের নীল নির্মলতা
দুই আঁখি ভরি' উঠিতে নামিতে চাই
আবর্তিত তরঙ্গের শিখরে গহ্বরে ।

প্রাণ-কর্ণে আর বার সেই গীতধ্বনি—
সৃষ্টির নেপথ্যে যেন নিশীথের তান,
কভু উচ্চ কভু মৃদু, সাগরের স্রোতে
জোয়ার-ভাঁটার মত, জন্ম ও মৃত্যুর
গভীর রহস্য-ভরা—চিত্ত সবাকার
উৎকণ্ঠিত করে যেন ; দেহের নিয়তি
মধুর আবেগ হানে হৃদ্‌পদ্মদলে,—
নিবিড় নিঠুর হর্ষে আপনি পাসরি'
ঝরে যেন পূর্ণস্ফুট সে মর্ত্য-কুসুম ।

তোমারি কবিতা, কবি,—বাংলার সেই
ভেরীরব—বহুদিন হয়েছে নীরব ;
আজ তারে কাব্যকুঞ্জ হ'তে বহি' আনি'
জাতির জীবন-যজ্ঞে আহুতির গাথা
রচিতে চাহি যে মোরা ; সেই মন্ত্ররাব—
সে নব উদ্‌গীথ-গানে আকাশ ভরিয়া
জনতার জয়ধ্বনি মুক্ত উথলিবে ।
ত্যজি' নিদ্রা তন্দ্রা আর কল্পনা-বিলাস,
রুগ্নদেহে দুষ্টক্ষত-কণ্ডুয়ন-সুখ,
আর্তস্বরে অর্থহীন বাণীর বিকার—
লভিবে নয়নে পুনঃ দৃষ্টি দীপ্তিময়,
কণ্ঠে ভাষা, বক্ষে নব সাহস দুর্জয় ।
তোমার সে কাব্য-বেদী হ'তে দাও কবি,
একটুকু প্রাণ-অগ্নি—সেই অগ্নিকণা
করিয়া চয়ন, কবিতার সোমযাগ
আবার করিব মোরা, হবিঃশেষ-পানে
লভিব নরত্ব সেই দেবতা-দুর্লভ ।

শুধু একদিন জাগো, বীর ! জাগো কবি !
জাগো তব মহানিদ্রা হ'তে—জাগো তুমি
আপনারি সঞ্জীবনী বাণীর হরষে !
ডাকে তোমা কবতক্ষ, ডাকে সেই গ্রাম,
যশোরে সাগরদাঁড়ী ; আজও সেথা বসি'
কাঁদিছেন পুত্রহারা অশেষ-দুখিনী
জননী জাহ্নবী তব, বঙ্গমাতারূপে ।
ডাকে গৌড়জন, জাগো কবি!—দাও বর,
তোমার অমর প্রাণ দাও বিলাইয়া

আমাদের মাঝে ; আবার তেমনি করি'
নিস্পন্দ নিশ্ছন্দ এই বঙ্গভারতীরে
জীয়াইয়া তোল নব বাণীমন্ত্রে তব,
এ জাতির কুল-মান রাখ এ সঙ্কটে!

বঙ্কিমচন্দ্র

১

বাঁশী আর বাজিল না কতকাল অজয়ের কূলে !
কীর্তনের সুরে শুধু ভরি' উঠে আকাশ বাতাস
বাঙ্গালার—সব গানে প্রেমেরি সে দীর্ঘ হাহাশ্বাস
নদীয়ার নদীপথে মর্মরিল বঞ্জুল-মঞ্জুলে !
ত্যজিয়া তমালতল রাধা জ্বালে তুলসীর মূলে
প্রাণের আরতি-দীপ ; আঁখির সে বিলোল বিলাস
ভুলিয়াছে—কাঁদে আর হরিনাম জপে বারো মাস ;
কল্পবৃক্ষে ফোটে প্রেম, ফোটে না সে মনের মুকুলে !
এমনি সে সারা বঙ্গ অঙ্গে পরি' হরিনামাবলী
বাদল-বসন্ত-নিশি গোঙাইল উদাসীন সুখে ।
রাখালের বেণুরবে গোঠে-মাঠে কাননে-কান্তারে
ধ্বনিল যে মধু-গীতি, তাহারি সে সরস ঝঙ্কারে
ক্বচিৎ উন্মনা কেহ—ঘটে বারি উঠিল উছলি',
গাঁথিতে পূজার মালা কোন্ ব্যথা গুমরিল বুকে !

২

মুক্তবেণী জাহ্নবীর ক্রমে লুপ্ত হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মন্ত্রে-তন্ত্রে শুকাইল শেষে
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া ; এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মূরতি !
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি, আর আছে সতী-
দম্পতী নাহিক' কোথা ! নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় ওঠে বৈকুণ্ঠের সুদূর উদ্দেশে !
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধোগতি ।
সন্ধ্যা হ'লে শঙ্খ বাজে গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে,
ঘাট হ'তে ঘরে ফিরে' দীপ জ্বালে ত্বরায় বধূরা ;

একে একে উঠে আসে তারকারা আকাশের তীরে,
সমীরণ শ্বসে মৃদু, ফুলগন্ধে রজনী মধুরা।
নিদ্রার নিশীথ-স্বপ্নে জেগে ওঠে বিরহ-বিধুরা
জীয়াইতে মৃত-প্রেম, তনু তার বীজনিয়া ধীরে!

৩

এমনি কাটিল যুগ ; যুগান্তের নিশা-অবসানে
দখিনা-পবন সাথে ভাগিরথী বহিল উজান—
দুয়ারে দাঁড়াল সিন্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান
স্বপনেরে ছিন্ন করি' কি বারতা বিতরিল প্রাণে!
উছসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা ঘাটে সোপান-পাষাণে,
কূল সে অকূল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ!
আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীক্ষে কারা গায় গান!
দেবতা কহিল কথা চুপি-চুপি মানুষের কানে!
স্বপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—
পুরুষের চোখে রূপ—হর-চক্ষে উমা-হৈমবতী!
সে নহে কিশোর-বালা, শ্যাম-শোভা নবীনা ব্রততী—
ননুএ্যাবদনী রাধা যমুনায় গাগরি-ভরণে।
সে রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—
পান করে কালকূট মহাসুখে, ডরে না মরণে!

৪

সততা স্বাধ্যায়শীল আত্মভোলা গৃহী-ব্রহ্মচারী
পুঁথি হ'তে চোখ তুলি' একদা সে নিজ নারী-মুখে
নেহারি' কিসের ছায়া জলাঞ্জলি দিল সব সুখে,
ক্ষুধায় আকুল হ'ল—প্রাণ যার ছিল নিরাহারী!
গৃহ যার স্বর্গ ছিল সেও সাজে পথের ভিখারী—
মজিল শেফালী ফেলি' রাগরক্ত রূপের কিংশুকে,
মন্দারের মালা ছিঁড়ি আশীবিষ তুলি' নিল বুকে—
যত জ্বালা তত সুখ, তত ঝরে নয়নের বারি!
সর্বত্যাগী বীর-যুবা আত্মজয়ে করি' প্রাণ পণ
সকল সাধনা তার বলি দিবে নারী-পদমূলে—
মৃত্যুর অনলে শেষে সেই দাহ করিল নির্বাণ!
নিজেরি সে পত্নী, তবু আজ দূর দেবীর সমান!
কিছুতে দিবে না ধরা, পতি-প্রেম গিয়েছে সে ভুলে-
তারি লাগি' রাজা রাজ্য ঘুচাইল, সর্বস্ব আপন!

৫

বাল্য-প্রণয়ের সুধা বিষ হ'ল নবীন যৌবনে !
সাঁতারি' অগাধ জলে দোঁহে মিলি' করিল উপায়—
নির্ভয়ে ডুবিল যুবা, আর-জন দেখে ভয় পায় ;
পুরুষ মরিল, নারী ফিরে চলে পতির ভবনে!
শিবিরে নামিছে সন্ধ্যা—অন্ধকার মনে ও ভুবনে,
"কেন বা মরিবে, প্রিয় ?" প্রণয়িনী কাতরে শুধায় ;
হেন কালে কার ছায়া হেরি' বীর মুহু মূরছায়—
"মরিতেই হবে !" বলি' হানে কর ললাটে সঘনে !
এ নহে কবির ভ্রম—নহে চন্দ্র পথের পল্বলে,
অথবা সে মৃত্যুলোভী পতঙ্গের নব বহ্নিস্তুতি ;
যেই শক্তি নারীরূপা—বিধি-বিষ্ণু-হরের প্রসূতি—
সেই পুনঃ নিবসিল পুরুষের চিত্ত-শতদলে !
জীবনেরি যজ্ঞে সে যে স্বাহা-মন্ত্রে প্রাণের আহুতি—
মরা-গাঙে ডাকে বান, মৃত্যু মাঝে অমৃত উথলে !

৬

আঁধার শ্রাবণ-রাতে কাঁদে কেবা আর্দ্র বায়ুশ্বাসে ?—
ধূলায়-ধূসরস্তনী, প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী—পাগলিনী !
পতিরে করিতে সুখী অশ্রুহীনা কোন্ হতভাগিনী—
নিমীলিত আঁখি, মুখ বিষ-নীল—সুখহাসি হাসে !
শারদীয়া জ্যোৎস্নারাতি, ভরা নদী, স্রোতে তরী ভাসে—
তারি' পরে কাঁদে বীণ, স্বপ্নে তাই শোনে নিশীথিনী !
ভৈরবী-পালিতা যেই—কামে প্রেমে সম-উদাসিনী—
কি স্নেহে, মশানে তার ভাগ্যগত স্বামীরে সম্ভাষে !

* * *

মাঠ, বাট, গোষ্ঠ হ'তে এ বঙ্গের জীবন-জাহ্নবী
বহিল উজানে পুনঃ সুদুর্গম দূর হিমাচলে—
যেথায় তারকা-তলে দেওদারু-নমেরু-অটবী
রতি-বিলাপের গাথা স্মরে আজও শিশিরের ছলে ;
হর তবু হেরে যেথা মুগ্ধনেত্রে গৌরী-মুখচ্ছবি—
বঙ্কিম-চন্দ্রের কলা ভালে তাঁর অনিমেষে জ্বলে !

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

(১৩৩৮)

১

সারাটি গগন ঘুরি', পূর্ব হ'তে পশ্চিম-অচলে
পহুঁছিলে হে রবীন্দ্র! পলাতকা সে উষা-প্রেয়সী
এবার ফিরাবে মুখ, চিরতরে উঠিবে বিকশি'
ক্ষণিকের দেখা সেই আভা তার কপোল-যুগলে !
তারি লাগি' নিশান্তের তারাময় তিমির-তোরণ
খুলিয়া বাহিরি' এলে, তব নেত্রে নিমেষে হরণ
করেছিল সে উর্বশী—আলোকের প্রথম প্রতিমা !
তোমার উদয়-ছন্দে জাগিল সে-রূপের হিন্দোল,
মেঘে মেঘে মুহুর্মুহু কি বিচিত্র বরণ-হিল্লোল !
ধরণী ফিরিয়া পেল' অসিত নিচোলে তার হরিত-নীলিমা,
অম্বুনিধি আরম্ভিল মৃদু কলরোল ।

২

বীণার সে সপ্ততন্ত্রী মূরছিল এক শুভ্র রাগে !—
দিকে দিকে বিরচিলে মায়া-পরী ছায়া-মনোহর ;
মধ্যাহ্ন অতীত যবে, স্মৃতি-শেষ প্রভাত প্রহর—
হেরিলে কি পুনঃ সেই পদচিহ্ন রথ-পুরোভাগে
বীণায় বাজিল তাই বৈকালী সে রাখালিয়া সুর,
শোনা যায় তারি মাঝে বাজে কার বিধুর নূপুর
দূর হ'তে ! নভো-নাভি হ'তে তাই নিম্ন-মুখে হেলি'
রশ্মি তব প্রসারিলে দীর্ঘতর পশ্চিম-অয়নে—
যেথায় সাগর-তীরে নিশীথের কজ্জল-নয়নে
ঘুমায় সাঁজের তারা ; সোনার সিকতা 'পরে ক্লান্ত তনু মেলি'
রবি-বিরহিণী রত স্বপন-বয়নে !

৩

ধায় রথ এখনো যে, রশ্মি-রজঃ বিলায় বিমানে—
দিগঙ্গনা তাই হ'তে ভরি' লয় করঙ্কে কুঙ্কুম !
জল-জাল হ'তে উঠে বারুণীর কেশধূপ-ধূম,
ছুটে চলে তুরগেরা গোধূলির শিশির-নিপানে ।
তব বীণাযন্ত্রে বাজে পূরবীর রাগিণী উদাস—
বৈশাখী নিদাঘ-দিবা মানে না সে বিদায়-হুতাশ,
যত শেষ হয় আয়ু, তত তার রূপ রমণীয় !

সে তব চরণে বসি' জানু ধরি' চেয়ে আছে মুখে—
যৌবন যাপিল যেই তোমা সাথে অসীম কৌতুকে,
সে জানে, কাহার লাগি ছানিয়াছ নীলাকাশে আলোর অমিয়,
—কার পাণি ভরিবে ও গানের যৌতুকে !

৪

সে দিবারে হেরিয়াছি—কলাবতী কবি-প্রতিভার
চির-স্ফূর্তি ! হেরিয়াছি কেমনে সে জ্যোতির কমল
মুদিত মুকুল হ'তে মেলিয়াছে লাবণ্যের দল
বৃন্ত-বন্ধে, রূপ-অন্ধ আঁখি হ'তে হরি' অন্ধকার !
অর্দ্ধপথে কে তোমারে ডাক দিল অস্ত-সিন্ধু পারে—
রূপের সোনার-তরী ডুবাইলে সঙ্গীত-পাথারে
কার লাগি' হে বিবাগী ?—সেই দিবা পদতললীনা
চায় কভু নিজপানে, কভু তব নয়ন-মুকুরে—
হেরে তার সে মূরতি আজও সেথা রহি' রহি' ফুরে !
তবু কার অনুরাগে উদাসিনী বাণী তব রূপমোহহীনা
পরায় সুরের মালা নিশার চিকুরে ?

৫

তুমি শুধু জানো তারে—ভালে যার বিবাহ-চন্দন
পরাবে তাপসী সন্ধ্যা, ঊষা হ'বে রবি-স্বয়ম্বরা !
ছিল যে অসূর্য্যম্পশ্যা, আলো-ভীরু, কুহেলি-অম্বরা—
পূর্ণ আঁখি মেলিবে সে অপসারি' মুখাবগুণ্ঠন !
রূপার কাজল-লতা—আধ'-চাঁদ—কবরীর পাশে,
একটি তারার টিপ হেরিবে সে ভুরুর সকাশে ;
বিলোল অপাঙ্গে তার রবে না সে কটাক্ষ অথির—
তুমি যবে পরাইবে সাবধানে সীমন্ত-সীমায়
তব শেষ-কিরণের রেণুটুকু সিন্দূরের প্রায় !
সেই লগ্নে দিবা নিশা দোঁহে মিলি' অপরূপ এক আরতির
দীপাবলী সাজাইবে সোনার থালায় !

৬

রথ হ'তে নামি' এবে কোন্ মহা দিক্-চক্রবালে
উত্তরি' যাপিবে, রবি, অন্তহীন আলোক-বাসর ?
হেথায় নিশীথ-রাতে নিদ্‌হারা পিপাসা-কাতর
তারারা রহিবে চেয়ে প্রাচীপানে ; সে নিশি পোহালে
ভাতিবে কি আর বার এ গগনে আদিম প্রভাত—

কালের তিমির-গর্ভে পশিবে কি আলোর প্রপাত ?
নিবারি' দুরন্ত দাহ দিবা-দেহে ধ্যানমন্ত্র-বলে
অন্তরালে হেরিল যে বেদমাতা উষার মূরতি,
স্ফটিকাক্ষমালা হাতে নিবসিল নিখিল-ভারতী
সবিতৃমণ্ডলে যার, পুনঃ এই বর্ষ-মাস— রাশিচক্র-তলে
অবতরি' উদিবে সে রবিকুলপতি ?

৭

মন্দ করি' গতিবেগ নিরন্তর অগ্রসর-পথে,
সাঙ্গ কর সুবিলম্বে সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অবকাশ ;
নেহারিব বহুক্ষণ সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ
তরুণার্ক-রূপে তোমা—যেন নব উদয়-পর্বতে!
সহসা বিটপী-শিরে, পৃথিবীর প্রদোষ-প্রাঙ্গণে
ঝরিবে আশিস-ধারা তরলিত আবীর কাঞ্চনে !
হরজটাজালে যথা ঊর্মিমালা চন্দ্রকরোজ্জ্বল—
দিবার অলক-মেঘে উছলিবে গীত-তরঙ্গিণী
অস্তরাগে ; তারপর এক হাতে সে বরবর্ণিনী
ছড়াবে কুসুম্ভ-ফুল, আর হাতে আলুলিবে ধূসর কুন্তল-
তখনো অ-শেষ তব কিরণ-কাহিনী !

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৮

ফেরদৌসী

[সহস্রবার্ষিকী স্মৃতি-বাসরে]

হাজার বছর আগে—ভাবিতে বিস্ময় মানি, হে ফেরদৌসী-কবি !—
সারা প্রাচী স্তব্ধ যবে, অস্তপ্রায় কাব্যরবিচ্ছবি,
ধ্বংস রাজ্য-রাজপাট—দাস বসে প্রভুর আসনে,
ধরণী মূর্ছিতা যবে লোভ হিংসা রণোন্মাদ শঠতার নিঠুর শাসনে—
সেইকালে ওগো পুণ্যবান!
তোমার সাধনা-বলে জাগিয়া উঠিল হর্ষে কবেকার প্রাচীন ঈরান!
হোমারের কাব্যে যথা সঞ্জীবিত হয়েছিল য়ুনানী-মণ্ডলী
পশ্চিম সাগর-কূলে,
আর বার পূর্বাচল হিমালয়-মূলে

গঙ্গার তরঙ্গ যথা উঠেছিল একদা উচ্ছলি'
ভারতের মহাকাব্য-গানে—
সেই মত তুমি কবি,—একমাত্র তুমিই সেদিন-
বাজাইয়া সপ্তস্বরা বীণ,
জাতির গৌরব-গাথা বিরচিলে গর্বোৎফুল্ল প্রাণে,
আপনি হইলে ধন্য, ধন্য হ'ল স্বজাতি তোমার !

তোমার সে গীতচ্ছন্দে নেমে এল স্বর্গ হ'তে পিতৃ-পিতামহ—
কিরণ-কিরীট শিরে, মূর্তি মহিমার !
ঈরানের প্রতি কুঞ্জে প্রচারিল মুগ্ধ গন্ধবহ
পৌরুষের দিব্য পরিমল—
প্রত্যেক পর্বত-সানু, উপত্যকা, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রতল
বীরদাপে করে টলমল !
নিভৃত সে ছায়া কত বৃদ্ধ বিটপীর,
পথচিহ্নহীন কত তুচ্ছ নদীতীর
সহসা লভিল খ্যাতি তীর্থের সমান !

হে ফারসী কবি !
তোমার গানের তানে প্রাচীন পহলবী
প্রতিধ্বনি-সম ঘোষে অতি দূর সিন্ধুর আহ্বান !
জাম্‌শিদের ভগ্নস্তূপ প্রাসাদ-বিজনে
শোনা যায় মধ্যাহ্নের তন্দ্রাহীন কপোত-কূজনে
উদাস করুণ সেই পুরাতন শ্লোক,
প্রতিটি অক্ষরে তার বিস্মৃতির পুঞ্জীভূত শোক !
হেল্‌মন্দ-নদীতীরে সীস্তানের বালুকাপ্রান্তরে,
সুদুর্গম গিরিদুর্গ 'পরে,
একাকী যে বৃদ্ধ পিতা শ্বেত-শ্মশ্রু নরপতি জা'ল্‌
বীরপুত্র-পথ চাহি' নিরানন্দে কাটাইছে কাল—
তার সেই হৃদয়-বেদন
নবীন ভাষায় লভে অপরূপ রূপ চিরন্তন !

* * *

সহস্র বৎসর আগে জন্মেছিলে, হে কবি অমর!
জন্মান্তর হয়েছিল তারো আগে—আরো এক সহস্র বৎসর !
জাতিস্মর ছিলে তুমি, তাই নিজ কাল অতিক্রমি',
ক্ষণজীবী পতঙ্গের অভ্রভেদী আস্ফালন, দস্যুতার দম্ভে নাহি নমি',

ফিরাইলে দৃষ্টি তব শাশ্বত সে মানুষের পানে,
যে মানুষ ক্ষুদ্র নহে, সঞ্জীবনী-শক্তিসুধা পানে,
আপন প্রাণের সত্যে যে মানুষ মহাবীর্যবান্—
হোক্ ভৃত্য, হোক্ প্রভু, শত্রু-মিত্র যুবা-বৃদ্ধ সবাই সমান !
—তার সেই পৌরুষের প্রবল বন্যায়
জীবনের সর্বগ্লানি নিত্য ধুয়ে যায় !
হিংসা-প্রেম, পাপ-পুণ্য—দুই-ই চমৎকার !—
হে কবি, তোমার গানে এই মর্ম বুঝিয়াছি সার ।

সহস্র-বার্ষিকী তব স্মরণ-বাসরে
আমরাও আনিয়াছি অর্ঘ তব তরে,
ঈরানের হে কবি-প্রধান !
তোমার কবরে আজ বাঙালীও করে দীপ-দান !
এ দুর্ভাগা দেশ
অশেষ দুর্গতি মাঝে লয় আজি তোমার উদ্দেশ ।
প্রাণ তার ধ্যান করি' মানুষের পৌরুষ-মহিমা,
পিতৃ-পিতামহে স্মরি' গড়িয়া লইতে চায় একখানি মানসী-প্রতিমা
অতীতের ইতিকথা হ'তে
সঞ্জীবন-মন্ত্র লভি' ভবিষ্যের দুর্ণিবার স্রোতে
বেয়ে যেন চলি মোরা এক তরী—এক কর্ণধার,
আমার এ বঙ্গ যেন বক্ষে ধরে শাহ্‌নামা-সম কণ্ঠহার !

রূপকথা

এত রূপকথা রোজ শুনি, তবু যখনি আকাশে চাই—
মনে হয়, ওই উহাদের কথা কেহ কি জানে না, ভাই?
দলে-দলে ওরা কোথা হ'তে আসে—
ঝিঁঝি ডাকে যবে হেথা চারিপাশে,
ফুলের গন্ধ বেড়ায় বাতাসে—
দেখিতে কিছু না পাই ;
শুধু যে ওরাই চোখে-চোখে ডাকে, আকাশে যে-দিকে চাই!

আছে কি হোথায়—পৃথিবীর সাথে আকাশ যেথায় মেশে—
সার-সারি গাছ সব দিকপানে শাখায় শাখায় ঘেঁসে ?
গোড়াটি তাদের দেখা নাহি যায়,
ঘন-পল্লবে আঁধার ঘনায়,
শুধু কুঁড়িগুলি সাঁজের হাওয়ায়
পাতার বাহিরে এসে,—
এক সাথে সব ফুটি-ফুটি করে পাশাপাশি ঘেঁসে-ঘেঁসে !

কি ফুল উহারা?—আধ-ফুটন্ত বকুলের মত নয় ?
সোনার বরণ যুঁই বলি যদি, মন্দ সে পরিচয় ?
কেহ বা রূপালি চামেলির মত
শিশিরের ভারে কাঁপে অবিরত !
একটু সে লাল ওই আরো যত—
জানো কি উহারে কয় ?
ওরা বুঝি কুঁড়ি?—মুখগুলি কই পাপড়ি-কাটা ত নয় !

মুখ? তাই বটে, সেই রূপকথা ভুল করে' ভুলে যাই—
ফুল নয় ওরা, আধেক স্বপনে ওদেব চিনি যে ভাই !
যেন চেনা মুখ—কোথা কবেকার !—
বলে, বল দেখি কে হই তোমার ?
আকুল পরাণে চাই বারে বার—
প্রাণে চিনি, মনে নাই !
ঠিক কোন্ জনা কোন্‌টি—সে কথা বারে বারে ভুলে যাই !

ওই যে ওখানে মুখখানি দেখি সব চেয়ে সুন্দর—
মুখের হাসি ও চোখের চাহনি নহে যে স্বতন্তর !
কোন্ জনমের কোন্ মার মুখ,
কোন্ অতীতের কোন্ সুখ-দুখ
নূতন করিয়া ভরি' তোলে বুক—
সকলি হয়েছে পর !
তাই ভাবি, আর দেখি—মুখখানি সব চেয়ে সুন্দর !

করো পানে চেয়ে মনে হয় যেন, যে জন গিয়েছে চলে'
সে-দিনের খেলা সাঙ্গ না করি', কাহারে কিছু না বলে'—
সেই যেন হোথা উঁকি দিয়ে চায়,
যেন মৃদু-মৃদু হাসে ইসারায়,

তবু সে আঁখিটি জলে ভরে' যায়—
কাঁদে যেন দেখা হ'লে !
অত দূরে থেকে সুখ হয় কারো ?—কেন গেলি ভাই চলে' ?

এইমত যত রূপকথা আমি আপনি রচনা করি—
ফুল, না সে মুখ ?—যাই বল তাই, কি হবে সে ভুল ধরি' ?
ফুল যদি বল, সেও মিছা নয়—
শুধু রূপ দেখে তাই মনে হয় ;
প্রাণে প্রাণে যদি চাও পরিচয়
স্বপনে নয়ন ভরি'—
তবে রূপ নয়—রূপকথা এস বিরলে রচনা করি ।

বাংলার ফুল

এই বাংলার তৃণে তৃণে ফুল, কূলে কূলে মধুমতী,
শ্যামলে সবুজে ধূলামাটি ঢাকা—আলোকের আলিপনা !
যূই-শেফালীর গন্ধে আকুল সন্ধ্যা মৌনবতী,
সমীরে নীরব ঝরে সে বকুল—সুরভি তুষার-কণা !

কোমল-মলয়-সমীর-সেবিত ললিত-লতার বনে
ফুটে আছে কত টগর, করবী, অতসী, অপরাজিতা ;
মালঞ্চে হের মিলেছে মাধবী মধুমালতীর সনে,
কত না কুসুম করে কটাক্ষ —কচিৎ অপরিচিতা ।

সোঁদালের সোনা, ভাঁটের মুকুতা, চুনি সে কৃষ্ণকলি,
পরীদের শাঁখ মল্লি-কলিকা—ধুতুরাও দেখি আছে ;
রজনীগন্ধা—গন্ধরাজের নাতিনী তাহারে বলি,
সর্বজয়ার রঙীন রুমালে ফোঁটা কেবা আঁকিয়াছে !

হেরি যে হোথায় তোড়া-বাঁধা যেন ফুটিয়াছে রঙ্গন,
উপরে তাহার শাখা মেলিয়াছে নধর কনক-চাঁপা ;
কোন্ উপাসিকা দোপাটির বনে ছিটায়েছে চন্দন !
গাঁদা হাসিতেছে আঙিনার কোণে—হাসিখানি তার চাপা

সহসা হেরিনু দূরে একধারে দোলন-চাঁপার সনে
একটি সে গাছে আগুনের মত ফুটিয়া রয়েছে কিবা !
সহে না শাখায়, টুটিবে এখনি বৃন্তের বন্ধনে—
চিনিনু তখনি—সধবা জবার সে যে সিন্দূর-ডিবা !

ঝুমুকার খোঁপা মানায়েছে ভালো, কেতকী এলায়ে চুল
কাঁটার-দিব্য-দেওয়া লিপি তার মুড়িয়াছে পরিপাটি !
ভাবগীতিময় প্রশ্নের মত নীল সে কল্‌মী-ফুল,
কামিনী মাটিতে বিছায়েছে তার শুভ্র-সুরভি শাটি !

কহিছে, 'তুলো না, ভুলো না তা' বলে' !—কহিছে সকল ফুল,
ছলনায় ভুলে চেয়ে থাকি শুধু শুনে সে করুণ কথা ;
মনে হয় তবু হাসিছে কাহারা—হয়ে যায় দিক্‌-ভুল,—
রূপসী-সভায় উপোষিত আঁখি ঘুরে ফিরে যথা তথা ।

বুদ্ধিমান্‌

হৃদয়-আবেগে যদি কিছু কর জীবনের কোন পরম ক্ষণে—
দুঃখ যে তার সহিতেই হয় নিত্য-দিনের সহজ মনে ।
ভাল যা' করেছ, বড় যা' ভেবেছ—ক্ষোভ যদি হয়, সে কথা স্মরি',
জেনো, তুমি নও—তোমার মাঝারে যায় নি যেজন এখনো মরি',
তারি নির্দেশে হয়েছিলে তুমি একদিন কবে হঠাৎ বড়—
তুমি বড় নও—নির্বোধ নও ! তুমি চিরদিন হিসাবে দড় ।

জীবনের হাটে বেসাতি করিয়া কারো লাভ হয়, কারো বা ক্ষতি,
কারো খোয়া যায় শেষ কড়িটিও, কেউ সহজেই লক্ষপতি।
বুদ্ধিরে তবু দেয় নাক' দোষ—লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া যায়,
বলে, ভাগ্যের প্রতারণা সে যে, মানুষের হাত কি আছে তা'য়?
তখনও তাহার এক সান্ত্বনা—হিসাবে ছিল না একটু ভুল,
মানুষ তাহারে ঠকাতে পারে নি, শক্ত এমনই মনের মূল !

এহেন মানুষ যদি কোন দিন হিসাব হারায় প্রাণের দোষে,
আপনার কাছে আপনি ঠকিয়া মাথা খুঁড়ে মরে কি আপশোষে

কন্যা-প্রশস্তি

[বন্ধু-কন্যার বিবাহে]

আজিকে তোমার হাতে কোমল কমল-পাতে
দিব আনি' আরো কি কোমলতর ফুল ?—
ভেবে নাহি পাই মনে, কবিতার ফুলবনে
আছে কিবা মনোহর তার সমতুল !
শ্যামকান্তি দূর্বা-শীষ রচিবে কি শুভাশিস
শিরে তব, শুভতর ও কেশ-কেশরে ?
দেবতা আপনি তথা চির-শ্যাম নবীনতা
রচিয়াছে সুচিক্কণ রেশমের স্তরে !

তোমারে হেরিতে চোখে হেরি শুধু কল্পলোকে
যেন সেই মন্দাকিনী-বালুকা-বেলায়—
কন্দুক-ক্রীড়ায় মতি গিরিবালা হৈমবতী
উমা আজও কৈশোরের মাধুরী বিলায় !
নয়ন-পল্লবে তোর শৈশব-স্বপনঘোর—
গান গেয়ে দোল-দেওয়া ঘুমের কুঙ্কুম
আজো যে রে ঘুচে নাই, মুখে তোর মুছে নাই
মা-বাপের কোলে-পাওয়া শত স্নেহ-চুম !
জীবনের মধুমাস বিষ-বায়ু তপ্ত শ্বাস
হানে নাই—ফাগুনেও ঝরিছে শিশির !
নয়নে যে আলো নাচে ঊষা ম্লান তার কাছে,
সে নহে মশাল-ভাতি তামসী নিশির।
এ যেন মাধবী-দিনে— কত ফুল কেবা চিনে?
রঙে সে রঙীন হ'ল লতার বিতান,
তবু সে শরৎ-শশী আকাশে রয়েছে বসি',
অমল কমল ফোটে সরসী-শিথান !

যে রূপের ভাব-ছবি বাঙালী সাধক-কবি
হেরিয়াছে যুগ-যুগ কুমারী-বদনে,
পূজিয়াছে বালিকারে সচন্দন পুষ্পভারে
—কন্যারূপা মহামায়া ভক্তের সদনে,
তোমার মাঝারে কন্যা আরও সে হয়েছে ধন্যা
কুমারীর পূর্ণ তনু-মনের পূর্ণিমা—

সুকোমল শিশু-আস্যে খলহীন কলহাস্যে
মায়াবিনী তরুণী সে দেবীর মহিমা !
তাই কি ভাবের ঘোর লেগেছে নয়নে মোর
—আশিস করিতে কর করে যে অঞ্জলি !
প্রাণে মোর দিলে আনি' যে পুণ্য পরশখানি
কোন্ ছন্দে রচি হায় তার পদাবলী ?

দাঁড়াও সভার মাঝে, হেরি তোমা কন্যা-সাজে
সালঙ্কারা চেলাম্বরা সৌভাগ্য-রূপিণী !
চন্দন-চর্চিত ভাল নত নেত্রপক্ষ্মজাল—
শীতান্তে মুকুল-মুখী লতা পল্লবিনী।
কে সে চির ভাগ্যবান— ও পাণি করিবে দান
তুমি যারে অনুরাগে অকুণ্ঠিত মনে ?
সার্থক যতন তার এমন রতন-হার
লভে যেই—খুঁজে সারা সংসার-গহনে।
প্রজাপতি ধন্য আজ, দুষ্ট স্মর পায় লাজ—
যাঁর বিধি মিলাইল হেন বধূ-বর ;
আজি এ মণ্ডপ-তলে মহাহর্ষ-কুতূহলে
মন্ত্রপাঠ করে যত ঋষিরা অমর।

তারি সাথে মৃদুস্বরে স্নেহ-সুখ-গর্ব্বভরে
রচিনু মঙ্গল-গীতি দম্পতী-বন্দনা ;
এ মিলন পুণ্য হোক সর্ববিঘ্নশূন্য হোক
চির-শান্তিপূর্ণ হোক—এ মোর প্রার্থনা !

ঊষা

তোমরা কি হেরিয়াছ তরুশাখে নব কিশলয়—
পেলব পুষ্পের মত, তাম্ররুচি, সুস্নিগ্ধ চিক্কণ ?
কিশোরীর চারু গণ্ডে করিয়াছ কভু নিরীক্ষণ
লজ্জারুণ আভাখানি ? চিত্ত কি গো করিয়াছে ৩
শিশুর সুন্দর আস্য—ক্ষণ-হাস্য ক্ষণ-অশ্রুময় ?

অস্তাচল-শিরে কভু হেরিয়াছ কনক-কিরণ—
তৃতীয়ার শশিকলা, ক্ষণিকের আঁধার-হরণ ?
তা'হলে উষার সাথে করিয়াছ দৃষ্টি-বিনিময় ।

পেলব কোমল, আর যাহা-কিছু নিমেষে মিলায়—
মুহূর্তের সেই শোভা মনোহর—তারি নাম উষা ;
একাবার ধরা দিয়ে ভরি' রাখে স্মৃতির মঞ্জুষা—
সোনার সে দাগটুকু মানসের নিকষ-শিলায় !
সে নহে খনির মণি—ধরণীর চিরন্তনী ভূষা,
দিবা-মুখে চুমা সে যে রজনীর বিদায়-লীলায় !

বধূ-বাসন্তী

হোমের আগুন আগে-ভাগে জ্বালা দেখি যে পলাশ-শাখে
আগুনই ত বটে !—পিঙ্গল শিখা, অঙ্গার নীচে তার !
মাঘ মাস যায়, ধূম-কুয়াসায় হেথায় বনের ফাঁকে
কাহার বিবাহে মন্ত্র পড়িছে কোকিল বারম্বার !

থমকি দাঁড়ানু—আরে, এযে দেখি ভারে ভারে যৌতুক !-
চূত-পল্লব-মঞ্জুষা ভরি' হেম-মঞ্জরী-ভূষা !
সজিনা সাজায় লাজ-অঞ্জলি, মাঝে লাল টুকটুক
প্রবাল-পসরা ধরিয়াছে দেখি বদরী—বণিক-স্নুষা !

মনে পড়ে' গেল, কালি সন্ধ্যায় মৃদু সুগন্ধ বহি'
নেবুফুল হ'তে, মন্থর বায়ু করেছে নিমন্ত্রণ ;
দুরু দুরু করি' কেঁপেছিল হিয়া, সে কথা কাহারে কহি—
হাসিবে তোমরা—তবু শোন বলি, ঘটিল কি অঘটন !

সহসা হেরিনু মণ্ডপ-তলে অঞ্চল শুধু তার—
শিমূল-শীর্ষে বিপুল-বিথার রক্ত-চীনাংশুক !
আর কেহ নহে, কন্যা-মাধবী মাগিছে নয়ন কার—
শুভ-দৃষ্টির ক্ষণে সে খুলিবে সুন্দর বধূ-মুখ ।

কে জিনিবে তারে আজিকার এই বিজন স্বয়ম্বরে !—
ভাবিতে ভাবিতে চকিতে নামিল আঁখিতে স্বপন-ঘোর,
অমনি হেরিনু ঘোমটার ফাঁকে ঊষার অনম্বরে
ব্রীড়া-হাসিখানি—আমি বর হ'য়ে বাঁধিনু বিবাহ-ডোর !

শ্রীপঞ্চমী

১

কানন কুসুমি' উঠে যাঁহার পরশে—
চির-বন্ধ্যা বন-বধূ পুষ্প-প্রসবিনী ।
পাখী ও পতঙ্গ মাতি' যাঁর প্রীতি-রসে
বাতাসে বহিয়া আনে গীত-মন্দাকিনী ;
যাঁর শিরে ধরিয়াছে ধরা-মনোহর
বসন্ত শীতান্তে এই সুখোষ্ণ সমীরে
হরিতের আতপত্র,—ফুলের চাঁমর
শিশির-চর্চিত, চারু, ঢুলাইছে ধীরে,—
সে সুন্দর-দেবতার চরণ-নখর
আমিও রঞ্জিব আজি আরক্ত আবীরে ।

২

শরতের সন্ধ্যা-মেঘে যত রঙ ছিল,
ফুলে-ফলে আঁকা তাই আজি বনে-বনে
কবি-কণ্ঠে যত গান যেথায় ধ্বনিল,
স্বনিছে মধুরতর আজি মনে-মনে !
স্মৃতির সুরভি-ঘ্রাণে প্রাণ ভরপুর,
(অন্ধকারে নেবুফুলে গুঞ্জরিছে অলি !)
ভালোবেসেছিনু সেই কিশোর-বয়সে
যত জনে, যৌবনের ব্যথা সুমধুর
ভুঞ্জিনু যাদের সাথে, সম-কুতূহলী—
তাদেরি মেলায় মিলি স্বপন-রভসে ।

৩

মনের—বনের—অয়ি মাধবী সুষমা,
কবি-ঋষি-মনীষীর প্রথমা প্রেয়সী,
জগত-যৌবন-ধাত্রী যুবতী পরমা,
বিশ্বরমা কন্যা অয়ি, ব্রহ্মার মানসী !—
এস দেবি ! মর-জন্মে অমর-দুর্লভ
বিতর' তোমার সেই প্রেমের প্রসাদ—
রূপের পীযূষ-পান মনো-মধুমাসে !
নেহারিব আর বার নয়ন-বল্লভ
বাসন্তী-নিশার রূপে অসীম অবাধ
তোমার কায়ার ছায়া আনীল আকাশে !

৪

যে বাক্-ব্রহ্মের ছন্দ তোমার বাহন—
'হংস'-নামে আদি-স্পন্দ জড়-চেতনার ;
যার স্ফূর্ত রস-মূর্তি মধুর-সাধন—
অরূপের রূপ-রাগ কবি-কল্পনার ;
যে-বাণী বিলসি' উঠে বর্ণে গন্ধে গানে
ধরণীর মধুবন, নিতুই নূতন !—
সেই তিথি-শ্রীপঞ্চমী-রূপে আজি তুমি
মুছাও তুহিন-কণা কৃপণের প্রাণে,
সরস কটাক্ষ-সুধা করিয়া সিঞ্চন
আর্দ্র কর রসিকের মনোবনভূমি ।

প্রীতি-উপহার

(কবি-বন্ধু হেমচন্দ্র বাগচীর 'দীপান্বিতা' কাব্যের উৎসর্গ-পত্র পাঠ করিয়া)

যে নবীন বৈতালিক বাণীর নিকুঞ্জতলে বসি'
প্রভাত-কাকলি গানে অরুণের করিছে বন্দনা,
তার কানে অন্ধ-রাত্রি তারকার তিমির-মন্ত্রণা
কেমনে পাঠায়ে দিল! আয়ুহীন দশমীর শশী
যে নিশারে করেছে অনাথা, যার 'বিস্মরণী'-মসী
ঢাকিয়াছে সন্ধ্যামুখে রাগরক্ত লজ্জার লাঞ্ছনা,
হরিয়াছে অস্তাচল-শায়িনীর মূর্ছার মূর্ছনা—
আলোর জননী সে কি? নহে বন্ধ্যা ত্রিযামা-তাপসী ?

যে ডাকিনী স্বপ্নঘোরে করিয়াছে মোরে গৃহহীন,
যার পিছে আঁখি মুদি' চলিয়াছি কাননে কান্তারে,
পিঠের তমিস্রা যার হেরি শুধু আগুল্‌ফ-লুণ্ঠিতা—
এলোকেশী নিশীথিনী!—তারি লাগি' আমি উদাসীন!
আমিও হেরি নি যাহা, তুমি কোন্ প্রীতি-উপহারে
হেরিলে সে মুখ তার? তব চক্ষে সে কি দীপান্বিতা!

যৌবন-যমুনা

(কোনও প্রীতিমুগ্ধ তরুণ-কবি-প্রেরিত প্রশস্তি-কবিতা পাঠে)

যৌবন-যমুনা-তীরে বাজিয়াছে মোহন মুরলী
কবিতা-কদম্ব মূলে ; তাই শুনি' আহিরিণী বালা—
জানে না সে কার লাগি'—গাঁথিয়াছে মালতীর মালা
আষাঢ়ের দিন-শেষে, হেরি' নভে নব ঘনাবলী।
কোন্ সুরে কত মধু, আজও তায় নহে কুতূহলী—
কান চেয়ে প্রাণে সুখ—মনে হয় সবই সুধাঢালা !
উতলা পীরিতি তার, বৃষ্টি নামে, নিকুঞ্জ নিরালা—
কার গলে দিবে মালা ? আঁখি তার উঠে ছল-ছলি'।

হেন কালে কে পশিল দ্বার খুলি' সাঁজের আঁধারে—
অধরে গুমরে গীতি, প্রভাহীন নয়ন উদাস !
সে-ও বাঁশি শুনেছিল মায়াবিনী যমুনার পারে,
তারি মধু-গন্ধ-স্মৃতি সুরভিছে প্রাণের নিঃশ্বাস !
নিমেষে চিনিল তারে, না জানিতে সব ইতিহাস
সঁপিল সাধের মালা, আর্দ্র করি' আঁখির আসারে।

বালুকা-বাসর

তোমার সাথে একটি রাতে সেই যে দেখা নদীর চরে—
সেই কথাটি পড়ছে মনে আজকে অনেক দিনের পরে ;
নদী তখন উঠছে ফুলে' জোয়ার জলে কানায় কানায়—
সেই জোয়ারে চাঁদের হাসি—বল দেখি কেমন মানায় !

গাঙের কূলে মনের ভুলে বসেছিলাম তোমার পাশে,
ওপার হ'তে বাঁশির উদাস সুরখানি কার হাওয়ায় ভাসে ;
চেয়েছিলাম তোমার মুখে, তুমি ছিলে অন্যমনা—
আঙুলটিতে জড়িয়েছিলে নীলাম্বরী-শাড়ীর কোণা।

ঠোঁট-দুখানি কাঁপল না ত', চুলের ছায়া চোখ যে ঢাকে,
মনটি বুঝি উধাও তখন উদাস-করা বাঁশির ডাকে ?
মুখের কথা, চোখের দিঠি—পেলাম না ত' কোনই সাড়া,
মনে হ'ল, সেদিন রাতের সব-কিছু কি সৃষ্টিছাড়া !

শেষ-খেয়ার সে তরীখানি ছাড়ল যখন এপার থেকে,
উঠ্‌লে তুমি তাহার 'পরে, আমায় গেলে এক্‌লা রেখে ;
যাবার বেলায় বল্‌লে শুধু—'রাত্রি হ'ল, চাই যে ঘর ;
এপারে ত' আছে কেবল ভাঙন-ধরা নদীর চর।'

বাব্‌লা-বনের ফাঁকে ফাঁকে, বুনো ঝাউ-এর ঝোপের ধারে,
ঘুরে বেড়াই পথ-বিপথে প্রাণের বিজন অন্ধকারে।
জ্যোৎস্না যত আঁধার তত—গাইনু তবু আলোর গান,
নদীর জোয়ার থাম্‌ল শেষে, পূর্ণ শশী অস্তমান।

বালির 'পরে শয়ন পাতি' মুখটি গুঁজে পড়ব শুয়ে,
(ভাঁটার শেষে জোয়ার এসে দেবে সে ঠাঁই আবার ধুয়ে)
এমন সময় চমকে দেখি, পাশেই এ কার চুলের গোছা !
চুলের মাঝে মুখটি তোমার—নয়ন যেন সদ্য-মোছা !

জ্যোৎস্না তখন ফুরিয়ে গেছে, নেইক' জলের কলধ্বনি,
জিজ্ঞাসিনু, কেমন করে ডুবল তোমার সেই তরণী ?
ফিরলে তুমি কেমন করে' সেই পুরাতন বালুর চরে—
খেয়ার মাঝি পারল না কি পৌঁছে দিতে গ্রামের 'পরে ?

শুকতারাটি উঠল জ্বলে', তোমার মুখে ফুটল হাসি ;
ঠোঁট দুখানি নড়ল বারেক, বল্‌লে 'বল, ভালবাসি'।
জোয়ার-জলে তলিয়ে গিয়ে ভাঁটায় ভেসে ওঠার পরে
একি কথা তোমার মুখে বালুচরের বাসর-ঘরে !

টুট্‌ল যখন সুখের নেশা, থামল কানে গানের সুর,
ঝড়ের ঝাপট ঢেউয়ের দোলায় প'ড়ল খ'সে পা'র নূপুর ;
ফুলের মালার বাঁধন খুলে এলিয়ে প'ল চুলের রাশ—
সর্বনাশের সেই লগনে ব্যাকুল হ'ল বাহুর পাশ !

তোমার চোখে কিসের আলো ? আমার চোখে ঘুমের ঘোর
মরে' তুমি বাঁচবে আবার ; আমার প্রাণের নেই সে জোর ।
ভালবাসা ?—হাসির কথা !—উড়িয়ে দিছি অনেক দিন,
বালুর উপর ঝাউ-এর ছায়া তার চেয়ে যে ঢের রঙীন্ !

* * *

সেই ছায়ারও মায়ার মোহ ঘুচবে এবার—আশায় তারি
শয়ন বিছাই গাঙের কূলে, চোখের পাতা হয় যে ভারি ।
এখন আমায় আর ডেকো না—রাত-পথিকের দিনেই ভয় ;
তুমি যে গো দিনের পাখি, এ জন তোমার কেউ যে নয় !

তবু যদি রাতের মায়া, ঝাউ-এর ছায়া, বালুর চর
মন কখনো উদাস করে, শূন্য লাগে বদ্ধ ঘর—
এই খানে এই নদীর বাঁকে—ভাঙন যেথায় ভাসিয়ে নেবে
আমার শেষের শয্যাখানি—সেথায় তোমার চরণ দেবে ?

আবার তুমি তেমনি করে' বসবে হেথায় অন্যমনা—
আঙুলটিতে জড়িয়ে তোমার নীলাম্বরী-শাড়ীর কোণা ?
ঠোঁট-দুখানি কাঁপবে আবার ?—পড়বে চোখে কিসের ছায়া !
জ্যোৎস্না-রাতে বালুর চরে ভুলবে ক্ষণেক ঘরের মায়া ?

প্রবাসী

শুভ-ক্ষণ

শাদাফুলে-ভরা মালতীর বনে, প্রিয়,
মোর মুখে চেয়ে সুখ-হাসি হেসে নিয়ো !
অধরে, কপোলে, অলকে, পলক' পরে—
যেথা মধু পাও সেথায় চুমাটি দিয়ো ।

এই রজনীর চাঁদিনীর আবছায়া
দেখ না, কেমন বাড়ায় চোখের মায়া !—
দেহের যে-ঠাঁই সব চেয়ে সুন্দর,
সেইখানে, সখা, অধীর চুমাটি দিয়ো।
কে বলিবে, কাল কোথা র'বে রূপরাশি ?-
আজ রাতে তাই নিঃশেষ সুধা পিয়ো।

ওই দেখ, হোথা শিউলি পড়িছে ঝরি'—
চাঁদ না ডুবিতে অমনি সে যায় মরি'!
নিমেষ ফেলিতে সুখ যে পলা'য়ে যায়—
ফাগুনের বুক আগুনে উঠিছে ভরি'!
আকাশ-সেতারে রজনী যে-তার বাঁধে,
সে কি প্রতিনিশি এমন মূরছি' কাঁদে ?
প্রেয়সীর মুখ, যেন সে সাঁজের তারা—
আঁখি-পথ হ'তে সহসা যায় যে সরি'!
যত ভালবাসা, হে মোর পরাণ-প্রিয়,
এ শুভ-লগনে সবটুকু বেসে নিয়ো!

রূপ-দর্পণ

আমার নয়ন-পুতলিতে হের তোমার রূপের ছায়া—
দর্পণ ফেলে দাও!
থির-কটাক্ষে আঁখি মেলি' সখি চাও।
সোনার মুকুরে কিবা কাজ তব ?—এ মনোমুকুরতলে
যে দীপ-দহনে হৃদয়-গহনে মমতার মোম গলে—
তাহারি আলোকে নেহারি' ও মুখ-ছায়া
ভুলে যাবে, তুমি নারী—নশ্বর-কায়া,
—দর্পণ ফেলে দাও!

তোমার পিঠের কালো কেশপাশ তুলিয়া গ্রীবার 'পরে
বেঁধেছ কবরীখানি,
চোখের কিনারে কাজল দিয়েছ টানি'।

তারো চেয়ে কালো অসীম-রাতির তিমিরের পটে আঁকা
ও বিধু-বদনে—আমারি মনের কলঙ্ক-কালি-মাখা
নীল আঁখিদুটি মুনিদেরো মন হরে !
মূরছিবে তুমি নিজ কটাক্ষ-শরে—
দর্পণ ফেলে দাও !

কেতকী-পরাগে পাণ্ডুর করি' ললাটের হেম-ভাতি—
অঙ্কিত-কুঙ্কুম,
অধরে ভরেছ মদিরা-সুরভি চুম্ ।
হেথা হের, তব সীমন্ত-তলে উষায়-ধূসর নিশা—
একটি সে তারা, বুকে জ্বলে তার উদয়-আলোর তৃষা !
মোর স্বপনের পোহাইছে শেষ-রাতি—
তা' লাগি' তোমার অধরে হাস্য-ভাতি !
—দর্পণ ফেলে দাও !

আমার নয়ন-রশ্মির রসে পরায়েছি যেই টীকা
তব ভালে, সুন্দরি !
শশিতারাময় নিশাকাশ সন্তরি'—
তাহারি কুহকে মানস-সায়রে উছলে বারিধি-নীর,
জলতলে ছায়া—কনক-কান্তি কোন্ সে পদ্মিনীর !
তোমারি সে রূপ—চিনিবে কি, মালবিকা ?
মোর আঁখি দিয়ে আপনার পানে চাও,
—দর্পণ ফেলে দাও !

নির্বেদ

১

তুমি চলে' গেছ, তবু বসন্তে আজিও
বিরহ জাগে না আর ; কুসুম-কুন্তলা
পুনর্নবা বনবীথি করে না উতলা
সেদিনের মত । নয়নের এ পানীয়,
এত রঙ, এত রূপ পিও, পিও, পিও-

ভোরের কোকিল সাধে ; ইঙ্গিত-কুশলা
মাধব-সখার জায়া জানে যত ছলা,
ব্যর্থ সবই—তৃষাহীনে কি করে অমিয় ?

তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি ;
প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি সাথে ।
চাঁদ নাই জ্যোৎস্না আছে !—অন্ধ অমারাতে
বিরহ-বাতুল রহে স্বপ্নে অবগাহি' !
সে বিরহ নাই মোর, মৃত্যু-পথ বাহি'
চলে গেছি প্রিয়া যেথা—কি আছে আমাতে ?

২

একদা এ মোর দিবা, এই রাতি মোর
পূর্ণ করি' ছিলে তুমি, হৃদয়-ঈশ্বরী ।
জীবনে চাহি নি কিছু, সংসার-শর্বরী
তব রূপ-স্বপ্নে আমি করেছিনু ভোর ।
চরণে কণ্টক দলি', অশ্রুবাষ্প-ঘোর
বিথারি' নিদাঘ-তাপে, গৃহ পরিহরি'
চলেছিনু কল্পবাসে—শুধু কণ্ঠে ধরি'
একখানি বাহুলতা, ফুল্ল ফুলডোর !

আজ ফুরায়েছে মোর সে পদ-চারণ ।
শেষ না হইতে পথ, বালুর পাথারে
সহসা নূপুর তব গুঞ্জরিতে নারে—
কণ্ঠাশ্লেষ ত্যজিল কি বাহু সে কারণ ?
জীবনের ঢালু-পথে বালুরে বারণ
কে করিবে ? প্রেম তবু ছাড়িবে কি তারে !

৩

তবু ব্যর্থ নহে জানি এ মোর সাধন ;
চঞ্চল চপল প্রিয়া চলে' গেল যদি,
সহিতে না পারি' মোর প্রেম নিরবধি,
সে নিতি অধর-রোধ, বাহুর বাঁধন,—
তবু সে যৌবন-যজ্ঞে তাপ উন্মাদন,
(এ শীর্ণ পল্বলে সেই উদ্বেল উদধি !)
সেই সোম মধুস্রবা—অমৃত-ওষধি—
ভুঞ্জেছি বিধির বিধি করিয়া শোধন !

একদা হরিনু তোমা যৌবনের রথে—
ক্ষয় করি' ক্ষুদ্র আয়ু রুদ্রবেগে তার ;
চুম্বন করেছি লঙিঘ' মৃত্যুর প্রাকার
তব ওষ্ঠ বহ্নিময়, স্বপ্ন-অবসথে !
হোক্ দেহ ভস্ম-শেষ আজি হেন মতে—
কামের অন্ত্যেষ্টি-মন্ত্রে পূত সে অঙ্গার !

প্রকাশ

আসন্ন-প্রভাত রাতি—মায়াময়ী ত্রিযামা রজনী ।
জাগর-সুষুপ্তি-স্বপ্ন—চেতনার ত্রিবিধ বিধান
বরিলাম একে একে ; আগে হ'ল জ্যোৎস্না-সুধাপান,
তারপর অন্ধকারে হারাইনু আকাশ অবনী ।
শেষ-যামে নেহারিনু একটি সে দিব্য দীপ-মণি
গাঢ় তমিস্রার কূলে ; সুপ্তি-ভঙ্গে মেলি' দু'নয়ান
আশ্বাসে চাহিয়াছিনু, হয় বুঝি নিশা-অবসান—
সুন্দরের জ্যোৎস্না-শেষে তারাটিরে মনে সত্য গণি' ।

অবশেষে আসে উষা—লাল হ'য়ে উঠে নভস্তল ;
তারো পরে, ভেদ করি' স্তরে স্তরে নির্মল নীলিমা—
উদিল আঁখির আগে দেবতাত্মা তুঙ্গ হিমাচল !
ঘুচিল সংশয়-মোহ—সত্য আর সুন্দরের ছল ;
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা ! সৎ শুধু প্রকাশ-মহিমা
প্রাণস্পর্শী বিরাটের ; তারি ধ্যানে সঁপিনু সকল ।

উপমা

মৃত্যুর বরণ নীল—শুনেছিনু কবে সে কোথায় !
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম ?
অথবা গরল-দ্যুতি হর-কণ্ঠে নয়নাভিরাম ?
উমার কপোলশোভী—সে কি নীল অলকের প্রায় ?
অতিদূর কূলে যথা তালীবন-রেখা দেখা যায়
নিবিড় আয়স-নীল—তেমনি সে আঁখির আরাম ?
কিম্বা সে কি দিক্‌প্রান্তে আচম্বিত বিদ্যুতের দাম
ভীষণ নিঃশব্দ-নীল ?—পরে সে অশনি গরজায় !

উপমা মনেরি খেলা, প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর ;
নীলাকাশ-তলে যথা সিন্ধু-জল নীল নিরন্তর,
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে !
সে নহে যমুনা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্য !—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর ।

গঙ্গাতীরে

বহুদিন পরে দাঁড়াইনু আজ গঙ্গার এই কূলে—
পল্লীপ্রান্তে, পথ হ'তে নামি' দিনের ভাবনা ভুলে' ।
জীবনের দিবা, যৌবন-বিভা—শীত-সায়াহ্ন-ম্লান,
শ্রান্ত পাঁথিকে তাই এ তীর্থ করিল কি আহ্বান ?

উঁচু পাড় বেয়ে নামিনু পিছল পদরেখা-পথ ধরি'—
একটি অশথ ঝুঁকে আছে যেথা ঘাটটিরে ছায়া করি'
ভাঙনের মুখে ধ্বসে' গেছে মাটি—নগ্ন বিপুল মূল,
তবু সে তেমনি আলো-ঝিল্‌মিল্ পল্লব-সমাকুল !

সম্মুখে হেরি ধারা অবিরাম ধুয়ে চলে দুই কূল—
যার মহিমায় সারা তটভূমি বারাণসী-সমতুল !
পিতৃগণের পরাণের তৃষা—তর্পণ অঞ্জলি—
এই অক্ষয় সলিল-বর্ষ্মে নিতি উঠে উচ্ছলি'।

নদী-বুকে হোথা পড়িয়াছে চর—চাষীরা দেখে না চেয়ে,
তাই কাশফুলে বিধবা-বেশিনী যেন সে কুমারী-মেয়ে !
উপরে নিবিড় নীলের বিথার, নিম্নে ভাঁটার টানে
নীরবে বহিছে খর-বেগ নদী, ঢেউ নাহি কোনখানে।

পা' দুটি ডুবায়ে বসিনু বিরলে বালুকার পৈঁঠায় ;
হেরি, খেয়াতরী—দূর পরপারে ঘাটগুলি দেখা যায়।
ছোট ছোট পথ নামিয়াছে জলে তীরতরু-ফাঁকে ফাঁকে,
কোথাও শীর্ণ সোপান-পংক্তি উঠিয়াছে থাকে-থাকে।

এপারে অদূরে তটের উপরে দাঁড়ায়ে যে তরুসারি—
ক্বচিৎ-কূজনে আরো সে গভীর মধুর-মৌনচারী !
শ্যাম তরুশিরে ক্লান্ত কিরণ ঝিমায় তন্দ্রাহত,
পল্লব-তলে ঘনায় আঁধার ছায়া-গোধূলির মত।

বেলা বেড়ে উঠে, ছায়া সরে' যায়—চেয়ে আছি পরপারে,
আজ নদীকূলে সহসা স্মরিনু জীবনের দেবতারে !—
যে-দেবতা মোর প্রাণের বিজনে জেগে আছে নিশিদিন,
অশ্রু-হাসির উদ্বেল গানে ছিল না যে উদাসীন।

যাঁর প্রসাদের প্রীতি-রস মোর জীবনের সম্বল,
যাঁর আঁখিপাতে মরুর মাঝারে মিলেছে উৎস-জল।
ইঙ্গিতে যাঁর বিলায়ে দিয়েছি যৌবন সুমধুর—
সুন্দর আর সত্যের লাগি' নিষ্ঠা সে নিষ্ঠুর !

পরশ-হরষে মজি নাই—তাই গেয়েছি দেহের গান,
জেগে র'ব বলি' করি নাই তা'র অধরের মধু পান !
রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে,
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে !

সেই বৈরাগী আজি এ প্রভাতে তেয়াগি' ছদ্মবেশ
গাহন করিতে চাহে ওই নীরে, আজ বুঝি ব্রত শেষ !
আর কিছু নয়, শুধু স্নানশেষে ওই অশথের তল—
গুঞ্জনহীন নিবিড় নীরব ছায়ালোক সুশীতল !

মথিতে চাহি না জলরাশি আর—করিবারে পারাপার,
তরঙ্গ-মুখে তরণী সঁপিয়া দুরন্ত অভিসার !
আজ শুয়ে র'ব সিকতার 'পরে বাহুতে নয়ন ঢাকি',
সব-ভুলে-যাওয়া অসীম আরাম পরাণে লইব মাখি' ।

দিনশেষে যবে আসিবে জোয়ার—যদি সেই কলনাদে
তন্দ্রা না টুটে, হয়ে যাই ক্রমে অচেতন অবসাদে,
তলাইয়া যাই কিছু না জানিতে জাহ্নবী-জলতলে !—
হায় রে, এমন সুখ-পরিণাম নরের ভাগ্যে ফলে ?

'অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি' আজিকে মাগিছে প্রাণ,
মনে হয় এই গঙ্গার কূলে আছে তারি সন্ধান ।
আজ বুঝিয়াছি, কেন অন্তিমে এই বালু-শয্যায়
আমার দেশের যত মহাজন নয়ন মুদিতে চায় !

মিনতি

১

"আর একটুকু ব'স গো বন্ধু, এখনি সন্ধ্যা হ'বে—
জ্যোৎস্নায় ভ'রে যাবে যে উঠান আমাদের উৎসবে !
ঊর্ধ্ব-আকাশে দশমীর চাঁদ—কাঁসার পাত্রখানি—
সোনার পালিশ পায় কোথা হ'তে—কি মন্ত্রে নাহি জানি
গোধূলি-লগনে আজ
তারাহার-গলে রাত্রি-রূপসী তাকায় ওড়না-মাঝ !

"বিষম রৌদ্র হবে না সহিতে, পথের তপ্ত বালু
আর দহিবে না তব পদতল, শুষ্ক হবে না তালু।
সারাদিনমান ললাটে তুমি যে বহিলে অনল-টীকা—
চন্দ্রের শ্বেত-চন্দনে সেথা আঁকিও তিলক-লিখা।
দগ্ধ-দিনের শেষে
স্নিগ্ধ শীতল নারিকেল-বারি পান কর হেথা এসে।

"তোমারি নিদেশে মিলিয়াছি মোরা মন্দির-চত্বরে—
সুন্দর করি' পেতেছি আসন—চির-সুন্দর তরে।
পূজার আবীরে ক্রীড়া-কুঙ্কুমে ভরেছি বরণ-ডালা,
কাপাস-তুলার সলিতায় হ'বে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা;
ধূপধূম-আঘ্রাণে
ঘুচিবে তোমার প্রাণের ক্লান্তি—ব'স ব'স এইখানে।"

২

"হায় গো বন্ধু, সে সুখ-আশায় নাহি মোর অধিকার—
চোরের মতন পলায়ে এসেছি খুলিয়া গৃহের দ্বার!
রৌদ্রের মদে হয়েছি মাতাল, গত রজনীর কথা
ভুলিয়া আছিনু—আরেক জনের অন্তিম আকুলতা!
রাত্রি দ্বি-প্রহরে
চ'লে যাবে সেও—জেগে ব'সে আছে শেষ চুমাটির তরে!

"স্বপনে হেরিনু কার ছায়া-ছবি, সে নহে আপন জনা—
বুকে যে ঘুমায় তাহারে ভুলিনু—এমনি উন্মাদনা!
নেশায় আকুল, বাহিরিনু পথে—তখনো হয় নি ভোর;
ধূলি-কঙ্করে খর রবিতাপে ভাঙে নাই ঘুম-ঘোর!
এখন নীরব সাঁঝে
কে যেন কপালে কাঁকন হানিছে—কানে সেই ধ্বনি বাজে!

"গগনের গায়ে এখনি ফুটিছে অগ্নি-অশ্রুকণা,
আর দেরী হ'লে পাব না দেখিতে, চাহিবারে মার্জনা।
দিবসে যুঝিনু অমৃতের আশে—সেও নহে মোর লাগি',
নিশীথে শুধিব জীবনের ঋণ মৃত্যু-বাসর জাগি'।
তোমরা করিও পান,—
একটি পেয়ালা পূর্ণ রাখিও, সেই মোর বহুমান।"

স্বপ্ন নহে

স্বপ্নহীন রাতি মোর। কৃষ্ণা-তিথি যবে,
না উদিতে জ্যোৎস্না আমি ঘুমাইয়া পড়ি ;
অর্দ্ধ-রাত্রে শয্যা 'পরে উঠি ধড়মড়ি'
শুনি, কে ডাকিছে যেন মৃদু আর্তরবে !
শীর্ণ দ্বাদশীর চন্দ্র হেরি নিম্ন-নভে,
বায়ুশ্বাসে ছায়া যত উঠিতেছে নড়ি'
সহসা উঠিল বাজি' দূরে কোথা ঘড়ি—
কই, কোথা ?—কেহ নাই ! বুঝি স্বপ্ন হবে

স্বপ্ন নহে ; ছায়ালোকে, এই স্তব্ধ ক্ষণে
অশরীরী ফিরে পায় শব্দের শরীর—
গানে যথা ধরা দেয় অ-ধর অধীর
কবির মনের মায়া! নিদ্রা-অচেতনে
কর্ণে তব স্পর্শ লভি শুধু কণ্ঠস্বনে,
তার বেশি চাওয়া বৃথা—বারণ বিধির !

অজ্ঞান

বিষে-ভরা যে অমৃত ধরিলে আমার মুখে
প্রভু মোর, প্রিয় !
আকণ্ঠ করিনু পান অকুণ্ঠিতে—হোক্ বিষ,
হোক্ সে অমিয় !
তারাস্তীর্ণ আকাশের তলে বসি', নিশীথের
নির্বাক আননে
পড়িনু সঙ্কেত-লিপি, হাহা-হাসি শুনিলাম
পবন-স্বননে !

তোমার বিপুল ছায়া—অনাদ্যন্ত-রহস্যের
ভ্রূকুটি ভীষণ—
নাম যার মহাকাল—পশ্চাতে রয়েছে জাগি',
জানি, অনুক্ষণ।
সম্মুখে হেরি যে তবু চন্দ্র-তারা-তিলকের
প্রেমচিহ্ন-আঁকা
অপরূপ রূপখানি—আঁখি দুটি অরুণিম,
ভুরু দুটি বাঁকা!

হেরি শুধু সেই রূপ—সমুখের সেই শোভা!—
পশ্চাতের ভয়
বিষদিগ্ধ হৃদয়ের তপ্তমধু-পিপাসারে
করিল না জয়;
শুধু সে সুরভি-স্বাদ—তব করধৃত সেই
অমৃত-মদিরা
ভুলাইল সর্ব্ব ভয়—মোহরসে মূরছিল
শিরা-উপশিরা।

মরণ মধুর হ'ল, জীবনের দিক হ'তে
ফিরাইনু মুখ;
প্রভু তুমি, প্রিয় তুমি!—বুকে মোর ভরি' দিলে
যে দহন-দুখ—
তোমার করুণ আঁখি সাধিল যে বিষ-মধু
করিবারে পান,
তাহারি অসীম জ্বালা পীরিতির সুখাবেশে
করিল অজ্ঞান!

যাত্রাশেষে

১

তুলিনু কত না ফুল পথে পথে ; কভু সে কঠিন
নিঠুর পাথর পায়ে বারে বারে হানিল নিষেধ—
তবু ঊর্ধ্বে আলোকের উৎস হেরি' করি নাই খেদ ;
ক্ষত পদ, নেত্রে তবু বুলায়েছি হর্ষে সারাদিন
হরিত শ্যামল নীল পীত শুভ্র লোহিত-রঙীন
ধরণীর অতুলন বরণ-বিথার ! করি' ভেদ
বায়ুস্তর, পশিয়াছে কানে মোর ধ্বনি অবিচ্ছেদ
আকাশ-কিনার হ'তে—চলেছিনু তাই শ্রান্তিহীন।

যত চলি, মনে হয় একই পথ—আদি-অন্ত নাই,
নব-নব আনন্দের কত তীর্থে হইনু অতিথি !
তবু সে রাখি না মনে, একমুখে পার হ'য়ে যাই
একটি আবেগে শুধু—মাঠ বাট নদী বন-বীথি !
পথ বাড়ে, বাড়ে বেলা—ছোট হয় ছায়ার আকৃতি,
বাহিরে আমিও চলি, প্রাণ তবু রহে এক ঠাঁই !

২

কত সন্ধ্যা কত উষা, কত সে মধ্যাহ্ন-দিবালোক
উদিল নিবিল, তবু করি নাই আঁধারের ভয় ;
শুক্লা-নিশি, তমস্বিনী—উভয়ের গাহিয়াছি জয়,
মৃত্যু আর জীবনের রচিয়াছি একই মঞ্জু শ্লোক।
বালক, কিশোর, যুবা—দেহ-দশা যেমনই সে হোক—
এক স্বপ্ন এক সুখ—এক দুখে সঁপিনু হৃদয় ;
চাহি নি পিছনে কভু, সম্মুখের দূর-পরিচয়
নিবারিতে মেলি নাই মোর আধ'-নিমীলিত চোখ।

বাহিয়া আসিনু পথ দূর হ'তে ভ্রমি' দূরান্তরে—
তবু সে আমারে ঘেরি' ছিল যেন একটি সে দেশ !
কত বর্ষ কত ঋতু ঘুরে গেছে কালচক্র' পরে,
মোর আয়ু ব্যাপিয়াছে ভাব-স্থির একটি নিমেষে ;
চোখে আছে সেই জল, সেই হাসি রয়েছে অধরে—
এ জীবন চিত্রবৎ—মূলে তার নাই গতি-লেশ !

৩

সহসা ফুরাল পথ, চমকিয়া হেরিনু সমুখে
বিরাট দিগন্ত-রোধী তমোময় কঠিন প্রাচীর—
অবকাশ নাহি কোথা, এক যেন ভিতর-বাহির,
থেমেছে জগৎ-যাত্রা স্তব্ধ-স্রোত মোহানার মুখে !
স্বপ্ন-সঞ্চরণ মাঝে যেন এ ললাট গেল ঠুকে
অচল পাষাণ-গাত্রে ; পদনিম্নে গহ্বর গভীর
হেরিলাম মহাভয়ে—বুঝিলাম একটুক থির
ছিল না আমারি চলা, আঘাত বাজিল তাই বুকে ।

আজ আমি থেমে গেছি, জগৎ থেমেছে মোর সাথে !
নাহি আর উদয়াস্ত, আলো-ছায়া, ঋতু-আবর্তন ;
থামিয়াছে কাল-চক্র—কেন্দ্র যার আছিল আমাতে,
নিজে ঘুরি' এক ঠাঁই ঘুরায়েছি যারে সারাক্ষণ ;
কালের মুখোস খুলি' মহাকাল দাঁড়াল সাক্ষাতে,
আজ বুঝি—কার নাম গতি, আর অগতি কেমন !

পঞ্চাশতম জন্মদিনে

আয়ু-বিহঙ্গ মেলিযাছে পাখা অর্দ্ধ-শতক আগে,
অসীম শোভার সৃষ্টির 'পরে উড়িয়াছে দিন রাত ;
আজি সে ক্লান্ত, পক্ষে তাহার জরার জড়িমা জাগে,
নয়ন মুদিয়া দিবস-নাথেরে করিতেছে প্রণিপাত।

এতদিন আমি আলোর পিপাসা জানি নি কাহারে বলে,
আমার আকাশ আমার ধরণী ছিল যে আলোয়-আলো !
নিম্ন-ভুবনে সে আলো এখন নামিছে অস্তাচলে—
ঊর্ধ্ব-গগনে তাই কি, বন্ধু, তারার প্রদীপ জ্বালো ?

তোমারে দেখেছি দিনের আলোয়, অপরূপ সুন্দর !
সে রূপ-সাগর অতল অকূল—দিগন্ত নাহি তার !
যে রূপ হেরিতে নিমেষ ফেলিতে পাই নাই অবসর—
আজি সেই শোভা ঢাকিবে কি ধীরে সন্ধ্যার আঁধিয়ার ?

যা পেয়েছি আর যা দিয়েছি আমি, সে স্মৃতির মঞ্জুষা
রতনে-হিরণে বাঁধিয়া রাখিনু গানের গাঁথনি দিয়া ;
ব্যথা নাই কোথা', ক্ষোভ নাই মোর—গড়েছি বুকের ভূষা,
কালফণী-শিরে আছিল যে মণি তাহাই মাজিয়া নিয়া।

আমার গানের সেই মালাখানি যদি কারো চোখে পড়ে—
হেরিবে তাহার অক্ষরাজিতে তোমারি সে নাম-মালা ;
তোমার কাননে যে ফুল ঝরিল আমার প্রাণের ঝড়ে,
রচি নাই মোর ফুলশেজ তায়—ভরেছি পূজার থালা।

সেই দিন মোর নিতেছে বিদায়, আসিল গোধূলি-বেলা—
দেউল-দুয়ার বন্ধ হবে যে প্রথম-প্রহর রাতে !
ক্ষণেক দাঁড়াও, শ্রী-অঙ্গে তব ছায়া-আলোকের খেলা—
আঁকি' ল'ব চোখে, অস্তরাগের সুকোমল রেখাপাতে।

জানি, তার পর অন্ধকারের স্বচ্ছ শীতল তলে
ভাসিয়া আসিবে সমীরের শ্বাসে সুরভিত সংবাদ,—
হায় গো বন্ধু, তোমার প্রেমের উজান যমুনা-জলে
আর নামিব না—শুনিব শুধুই সুদূরের কলনাদ ?

সবশেষে আর রহিবে না কিছু বাহির ভুবনে মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির সনে !
তবু যতখন জাগিব আঁধারে—রহিব নেশায় ভোর,
তোমারে দেখেছি—এই কথা শুধু জপিব পরাণপণে।

অধরের বেণু, বনমালা, আর পায়ের নূপুর-মণি—
সেই শিখি-চূড়া, পীতধটিখানি হেরিব না আর যবে,
তখনো বক্ষে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি
থামিবে না জানি—যতখন মুখে তারকারা চেয়ে রবে।

বাণীহারা

অমন করিয়া চেয়ো নাক' আর, করিও না কৌতুক,
আজ তোমা তরে আনিয়াছি মোর সবশেষ যৌতুক।
বাঁধি' ফুলহারে ও চারু কবরী,
লাল মোতিমালা পয়োধরে ধরি
ওই ভুরুযুগে বাঁকায়ো না, সখি, কামনার কার্মুক—
আজ, হাতে নয়—অধরে সঁপিব অন্তিম যৌতুক।

ও রূপ-সাগরে মিলাইয়া যাক্ এ বাণী-স্রোতস্বিনী,
সুপ্তি-নিশীথে বাজায়ো না আর কঙ্কণ-কিঙ্কণী।
যে বিষ-পাত্রে পিয়ালে অমিয়া,
তার ভয় আজি ভুলিয়াছি প্রিয়া!
এ মন-ভ্রমর ভ্রমিবে না আর, ঠাঁই তার লবে চিনি'—
আর কিবা কাজ বাজায়ে মধুরে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী?

আধেক রজনী ও রূপ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালি'
তব নয়নের কাজলের লাগি পাড়াইনু তায় কালি।
সে দীপ-বহ্নি আজ নিবে আসে,
সে কালি তোমার আঁখিতারা-পাশে
ঘনাইল কোন্ সাগরের নীল—মোর চোখে ঘুম ঢালি'!
আমি সে ঘুমের কাজল রচিনু প্রাণের প্রদীপ জ্বালি'!

চেয়ে তোমা পানে যামিনী হ'ল যে একটি পলকে ভোর!
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর।
আর রহিবে না রূপের পিপাসা,
এই বাণী মোর হবে যে বিপাশা—
হারইয়া যায় গানের মুকুতা খুলিয়া শ্লোকের ডোর!
এইবার, সখি, নিমেষ লভিবে অনিমেষ আঁখি মোর।

আলোর বন্যা নিঃশেষ হ'ল—কেটে গেছে কোজাগরী,
কুঞ্জে আমার শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।
ওগো অকরুণা মোহিনী চতুরা!
এখনো অধরে ধরিবে কি সুরা?—
শিশিরের মাসে ফুটাইবে কোন্ কামনার মঞ্জরী?
কুঞ্জে এখন শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।

রূপ-অন্ধের আঁখি যে রবে না চিরনিশি জাগরুক,
নূপুর কাঞ্চী কঙ্কণে আর ক্বণিবে না সুখ-দুখ।
আঁখি রাখি' ওই আঁখির তারায়
বুজি বা এবার চেতনা হারায়!
আজি অ-ধরার অধরের লাগি' সারা প্রাণ উৎসুক—
সে রসে বিবশ ঘুমাইবে মোর বাণীহারা সুখ-দুখ।

সার্থক

আজীবন বহিয়াছি কিসের পিপাসা
কোন বারি চেয়েছিনু, কিসের নিরাশা
আমারে করেছে কবি—আজও বুঝি নাই,
আমি শুধু গান গেয়ে যাই।
গন্ধ-ছন্দে গাঁথিয়াছি—অন্ধ মালাকর—
অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে শুধু কুসুমের স্তর,
প্রাণ মোর পরশ-কাতর।

ফুলবনে শুনিয়াছি মধুপ-গুঞ্জন,
পতঙ্গ-পাখীর গান; কি সুধা-ভুঞ্জন
করে তারা, কিবা সেই পায়স-ব্যঞ্জন
রবিরশ্মিবিচ্ছুরিত কাঞ্চনথালায়—
কি মধু ফুলের বুকে সদা উথলায়,
আজও বুঝি নাই,
আনন্দের স্বাদ নয়—শুধু গন্ধ পাই।

আজও বাহিরাই যার অভিসার-আশে,
আঁধার রজনীযোগে দুরন্ত বাতাসে
তিমির-তমালকুঞ্জে—হেরি নাই তারে!
এ অন্ধ নয়ন মোর সেই অন্ধকারে—
কালো সে কেশের মাঝে—হারাইয়া যায়,
শুনি, কে দু'খানি করে কাঁকন বাজায়!

সেই ছন্দে মুখ তার গড়ি' মনে মনে,
মন্ত্র পড়ি' প্রতিমার করি আরাধনা—
জানি না, সে হাসে কিনা অধরের কোণে,
আমারি পরাণে নিতি নব উন্মাদনা।

এমনি যাপিনু এই জীবন-যামিনী—
জানি না কিসের তরে' !—কে অভিমানিনী
জাগাইল সারারাত স্বপন-শয়নে,
আনন্দের বৃন্তহীন কুসুম-চয়নে !
হেরি নাই আজও তারে ; আছে শুধু আশা-
এই স্বপ্ন, এই স্নেহ, এ মোর পিপাসা
রাত্রিশেষে মুঞ্জরিবে কিরণে শিশিরে,
পুঞ্জে পুঞ্জে তৃণ-তরু-ব্রততীর শিরে।
হেরে নি যে-রূপ কভু আমার নয়ন,
সেই রূপ নেহারিবে কত-শত জন !
আমার নিশীথ-স্বপ্ন অপরের চোখে—
স্বপ্ন নয়—সত্য হবে দিনের আলোকে।

বিদেশী কবিতা

রাতের আঁধারে থাকে না আড়াল ভূতলে ও নভ-তলে
আকাশ-কুসুম দীপ হ'য়ে দোলে তটিনীর কালো জলে ;
রূপ, রঙ, রেখা মিশে গিয়ে শুধু ফুটে ওঠে প্রাণ-শিখা—
ছবি, না সে ছায়া ?—থাকে না সে চিন্ আলোকের উৎপলে ।

তেমনি, কত সে কবির মানসী বিথারি' বরণ-মায়া
মোর মানসের রূপার মুকুরে রচিল যে নব-কায়া—
সে কি আসলের নিখুঁত নকল ? কতটুকু রঙ কার ?
ভাবনা সে মিছে—এ যে নদীবুকে আকাশের আবছায়া !

নমস্কার

১

যেখানে যত আছে কবি ও গীতিকার—
যারা বা ছিল আগে, আসিবে যারা আর ;
মানব-কলভাষে বেদনা মধুময়
উথলি' তোলে যারা মরণে করি' জয় ;
চয়ন 'করে যারা নিজেরা নিশি জাগি'
স্বপন-ফুলশোভা নিমীল-আঁখি লাগি' ;
যাদের গীতিরাগে ধূলিরে ভালো লাগে—
তাদেরে নমি আমি নীরবে অনিবার।

২

চলেছি ভোর হ'তে সাঁঝের পুরীপানে
পথের শ্রম হরি' তাদেরি গানে গানে !
সে পথে চলে সাথে যতেক নরনারী,
তারা যা বোঝে না, সে বুঝিতে আমি পারি !
কেহ না কারে জানে, তবুও সুখে-দুখে
বাহুতে বাহু বাঁধি' চলেছে হাসিমুখে।
আমি সে ভালো জানি—প্রাণের কানাকানি,
গানেরি সুরে-গাঁথা ভুলের ফুলহার।

৩

সেই সে কবিকুল হেরিল আঁখি ভরি'
নিদাঘ-খরতাপে চাঁদিনী-বিভাবরী !
দেহের মনোভবে পরা'ল পারিজাত,
বিধির কবি-রূপে করিল প্রণিপাত।
সুখের দুখ-শ্লোক, শোকের সুখ-সুর
রচিয়া করে তারা মনের মোহ দূর।
ধরারি লয়ে মাটি গড়ে যে প্রতিমাটি—
সহজে পূজি তারে, বুঝি না নিরাকার।

৪

যাদের সামগানে জীবন-সোমযাগ
স্রবিয়া সুধারসে সবারে দিল ভাগ ;
যাদের বাণীময়ী দিঠি সে অনাবিলা
প্রচারে দিকে দিকে মধুর নরলীলা ;
ভরসা দিল প্রাণে—কোথাও নাহি পাপ,
নাহি এ আয়ুমূলে আদিম অভিশাপ,—
অতীত অনাগত, জীবিত যেথা যত,
সবারে নমি আমি নীরবে অনিবার।

আবেদন

(William Morris)

সঙ্গীতে গড়ি স্বর্গ, নরক—এমন শকতি নাই,
শঙ্কাহরণ সুরের সোহিনী খুঁজিও না মোর গানে ;
মরণের দ্রুত-চরণের ধ্বনি ভুলাইতে নাহি চাই,
যে-সুখ বারেক ফুরাইয়া গেছে, ফিরাইতে নারি প্রাণে।
শুকাব না কারো অশ্রু-পাথার আমার বীণার তানে,
আমার বাণীতে ঘুচিবে না কারো নিরাশা-অন্ধকার—
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

তবু, ভরা-সুখে হিয়ায় যেদিন হরষের অবসাদ—
নিঃশ্বাস ফেলি' বলিবে কেবলি, কিছুই হ'ল না, হায় !
যবে ধরণীর সবই মধুময়—প্রীতিপূজা-পরসাদ,
নিমেষ গণিতে মনে হবে, এযে বড় ত্বরা চলে' যায় !
মনে হবে, সুখ পলকে পলায়, আর না ফিরিয়া চায়,—
সেদিন, বন্ধু, আমার কথাটি মনে কোরো একবার,
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

কি কাজ আমার অন্যায় সাথে ন্যায়ের যুদ্ধ জিনে'?—
আমি স্বপনের ফসল ফলাই—এসেছিনু অবেলায় !
আমার এ গীতি-পতঙ্গ তার পাখা দুটি ফিন্‌ফিনে
মৃদুল হানিবে চন্দনে-গড়া জাফ্‌রির জানালায় !
দিবারাতি যারা আলসে কাটায়, সুখাসীন নিরালায়—
তাদের সকাশে রচিবে রাগিণী—বেলোয়ারী-রঙ্‌দার !
শূন্য-আসরে বসি' খেলা করে খেয়ালী এ বীণ্‌কার !

ধূলার উপরে আলিপনা আঁকি, মন্দেরে বলি ভালো—
ধরিও না দোষ, ভুল বুঝিও না—ক্ষমিও আমারে, ভাই !
চৌদিকে ঢেউ গরজে ভীষণ—নিকষের চেয়ে কালো !—
তারি মাঝখানে প্রবালের দ্বীপ শ্যামলে ভরিতে চাই !
জানি, কারো প্রাণে একতিল সুখ-সান্ত্বনা হেথা নাই—
দানব দলিতে চাই বাহুবল—নব বীর-অবতার !
—সে ত' নয় এই ভাঙা-আসরের দীন-হীন বীণ্‌কার !

কবি-গাথা

(Arthur O' Shaughnessy)

আমরা সবাই সঙ্গীত গড়ি—ছন্দের কারিকর,
স্বপন বয়ন করি যে আমরা—ভাবনারো অগোচর !
আমরা বেড়াই উর্ম্মিমুখর বিজন সিন্ধু-কূলে,
শ্মশান-বাহিনী নদীটির কূলে বসে' থাকি মনোভুলে—
পাণ্ডু-চাঁদের জ্যোছনা বিকাশে মোদের মুখের 'পর !
জগৎ আমরা বিলাইয়া দিই, আমরা লক্ষ্মীছাড়া !
আমরাই তবু চালাই তাহারে, আমরাই দিই নাড়া—
আমরাই যেন যুগ-যুগ এই জগতের নির্ভর !

অতি অপরূপ শাশ্বত সঙ্গীতে—
কত মহাপুরী নির্ম্মাণ করি ধূলিভরা ধরণীতে !
আমাদেরি গীতি-কাহিনীতে উদ্ভব—
অতি সুবিশাল জনপদ-গৌরব!
একজন শুধু একটি স্বপন হাতে করি' বাহিরিবে—
তাই দিয়ে সে যে রাজার মুকুট হেলায় করিবে জয় !
তিন জনে মিলি' একটি যে সুরে নব-গীত রচি' দিবে—
তারি আক্রোশে রাজ্য ও রাজা চরণে চূর্ণ হয় !

কবে কোন্ কালে—সে দিন হয়েছে অস্ত,
স্মরণ-অতীত পৃথিবীর ইতিহাসে—
হাহাকার দিয়ে গড়েছিনু মোরা পুরী সে ইন্দ্রপ্রস্থ,
স্বর্ণলঙ্কা-কৌতুকে পরিহাসে !
ধূলিসাৎ হ'ল তারা যে আবার—মোদেরি সে মন্তর ;
আমরা শুনাই বিগত-বাসরে ভাবিযুগ-জয়গাথা !
একটি স্বপন শেষ হয় যবে, এক সে যুগান্তর—
আবার তখনি নূতন স্বপনে ভরি' আসে আঁখিপাতা !

আমরা স্বপন করি যে বপন—নাহি তার অবসান !
মোরা নিরলস, চিরদিন নিরাময় !
ভবিষ্যতের ভাস্বর বিভা সমুখে দীপ্যমান—
ললাটে তাহারি টীকা সে জ্যোতির্ম্ময় !
প্রাণে আমাদের বাজে অহরহ সঙ্গীত সুমহান্—
ওগো জগতের নরনারী সমুদয় !
আমরা স্বপন করি যে বপন—নাহি তার অবসান !
স্থান আমাদের তোমাদের পাশে নয় !

আমরা দাঁড়াই—খসি' পড়ে যেথা আঁধারের নির্মোক,
সকলের আগে উদয়-দুয়ারে আমরা অর্ঘ আনি !
কণ্ঠ মোদের পার হয়ে যায় অসীম সে উষালোক—
গাই নির্ভীক, ছন্দ-ধনুতে ভীম টঙ্কার হানি'।
মানুষের হীন অবিশ্বাসের ভ্রূকুটিরে করি' জয়,
বিধাতার আশা পূর্ণ যে হবে—ওরে তার দেরি নাই !
তোরা পুরাতন জড়-পুত্তলি হয়ে যাবি ধূলিময়—
বার্তা সে ধ্রুব গগনে গগনে এখনি শুনিতে পাই !

যারা আসে সেই এখনো-অজানা দিবালোক-তট হ'তে,
তাদের সবারে প্রাণ খুলে' বলি—স্বাগত ! নমস্কার !
নিয়ে এস হেথা নব-বসন্ত, ভাসাও আলোর স্রোতে,
ধরারে সাজাও নবযৌবনা বধূবেশে আরবার !
নবীন কণ্ঠে গাও নব-গীতি—রাগিণী চমৎকার !
যে স্বপন মোরা এখনো দেখিনি, শোনাও তাহারি বাণী-
মোরা শিখি' লব, যদিও এ বীণা ভুলিয়াছে ঝঙ্কার,
স্বপন-দেখা এ আঁখিতে নামিছে ঘুমের পর্দাখানি ।

প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯

গদ্য ও পদ্য

(Austin Dobson)

গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা,
কিম্বা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধূলো-বালি,
শীতের ঠেলায় ঘরে যখন শার্সি-কবাট আঁটা,—
তখন ঘেমে হাঁপিয়ে কেসে' গদ্য লেখো খালি ।
কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি',
ঝুম্‌কো-লতা দুল্‌ছে দেখি বারান্দাটির পাশে,
চিকের ফাঁকে একখানি মুখ, ফুল্ল ফুলের ডালি—
তখন ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে ।

মগজ যখন বেজায় ভারি, যেন লোহার ভাঁটা !
বুদ্ধি ত' নয়—যেন সমান চারকোণা এক টালি !
মনটা যখন দাড়ির মতন ছুঁচ্‌লো-করে' ছাঁটা,—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ।
কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন-চতুরালি,
বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে,
কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী—
তখন, ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে ।

চাই যেখানে ভারিক্কে চাল—বিদ্যে বহুৎ ঘাঁটা !
'হ'তেই হবে,' 'কখ্‌খনো নয়'—তর্ক এবং গালি,
ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় 'কিন্তু'-যদি'র কাঁটা—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ।
কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল-কালি,
মিলন-লগন ঘনিয়ে আসে কনক-চাঁপার বাসে,
যে-কথা কেউ জান্‌বে নাকো, সেই কথা কয় আলি-
তখন, ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে ।

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি !—
তার তরে, ভাই বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ,
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
তখন, ওহো !—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে ।

সৃষ্টির আদিতে

"Before the Beginning of Years"
(A. C. Swinburne)

হ'ল যবে আয়োজন সৃষ্টির আদিতে,
মানুষের মর্মের ছাঁচখানি বাঁধিতে—
মহাকাল নিয়ে এল অশ্রুর ভর্‌না ;
চিরসাথী হইবারে দুখ দিল ধর্‌না ;
সুখ,—যার স্বাদ নাই বেদনার বিহনে,
মধুমাস নিয়ে এল ঝরাফুল পিছনে ;

স্বর্গের স্মৃতি—কিবা সুন্দর ধারণা !
—অন্তরে উন্মাদ, নরকের তাড়না !
বল,—তার বাহু নাই ধরিবারে প্রহরণ,
প্রণয়ের পুলকেতে পলকেরি শিহরণ।
দিবসের ছায়া—সেই নিশীথের নীল-রূপ,
জীবনের হাসিমুখে মৃত্যুরি বিদ্রূপ !

দেবতারা নিল তাই আগুনের ফুল্‌কি,
আর জল,—কপোলের ধারা সেই, ভুল কি ?
ধেয়ে চলে ঋতু-মাস—ঝরে বালি পা'য় পা'য়,
নিল তুলি' ত্বরা করি' তার দুই কণিকায় ;
সিন্ধুর ফেনা নিল—ভেসে আসে যেই সব,
আর নিল মেদিনীর শ্রমধূলি-বৈভব।
জন্ম ও মৃত্যুর ভাবী উৎসঙ্গে
যত আছে রূপ-রাগ—নিল সেই সঙ্গে।
সব সাথে মাখি' ল'য়ে হাসি আর ক্রন্দন,
বিদ্বেষ-পঙ্ক ও প্রীতি-ঘন চন্দন ;
সাম্‌নে ও পিছে ধরি' জীবনের ডঙ্কা,
ঊর্ধ্বে ও মহীতলে মৃত্যুর শঙ্কা ;—
শুধু এক দিন, আর একটি সে রাত-ভোর
গাঁথিবারে শক্তি ও ফুর্তির ফুল-ডোর—
দিয়ে দুখ নিদারুণ—পাষাণের ভার তায়,
গড়ি' দিল সুমহান্‌ মানবের আত্মায় !

ভরি' দিক্‌ আর দিক্‌-অন্ত, ধায় তারা যেন মহা-দ্বন্দ্বে ;
দেহ তার করে প্রাণবন্ত, ফুৎকারি' মুখে নাসারন্ধ্রে।
দিল ভাষা আর দিল দৃষ্টি—অপরের অন্তর ছলিতে ;
হ'ল কাজ অকাজের সৃষ্টি, আর পাপ—তাপে তার জ্বলিতে।
দিল দীপ—হরি' পথ-ভ্রান্তি, দিল প্রেম, প্রমোদের পর্ব ;
আর নিশা—নিশীথের শান্তি ; পরমায়ু, আর রূপ-গর্ব।
বাণী তার জ্বালাময় বিদ্যুৎ—দু' অধরে প্রকাশের বেদনা !
কামনা যে অন্ধ ও অদ্ভুত ! চোখে তার মরণের চেতনা !
রচে বাস—তবু চির-নগ্ন, দেহ ঢাকে ঘৃণারি সে বসনে ;
বোনে বীজ, ফসলের লগ্ন—ব্যর্থ যে, ভাগ নাই অশনে।
ঢুলে' ঢুলে' স্বপ্নে ও তন্দ্রায়, তার সারা আয়ু যায় ফুরায়ে—
ঘুম থেকে জেগে ফের ঘুম যায়, জীবনের জ্বর যায় জুড়ায়ে !

কালিকলম

নাগার্জুন

(George Sylvester Viereck)

জানি, তব কক্ষে আছে দুঃখের অনল-উৎস,
শ্যামশষ্প-বলয়িত সুখ-নির্ঝরিণী,
হে পৃথিবী মানব-মোহিনী !
প্রসারিত করপুটে ধরে' আছ জীবনের বিচিত্র যৌতুক—
রূপসীর মুখ-মধু, শরতের শতদল, লেলিহান চিতার কৌতুক!
আর বজ্র, জ্বলে' উঠে আচম্বিতে অগ্নিবিম্ব যাহে,
অদৃষ্টের অন্ধকার আকাশ-কটাহে !
তবু সে সকলি ফাঁকি !—সর্বজ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিধি
ঘুরিয়াছে এই মোর তৃপ্তিহীন হৃদি !
সিন্ধু-সরীসৃপসম লালায়িত বাসনার যত অনীকিনী
বাজায় মানব-চিত্তে ভেরী-তুরী, বেণু-বীণা, কনক-কিঙ্কিণী—
তারা যে গো দেখা দেয় সারি সারি, ছায়াময়ী কুহকিনী-প্রায়,
প্রিয়ার সে আঁখি-দীপে !—মুহুর্মুহু তারা মূরছায় ।
আরও এক আছে নারী—বঙ্কিম গ্রীবায় তার, কটিতটে, নগ্ন বাহুমূলে,
শঙ্কিত সঙ্কেত-সম দুটি তার বুকের বর্তুলে,
আঁকা আছে এ বিশ্বের যত আশা যত সে নিরাশা—
রূপে-লেখা অরূপের ভাষা !
একজন দেয় পাড়ি কত যুগ-যুগান্তের নীল পীত যবনিকা দ্রুত অপসারি'-
স্বপনের তুরঙ্গম—ভর করি' পাখায় তাহারি !
আর জনা, হেমন্তের সদ্যচ্ছিন্ন নীবার-মঞ্জরী—
তারি মত দেহ-গন্ধে শয্যাতল রাখিয়াছে ভরি' !
এর চেয়ে কিবা সুখ ?—মধুর, কষায় কোন্ পান-পাত্রখানি ।
ধরিবে আমার ওষ্ঠে হে ধরিত্রীরাণী ?—
আমি যে বেসেছি ভালো দুই জনে, সমান দোঁহারে—
বালাবধূ যশোধরা, বারাঙ্গনা বসন্তসেনারে !

ত্বরিতে উঠিয়া গেনু মন্ত্রবলে স্বরগের আলোক-তোরণে,
—প্রবেশিনু অকম্পিত নিঃশঙ্ক-চরণে ।
অমর-মিথুন যত মূরছিল মহাভয়ে—শ্লথ হ'ল প্রিয়-আলিঙ্গন,
কহিলাম—"ওগো দেব, ওগো দেবীগণ !
আমি সিদ্ধ-নাগার্জুন—জীবনের বীণাযন্ত্রে সকল মূর্ছনা
হানিয়াছি, এবে তাই আসিয়াছি করিতে অর্চনা

তোমাদের রতিরাগ ; দাও মোরে, দাও ত্বরা করি'
কামদুঘা সুরভির দুগ্ধধারা এই মোর করপাত্র ভরি' !"
—মানবী-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান,
অমৃত-পায়স তার মনে হ'ল ক্ষারকটু প্রলেহ-সমান !
জগৎ-ঈশ্বরে ডাকি' কহিলাম, "ওগো ভগবান !
কি করিব হেথা আমি?—তুমি থাক তোমার ভবনে,
আমি যাই ; যদি কভু বসিতাম তব সিংহাসনে,
সকল ঐশ্বর্য মোর লীলাইয়া নিতাম খেলা'য়ে—
বাঁকায়ে বিদ্যুৎ-ধনু, নভো-নাভি পূর্বমুখে হেলায় হেলা'য়ে
গড়িতাম ইচ্ছাসুখে নব নব লোক-লোকান্তর !
—তবু আমি চাহি না সে, তব রাজ্যে থাক তুমি চির-একেশ্বর ।
মোর ক্ষুধা মিটিয়াছে ; শশী সূর্য তোমার কন্দুক ?
আমারও খেলনা আছে—প্রেয়সীর সুচারু চুচুক !
স্তোত্র-স্তুতি ভোগ্য তব, তবু কহ, শুধাই তোমারে—
কভু কি বেসেছ ভালো—মুদিতাক্ষী যশোধরা, মদিরাক্ষী বসন্তসেনারে !"

এত বলি' নামিলাম বহু নিম্নে, অতিদূর নরক-গভীরে—
তপ্তস্রোতা বৈতরণী-নীরে ।
লাল নীল অগ্নিশিখা, প্রধূমিত বারিরাশি হয়ে গেনু পার,
উত্তরিনু বক্ষরক্ত-হিম-করা যেথা সেই মসীবর্ণ জমাট তুষার !—
বিশাল মণ্ডপে তার বার দেয় একা বসি' মার মহাবল ;
হেরিনু তাহার সেই পাদপীঠতল
স্কন্ধে তুলি' কাঁদিতেছে প্রেত সারে সারে !—
মানবের মৃত-আশা আঁকা সেথা কক্ষতলে ভস্মরেখাকারে !
শত শত রক্তরশ্মি দীপ-বর্তিকায়
ক্ষরিছে শোণিতবিন্দু দীর্ঘ শ্বাস-স্ফুরিত শিখায় !
ভালো যারা বাসিয়াছে, যুগে-যুগে যাপিয়াছে নিদ্রাহীন নিশা,
যারা চির-জ্বরাতুর বহিয়াছে সারা দেহে আমরণ নিদারুণ তৃষা—
তাদেরি সে প্রাণবহ্নি জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ মারের লোচনে !
অগ্রসরি' কহিলাম বিনম্র বচনে,
"হে বন্ধু, নরক-নাথ ! বিধির দোসর !
তোমার ব্যথার কাঁটা বিঁধিয়াছে আমারও পঞ্জর—
শত বিষ-বৃশ্চিকের মালা
পরিয়াছি কণ্ঠে মোর, সহিয়াছি তোমা সম কোটিকল্প নরকের জ্বালা !
আমি যে বেসেছি ভালো দুইজনে, সমান দোঁহারে—
শুভ্র-যূথী যশোধরা, নিশিপদ্ম বসন্তসেনারে !"

ক্ষুদ্র দেব-দেবতায় তেয়াগিয়া এই বার মহাশূন্যে করিনু প্রয়াণ,
ভেটিলাম মহাকালে ! কহিলাম নতশিরে, বিষণ্ণ বয়ান—
"কামের পূজারী আমি, হে মহেশ ! দেহযন্ত্রে করিয়াছি নাড়ীচক্র-ভেদ,
হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করি' শিখিয়াছি সুধাবিষ-মন্থনের মহা-আয়ুর্বেদ !
ধরার দুলালী যারা, দুইরূপে দুলায়েছে হৃদয়-হিন্দোলা—
পল্লীবালা সরোজিনী, আর সেই পুষ্পসেনী সুনীল-নিচোলা ।
দিকভ্রান্ত হয়ে তাই হারায়েছি পথ,
স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে কোনখানে পুরে নাই মোর মনোরথ ।
দাও বর—ডুবে যাই বিস্মৃতির অতল-পাথারে,
অথবা নূতন করি' গড়ি' দাও এই মোর পুরাতন প্রাণের আধারে—
দাও তারে হেন আবরণ,
সব হবে মনোময়—নাহি রবে স্নায়ু-শিরা-শোণিতের মর্ম-শিহরণ ;
হলাহল হবে সুধা,—সত্য হবে মিথ্যারই স্বরূপ ;
আর সেই পৃথ্বী-সুতা—আঁধারের উদূখলে দলি' তার দুই-দেহ-রূপ,
সেই চূর্ণ তেজোমুষ্টি মিলাইয়া এক নারী কর গো নির্মাণ—
আনন্দ-সুন্দর তনু, স্বপনের অতিথিনী, কামনার পূর্ণ প্রতিমান ।
ধন্য হ'ব সেইদিন, এক-রূপে ভুঞ্জিব দোঁহারে
কুলবধূ যশোধরা, বারবধূ বসন্তসেনারে ।"

কালিকলম, বৈশাখ ১৩৩৩

প্রেতপুরী

(George Sylvester Viereck)

শুয়ে আছি তোমার সকাশে
ক্লান্ত দেহ, নেত্রে তবু নিদ্রা নাহি আসে ।
হেরিতেছি, মদ্যসম আরক্তিম তব ওষ্ঠাধরে
পিপাসার শুষ্ক মরু'পরে,
ক্ষণে-ক্ষণে খেলিতেছে একটুকু হাস্য-মরীচিকা !
যেন কত শতাব্দীর অনির্বাণ শিখা

পাষাণ-প্রেয়সী-মুখে হয় নি বিলীন !
আজও ক্ষীণ রেখা তার হেরি' উদাসীন
তরুণ চারণ-কবি—বাউল প্রেমিক !
ধূলি-ঝড়ে দিগ্বিদিক্
অন্ধ যবে, পুরাতন পুরীর চত্বরে
এমনি সে হাসি যেন নিবে আসে রূপসীর অধর-পাথরে
যেন আর মনে নাই ধরণীর কোন দুঃখ সুখ,—
গীত আর লালসার মদালসে তবু তার হেসে ওঠে মুখ !

কত দিন-রজনীর—কত বরষের—
প্রেমিকের চাটুবাণী, অন্তহীন ছলনার ফের
দিব্যজ্ঞান দানিল তোমায়—
আশা নাই, তবু তব পিপাসার অবধি কোথায় !
এমনি ভাবিতেছিনু, কহি নাই কিছু—
সহসা হেরিনু, কারা চলিয়াছে আগু আর পিছু,
—বিগত দিনের তব অগণিত হৃদয়বল্লভ,
করিবারে বাসনার বাসন্তী-উৎসব
তব দেহ-ভোগবতী তীরে !—
আমারি মতন তারা পতি ছিল অন্তরে বাহিরে ?
তারা বুঝি হেরিয়াছে অচতুরা বালিকার রতি-বিহ্বলতা,
শঙ্কাহীনা নবীনার নব-নব পাতকের কীর্তিকুশলতা !
হেরি' উরসের যুগ্ম যৌবন-মঞ্জরী
যে-অনল সর্ব-অঙ্গে শিরায় সঞ্চরি'
মর্মগ্রন্থি মোর
দাহ করি', গড়ে পুনঃ সোহাগের স্নেহ-হেম-ডোর—
সে অনল-পরশের আশে
মোর মত দেখি তারা ঘুরে' ঘুরে' আসে তব পাশে !
বিলোল কবরী আর নীবিবন্ধ মাঝে
পেলব বঙ্কিম ঠাঁই যেথা যত রাজে—
খুঁজিয়া লয়েছে তারা সর্ব-অগ্রে,. ব্যগ্র জনে-জনে,
অতনুর তনু-তীর্থে, লাবণ্যের লীলা-নিকেতনে !

যত কিছু আদর-সোহাগ
শেষ করে' গেছে তারা ; মোর অনুরাগ—
চুম্বন, আশ্লেষ—সে যে তাহাদেরি পুরাতন রীতি,
বহু-কৃত প্রণয়ের হীন অনুকৃতি !

—জানি, আমি জানি,
সেদিনও যে এসেছিল মোর মত প্রেম-অভিমানী—
ল'য়ে তারও চুলগুলি
এমনি করেছে খেলা চম্পক-অঙ্গুলি।
আছিল কি আছিল না সে জন সুন্দর,
সে কথার দিও না উত্তর—
বৃথা এ জিজ্ঞাসা !
এমনি ছলনা করি' কেড়েছিলে নিত্য-নব নাগরের মিথ্যা ভালোবাসা !
আজি এ নিশায়,
মনে হয় তারা সব রহিয়াছে ঘেরিয়া তোমায়—
তোমার প্রণয়ী, মোর সতীর্থ যে তারা !
যত কিছু পান করি রূপ-রসধারা—
তারা পান করিয়াছে আগে,
সর্বশেষ ভাগে
তাদেরি প্রসাদ যেন ভুঞ্জিতেছি, হায় !
নাহি হেন ফুল-ফল কামনার কল্প-লতিকায়,
যার 'পরে পড়ে নাই আর কারো দশনের দাগ,
—আর কেহ হরে নাই যাহার পরাগ !
ওগো কাম-বধূ !
বল, বল, অনুচ্ছিষ্ট আছে আর এতটুকু মধু ?
রেখেছ কি আমার লাগিয়া সযতনে
মনোমঞ্জুষায় তব পিরীতির অরূপ-রতনে ?
আর কোনো অভিনব প্রেমের চাতুরী
—মন্দ-বিষ মোহের মাধুরী ?
অন্তরের অন্তঃপুরে সুনির্জন পূজার আগার
আছে হেন—আর কেহ করে নাই আজও অধিকার ?
কারো স্মৃতি দাঁড়াবে না দু'বাহু পসারি'
প্রবেশিব যবে সেথা আমি পান্থ, প্রেমের পূজারী ?

আমারও মিটেছে সাধ,
চিত্তে মোর নামিয়াছে বহুজন-তৃপ্তি-অবসাদ।
তাই, যবে চাই তোমাপানে—
দেখি, ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে
প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সদ্য-বলিদান !
—চুম্বনের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান !

যবে তোমা বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে—
অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়ামূর্তি ভাসে !
—দিকে দিকে প্রেতের প্রহরা !
ওগো নারী, অনিন্দিত কান্তি তব ! মরি মরি রূপের পসরা !-
তবু মনে হয়,
ও সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয় !

* * *

কামনা-অঙ্কুশঘাতে যেই পুনঃ হইনু বিকল,
অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল !
তীব্র সুখ-শিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মৃদু আর্তনাদে.
নীরব নিশীথে তারা হাহাস্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদে !

কল্লোল, অগ্রহায়ণ ১৩৩২

অন্তর-দাহ

(Stephan Mallarme)

আজ রাতে আসি নাই দেহ তব করিতে হরণ,
পিশাচী ! তোমার দেহে ত্রিলোকের পাপের লাঞ্ছনা—
আজ আমি ওই তব মুক্ত-কেশ স্রস্ত করিব না
উত্তপ্ত চুম্বন-ঝড়ে ; কর আজ মোরে বিতরণ
তোমার সে গাঢ় নিদ্রা, যার তলে হও বিস্মরণ
মুহূর্তে মনের গ্লানি—দুষ্কৃতির সকল শোচনা !
দাও মোরে সেই ঘুম, তুমি যার করেছ সাধনা—
সে মহা-বিস্মৃতি কেহ মরণেও করে না বরণ !

আমিও তোমারি মত কাম-রণে ক্লেদাক্ত বিজয়ী—
অসহ্য তাহার জ্বালা, কাল-চক্র নহে এত ক্রূর !
তবু তুমি পাপের সেই বিষ-দন্তে নাহি কর ভয়,
হৃদয় পাষাণ তব, উদাসিনী পাপীয়সী অয়ি !
আমি হেরি স্বপ্নে—মোর মরা-মুখ, ভীষণ পাণ্ডুর !
একাকী শুইতে তাই বড় ডরি, পাছে মৃত্যু হয় !

প্রেমহীন

(Rupert Brooke)

বলেছিনু মিছা-কথা—"আমি তোমা বড় ভালবাসি"।
প্রবল সাগর-বন্যা বহে না যে রুদ্ধ হ্রদ-জলে !
সে দুরূহ দুঃখ সহে—দেব, কিম্বা মূঢ় মর্ত্যবাসী
তোমা সম,—রুচি নাই সে নির্মল মধু-হলাহলে।
প্রেমী উঠে উর্ধ্ব-স্বর্গে—অতি-সুখে মূর্ছিত চেতনা,
প্রেমী নামে রসাতলে—উল্কাসম অগ্নিবেগবান্ !
আধ-আলো-অন্ধকার মধ্য-শূন্যে ভ্রমে কত জনা
কাঁদিয়া ছায়ার পিছে, নাহি জানে—এমনি অজ্ঞান—
ভালবাসে কি না বাসে ; বাসে যদি, কেবা সেই প্রিয়া !—
কাব্যের মানসী-বধূ, কিম্বা কোন চিত্রিত পুত্তল,
অথবা তামসী-ভালে নিজ-মুখ হেরি' মুগ্ধ হিয়া !
বড় একা-একা থাকে, ভালবাসে ভালবাসা-ছল ;
দুঃখ নাই, সুখও নাই—দিন কাটে মৃদু নিঃশ্বসিয়া !
আমিও তাদের দলে—প্রেম নাই, শুষ্ক হৃদিতল।

নিঠুরা-রূপসী

(John Keats)

১

আহা, কেন হেন ম্লান মুখ তব,
ওগো যুবা-বীর অশ্বারোহী ?
কেন একা হেথা ঘুরিয়া বেড়াও,
কেমন বেদনা বক্ষে বহি' ?

দেখ, শুকায়েছে কুমুদের দল,
পাখিদেরো গান যায় না শোনা ;
হাহা করে মাঠ—কাঠবিড়ালীও
কোটরে ভরেছে ক্ষেতের সোনা।

আহা, তুমি কেন এ-হেন সময়ে
        ঘুরিয়া বেড়াও অশ্বারোহী ?
দেহ হ'ল ক্ষীণ—বদন মলিন,
        কোন্ সে বেদনা বক্ষে বহি' ?

কেয়াফুল জিনি' পাণ্ডু ললাট
        জ্বরের শিশিরে ভিজিয়া ওঠে,
দুই গালে দেখি শুকায় গোলাপ—
        রক্তের আভা নাই যে মোটে!

২

আমি দেখেছিনু প্রান্তর-পথে
        সুন্দরী এক, পরীর পারা—
পিঠ-ভরা চুল, চরণ রাতুল,
        উদাস আকুল অক্ষিতারা !

তখনি তাহারে তুলিয়া লইনু
        এই ছুটন্ত ঘোড়ার 'পরে ;—
পাশ থেকে ঝুঁকে সমুখে হেলিয়া,
কালো কেশপাশ বাতাসে মেলিয়া,
সারা দিনমান গাহিল সে গান
        কপোত-করুণ কণ্ঠ-স্বরে ;
জানি না কেমনে কেটে গেল দিন
        চেয়ে তারি সেই বিম্বাধরে ।

ফুল বিনাইয়া কপালে পরানু,
        দু'হাতে পরানু ফুলের বালা,
ক্ষীণ কটিতটে নীবির বাঁধনে
        দুলাইয়া দিনু ঝুমুকা-মালা ;
মৃদু মধু-সুরে গুমরি' গুমরি'
        ভালবাসা-চোখে চাহিল বালা ।

মাটি থেকে তুলে' কত মিঠা-মূল,
        বন হতে আনি' জংলা মধু,
পায়স-পীযূষ পিয়া'ল আমারে

মোর সে মোহিনী রূপসী-বধূ ;
কি এক ভাষায় কুহরিল কানে
'বড় ভালবাসি তোমারে, বঁধু' !

নিয়ে গেল শেষে গিরিগুহাতলে—
ছোট্ট সে ঘর, পরীর বাসা ;
সেথায় আমারে বাহুপাশে বাঁধি'
কাঁদিয়া জানালো কি ভালবাসা !
ঢেকে দিনু শেষে চারিটি চুমায়
তার সে চাহনি সর্বনাশা ।

গান গেয়ে গেয়ে পাড়াইল ঘুম,
দেখিনু স্বপন ঘুমের ঘোরে—
হায় বিধি, হায় !—সেই হ'তে আর
দেখি নি স্বপন শীতের ভোরে !

দেখিনু স্বপন, যেন কত রাজা
কত রাজ-রথী, পুরুষ-বীর—
সবে শব-সম পাংশু-বদন,
চাহিয়া রয়েছে—পলক থির !

সহসা সকলে একসাথে যেন
কাতরে ডাকিয়া কহিল মোরে—
"নিঠুরা-রূপসী নারী কুহকিনী
বাঁধিয়াছে তোরে কুহক-ডোরে !"

সেই আবছায়া-আঁধারে তাদের
পিপাসা-অধীর ওষ্ঠাধরে,
ব্যাদান-বদনে, সে কি বিভীষিকা !
চমকি' জাগিনু তাহার পরে ।
সেই হ'তে দেখি, ঘুরিতেছি—হেথা
এই পথহীন তেপান্তরে ।

তাই একা-একা ঘুরিয়া বেড়াই
ম্লান ছায়াসম, শূন্যমনা—
যদিও শালুক শুকায়েছে কবে,
পাখিদেরো গান যায় না শোনা ।

শ্যালট-বাসিনী

(Alfred Lord Tennyson)

প্রথম পর্ব

নদীতীরে ক্ষেতগুলি যব সরিষার
ঢেকে আছে সারা ভুঁই এপার-ওপার—
যেন ছুঁয়ে আছে দূর আকাশ-কিনার,
একটি সে পথ গেছে মাঠের মাঝার
ক্যামেলট-শহরের পানে ;
প্রবাসী পথিক কত যায় আর আসে,
চেয়ে চেয়ে দেখে যেথা 'লিলি'গুলি হাসে-
শ্যালট নামে সে দ্বীপ—তারি চারিপাশে,
—দ্বীপটি নদীর মাঝখানে ।

'আস্‌পেন্‌' শিহরায়, 'উইলো' খনে-খনে
শাদা হয়ে যায় মৃদু বায়ুর বীজনে,
জলতলে কাঁটা দেয় কালো ঢেউ সনে,
বহে নদী নিরবধি আপনার মনে—
রাজপুরী ক্যামেলট-মুখে ।
চারিটি দেউড়ি আর চারিটি প্রাচীর,
সমুখে একটু জমি, ফুলেদের ভিড়—
শ্যালট-সুন্দরী থাকে শান্তি-সুনিবিড়
সে নিকুঞ্জে, দ্বীপটির বুকে ।

'উইলো'-বনে-ঢাকা তীর—কিনারাটি দিয়ে
বড় বুড় ভারি ভরা যায় বেয়ে নিয়ে
গুণ-টানা ঘোড়া ; কভু পান্‌সীর নেয়ে
ফুলায়ে চিকন পাল, দ্রুত তরী বেয়ে
চলে' যায় ক্যামেলট পানে ।
কেহ কি দেখেছ কভু হাতখানি তাঁর—
বাতায়নে দাঁড়াইতে শুধু একবার ?
শ্যালট-বাসিনী যিনি—সারা দেশটার
কেউ তাঁর পরিচয় জানে ?

শুধু যবে কৃষাণেরা বিহান-বেলায়
শীষে-ভরা যবগুলি কেটে থাক্ দ্যায়,
শোনে গান—জলে তার মাধুরী লুটায়,
নিরমল স্রোতখানি যবে বয়ে যায়
ঘুরে ঘুরে ক্যামেলট পানে।
দিনশেষে উঁচু মাঠে সাঁজের হাওয়ায়
আঁটিগুলি সাজাইতে চাঁদিনী-বেলায়,
'শ্যালটের পরী বুঝি ওই গান গায়'—
শুনে' তারা কয় কানে-কানে।

দ্বিতীয় পর্ব

সেইখানে বসে' সারা দিবস-রজনী
রঙীন সুতায় বোনে মায়ার বুননি ;
শুনেছে কি শাপ আছে—কিসের অশনি
পড়িবে তাহার শিরে, চাহিবে যেমনি
ক্যামেলট-পুরী যেই দিকে।
কি যে সেই অভিশাপ—গেছে সে পাসরি',
তাই শুধু বুনে' যায়—রঙের লহরী !
বড় একা থাকে সেথা শ্যালট-সুন্দরী
আলো করি' সেই ঘরটিকে।
বারোমাস টাঙানো সে দেয়ালের গায়
মুখোমুখি একখানি বড় আয়নায়
বাহিরের যত ছবি চমকিয়া যায় !
তারি মাঝে পথখানি দেখিবারে পায়—
ক্যামেলট পানে গেছে মাঠ ঘাট বেয়ে ;
তারি মাঝে পাক খায় ঘূর্ণী নদীর,
তারি মাঝে চোখে পড়ে চাষাদের ভিড়,
তারি মাঝে রাঙা-বাস গ্রামবাসিনীর
ফুটে ওঠে—হাটে যায় পসারিনী মেয়ে।

যুবতীরা চলে' যায়—প্রাণে কত সুখ,
মোহান্তর ঘোড়া ওই হাঁটে টুগবুগ্ ;
কভু বা কোঁকড়া-চুল রাখালের মুখ,
মাথায় বাব্‌রি, গায়ে লাল টুক্‌টুক্

জামা কভু—চাকরেরা ক্যামেলটে ধায় ।
কখনো সে আয়নার নীলাকাশ-তলে
ঘোড়া চড়ি' যায় বীর যুগলে যুগলে—
আহা, কোনো বীর কভু নারীপূজা-ছলে
রাখিবে না মনখানি তার দুটি পায় !

তবু সে বুনিতে সদা সাধ হয় বটে
আয়নার ছায়া-ছবি, যবে নদীতটে
শব লয়ে যায় রাতে দূর ক্যামেলটে—
সাথে কত রোশ্‌নাই, আকাশের পটে
মুকুটের চূড়া সারি-সারি ;
কিম্বা, যবে চাঁদ ওঠে মাথার উপর,
বিজনে বেড়াতে আসে নব বধূ-বর—
"ছায়া আর ছায়া দেখে প্রাণ জরজর !"
—কেঁদে কয় শ্যালট-কুমারী ।

তৃতীয় পর্ব

ঘর হ'তে এক রাশি—যেথা নদীপারে
পড়ে' আছে যবগুলি কাটা ভারে ভারে,
ঘোড়া চড়ি' ল্যান্সেলট তাহারি মাঝারে
চলেছেন, দু'পায়ের কবচে দু'ধারে
ঝলসিছে খর-রবিকর ।
হলুদ মাঠের বুকে ঢালখানি জ্বলে—
নারী এক আঁকা তায়, তারি পদতলে
যুবক সন্ন্যাসী-বীর শুধু পূজাছলে
জানু পাতি' আছে নিরন্তর ।

ঘোড়ার লাগামখানি মণি-মুকুতায়
ঝলকিছে—ছায়াপথে আকাশের গায়
যেমন তারার মালা চিকি-মিকি চায়,
সোনার ঘুঙুরগুলি বাজিতেছে তায়—
চলে বীর দূর ক্যামেলটে ।

কাঁধ হ'তে ঝুলে আছে কোমরে তাঁহার
ভারি এক রণভেরী—সবটা রূপার ;
সাঁজোয়ার সাজগুলি বাজে বারবার,
—শোনা যায় সুদূর শ্যালটে।

মেঘহারা নিরমল নীল নভ-তলে
জড়োয়া-জিনের 'পরে আলোক উছলে ;
মুকুট, মুকুট-চূড়া একসাথে জ্বলে,
একখানি শিখা যেন দিনের অনলে !—
ধায় বীর দূর ক্যামেলট ;
উড়ায়ে আলোক-শিখা উল্কা-যেন ধায়,
তারাময় নীল-নিশা লাল হয়ে যায় !
টেনে চলে একখানি আগুন-রেখায়,
—নদীবুকে ঘুমায় শ্যালট।

উদার ললাটে এসে পড়ে রবিকর,
ঝক্‌ঝকে খুর ঘোড়া চাপে ভূমি'পর ;
মুকুটের তলে যেন মসীর নির্ঝর—
ঢেউ-তোলা চুলগুলি পড়ে থর-থর,
—ধীরবর ধায় ক্যামেলটে।
সহসা ঝলসি' ওঠে মুকুর-তিমিরে
সেই ছবি দুই হ'য়ে, তীরে আর নীরে—
'তা-রা লা-রা'—লান্সেলট গায় নদীতীরে,
শ্যালটের বড় সে নিকটে।

বুনানি ফেলিয়া বালা তাঁত ছেড়ে উঠে
তিন পা বাড়ায়ে এল বাতায়নে ছুটে,
দেখিল সে জলতলে 'লিলি' আছে ফুটে,
দেখিল মুকুট, আর পালক মুকুটে—
আঁখি-পাখি ক্যামেলটে ধায়।
অমনি বুনানি ছিঁড়ে' উড়িল বাতাসে,
আয়না দুখান হয়ে ফাটিল দু'পাশে,
'এতদিনে'—কহে বালা প্রাণের হুতাশে,
'সেই বাজ পড়িল মাথায়' !

চতুর্থ পর্ব

অতি বেগে পূবে-হাওয়া স্বনিছে শ্বসিছে,
পীত-পাণ্ডু পাতাগুলি কাননে খসিছে,
কূলে কূলে কালো নদী কেঁদে উছসিছে,
নত-মেঘ ক্যামেলটে ঘন বরষিছে,
রাজপুরী যেন উদাসিনী !
একখানি তরী বাঁধা 'উইলো'-তরুতলে,
ধীরে ধীরে নেমে বালা তারি পানে চলে ;
লিখিল আপন হাতে তরণীর গলে—
'শ্যালট-বাসিনী' ।

যোগাবেশে যোগী যথা নেহারে আপন
নিদারুণ নিয়তির লীলা-সমাপন,
সেই মত—আভাহীন উদাস আনন—
দূর নদী-সীমা 'পরে তুলিয়া নয়ন
চাহিল বারেক বালা ক্যামেলট পানে ।
দিন-শেষে এল যবে বিদায়-গোধূলি,
শুইয়া তরণী' পরে রশি দিল খুলি'—
বিশাল নদীর বুকে তরী দুলি' দুলি'
ভেসে গেল স্রোত-মুখে বাতাসের টানে ।

তুষারের মত শাদা বসন তাহার
এদিক ওদিক উড়ে' পড়ে বারবার ;
টুপ্‌টাপ্ ফেলে পাতা তরু সারে-সার,
রিনি-রিনি করে রাতি, স্তব্ধ চারিধার—
ক্যামেলট পানে, হের, ভেসে যায় তরী ।
'উইলো'-ঘেরা উঁচু পাড়, ক্ষেত-খোলা দিয়ে,
তরী চলে এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ঘুরে গিয়ে ;
দুই তীরে যত লোক শোনে চমকিয়ে—
শেষ গান গায় আজ শ্যালট-সুন্দরী !

কে যেন গভীর সুরে করে স্তবগান—
কভু উচ্চ কণ্ঠ তার, কভু মৃদু তান !
ক্রমে রক্ত হিম হ'ল, দেহটি অসান,
আঁধার আঁধার হ'য়ে এল দু'নয়ান,

—তখনো তাকিয়ে আছে ক্যামেলট পানে।
এখনো তরীটি তার পড়েনি সাগরে ;
প্রথম যে বাড়িখানি জলের উপরে,
সেইখানে পহুঁছিয়া—সে নহে শহরে—
প্রাণটুকু শেষ হ'ল গানে।

দালান খিলান ছাদ গম্বুজ প্রাকার
সারি সারি বেড়িয়াছে নদীর কিনার ;
তারি তলে মৃত্যু-পাণ্ডু তনুখানি তার
ক্যামেলট পানে ভেসে চলে অনিবার—
কালো জলে শ্বেত-সরোজিনী !
ছুটে আসে নর-নারী নদীর সোপানে,
আসে ধনী, আসে মানী—চাহে তরীপানে,
গায়ে তার লেখা কি যে পড়ে সাবধানে—
'শ্যালট-বাসিনী'।

একি হেরি ! কেবা এই ! আসিল কেমনে ?
শতদীপ-আলোকিত রাজার ভবনে
থেমে গেল হাসি-গান, সভাসদ্‌গণে
সভয়ে দেবতা-নাম স্মরে মনে মনে,
—যত বীর রাজ-অনুচর।
বীরবর ল্যান্সেলট কি ভেবে না জানি,
কহিলেন অবশেষে—"বেশ মুখখানি !
বিভুর কৃপায় যেন শ্যালটের রাণী
শান্তি পায় মরণের পর।"

কালিকলম

ভাগবত-পাঠ

(জার্মান কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

শোন্ দেখি বাছা, দরজায় যেন কিসের শব্দ হয়—
এত রাত্তিরে কেন বা এমন নড়ে !
না গো, মা-জননী ! শব্দ ও কিছু নয়—
বাতাসের ডাক, দুয়ার কাঁপিছে ঝড়ে।

শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার !
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।—

"জেরুজালেমের যতেক যুবতী আজ রাতে ঘুমায়ো না,
বন-পথ বাহি' আসিছে বঁধুয়া—ওই যে যেতেছে শোনা !
পথের পাথরে—শুনি আমি,—তার চরণের ধ্বনি বাজে,
নিশার শিশির জমিয়াছে তার সুরভি-কেশের মাঝে।"

ওই শোন্ বাছা, বাড়ির ভিতরে মানুষের সাড়া পাই—
গুটি গুটি যেন সিঁড়ি বেয়ে কেউ আসে !
না গো, মা জননী ! কেহই কোথাও নাই,
ইঁদুর ছুটিছে, ঝিঁঝিরা ডাকিছে ঘাসে।
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার !
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।

"জেরুজালেমের যুবতীরা শোন,—আছে মোর বঁধুয়ার
নীল আঙুরের কুঞ্জ-বিতান, মধুর রসের সার !
পাণ্ডুবরণ আনার সেথায় ক্রমে হয় সিন্দূর,—
এ সব ছাড়িয়া পরাণ-বঁধুয়া আসিয়াছে এতদূর !"

ওরে বাছা, তোরে ভূত কি পিশাচে পাইয়াছে নিশ্চয়—
পায়ের শব্দ শুনি যে মেঝের 'পরে !
না গো, মা-জননী ! ভূতের সাধ্য নয়—
হয়তো সে কোন্ দেবতা এসেছে ঘরে !
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার !
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।—

" মম বল্লভ, হে বর-নাগর, চির-সুন্দর চোর !
আজি এ নিশীথে নিবারিতে নারি হিয়ার কাঁপনি মোর !
নিবিয়াছে দীপ, নিদ্রিত পুরী নিবিড় অন্ধকারে—
এ হেন সময়ে, রাজার প্রহরী ! ছাড়িয়া দিয়ো গো তারে !"

গান

(Christina Rossetti)

আমি মরে' গেলে, ওগো প্রিয়তম,
গেয়ো না কাতরে করুণ গান,
কবরে আমার দিয়ো না গোলাপ,
অথবা ঝাউয়ের ছায়া সে ম্লান !
নবীন দূর্বা আপনি দুলিবে
হিমকণা আর বৃষ্টিধারে—
মন চায়, রেখো অভাগীরে মনে,
মন নাহি চায়, ভুলিয়ো তারে !

এই আলো-ছায়া পড়িবে না চোখে,
গায়ে লাগিবে না বৃষ্টি-শীত,
রাতের পাখিটি গাবে সারারাত—
শুনিব না তার ব্যথার গীত ;
নাই কভু যার অস্ত-উদয়—
সেই গোধূলির স্বপন-বনে
হয়তো তোমারে ভুলে যাব, সখা,
হয়তো তোমারে পড়িবে মনে !

মনে রেখো

(ঐ)

আমারে রাখিও মনে, চলে' যবে যাব সেই দেশে—
যেথায় সকলি স্তব্ধ, নাহি কথা, নাহি গীত-গান ;
তখন ও হাতখানি এ হাতের পাবে না সন্ধান,
আমিও চলিতে গিয়ে থমকিয়া থামিব না হেসে।
এত যে মিলন-স্বপ্ন, সুখ-সাধ, সব যাবে ভেসে,
দিনে-দিনে গড়ে'-তোলা বাসনার হবে অবসান !
যখন সকল ভয়-ভাবনার ঘুচিবে নিদান,
তখন আমারে শুধু মনে রেখো—কঠিন নহে সে।

তবু যদি ভুলে গিয়ে, কিছুকাল পরে পুনরায়
সহসা স্মরণ কর—চিত্তে যেন নাহি হয় ক্লেশ ;
আমার এ দেহ যদি ততদিনে মাটি হয়ে যায়,
জেগে থাকে তবু তাহে এতটুকু চেতনার লেশ—
জেনো তবে—ব্যথা যদি পাও, সখা, স্মরিয়া আমায়,
ভুলিয়াই ভালো থেকো—সেই মোর সুখ যে অশেষ !

যদি

(ঐ)

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
পদ্মের বীজ জলতলে ফেলি' রব না বসি' ;
রোপণ করিব সেই ফুল শুধু আগুন-কোণে,
সদ্য যা ফুটে পড়িবে খসি' ।

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
শুনিব না আমি যেই গান গায় রাতের পাখি ;
দিনের আলোয় গান গায় যারা ঝটিকা-সনে,
তাহাদেরি সাথে উঠিব ডাকি' ।

আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
যদি আসে !—হায়, জীবনে এখন সকলি 'যদি' !—
ভাবিব না আর দূরের ভাবনা অন্যমনে,
বাঁধিতে চাব না স্রোতের নদী ।

দিন যায়, সে যে চলেই যায়,
হেসে খেলে তারে দিব বিদায়,—
আরবার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
জাগিয়া রহিব প্রথমাবধি ।

জন্মদিন

(ঐ)

আজি এ হৃদয় পাখিটির মত
গান গেয়ে কচি শাখায় দোলে,
আপেল-তরুর মতন আজি সে
ফলে-ফলে ডাল ভরিয়া তোলে !
যেন সে রঙীন ঝিনুক-তরীটি
বাহিছে নিথর নীল সাগর,
আজ মোর প্রাণে সুখ ধরে না যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর !

শয়নের বেদী উঁচু করে' বাঁধি
ফুলমালা তায় দুলায়ে দে,
সোনার সুতায় বোনা সে চাদরে
মুকুতা-ঝালর ঝুলায়ে দে !
আঁকি' তোল্ তায় পাখি-ফুল-ফল—
লতায় পাতায় সুমনোহর,
আজি এ প্রাণের জন্মতিথি যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর !

দুর্গম

(ঐ)

'সারা পথ কিগো এমনি উচল—উঠেছে পাহাড় বেয়ে ?'
—তাহাতে যে ভুল নাই !
'দীর্ঘ দিনেও ফুরাবে না পথ, চলিতে হবে কি ধেয়ে ?'
—সকাল হইতে সন্ধ্যা-নগাদ, ভাই !

'পথের অন্তে রাত্রিবাসের আছে কি পান্থশালা ?'
—আছে, আছে, যবে সন্ধ্যা নামিবে ধীরে।
'আঁধারে অন্ধ—খুঁজিয়া না পাই যদি সেই একচালা ?'
—হ'তেই পারে না, পাবে সে আবাসটিরে।

'আরো সে অনেক পান্থজনের পাব কি সে রাতে দেখা ?'
—আগে যারা গেছে তারাই সেথায় র'বে।
'ডাকিতে হবে, না—ঘা দিব দুয়ারে, বাহিরে দাঁড়ায়ে একা ?'
—দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকিতে কভু না হবে।

'দীর্ঘপথের ক্লান্ত পথিক—লভিব শান্তি-সুখ ?'
—সব দুঃখের অবসান সেই ঘরে।
'শয্যা সেথায় আছে কি বিছানো ঘুমাইতে এতটুক ?'
—যে আসে তাহারি তরে।

প্রেমের পাঠ

(Clemant Marot)

মনে বড় খুসী, মুখে বলে, না না,—
ভঙ্গি সে সুমধুর
সরলা বালারে বড় যে মানায়
তুমিও শেখ না তাইn
এমন সহজে রাজি হয়ে যাওয়া—
নয় সে যে ততদূর—
অর্থাৎ কিনা—একটু সে ইয়ে—
তুমিই বোঝ না, ভাই !

তা' বলে' ভেবো না, আমার পাওনা
ছেড়ে দেব একটুক্—
চুমো খেতে গিয়ে থেমে যাব শেষে
আমিও অর্ধপথে !
আমি শুধু চাই, তেমন সময়ে
ফেরাবে না বটে মুখ,
বলিবে তবুও—'আহা ও কি কর ?
হবে না সে কোনমতে !'

আমার প্রিয়তমা

(Heinrich Heine)

আমার প্রিয়তমার দুটি উজল আঁখিতারা,
বাখানি তা'য় কবিতা লিখি কত !
আমার প্রিয়তমার দুটি অধর 'চেরী'-পারা—
উপমা তারি রচিনু মনোমত ।

আমার প্রিয়তমার দুটি কপোল কমনীয়,
গেঁথেছি তারো শোভার সুধা-গীতি ;
হৃদয়, আহা, হইত যদি তেমনি রমণীয়—
দিতাম রচি' সনেট নিতি নিতি !

এমন রবে না

(ঐ)

এখন তোমার গাল দু'খানিতে
গোলাপের নব ফাগুন-রাগ,
বুকের মাঝারে সুকঠিন শীত,
সেথা বাস করে দারুণ মাঘ !
এর পর, সখি, এমন রবে না—
কালের কঠিন নিঠুর দাপে
গাল দুটি হবে শীত-জর্জর,
হৃদয় গলিবে সূর্যতাপে ।

দ্বিতীয় বার

(ঐ)

প্রথম প্রেমে যে পরাজয়ও ভাল !
—সে দুর্ভাগারে প্রণাম করি,
যদি সেই জন ফের প্রেম করে,
পায় না সেবারও—গলায় দড়ি !

আমি যে তেমনই মহান মূর্খ—
নিষ্ফল হ'নু দ্বিতীয় বার ;
রবি, শশী, তারা হেসে হ'ল সারা,
হাসে সে-ও—টুটে পরাণ যার

চরম দুঃখ

(ঐ)

চিরদিন সবে জ্বালালো আমারে,
সহিনু কত না অত্যাচার—
কেহ জ্বালায়েছে ভালবাসা দিয়ে,
কেহ শত্রুতা করেছে সার ।

জীবনের সুখ-শান্তির মাঝে
কেহ ঢালিয়াছে প্রেমের বিষ,
কেহ বা তাহারে করিয়াছে কটু
ঢালি' বিদ্বেষ অহর্নিশ ।

তবুও যে জন সবচেয়ে দুখ
দিয়াছে আমার এই প্রাণে—
ভালও বাসে নি, ঘৃণাও করে নি,
ফিরেও চাহে নি মুখপানে !

জীবন-মরণ

(ঐ)

এক্ষুনি ভাই জিন কসে' তুমি ঘোড়াটার পিঠে ওঠো,
মাঠ বাট বন পার হয়ে সেই রাজার পুরীতে ছোটো ।
সবেচেয়ে জোরে ছুটিতে যে পারে, সেই ঘোড়া বেছে নাও-
এই রাতে আজ এক্ষুনি সেই দূর পথে পাড়ি দাও !

সেথা পৌঁছিয়া অশ্বশালায় চলে যেয়ো চুপিসারে,
কিছুখন পরে কেহ বা তোমায় দেখিয়া ফেলিতে পারে ;
তখন তাহারে এই কথা শুধু কোরো ভাই জিজ্ঞাসা—
রাজকন্যার কোন্‌টির বিয়ে ?—ওইটুকু মোর আশা !

কালো চুল যার, সেইটির বিয়ে—এই কথা যদি বলে,
তা' হ'লে তখনি ছুটে চলে' এস, যত জোরে ঘোড়া চলে
আর যদি বলে, সেই কন্যার—সোনা হেন যার চুল,
ফিরে এস আর না-ই এস—দুই-ই মোর কাছে সমতুল !

তাই যদি হয়, আসিবার কালে কিনে এনো মোর তরে
একগাছি দড়ি, যে দড়ি মানুষে গলায় বাঁধিয়া মরে ।
করিও না ত্বরা, ফিরে এসো তুমি অতি ধীরে পথ চলি',
হাতে দিও শুধু সেই দড়িগাছি একটি কথা না বলি' ।

ঘোষণা

(ঐ)

সন্ধ্যার ঘোর ঘনায় অন্ধকারে,
সাগরে বাড়িছে জোয়ারের কলরব ;
সৈকত-ভূমে ব'সে আছি এক ধারে,
হেরিতেছি সাদা ঢেউয়েদের উৎসব ।
ক্রমে সে আমারো বক্ষ ফুলিয়া ওঠে
সিন্ধুর মত,—জাগে কোন্ ব্যাকুলতা ?
মন কার পানে অধীর হইয়া ছোটে,
বাড়িয়া উঠিল দারুণ বিরহ-ব্যথা !
সে যে তোমা লাগি', ওগো হৃদয়েশ্বরী !
তোমারি মুরতি হেরি যে আঁখির আগে ;
ওগো মায়াময়ী মর্ত্যের অপ্সরী !
ডাকিতেছ যেন আমারেই অনুরাগে !
বহে সব ঠাঁই সেই কণ্ঠের সঙ্গীত-সুরধুনী-
বায়ুর বাঁশীতে, জলের কলোচ্ছ্বাসে,
কান পাতি' সেই কণ্ঠের ধ্বনি শুনি
আমার বুকের মৃদুতর নিঃশ্বাসে !

নল-খাগ্‌ড়ার শীর্ণ কলমে লিখিনু বালুর তটে—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি',
সাগরের ঢেউ এমনি নিঠুর বটে—
মুছিয়া দিল তা' তখনি ছুটিয়া আসি' !
ওগো দুর্বল তৃণের লেখনী, বেলাভূমি বালুময়,
ওগো দয়াহীন উর্মির দল !—তোমাদেরে আর নয় !
আকাশের পট কালো হয়ে ওঠে যত,
হৃদয়ে আমার বাসনার বেগ তত ।
মনে হয়, ভাঙি' মহা-অরণ্য হ'তে
বনস্পতির শাখাটি দীর্ঘতম,—
ডুবাইয়া মুখ গিরির অনল-স্রোতে
করি' লই তারে অগ্নি-লেখনী মম !
লিখি তাই দিয়ে আকাশ-ললাটে, ভেদিয়া আঁধাররাশি-
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি ।'
যুগযুগান্ত নিশার আকাশে জ্বলিবে সে লেখা মোর,
আগুনের লেখা আঁধারে অনির্বাণ !
কোটি নরনারী পড়িবে হরষে ভোর—
স্বর্গ-তোরণে বাণী সে দীপ্যমান ;
তারাও পড়িবে, আজো যারা নয় ধরণীর অধিবাসী—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি ।'

প্রেমের স্বরূপ

(ঐ)

চায়ের টেবিলে বসি' কয়জনে
প্রেমের বিষয়ে কহিছে কথা ;
পুরুষেরা বাকি বসি' চুপচাপ,
মেয়েরা সকলে হাস্যরতা ।

কহিলা জনেক জন-হিতৈষী—
'সেই প্রেম— যাহা দহে না দেহ' !
পত্নী তাঁহার হাসি চাপিলেন,
তাঁর চেয়ে বেশি জানে কি কেহ ?

'ঘর-কর্‌নার সামিল না হ'লে
প্রেম লঘুপাক কখনো নয়'—
অধ্যাপকের এ কথা শুনিয়া
'বুঝায়ে বলুন'—ছাত্রী কয়।

হেনকালে কহে জমিদার-জায়া,
'প্রেম অসি-সম করাল ক্রূর' !—
স্বামীরে পেয়ালা আগাইয়া দিতে
গাল লাল হ'ল সেই বধূর।

তুমি যে সেদিন ছিলে না সেথায়
চেয়ে' মোর পানে ভাবের ভরে,-
দু'জনে নীরবে দিতাম বুঝায়ে
এত বকাবকি যাহার তরে !

গুপ্তকথা

(ঐ)

নয়নে অশ্রু, দীর্ঘনিশাস দেখিতে পাবে না আর,
মুখে হাসি নাই—সে শুধু হাসির রব ;
আমার প্রেমের গোপন-তত্ত্ব কে করে আবিষ্কার ?
কথায় ধরিয়া ফেলিবে—অসম্ভব !

দোল্‌নার ওই শিশুটি, অথবা যে জন কবরে আছে—
তারাও যদি বা দিতে পারে সংবাদ,
আরো যে গোপন, আরো অকথন সে কথা আমার কাছে,
—জীবনের সেই সুমহান অপরাধ !

কৈফিয়ৎ

(ঐ)

কেন যে গড়িনু এ-হেন বিশ্ব,
এমন জগৎ জ্যোতির্ময়—
শুনিবে কারণ?—প্রাণে জ্বলেছিল
কামনা-বহ্নি সুদুর্জয়।

সেই সে ব্যাধির বিষম তাড়নায়
শেষে ঘটাইল এই ব্যাপার
যেই সারা হ'ল—জ্বালা জুড়াইল,
হইনু নীরোগ নির্বিকার ।

পত্নীহারা

(William Barnes)

দেখতে যখন পাবই না আর
মুখখানি তোর, ঘর্‌কে গেলে—
বসব এখন বিজন-মাঠে
অশথ-তলায় দুই পা' মেলে ।
অশথ-তলায় কখ্‌খনো তুই
বসিস্‌ নি ত', সোনামণি !—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি !

পোষের শীতে উঠান্‌টিতে
রোদ পোয়াতিস্‌ আমার পাশে-
এবার থেকে ভোরের বেলায়
বস্‌ব গিয়ে ঠাণ্ডা ঘাসে ।
নিওর-ঝরা গাছের তলায়
আস্‌বি নে ত', সোনামণি !—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি !

খাবার বেলায় ঘরের দাওয়ায়
বাজ্‌বে না আর পৈঁছে কাঁকন,
ভাত ক'টি তাই গামছা পেতে
মাঠের ধারেই খাব এখন ;
মাঠের ধারে ভাত বেড়ে তুই
দিতিস্‌ নে ত', সোনামণি—
সেথায় ত' নেই দেখার আশা,
ঘর্‌কে গেলেই বোকা বনি !

সাঁজের বেলায় আর কে শোনায়
ঠাকুরদের সে নামের পালা ?
এখন আমি একাই ডাকি—
হয় না সে ডাক পরাণ-ঢালা ।
বলি, ঠাকুর! আর কতদিন ?
—পাঠাও মোরে ঐ আকাশে,
হোথায় আছে সোনামণি—
আর কতদিন রয় একা সে !

মরা-মা

(Robert Buchanon)

ঘুমিয়েছিলাম বড় গভীর ঘুমের ঘোরে,
শ্মশান-ঘাটে, নদীর দিকে শিয়র করে' ।
ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে,
জলের ছলচ্ছলধ্বনির কলস্বনে ।
দুপুর রাতে সেই শাড়ী আর সেই সিঁদুরে,
জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কান্না দূরে !
মেয়ে কাঁদে !—আমার নন্দরাণীর গলা !—
কি যে করুণ কাতর স্বরে—যায় না বলা ।
'মাগো আমার ! আজকে রাতে আয় না মা গো !
এক্‌লা আছি, কেউ কাছে নেই—দেখে যা গো !
কেউ করে না—একটু এসে আদর কর,
আর-একটা যে মা এয়েছে নতুনতর !
অন্ধকারে একলা শুয়ে ভয় যে করে,
নেই বিছানা, হয না যে ঘুম অন্ধকারে !
পেট জ্বলে মা, দিনে-রাতে ক্ষুধায় মরি—
কেমন করে' বল্ না মাগো, ঘুমিয়ে পড়ি !'
অসাড় অঘোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে,
কান্না শুনে সে-ঘুম ভাঙে শ্মশান-ভূমে !

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
ঘুমিয়েছিলাম—আবার দেখি নয়ন খুলে'—

আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন ?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদছে যেন !
গেলাম হেঁটে, শীর্ণমুখে ঘোম্‌টা তুলে'
বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিড়কি খুলে' ।।
ঘরখানাতে ঘুট্‌ঘুটে কি অন্ধকার !—
তাইতে তবু শাদা দেখায় মুখ আমার !
'ওমা মাগো !—এই যে তোমার পেইছি দেখা !—
ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে একা !
মুখে তোমার রক্ত যে নেই, চোখ যে ঘুমায় !'—
ভয় গেল তার—একটু হাসি, একটি চুমায় ।
মাথায় দিলাম হাত বুলিয়ে—গান শুনিয়ে
ছড়ার সুরে, দিলাম দোলা বক্ষে নিয়ে ।
'এম্‌নি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো !
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো !'
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ'ল,
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল !

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
নন্দা আছে বুকের উপর মুখটি থুয়ে ।
মুখখানিতে রক্ত যে নেই একটুখানি—
তবু কেমন ঘুমিয়ে হাসে, নন্দরাণী !
এমন সময় শিশুর করুণ কাতর স্বরে
ঘুম ভেঙে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে !
সে যে আমার ছেলের গলা—আমায় ডাকে !—
ন্যাওটো ছেলে পঞ্চু যে তার ডাক্‌ছে মাকে !
'ওরা মারে, গায়ে আমার বড্ড ব্যথা !
দুষ্টু বলে' গাল দি' ওদের—সত্যি কথা !
দেয় না খেতে, ক্ষুধায় জ্বলি দিবস রাতি,
ইচ্ছে করে পালাই কোথায়—নেই যে সাথী !'
ঘুমিয়ে ছিলাম স্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে,
ভাঙ্‌ল তবু সে ঘুম আমার, শ্মশান-ভূমে ।

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
ঘুমিয়েছিলাম, আবার দেখি নয়ন খুলে'—
আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন ?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদছে যেন !

গেলাম হেঁটে, শীর্ণমুখে ঘোমটা তুলে,
বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিল্‌টি খুলে'।
'ওমা মাগো! এই যে তোমার পেইছি দেখা!
ভয় করে না তোমার পানে চাইতে একা।
নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালের 'পরে—
বড় কাহিল, অবশ দেহ ব্যথার ভরে!'
শক্ত ছেলে, ভয় পেলে না—উঠ্‌ল হেসে,
আহ্লাদে হাত বুলিয়ে দিলাম রুক্ষ কেশে।
বুকে তুলে দুই গালে তার দিলাম চুমো,
গানের সুরে কইনু তারে, এবার ঘুমো।
'অম্‌নি করে' গুনগুনিয়ে গাও না মাগো!
ঘুম এসেছে—চক্ষে যে আর দেখছি না গো!'
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপতে হ'ল,
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল!

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
ছেলে, মেয়ে—এক বুকেতে ঘুমায় দু'য়ে।
ঘুমিয়েছিলাম—হঠাৎ জেগে ভয় যেন পাই!
আর দুটিরে ঘুম থেকে আর জাগাই নি তাই।
কচি ছেলের কান্না শুনি অন্ধকারে—
বড় করুণ কাতর স্বরে ডাকছে কারে?
ও যে আমার কোলের ছেলে খোকার গলা!—
কাঁদন শুনে' উঠ্‌ল ঠেলে বুকের তলা।
কেউ দেখে না, নেয় না কোলে—বাছা আমার!
মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে বাঁচে না আর!
ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিল্‌টি খুলে,
দেখি, খোকন শুকিয়ে গেছে—নিলাম তুলে।
কত করে' থামল বাছার ফুঁপিয়ে-ওঠা—
মুখে দিলাম হাড়-বেরোনো বুকের বোঁটা!
সেই রাঙা-চাঁদ দিচ্ছে উঁকি আকাশ থেকে—
পাংশু হ'ল আমার চাঁদের সে মুখ দেখে!
চুমায় চুমায় কান্না তখন চাপতে হ'ল,
খোকন আমার ঘুমিয়ে প'ল, ঘুমিয়ে প'ল!

ঘুমিয়ে প'ল—নেতিয়ে প'ল—আর সাড়া নেই,
শুইয়ে দিলাম মেঝের উপর অন্ধকারেই!

হাত পা' গুলি সমান করে' দিলাম রেখে,
গায়ের উপর দোলাইখানি দিলাম ঢেকে।
ছুটে দেখি, আরেক ঘরে স্বামীর পাশে
সতীন ঘুমায়—তারই কেবল ঘুম না আসে!
দেখেই আমায় চিন্‌লে, তবু লাগল ধাঁধাঁ—
সেই আঁধারে মুখ যে আমার দেখায় সাদা!
চোখে-চোখে যেমন চাওয়া—কী চীৎকার!
জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তার।
চুপে চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে,
খানিক পরেই খোকায় তারা সেথায় আনে।
বড় দু'জন দুই পাশেতে—কাছে কাছে,
খোকন আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে।
আমরা সবাই ঘুমাই জলের কলস্বনে,
ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে!

প্রবাসী, মাঘ ১৩৩০

খেলনা

(Conventry Patmore)

আমার শিশু-পুত্রটিকে শাসন করি যতই,
এমন করে' থাকবে চেয়ে—বিজ্ঞ যেন কতই!
বারণ করি করতে যেটি, করবে সেটি আগে—
দিলাম জোরে চড় বসিয়ে হঠাৎ সেদিন রাগে;
তাড়িয়ে দিলাম সামনে থেকে, গালও দিলাম কত,
শেষে আবার দিলাম নাক' চুমা, আগের মত।
মা-হারা সে, মায়ের আদর পায় না সে ত আর—
ভাবনা হ'ল, আজকে বোধ হয় মনের দুখে ঘুম হবে না তার।

গেলাম চুপে খোকার শোবার ঘরে;
গিয়ে দেখি, ঘুমায় বাছা—ফুঁপিয়ে কাঁদার পরে
চোখের পাতা একটু ভারি, রোমগুলি তার ভিজে!
ব্যথার ভরে গুম্‌রে উঠে' নিজে—

চুমায় সে চোখ মুছিয়ে দিতে, আপন চোখের জল
সেইখানেতে পড়ল ঝ'রে—মুছিয়ে দেওয়া হ'ল যে নিষ্ফল।
দেখি, খোকন শিয়র হ'তে হাত-নাগালে টেনে টেবিলটাকে,
সাজিয়েছে তার খেলনাগুলি তারি উপর যত্নে থাকে-থাকে,—
দেশালায়ের খালি বাক্স, শিরা-আঁকা নুড়ি-পাথর দুটি,
কালো কাচের গুটি,
গোটাকয়েক রঙীন ঝিনুক, শিশি'র মুখে ফুল,
একটি নতুন পাই-পয়সা—তার চোখে সে রত্ন-সমতুল !—
এই সব সে সাজিয়েছিল একটুখানি শান্তি পাবার তরে।

সেদিন রাতে উপাসনার পরে,
বল্‌লাম কেঁদে, 'ওগো পিতা, পরম স্নেহময় !
এই দুনিয়ায় খেলার শেষে আস্‌বে যখন সেদিন সুনিশ্চয়—
মরণ-ঘুমে সংজ্ঞাহারা করব না আর তোমায় জ্বালাতন,
পড়বে যখন তোমার মনে—করেছিলাম সুখের আয়োজন
তুচ্ছ যে সব খেলনা দিয়ে ! শ্রেষ্ঠ সুকল্যাণ
তোমার আদেশ ভুলেছিলাম—এমনই অজ্ঞান !—
তখন তুমি, তোমার হাতের ধূলোয়-গড়া এই অধমের দেহে
দিয়েছিলে যেটুক্—তারো অনেক বেশি স্নেহে
অবোধ তোমার সন্তানেরে করবে ক্ষমা, জানি ;
আজ বুঝেছি, পিতার প্রাণের প্রেম সে কতখানি।
ঘুমন্ত মুখ দেখে সেদিন বল্‌তে হবে তোমায়—
'খেলার ঝোঁকে ভুল করেছে, আহা, বাছা এখন কেমন ঘুমায় !'

অন্ধ কবি

(Kohlil Gibran)

আলোকে যে অন্ধ আমি !—দীপ্ত দিবাকর
আমারে দানিল নিশা, গভীর তামসী—
স্বপনের চেয়ে নীল মোর নীলাম্বর।
তবু আমি পথ চলি সুদূরের লাগি',
তোমরা রয়েছ বাঁধা জন্মগৃহ-কোণে—
মরণের আগে আর হবে না বিবাগী।

হাতে শুধু এই 'নড়ি', বাহুতে বেহালা—
এই দিয়ে পথ খুঁজি অগম-গহনে,
তোমরা ত' ঘরে থাক—করে জপমালা !

যে পথে দিনেও যেতে ডরিবে সবাই—
সে পথে আঁধারে আমি একা বাহিরাই,
—আমি গান গাই ।

পা' যদি উচল-পথে বাধে বার বার,
গান তবু পাখা মেলে উড়িবে সদাই !

অথই পাথার তলে, উর্ধ্ব-নীলিমায়
চেয়ে চেয়ে—আঁখি মোর আর নাহি পারে !
তবু তায় খেদ কিবা—যদি অসীমায়
চোখ চলে, বাধা পেয়ে সীমার আঁধারে !
উষার উদয় লাগি' কেবা নাহি চায়
নিবাইতে দুটি ক্ষীণ প্রদীপ-শিখারে ?

তোমরা বলিবে—'আহা, ও যে আঁখিহারা !—
মাঠে এত ফুল ফোটে, ও কি জানে তার ?
কখনো হেরে নি ও' যে গগনের তারা ।'
আমি বলি, 'আহা, ওরা বড় অভাজন !—
বসিতে না পায় কভু তারার আসরে,
ফুলেদের ভাষা কভু করেনি শ্রবণ !

ওরা শুধু কাণে শোনে, প্রাণে শোনে না যে !
—আঙুলে পরশ আছে, নাহি শিহরণ ।'

শরাবখানা

(সূফী কবিতা)

আহা সে তরুণী তর্ করে দিল্ ! মদ বেচে কিনা-
সে যে কাফেরের মেয়ে !
তারি সন্ধানে শুঁড়িপাড়া পানে যেতেছিনু কাল
গুন্ গুন্ গান গেয়ে ।

মোড় ফিরে দেখি, আসে মোর কাছে সুন্দরী হুরী—
ছিপ-ছিপে এক ছুঁড়ী,
বেইমান পারা !—গোছা-এলোচুল পৈতার মত
পড়িয়াছে বুক জুড়ি' !

কহিনু ডাকিয়া, "কে গো তুমি, হাঁ গা? ও ভুরু-ভঙ্গে
বাঁকা-চাঁদ পায় লাজ !
কোথায় আসিনু? এটা কোন্ পাড়া ? কোথা থাক তুমি,
নারীদের মম্‌তাজ !"
কহে সুন্দরী, "কাঁধে পর' দেখি কাফেরের সুতা,
ফেলে দাও জপমালা !
পেয়ালায় মদ ভরপুর পিও, চলে এস ভেঙে
ধর্ম্মের আটচালা !
চুর হয়ে শেষে চুমাটি বাড়াও, গালে গাল দিয়ে
কথা ক'ব কানে-কানে,
—একটি সে কথা, জান্ তর্ হ'য়ে তরে' যাবে তায়,
যদি বোঝ তার মানে !"

দিল্ খুলে' গেল, ফূর্তির বেগে বেব্‌ভুল হয়ে,
গেনু তার পিছু-পিছু—
এক লহমায় ছুটিল সেথায় ধরম-শরম
ছিল মোর যত-কিছু !
একটু তফাতে বসে' আছে দেখি ইয়ারের দল
একদম মাতোয়ারা !—
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁশ—প্রাণ ভরে' পিয়ে
পীরিতির রসধারা !
নাই করতাল, বেহালা, সারং—মজ্‌লিসে তবু
হাসি-গান কম নাই !
বোতাল, গেলাস, মদ দেখি না যে—তবু ঢালে, আর
পান করে একজাই !

মনের বাঁধন-দড়িটি যখন হাত হ'তে শেষ
খসে' গেল একেবারে,
শুধা'তে চাহিনু একটি বচন, নিবারিল মোরে—
'চুপ কর'-ঝঙ্কারে !
বলে, 'ঠেলা দিলে অমনি খুলিবে—এ ত' নয় সেই
মন্দির চারকোণা !

মস্‌জিদও নয়,—হুড়াহুড়ি করি' ঢুকিবে হেথায়,
নাই থাক জানা-শোনা !
অবিশ্বাসীর আসর এটা যে—সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার,
সুরু হ'তে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলি—
অবাক্ চমৎকার !
পূজা-নমাজের ঘর ছেড়ে দিয়ে বসে' পড় হেথা
শরাবখানার মাঝে,
খুলে ফেলে ওই দরবেশ-বেশ, সাজ দেখি এই
ফূর্তিবাজের সাজে !—

করিলাম তাই ! চাও যদি, ভাই, আমারি মতন
দিল্‌খানা লালে-লাল,
এক-ফোঁটা এই খাঁটির লাগিয়া, খোয়াও সকলে
ইহকাল পরকাল !

ভাবতী, চৈত্র ১৩৩০

গজল

(জালাল-উদ্দীন রুমি)

নিজেরে নিজেই জানিনা যখন
জানিব কেমনে, কে ভগবান ?
নই খৃষ্টান, ইহুদাও নই,
কাফের কিম্বা মুসলমান।

পূব-পশ্চিম, সাগর-নগর—
কোথাও আমার নাই যে রে ঘর,
কেহ জ্ঞাতি নয়— মর কি অমর,
ক্ষিতি তেজ কিবা মরুৎ সলিলে গড়েনি আমার এ দেহখান

জন্ম আমার নয় কোনখানে—
রুম, মহাচীন, কিবা শক্‌সানে,
ইরাকে সে নয়, নয় খোরাসানে,
হিন্দুর দেশ, সেখানেও নয়—সিন্ধু যেখানে প্রবহমান।

ইহলোকে কিবা পরলোকে ঠাঁই—
স্বর্গ-নরক মোর তরে নাই,
নই সন্তান আদমের—তাই
স্বর্গ হইতে করে নাই দূর, করেনি আমারে সে অপমান।

নাই যার চিন্, নাই নির্দেশ—
লোকাতীত লোক—সেই মোর দেশ!
দেহ-বিদেহের ত্যজি' দুই বেশ
বন্ধুর বুকে বাস করি আমি, চিরযৌবনে জ্যোতিষ্মান!

ফার্সি ফরাস

(ফার্সির ইংরাজী হইতে)

রুবাই-গুচ্ছ

১

যে পথেই হোক—তোমারে যে খোঁজে, ধন্য চরণ তার
তব রূপ যার ধেয়ানের ধন—ধন্য ধরণ তার!
ধন্য সে আঁখি—অনিমেষ হয় তোমার আননে চেয়ে!
যে বাণী তোমায় করে গো বরণ—ধন্য ক্ষরণ তার!

২

পেয়ালা শরাব কি হবে আমার? তুমি-মদ মোরে মাতাল করে,
আমি যে কেবল তোমারি শিকার—আর কোন্ ফাঁদ আমায় ধরে!
কাবা-ঘর আর মন্দিরে মঠে বৃথাই তোমায় খোঁজে সবাই,
আমা-হেন জন যাবে না কখনো মন্দিরে মঠে কাবার ঘরে।

৩

প্রেমেরি বাঁধনে একদিন যবে বাঁধিবে বাহুর পাশে—
জান্নাত্ পানে চাহিতে আঁখি যে ঘৃণায় মুদিয়া আসে!
আর, যদি ঠাঁই হয় গো সেদিন তুমি-হীন অমরায়,
কিছুই তফাৎ রবে না আমার স্বর্গ-নরক-বাসে!

৪

সুরায় আমার আয়ু যে ফুরাই, দূষিও না মোরে তাই,
করিও না ঘৃণা—পেয়ালা ও প্রেম এক যে করিতে চাই !
সাদা চোখে বসি যাদের সমাজে—তারা যে সবাই পর,
নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই যবে, বন্ধুরে মোর পাই !

ক্ষণিকা

চাই না প্রণয়—চির-সৌহৃদ,
সেই ত' রহে না, সে যে গো বৃথায় !
আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি—
নিমেষের দেখা, মধুর বিদায় ।

একটি নিমেষ

শুধু এক পাক ঘুরিব দু'জনে
ফুলের বনে,
হাতখানি চেপে ধর একবার
অন্য মনে ।
আবেশে অবশ দাওগো বারেক
আলিঙ্গন,
একটি সে চুমা—অধীর অধরে
আলিম্পন !
নিঠুর বিধিরে ফাঁকি দিই মোরা,
এস গো, সখি,
একটি নিমেষ উজলি' তুলিয়া
অমৃত ভখি !

তারাগুলি সব ওই চলে' যায়
অস্তপারে,
যাত্রীরা হবে এখনি বিদায়
অন্ধকারে !

রূপের গরব

ভোরের বেলায় বলে বুল্‌বুল্‌
গোলাপে মিনতি করি'--
চাঁদ ধুয়ে দেছে ও-মুখ তোমার,
জানি তাহা, সুন্দরি !
তাই বলে', সখি, কোরো না দেমাক-
তোমারি মতন হেসে
এই বনে গেছে কত ফুল ঝরি'
ক্ষণিক-বাসর-শেষে !

মূল্য-জ্ঞান

চুলগুলি তোর কাকের পালক,
ঘাড়ের কাছটি বরফ-সাদা !
টুক্‌টুকে ঠোঁট লালা-ফুল যেন,
চোখ কি নরম—আদর-সাধা !
পিয়ারী! করিনু ধর্ম-শপথ—
এর একটিরও বদলে আমি
কায়কোবাদ আর কায়-খস্রুর
চাই না মুক্তা-মণির গাদা !

প্রেমহীনের পূজা

কার তরে তুই ছেয়ে দিলি ভুঁই—
তুলিলি আকাশ ঘিরে'
উদ্ধত ওই গুম্বুজগুলা
মস্‌জেদ-মন্দিরে ?
কার কাছে তুই জুড়িস দু'হাত,
জানু পাতি' পূজা কার ?—
ধূম-কুণ্ডলী, ধূপের অর্ঘ,
বলির রক্তধার ?
কাঙাল জনেরে বঞ্চিত করি'
অন্নহীনের গ্রাস
ভারে ভারে যারে দিস্ তুই—সে যে
করে না আশ !

মৃত্যুর প্রতি

(John Addington Symonds)

ওগো মৃত্যু, চিরনিদ্রা নাম তব !—বল, বল তবে,
নিস্তব্ধ সে পুরীমাঝে আর কি গো নাহি জাগরণ ?
বড় ক্লান্ত শ্রান্ত যারা, করিবে না তাদেরে পীড়ন
স্বপনের চেড়ীদল—অঘোরে ঘুমায়ে র'ব সবে ?
ঘুমাবে অন্তর-দাহ ? বাহু রাখি' আঁখির পল্লবে
চিরসাথী ব্যথা-সতী ঘুমঘোরে র'বে অচেতন ?
তেয়াগি' কণ্টক-শয্যা স্মৃতি বুঝি করিবে শয়ন
সুকোমল বিছানায়—জাগিবে না কোন গীত-রবে ?
বল, বল, মহাকাল ! আরবার জিজ্ঞাসি তোমায়—
প্রেম-ও কি তোমার বুকে শিশুসম মৃদু নিঃশ্বসিবে ?
ব্যর্থ-বাসনার জ্বালা জুড়াবে কি তোমার চুমায়—
অনির্বাণ আশা-দীপ তোমার সকাশে যাবে নিবে' ?
হায়, তুমি নিরুত্তর ! শুধু ওই ললাট-ত্রিদিবে
কাঁপিছে তারার মালা—তোমারো যে দু' আঁখি ঘুমায় !

মৃত্যুর পরে

(Rupert Brooke)

নয়নের মণিপদ্মে দৃষ্টি-মধু যবে নাহি র'বে,
সব আলো নিবে যাবে, রুদ্ধ হবে চেতনা-তোরণ ;
কর্ণে কোন কলকণ্ঠ পশিবে না—বসন্ত-উৎসবে
নৃত্যপরা যুবতীর সনূপুর চারু-বিচরণ ;
যেথা হ'তে বিকাশিল—সেই শূন্যে হবে অপলাপ
জলধনু, আর সে গোলাপ !—
সে অনন্ত কালে তবু রহে যেন একটুকু ঠাঁই
মেলিয়া ধরিতে মোর মৃদুগন্ধ স্মৃতি সব ক'টি
নীলাকাশ, ফুল, গান, মুখগুলি যেন না হারাই !
বসিয়া গণিব সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে উলটি'-পালটি',
মধুর ভাবনাভরে ; যথা দীর্ঘ দীপ্ত দিনমান
শিশুদের খেলা হেরি', সন্ধ্যালোকে একেলা জননী
কর্মক্লান্ত করদুটি গুটাইয়া, বিমুগ্ধ-নয়ান,
চেয়ে থাকে শিশুদের সুপ্তমুখে—আমিও তেমনি .

নিশীথ-রাতে

(Alfred Lord Tennyson)

ফুলেরা ঘুমায়—শাদা আর লাল পাপড়িতে ঘুম ঢালা,
প্রাসাদ-কাননে তরুবীথি 'পরে দুলিছে না ঝাউগুলি ;
নীলকাচে-ঘেরা সোনার শফরী জলতলে গতিহারা,
জোনাকীরা জাগে, মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরি !

দুধের -বরণ ময়ূর হোথায় ঝিমায় ঝরোকাতলে—
ঝিকিমিকি করে—দেখে মনে হয়, এ কোন্ উপচ্ছায়া !
ধরা খুলে দেছে সারা বুক তার তারাদের উদ্দেশে,
সজনি, তোমারও বুকখানি খোলো আমার নয়নতলে !

একটি উল্কা উলসি' উঠিল, আঁকিল নিথর নভে
দ্রুত আলো-রেখা—মোর মনে যথা তব কথা, সুন্দরি !

হের সখি, এবে কমল মুদিছে লুকায়ে বুকের মধু—
সরসী-শয়নে ঢুলে' পড়ে বালা সহসা বিবশা হয়ে !
তুমিও তেমনি, হৃদয়েশ্বরী, মুদিয়া কমল-তনু
ঢুলে পড় এই উরস-উপরে—মিশে যাও একেবারে !

সোমপায়ীর গান

(ঋগ্‌বেদ)

আমি করেছি কি সোমপান ?—
মনে হয়, যত হয় আর গবী
আমি একা যেন সমুদয় লভি,
— কেন হেন অভিযান
আমি করেছি কি সোমপান ?

যেন গো আমারে বায়ুতে উড়ায়—
আমি যেন রথ, মোরে ল'য়ে যায়
তুরগেরা বেগবান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

ধেনুমাতা যথা বৎসের পাশে—
দূর হ'তে হেরি' দ্রুত ছুটে আসে,
ছন্দ আজিকে মন্ত্রে আমার
তেমনি যে ধাবমান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

ছুতার যেমন রথের ধুরায়
গড়িবার কালে কেবলি ঘুরায়,
মনে মনে আমি ঘুরাই তেমনি—
গান করি নির্মাণ !
আমি করেছি কি সোমপান ?

এই ধরাখানা হাতটা ঘুরায়ে
হেথা হ'তে হোথা দিব কি সরায়ে—
করিব কি খান্‌খান্‌ ?
আমি করেছি কি সোমপান ?

পাঁচ-গোষ্ঠীর কাহারেও আজ—
মনে হয় না যে, কিছু করি লাজ,
—কারে করি সম্মান ?
দ্যাবা-পৃথিবীর চেয়ে বড় আমি,
স্বর্গ-মত্য কোথা গেছে নামি' !—
কেন হেন অভিমান ?
আমি করেছি কি সোমপান ?

মোর আধখানা আকাশেতে মেশে,
বাকি আধখানা নীচে কোন্ দেশে—
নাই তার সন্ধান !
মোর চেয়ে বড় কেহ নাই কোথা—
গাই শুধু এই গান !
আমি করেছি কি সোমপান ?

সন্ধ্যার সুর

(Charles Baudelaire)

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়,
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম ;
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে, গীতের মূর্ছনায়—
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম !

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম !
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্তনাদ !
নৃত্যের তালে মূর্ছাব রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম,
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ !

বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্তনাদ—
মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায় !
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ,
রক্তসাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য এখনি, হায় !

মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায়—
ফুরানো-দিনের সবটুকু আলো ধীরে নিল ফিরাইয়া ;
রক্তসাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য এখনি, হায় !
এবে মোর মনে ভাতিছে তোমারি বিকট মূরতি, প্রিয়া

অন্ধকার

(Blanco White)

হে রজনী মায়াবিনী ! যবে সেই প্রথম প্রভাতে
তখনো হেরেনি তোমা—নাম শুনে' আদি নারী-নর
শিহরি' ওঠেনি ভয়ে?—ভাবি' এই দীপ্ত নীলাম্বর
এখনি মুছিয়া যাবে অন্তহীন তিমির-প্রপাতে !
অবশেষে, অকস্মাৎ অস্তরবি-কিরণ-সম্পাতে,
স্বচ্ছ হিম-জাল ভেদি' দেখা দিল কত নভ-চর
অন্তরীক্ষে—জ্যোতির জনতা সে কি নিস্তব্ধ সুন্দর !—
ভরি' শূন্য, সৃষ্টি যেন বিথারিল অসীম শোভাতে !

কে জানিত, দিবাকর! তব রশ্মি আছিল আবরি'
এ-হেন তামসী কান্তি! কে জানিত—যাহার প্রসাদে
ক্ষুদ্র কীট, তৃণাঙ্কুর ধরা দেয় আঁখিতে অবাধে—
সেই তুমি, দৃষ্টি হতে এত তারা নিতে পার হরি' !
তবে কেন মৃত্যু-ভয়—না হেরি' সে-রূপের মাধুরী ?—
আলোক ছলিতে পারে, জীবনও কি জানে না চাতুরী ?

নিদালি

(Walter de la Mare)

উসুখুসু চুলগুলি চোখ থেকে তুলে' দাও,
পায়ের নূপুরদুটি খুলে নাও,
রেশ্‌মি চাদরখানি টেনে দিও পরিপাটি—
আর ওই আশ্‌মানি নেপটাও ।

সাজাও বালিশ শিরে সুকোমল ছন্দে,
সুরভিয়া অগুরুর গন্ধে ;
বহে যথা বালু-ঘড়ি ঝিরি-ঝিরি ঝুরু-ঝুরু—
রজনী কাটুক মৃদুমন্দে ।

দুটি কোয়া কম্‌লার, কিস্‌মিস্‌ গুটিদশ,
গুল্‌কঁদ, আনার, আনারস—
সোনার থালায় ধরি', বেলোয়ারী গেলাসে
ঢেলে দাও নারিঙ্গীর রস ।

ঢেকো না রাতের রূপ—থাক্‌ খোলা ফর্দা,
সরাও সমুখ থেকে পর্দা ;
আমার এ ঘুম-চোখে পড়ুক মেদুর-মৃদু
চাঁদের কিরণখানি জর্দা ।

আঁধার ঘনায় দূর বনানীর বক্ষে,
শোনো ওই শূন্যের কক্ষে
দিশি-দিশি সঞ্চরে পাপিয়ার ঝঙ্কার—
ঘুম নাই পাখিটারো চক্ষে !

এবার নিবাও তবে রূপার ও দীপটায়,
সেই গান বাজাও বেহালায়—
যে গান পরীরা শোনে নির্জন নদীতীরে,
চেয়ে দূর বৈশাখী-তারায় !

গান যেন থামে নাকো ; স্বপনের বন্ধন
পশিতে দিবে না হেন বন্দন !—
তবু, ও সোনার সুর কান যেন ফিরে পায়,
—মুছিলে চোখের ঘুম-চন্দন ।

অলস অবশ হয়ে মুদে' আসে অঙ্গ,
আঁখি-পাতা চায় আঁখি-সঙ্গ ;
চোখ বুজে' দেখি ওযে—কত রং, কত ফুল !
আলো দোলে !—আলো, না পতঙ্গ ?

প্রবাসী, মাঘ ১৩৩১

রূপকথা

১৯৪৫

'রূপকথা' -গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র

রূপকথা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
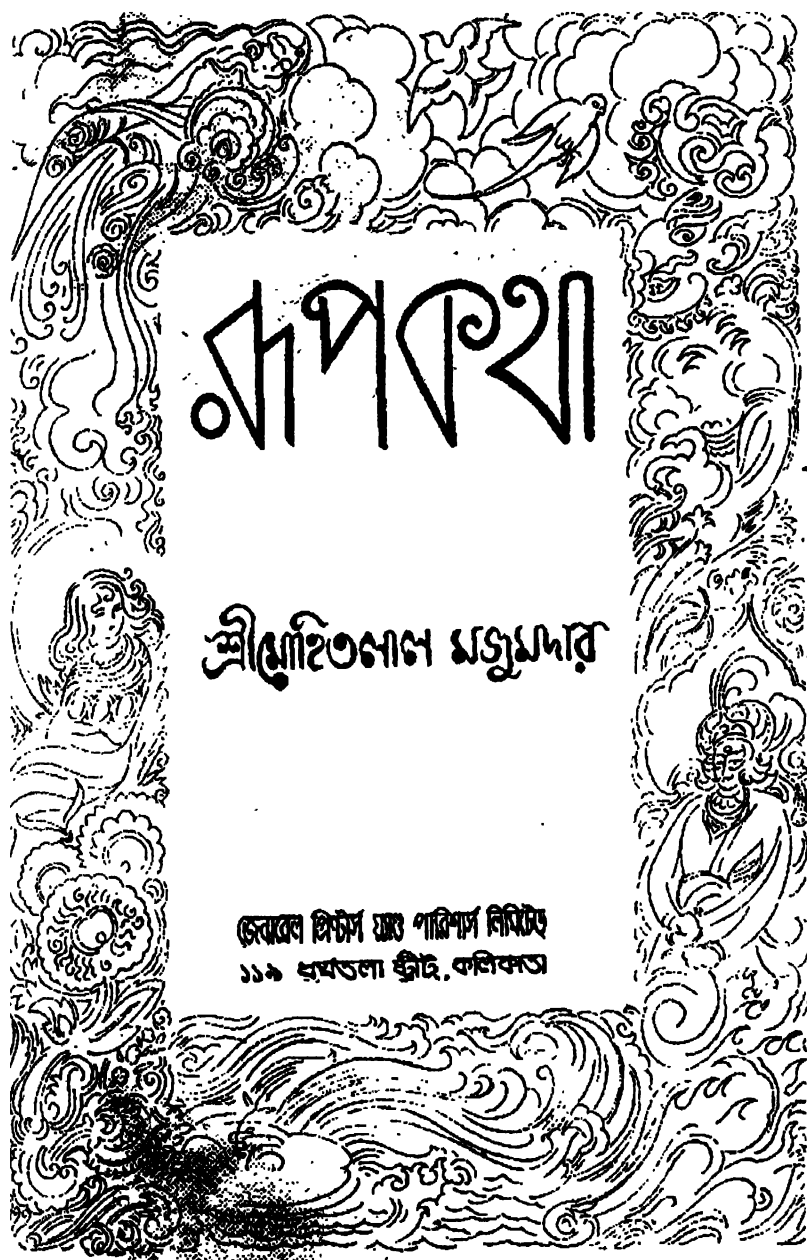
'রূপকথা'-গ্রন্থের আখ্যাপত্র

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৫৪
এক টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে, [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

রূপকথা-গ্রন্থের মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র

এক কালে ছেলেদের জন্য কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছিলাম ; যাঁহাদের তাগিদে লিখিয়াছিলাম তাঁহাদের পত্রিকাতেই সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ এতকাল পরে সেগুলিকে একত্র করিয়া ছাপিতে গিয়া দেখি, তাহারা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে ; কয়েকটি মাত্র পাইলাম, সেই সঙ্গে দুই একটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ যোগ করিয়া 'রূপকথা' রচনা করিলাম। শেষোক্ত কবিতাকয়টি সূচীপত্রে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি।[১]

আর একটি কথা। এই কবিতাগুলি ঠিক শিশুপাঠ্য নহে ; ইহাদের কাব্য-রস কিশোর বা বালক-মনেরই উপযোগী। ভাব ও ভাবনার যেটুকু প্রসার ইহাতে আছে তাহা অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ, এবং ভাষাও কুত্রাপি কঠিন নহে ; এ জন্য কাব্য-রসপিপাসু কিশোর ও কিশোরীদের হাতে আমি এই ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছ নির্ভয়ে তুলিয়া দিলাম।

পৌষ, ১৩৫২ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১. বর্তমান গ্রন্থে সূচিপত্রে নয়—সেই কবিতাগুলির শিরোনামই তারকা-চিহ্নিত হল।
—সম্পাদক

স্মরণে

অমিয়া ও অরুণা,

চোখ বুজে আজ খুঁজছি তোদের বুকের তলার অন্ধকারে,
কোথায় আছিস্, আছিস্ কি নেই—সে কথা কেউ বল্‌তে নারে।
মন যে বলে অট্ট হেসে, 'মিথ্যা সে সব ছায়ার মায়া',
প্রাণ কেঁদে কয়, 'দেখছি তবু সেই ছায়ারি অচল কায়া !'
আছিস তোরা—আছিস বেঁচে আমার নিশাস চোখের জলে,
থাকবি নে আর, ডুব্‌ব যখন আমিও সেই আঁধার-তলে।

আজকে শুধুই নাম দু'টি এই পুঁথির 'পরে দিলাম লিখে,
কি বলে' যে আশিস্ করি—জানিনে সেই বচনটিকে !
'বেঁচে থাকো' এমন কথা বাপের মুখেও নেই যে আজ
মানুষ যদি এতই পাপী—বিধির তা'তে হয় না লাজ ?
ধর্ মা তোরা তোদের বাপের বুক-ভাঙা এই ব্যথার দান,
তোদের কথাই 'রূপকথা' যে—এম্‌নি আমি ভাগ্যবান !

জাগো*

জাগো, সবাই জাগো!—বলে' ডাক্‌ছে রবির কিরণ,
ভোর-আকাশে ছড়ায় আলো, রঙটি যে তার হিরণ!
জাগো!—জেগে দেখো সবাই, বল্‌ছে রবির কর—
কেমন ক'রে তারারা সব পালায় অতঃপর!

জাগো, সবাই জাগো! ঐ ফুলেরা সব তাকায়—
শিশির-মাখা গন্ধভরা ঘুম থেকে কে জাগায়!
গাছপালা সব দাঁড়িয়ে আছে—জাগছে পাতার দল,
বাতাস জেগে তাদের মাঝে কর্‌ছে কোলাহল।

জাগো, সবাই জাগো!—আমার যাদুরা সব জাগো!
আর কেন ঘুম? বিছ্‌না ছাড়ো, দেরী কোরো না গো!'
ভোরের পাখী উঠ্‌ল জেগে, ফুর্তি কিবা তার—
ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ দেখে গায় কি চমৎকার!

ঘুমভাঙানি*

ফুট্‌ফুটে জোছ্‌নায়
জেগে শুনি বিছ্‌নায়
বনে কারা গান গায়,
    ঝিমি-ঝিমি ঝুম্‌-ঝুম্‌—

"চাও কেন পিটি-পিটি?
উঠে পড়, লক্ষ্মীটি!
চাঁদ চায় মিটি-মিটি,
বন-ভূমি নিঝ্‌ঝুম্‌!

"ফাল্গুনে বনে বনে
পরীরা যে ফুল বোনে—

চলে এস ভাই-বোনে,
চোখ্ কেন ঘুম্-ঘুম্ ?”

জানালায় মুখ দিয়ে
দেখি শাদা জোছ্নায়—
পাতাগুলো হল কি এ !
রূপোলি-তে রোজ নায় !

“ওগো, শোন কান পেতে,
মোরা আছি গানে মেতে,—
ছোট ছোট লণ্ঠন,
গায়ে গায়ে ঠন্‌ঠন্,
ঝক্‌মকে পলটন্—
আমাদের রোশ্‌নাই !

“ঘোর-ঘোর এই আলো—
আব্‌ছায়া বাসি ভালো,
ঘুরে' উড়ে' গান গাই,
খুশ দিল্, হুঁস নাই !”

চুপি চুপি ভয়ে-ভয়ে
জোছ্নার আব্‌ছায়
যেই গেনু হেঁট হয়ে
জুতো-মোজা দিতে পা'য়—

নিবে গেল রোশ্‌নাই,
পরীদেরও খোঁজ নাই !
কই গান? কই সুর ?
শোনা যায় ফুর-ফুর
বাতাসের ঝুর-ঝুর
বাইরেটা ফ্যাকাশে !

ডানায় শিশির মাখি'
এতখন শ্যামা-পাখী
কর্‌ছিল ডাকাডাকি,
—ভোর হয় আকাশে !

মায়ের প্রতিমা

ঝক্‌ঝকে নীলাকাশ
সোনা-ঢালা রোদ্দুর,
ভোর থেকে 'কাঁই-নানা',*
আর সানা'য়ের সুর।
আজ পূজো সত্যি রে!
এবারে যে ভাল আছি!
আন'বার জ্বরে পড়ি
ঠিক পূজো-কাছাকাছি।

একেবারে আসে না ত',
মা যে বড় দেরী করে—
সিঁদুরের দাগ বাঁশে,
তারও কতদিন পরে!
সেদিনের সেই শাঁখ,
আজ্‌কের ঢোল কাঁসি,
এর মাঝে কত ভয়,
মিলাইয়া যায় হাসি।

সিঙ্গিটা ঠিক হ'তে
কতদিন লাগে, ভাই?
পাল-কাকা কেন এত
দেরী করে, ভাবি তাই।
চশ্‌মাটি চোখে দিয়ে
সেই চোখ-ভুরু টানা,—
কত বার স'রে এসে
দেখে মার মুখখানা।

যত ভাবি, আর কেন?
তত দেখি আরও আছে;
শেষকালে চিনি ঠিক—
মা ত' এই আসিয়াছে!

* কাঁশির আওয়াজ।

প্রতিবার মন থেকে
ঠিক গড়ে ছবিখানি,
পুরুতের চেয়ে আমি
তাই তারে বড় মানি।

পর্শু ত' দিনভোর
চিত্তির হ'ল চাল,
আঁচ্‌লা ও মটুকেতে
সাজাইল মালী কাল।
আর মোটে তিন দিন,
তারপর সব শেষ ;
পূজো মানে শেষ-করা,
তার চেয়ে গড়া বেশ !

চট্‌ করে গড়ে' যদি
রেখে দেয় তিন মাস,
প্রাণ ভরে' দেখে নিই—
তবে বুঝি মেটে আশ !
আগে মার মুখ দেখে
ভরে' যাক অন্তর,
তারপর পূজো-পাঠ—
যত কিছু মন্তর।

পূজোর পোষাক

এবার পুজোয় কন্যা আমার (বয়স বছর তিন)
চেয়েছিলেন জামা জুতো ধুতি এষ্টাকিন্‌ !
গিন্নির বড়ই ইচ্ছে ছিল একটা দামী ফ্রক,
মেয়ের খেয়াল অন্য রকম—'বাবা'-সাজার সখ্‌ !
মায় সে রুমাল, চাদর এবং মানিব্যাগও চাই,
এনে দিলাম ফর্দ-মতন, বাকি কিছুই নাই।
সবচেয়ে তাঁর ধর্‌ল মনে পাঞ্জাবী আর জুতো—
বল্লেন তবু, "নেই ক' কেন জুতোয় বাঁধা 'সুতো' ?"

পাঞ্জাবীটা এত ভাল—ভাব্না হ'ল বেজায়—
বাবা যদি নিজেই পরে—ঘটির জলে ভেজায়।
বল্লে, "তুমি লক্ষ্মী-মেয়ে, দেব লজঞ্চুস—
পোরো না'ক আমার জামা!"—দিলেন চুমা ঘুষ।
মানিব্যাগটা খালি দেখে ফেলে দিলেন টেনে—
বল্লেন, 'তুমি দিলে না যে পয়সা কিনে এনে!"
শেষে যখন বাবার মত হ'ল সকল সাজ,
হ'ল সারা মায়ের হাতে চুলের কারুকাজ,
গট্‌গটিয়ে কাছে এসে বলেন হেসে মেয়ে,
"কেমন আমি বাবা হ'লাম, দেখ দিকিন চেয়ে!"
ভাবলাম বুঝি গেলাম বেঁচে, ফাঁড়া গেল কেটে—
হঠাৎ মেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ঠোঁট দুখানি এঁটে!
বল্লেন শেষে (শুনে আমি ছেড়ে দিলাম হোপ্),
"বাবা, তুমি আমার জন্যে আন্‌লে না যে গোঁপ!"

চালাক জগাই

''—বলিস্ কিরে! তুই হরিশের ভাই!
তার মত যে ভাল ছেলে স্কুলে আর নাই!
যেমন ঠাণ্ডা, তেম্‌নি কেমন দিব্যি সে ফুট্‌ফুটে!
তারি ভা'য়ের মূর্তি এমন! —স্বভাব কি বিদ্‌ঘুটে!
স্বভাব যা'হোক্, কেমন করে' হলি এমন কালো?"
"কি জানি, স্যার?—ফর্‌সা হওয়া এমন বুঝি ভালো!

দাদা বুঝি বড্ড ভালো?—জানি, সে খুব জানি,
এমন বোকা! মাথায় নেই তার বুদ্ধি একটুখানি!
আমি কেমন চালাক্!—সে ত' বলে এখন সবাই,
বলে, হরিশ মস্ত গাধা! কেমন তুখোড় জগাই!—
আমার কাছে যখন-তখন হেরে যায় ত' দাদা।—"

"তাই নাকি? তুই এমন চালাক! দাদা এমন গাধা!
আচ্ছা শুনি, কেমন করে' হারাস্ যে তুই তাকে?"
"কোন্ কথাটা বলি এখন, সব কি মনে থাকে!—

একটা আছে হাত-ঘড়ি তার—দিছ্‌ল কিনে মামা,
বল্‌লে সেদিন, 'রাখ্ ত' জগা!'—আমি কি খান্‌সামা ?
বিকেল বেলায় পায়না খুঁজে', বল্‌লাম, 'আছে হোথা ?'—
তত চেঁচায়, বলে—'আমি দেখ্‌ছি না ত' কোথা !'
বাবু যাবেন বায়স্কোপে—তা'ও আবার 'পাশে' !
না পর্‌লে নয় হাত-ঘড়িটা, দেখে যে লোক হাসে !

"রেখেছিলাম আমি সেটা ডেস্কটারি তলায়,
দেখি কেমন পায় সে খুঁজে—বুদ্ধি কেমন খেলায়।
যত বলে, 'কোথায় জগা?' আমি বলি, 'হোথায় !'
তেড়ে এল, পালিয়ে গেলাম চিলে-কোঠার মাথায় !
শুধু-হাতেই যেতে হ'ল, কেমন জব্দ ! হি হি ।
জানি, এর পর বাবার কাছে কর্‌বে জবাবদিহি,
তারো উপায় রাখ্‌ছি করে',—ছাদের উপর থেকে
হেসে যে আর বাঁচিনে তার গোম্‌সা-বদন দেখে !

"যা' বলেছি !—ফিরে এসেই ছিঁচ্‌-কাঁদুনে ধাড়ি
লাগিয়ে দিলে বাবার কাছে ; গেলাম তাড়াতাড়ি ।
শুনলাম 'জগা! কি হয়েছে? কি করেছিস্, গাধা !'
'কি করেছি? মিথ্যে করে' লাগায় কেন দাদা ?'
'হাত-ঘড়িটা বল্ ত কোথায় ?' 'আমি কি তার জানি ?
রেখেছিলাম শেল্‌ফের উপর, যেথায় দোয়াতদানি ;
পায় না খুঁজে, সে দোষ আমার? বেশ ত' মজার লোক !'
পাচ্ছিল যে হাসি তখন, দেখে দাদার চোখ !
হিড়হিড়িয়ে টেনে আমায় চল্‌ল পড়ার ঘরে,
দ্যাখে, ঘড়ি ঠিক্ সে আছে দু'খান বইয়ের পরে !

"যেমন মুখে চাইবে ফিরে, ছিনিয়ে নিয়ে হাত
দৌড় দিলাম রান্নাঘরে, বল্‌লাম, 'মা, দাও ভাত ।'
মায়ের কাছে কর্‌বে কি আর? এম্‌নি বোকা দাদা—
থেমে গেল, বলে' দুবার, 'ইষ্টুপিড্' আর 'গাধা' ।"

"চালাক্ তুমি নও ত' মোটেই—পাজী হচ্ছ, জগাই !"
"হ্যাঁ স্যার, কেন ?—ওই কথা ত' বলে আমায় সবাই ।"

আড়ি ও ভাব

আড়ি দিলি? খেলবি না ত' ?
　　বয়ে' গেল, বেশ ত' !
আমি এখন পড়ব কেবল,
　　ছুটি হ'ল শেষ ত' ।
অঙ্কগুলো ফেলব কসে',
　　করব ভূগোল মুখস্থ,
টকাটক্ সব বলব ক্লাসে—
　　একটা বাদ নয়—সমস্ত
দেখবি তখন কেমন মজা,
　　তুই ত' পড়ে' থাক্‌বি,
দেখিস, ফিরেও চাইব নাক'
　　আমায় যখন ডাকবি ।

খেলার সাথী নাইবা হ'ল
　　খেলার নইকো ভক্ত,
এবার জেনো, সাধছি নে আর—
　　ভাবটি করা শক্ত ।

(পড়া সে ত' করব আমি।
　　রাখ্‌না কথা, ফট্‌কে,—
উনি আবাব অঙ্ক কসেন
　　—জানেন না ক' শট্‌কে !)
এবার যখন আসবে বাবা—
　　কত কি যে আনবে !
সে সব আমি রাখব তুলে,
　　আর কেউ না জানবে ।
এমন একটা কল আনবে—
　　লেখা হবে আপ্‌নি—
খাতার উপর ধরব যখন
　　খুলে মুখের ঢাক্‌নি ।
আনবে এবার কত যে বই,
　　এ্যায়সা মজার গল্প,
প্যানার বই সে লাগে কোথায়,
　　দামও নয় ত' অল্প !

লাল নীল আর বেগ্‌নী রঙের
পেন্সিল ছটা-সাতটা
জলছবিতে ভরিয়ে দেব
বইয়ের সারা পাতটা !

এত নিয়ে করব কি যে
তাই ত' ভেবে পাইনে',
তাই বলে' যে করবে আড়ি
'তারেও দিতে চাইনে' ।

(যাঃ, ওসব মিছে কথা,
এমন বোকা পাওনি—
সেবার একখান সিগারেটের
ছবি চাইলাম—দাওনি !)

এবার এমন নেবুর আচার
হয়েছে—কি বলব !
জেঠাই-মা সে কোথায় রাখে,
বের করে ঠিক ফেলব ।

বাগানেতে তেম্‌নি এবার
গাছটি ভরা জামরুল,
পেয়ারাগুলো যেমন বড়,
তেমনি পাকা বিল্‌কুল !

একটি করে' কামড় দেব,
হোক্‌ না পাকা মিষ্টি—
ছড়িয়ে দেব এক এক বারে
পঁচিশ কিম্বা তিরিশটি ।

আমার আর কি?—কেমন মজা :
কত কি যে করব !
কাগজ-মোড়া আমচুরেতে
নিত্যি পকেট ভরব ।

(তুমিই ত' ভাই মিথ্যে করে'
আমার নামে দোষ দিলে,
পন্নিমশাই তাই ত' আমায়
পিটিয়ে দিলে চড়-কিলে ।)

না বল্লে যে আমায় ধ'রে
আছাড় দিত ঠ্যাং তুলি' !
আর হবে না—ভাব কিন্তু !
আয়, খেলি গে ডাংগুলি

শান্ত খোকা

ডাক্তার এলে আজকে আমি বলব তাকে—
দুষ্টুমী আর করি না তো—শুধাও মাকে !
আর কি আমি বাদল-হওয়ায়, আদুল গায়ে
ফটক খুলে' দাঁড়িয়ে থাকি মুখ বাড়ায়ে ?
বাবার লাঠি যায় না পাওয়া—চড়ে বেড়াই ?
সার্সি ভাঙি? গাছগুলোকে কুকুর-তাড়াই ?
সে লাঠি ওই যেমন থাকে তেম্‌নি আছে,
পুসি এখন ভয় করে না আসতে কাছে।
মায়ের চাবি হারায় না আর, দাদার ছুরী ;
দিদির পুতুল, বাক্স থেকে যায় না চুরী।
বারান্দাতে ডিগ্‌বাজি আর খাইনে, তাই
গায়ে মাথায় নেইক ধুলো—আর কি চাই ?
এখন আমায় যখন ডাকো তখন পাবে,
বিছ্‌নাটিতে কেমন থাকি শান্তভাবে !
হয়েছি ত' লক্ষ্মীছেলে—কান্নাকাটি
একটু করি, দেখলে পরে সাবুর বাটি ;
সেও আমি করব না আর, খাবার তরে
চাইনে কিছুই, খেলেই আমার অসুখ করে।
আঙুর ডালিম মিছরী খেজুর লজঞ্চুস
মিথ্যে কেন আর এখনো দিচ্ছ ঘুষ?
ভাতের থালা উল্‌টে আমি ফেলব না আর,
তোমরা শুধু দিয়েই দেখ একটি বার !
ডাক্তার এলে আজকে আমি বলব তাকে
দুষ্টু ত' নই, ওষুধ কেন দাও আমাকে ?
দুষ্টু আমি ছিলাম বটে, আর ত তা' নই,
ঘুমাই যখন—এক্কেবারে শান্ত যে হই !

জেগে থাকি যখন, দেখি, নীল আকাশে
মেঘ-শিশুরা শুয়ে আছে একটি পাশে !
ওরা কি কম দুষ্টু ছিল ! তাই ত ভাবি,
ঘুম হ'তনা শুনে ওদের দাবাদাবি ।
এখন কেমন শান্ত হয়ে ঘুরে ফিরে
মস্ত বড় বিছ্নাটাতে গড়ায় ধীরে !
কি খায় ওরা? একটু হাওয়া? কোথায় বা দুধ !
কেবলি খায় হল্‌দে-রঙের রোদ-ওষুধ ?
আমার মতন লক্ষ্মীছেলে হ'তেই হবে,
নইলে ওদের ওষুধ খাওয়া ঘুচবে কবে ?
ওরাও দেখি হঠাৎ কখন পালিয়ে যায়,
আমার মত বদ্ধ হয়ে থাকতে না চায় ।
ডাক্তার এলে আজকে আমি বলব তাকে—
এখন কেমন হইছি ভালো, বলো মাকে।
চুপটি করে থাকি, তবু মা যে কাঁদে,
ভাবে, আবার দুষ্টু হব দু'দিন বাদে ?—
রাতের বেলায় ঘুমিয়ে যখন পড়বে সবাই,
জেগে উঠে সেই ফাঁকেতে যদি পালাই !
আমি শুধু বলেছিলাম সেদিন মাকে—
গাছের পাতায় ফড়িং যেমন মিলিয়ে থাকে,
আবার যেমন হঠাৎ উড়ে এক নিমেষে
নীল আকাশের কোলে মিলায় হাওয়ায় ভেসে—
তেমনি করে' পাখ্‌না মেলে আলো-হাওয়ায়
একদিকেতে উড়ে যেতে প্রাণটা যে চায় !
সেদিন থেকে কাঁদে কেবল, বোধ হয় ভাবে,
খোকা আবার দুষ্টু হয়ে পালিয়ে যাবে !

ভোলানাথ

ভোলানাথ, তুমি ভুল করে' এসেছিলে ?
চলে গেলে ফের—সেও কি তেমনই ভুল ?
হাতছানি দিয়ে কে তোমারে ডাকে নিলে—
কারো ভালবাসা নয় কি তাহার তুল ?

রাতের আঁধারে কোন্ সে বনের পাখী
ঘরে উড়ে এল ? রাতটি না হ'তে শেষ—
ভোরের কাকলী সবটুকু রেখে বাকি,
আকাশের নীলে আবার নিরুদ্দেশ !

দুধের বাটিতে দুধ যে রহিল পড়ে' ।
চোখের কাজল আধেক রহিল টানা,
চুমাটি খাইতে মু'খানি গেল যে নড়ে'—
তাও শেষ করে' যেতে কি আছিল মানা ?

ভোলানাথ, তুমি এসেছিলে পথ ভুলে,
যাবার বেলায় হ'ল কি তেমনি ভুল ?
উষার আলোকে একটু পাপড়ি খুলে'
বেলা না বাড়িতে হঠাৎ ঝরিল ফুল !

পুষ্পজীবন

ফুল যবে ঝরে' যায়, ভেবেছ কি মরে' যায়—
শেষ হয় চিরতরে তার রূপ-সৌরভ ?
সে যে ফিরে ফিরে আসে বছরের সেই মাসে—
দেখ না কি সেই রঙ, সেই শোভা, সেই সব !

ফাগুনে অশোক-শাখে যে সব কোকিল ডাকে,
আকাশে যে চাঁদ হয় বারে বারে পূর্ণ ;
আষাঢ়ে মাঠের শেষে নীল মেঘ উঠে ভেসে,
অঘ্রাণে তৃণে তৃণে সেই হীরা-চূর্ণ ;—

বল, সে কি মনে হয়, তারা সব এক নয় ?
আগেকার থেকে তারা এক তিল ভিন্ন ?
মরে' তারা বাঁচে ফের পাছে কেউ পায় টের—
তাই কোথা নাহি রাখে মরণের চিহ্ন ।

ফুলেদেরো ঠিক তাই ! তারা ত' মরে না, ভাই,—
যখন যেখানে ফোটে—সেই নাম, সেই ফুল !

তারা যে আপন জন, ধরার বুকের ধন—
মাটিতে জনম যার অমর তাহার মূল !

তারা যে, শুধুই হাসে, ভালবাসে কি না বাসে,
—শুধায় না কেউ কারে, তবু সদানন্দ ;
বলে না যে, সুখ চাই, তাই কারো দুখ নাই,
ভুলেও ভাবে না, কিবা ভাল কিবা মন্দ ।

ওদের মুখের পরে শুধু আলো খেলা করে,
শিশিরে কাঁদে না ওরা—বাড়ে তা'য় সৌরভ !
একসাথে ফোটে ঝরে, ঝরে, তবু নাহি মরে,
ওরা যে সবাই এক —তাই হেন গৌরব ।

শ্রাবণের কবিতা

শ্রাবণের দিনে কি লিখিব ভাবি তাই,
আকাশের পানে চাহিলে কিছুই নাই ;
কারণ, কবিরা চাহে না মাটির পানে—
বলা বাহুল্য, একথা সকলে জানে ।

দেখি, আর ভাবি—কোথা গেল সেই মেঘ,
কালো-কাজলের বুকে সে ঝড়ের বেগ ?
থেকে থেকে সেই বেগুনী বিজলী-ছটা ?
কত সমারোহ—সে মেঘের কত ঘটা !

গুরু-গুরু ডাক—সে মেঘ ইহা ত' নয়,
যারে দেখে মন কি-জানি-কেমন হয়—
যেন ওই দূর আকাশের সবশেষে
চলে' গেছি কোন্ সব-নতুনের দেশে !

শ্রাবণ-আকাশে কিছু নাই—কিছু নাই !
চারিদিকে শুধু ছড়ানো রয়েছে ছাই ;
কখনো যেন সে ঘসা-ঈস্পাতে গড়া—
তা'ও মাঝে-মাঝে কয়লার দাগে ভরা !

ঘুরে যে আসিবে একটু মাঠের মাঝে,
নদীর কিনারে বেড়াবে সকালে সাঁঝে,—
বাগানে একটু বসিয়া থাকিতে চাও?
এ সুখ-শ্রাবণে সে কথা ভুলিয়া যাও !

ভোরের বেলায় ডাকে না একটা পাখী,
কে বলিবে, ভোর এখনো হইল নাকি,
সূর্যের মুখ দেখিতে পাবে না দিনে,
ঘড়ি দেখে তবে সন্ধ্যারে লবে চিনে' !
তোমরা সকলে ভাবিতেছ নিশ্চয়—
এসব কি কথা? কবিতা ইহারে কয় ?
সকলেই জানে, শ্রাবণ কেমন মাস,—
বিশেষ যাহারা পাড়াগাঁয়ে করে বাস ।
কবি তবু তার রচিবে এমন ছবি—
রঙীন হবে সে, না ওঠে যদিও রবি !
পূবে-বাতাসের নাম হবে 'পূরবিয়া',
শুধু নাম শুনে ভরিয়া উঠিবে হিয়া !

সেই সাথে আসে উচ্ছ্বসি' মৃদুমন্দ
জুঁই-চামেলী ও হাস্নুহানার গন্ধ,—
চক্ষু যখন মুদি' আসে সৌরভে,
আকাশের পানে চাহিতে কেন বা হবে ?

আর সে আঁধার? আছে কি তেমন কিছু—
রাত আসে যবে দিবসের পিছু পিছু !
দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া
একটি সে দীপ ঘরে রাখো জ্বালাইয়া।

শুনিবে কেমন ঘুম-পাড়ানিয়া গান—
দাদুরীর সাথে ঝিল্লীরা ধরে তান !
জল ঝরে—যেমন নূপুরের ঝুম ঝুম,
চোখের পাতায় এসেও আসে না ঘুম !

তেমন সময়ে কত না স্বপন আসে,
বুড়ারাও ঘুমে শিশুর মতন হাসে !
নিবু-নিবু দীপ—দেয়ালে কাঁপিছে ছায়া,
সবই মনে হয় কোন্ মায়াবীর মায়া !

শিশুকালে শোনা ঠাকুমার রূপকথা
চোখের উপরে রূপ ধরে যথা তথা ;
সাতটি রাজার এক যে মাণিক আছে—
দেখি, সে রয়েছে আমারি হাতের কাছে !

দুয়ারের ফাঁকে কখন বাতাস এসে
নিবাইল দীপ—আঁধার উঠিল হেসে ;
সেই সে মাণিক আলোয় করিল আলো,
আধ' ঘুমঘোরে স্বপনের বাতি জ্বালো ।

মনে হয়, কোন্ সরোবর-তলে নামি'
পাতাল-পুরীর পথে চলিয়াছি আমি !
জল সরে' গিয়ে নিয়ে যায় কোন্ দেশে—
আলো আর গান এক হয়ে সেথা মেশে !

থাক্, আর নয়,--ভেসে গেল ঘর-দ্বার,
পথে ও পুকুরে হয়ে গেল একাকার !
এখন একটু রৌদ্র উঠিলে বাঁচি—
জেগেই নেমেছি পাতালের কাছাকাছি !

কবিরাও বলে, শ্রাবণে দুয়ার রুধি'
ঘরে ব'সে থাকো চুপচাপ চোখ মুদি' ।
আমি বলি, না না—ও কাজ করিও নাকো,
সারাদিন শুধু অঙ্ক কসিতে থাকো ।

বীর-গাথা

ওগো সুন্দর যুবা-বীরবর! ধরা দাও মোর গানে—
তোমার কাহিনী ধ্বনিয়া তুলিব চির-কিশোরের কানে ।

তেপান্তরের মাঠের কিনারে গোধূলির আবছায়
ঘোড়ায়-চড়া সে মূরতি তোমার ক্ষণে ক্ষণে ছুটে যায় !
মুকুতার খাপে বাঁকা তলোয়ার ঝন্ ঝন্ করে পাশে,
হীরার দোলক উষ্ণীষে দোলে জড়োয়া জরীর ফাঁসে ;

দুই কানে বীরবৌলি, গলায় আধেক-চাঁদের মালা,
রক্ত-তিলক ললাটে, আঁখিতে প্রতিভার দীপ জ্বালা !

কার সন্ধানে ছুটেছ কোথায়, রাজার পুত্র, বীর ?
অসমসাহসী, কি ধন লুটিবে অসীম এ পৃথিবীর ?
আছে বুঝি কোথা' দারুচিনি-দ্বীপ নীলসাগরের কূলে,
সেথায় ভ্রমিছে সোনার ভ্রমর ইন্দ্রনীলের ফুলে !
জাফ্‌রান-রাঙা জ্যোৎস্নার আলো, রৌদ্র সেথায় নাহি ;
দিবা নাই সেথা, ঘুম এনে দেয় তারকারা গান গাহি' ।

সেইখানে আছে, অপরূপ পাখী, 'স্বপন' তাহার নাম—
দু'খানি পাখায় আঁকা আছে যত রূপ-রেখা অভিরাম !
ধরা নাহি দেয়, ডানার ঝাপটে মুরছিল কত বীর !
তাহারি লাগিয়া ছুটিয়াছ সেথা, সেই সে সিন্ধুতীর ?

পৃথিবীর আর প্রান্তে কোথায় হিমময় মেরু-দেশে—
রাতি নাই, শুধু ঊষা চেয়ে রয় আকাশে নির্নিমেষে !
সেইখানে আছে একটি যে তরু, সোনার আপেল তায়—
সে ফল লভিতে কেহ নাহি পারে—দানবে বা দেবতায়

ভীম অজগর আগুলিছে তারে জড়াইয়া পাকে পাকে,
এক চোখ তার ঘুমায় যখন, আর চোখ জেগে থাকে !
শুধু তাই নয়, বেড়িয়া বেড়িয়া শুভ্র সে তরুতল,
হাতে-হাতে ধরি' নাচে আর গায় কুমারী পরীর দল !

সেই ফল যদি একটিও কেহ নিতে পারে নিজ হাতে,
যত জ্ঞানী-গুণী চরণে তাহার লুটাইবে একসাথে !

বার বার কত রাজার কুমার ভয় পেয়ে গেছে ফিরে,
অজগর-গ্রাসে কেহ বা সঁপিল আপনা ও ঘোড়াটীরে !
কেহ বা পাগল হ'য়ে গেছে শুনে পরীদের সেই গান,
বাকি সে জীবন কেঁদে কেঁদে তার হ'য়ে গেছে অবসান

তবু তারি লাগি' চলিয়াছ বীর,—তুমি যে দুঃসাহসী,
বুকে আছে তব অভয়-কবচ, মুঠিতে বজ্র-অসি !
পরীরা পলকে মিলাইয়া যাবে তোমার আঁখির আগে,
একটি আঘাতে অজগর-দেহ কাটিবে দুইটী ভাগে !

কোন্ দুর্গম অতি-অশরণ নির্জন গিরি-চূড়ে
দৈত্যপুরীতে অত্যাচারীর রক্ত-পতাকা উড়ে।
সেইখানে কাঁদে বন্দিনী কোন্ কন্যা সে অভাগিনী,
সোনার খাঁচায় বদ্ধ রয়েছে সে কোন্ বিহঙ্গিনী!
সোনার শয্যা, সোনার পালঙ, শিয়রে সোনার দীপ,
সোনার মুকুরে ছায়াখানি পড়ে—ম্লান সে যে নির্জীব!
বাতায়ন খুলে' কভু চেয়ে থাকে সুদূর আকাশ পানে,
আঁখি ভরি' ওঠে উড়ে-যাওয়া যত পাখীর মধুর গানে।
গোধূলির ভালে ফুটে উঠে যেই রূপালী-চাঁদের কোণা,
চেয়ে দেখে—তারো সরু মুখখানি ক্রমে হ'য়ে ওঠে সোনা
দুরন্ত সেই মায়াবী দানব—কঠিন পাষাণ-পুরী—
রাজার কুমারী কতদিন সেথা গোঙাইছে ঝুরি' ঝুরি'।

সে বারতা শুনি' ওগো বীর, তুমি নদী-গিরি-কান্তার
উল্কার মত লঙ্ঘিয়া চলো, সঙ্গীও নাহি আর!
পশ্চাতে নাই দৃক্‌পাত, দিবা-রাত্রির নাই ভেদ,
ঘোড়ার খুরে ও পথের পাথরে তিল নাহি বিচ্ছেদ!
উষ্ণীষ-তলে দীর্ঘ সে কেশ-কেশর আন্দোলিছে,
কানে বাজে শুধু কোথা' কোন্ নারী সকরুণ ক্রন্দিছে!
বীরের ধর্ম পালন করিতে করেছ কঠিন পণ —
দুর্বল আর অসহায় লাগি' আত্ম-বিসর্জন!

দেখি যে তোমার সে বীর-মূরতী স্বপনে ও জাগরণে,
সেই ইতিহাস, সত্য-কাহিনী, স্মরি মোরা মনে মনে।
গিরি, নদী, বন, মরু-প্রান্তর, অকূল সাগর-কূলে
তোমার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ সদা সচকিয়া তুলে।
আমারাও তাই ছুটে বাহিরাই—দেহ থাকে পিছে পড়ি'—
প্রাণ তোমা' সাথে করে অভিযান দুর্গম পথ ধরি'।

তোমার চরিত-কাহিনী যে শোনে সে রহে চির-কিশোর,
করমূলে তব তাই যে বাঁধিনু কবিতার রাখী মোর।

রাজ-বেশ

রাজা গেছে বনে, গেছে তাঁর সনে
একটি সে অনুচর,
দুঃখের দিনে, কেহ নাহি চিনে,
সবাই হয়েছে পর।
শাল-দোশালার কিছু নাহি আর
—নব নব বেশ-বাস,
রাজার দুলাল হয়েছে কাঙাল,
এমনি সর্বনাশ।
তবু তাঁর মন নহে অনুখন
সেই শোকে ম্রিয়মাণ,
যত বাজে বুকে তত হাসিমুখে
সে ব্যথা সহিতে চান।

ফুরায়ে এসেছে আনিল যা' বেছে
বসন দু'চারিখানি—
বেদনা-কাতর রাজ-অনুচর
প্রভু-প্রয়োজন মানি'।
একদা প্রভাতে দিল তুলি' হাতে
যেমনি জীর্ণ বাস
রাজার বদনে ভ্রূকুটির সনে
পড়িল দীর্ঘশ্বাস।
কহিলেন ডাকি' "আর নাই নাকি ?
ফুরাইল এতদিনে ?
একি পরমাদ— বসনের সাধ
ঘুচিল না মানহীনে !
নিশ্চয় আছে শেষ হয় পাছে—
করিতেছ সঞ্চয়,
হৃদয় আমার তাই বার বার
করিতেছে অবিনয়।
রাজার আসন ছাড়ে যেই জন
বসন ছাড়িতে নারে !

ঐশ্বর্যের রাখে হেন জের—
ভিখারী কহে ত' তারে।
এক, সব পায় নয়, সব যায়—
উভয়ের নাই দুখ,
রাজার মুকুটে আর জটাজুটে—
ভেদ নাই এতটুক।
গেছে রাজপাট তবু চাই ঠাট
একি এ দুর্বলতা।
থাকে যদি বাকি রাখিও না ঢাকি'—
কহিও সত্য কথা।"

"সোণার সুতায় লতায় পাতায়
কাজ-করা আংরাখা
রাখিয়াছি, প্রভু! রহিবেক তবু
যতদিন যায় রাখা।
আর কিছু নাই, যাহা ছিল তাই
সেদিন দিয়েছি দানে
তোমার আদেশে,— প্রভু, সবশেষে
কি রহিবে পরিধানে ?
অধীন জনের এ ভুল মনের
ক্ষমা কর মহারাজ !
শুনিনু' যে কথা ঘুচিয়াছে ব্যথা,
পাইয়াছি বড় লাজ।"

রাজা কহে, "আজ ততোধিক লাজ
আমি পাইয়াছি মনে,—
ওইটুকু শেষ আছে রাজ-বেশ
তা'রি হায় প্রলোভনে
ভিক্ষুক-প্রাণ মানে অপমান,
করিছে কাঙাল-পনা,—
দাও পরে' লই, এর পরে ওই
চীর-বাস হবে সোণা ;
শয়তান মন মানিবে শাসন
সব ফুরাবার পরে,
শিশুর মতন ভুলি' ক্রন্দন
ঘুমাইবে অকাতরে।

ছন্দ-চতুর্দশী

১৯৫১

'ছন্দ-চতুর্দশী' প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

ছন্দ-চতুর্দশী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
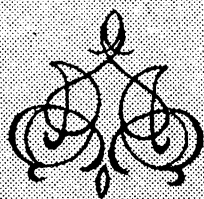
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'ছন্দ-চতুর্দশী' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫৮
দুই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

'ছন্দ-চতুর্দশী' প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন

স্মরণে

প্রণয়-ভীরু

মৃত্যু আসি' কহে মোরে—"একবার, ওগো প্রিয়তম,
চাহ মোর মুখপানে ; হের কান্তি তুহিন-শীতল,
নিশ্চল তারার মত দেখ মোর নয়ন যুগল,
আলুলিত কেশপাশ তন্দ্রাময়ী নিশীথিনী সম!
দিবারাত্র ধুক্ ধুক্ নাহি করে হৃদ্‌পিণ্ড মোর,
বিস্মৃতি-অমৃত ঝরে দু'অধরে হাসির ধারায়—
কেন বৃথা জাগরণ জীবনের স্বপন-কারায়?
তার চেয়ে কত স্নিগ্ধ সুকোমল এই বাহুডোর!
চুম্বনে মুদিবে চোখ,—মুছে যাবে চির- অন্ধকারে
মায়াময়ী মরীচিকা, শতবর্ণ আলোকের লীলা ;
আলিঙ্গনে অঙ্গ হবে সুকঠিন গিরি-হিমশিলা—
ঈশান-'অমরনাথ' হয়ে রবে অনন্ত তুষারে!"

অপাঙ্গে চাহিনু শুধু একবার আননে তাহার—
এত রূপ! হায়, হায়, তবু কাঁপে হৃদয় আমার!

বিবাহ-মঙ্গল

জীবন-দুয়ারে তব দাঁড়ায়েছে নারী—
আজ, বধূ, কাল জায়া 'পরে পথ শেষে
হাতে হাত রাখি' পুনঃ অমৃত-উদ্দেশে
বাহিরিবে একসাথে ;—সীমন্তে তাহারি
সিন্দূর দানিবে যবে যত্নে অপসারি'
মুখাবগুণ্ঠন, কুমারীর কালোকেশে
অকস্মাৎ সেই দীপ্তি হেরি' স্বপ্নাবেশে
জানি ও নয়ন রবে বিস্ময়ে বিস্ফারি'।
সহজ সুলভ সে যে—সে ক্ষণ-বিস্ময় !

তব ভাগ্যে, জীবনের নিত্য-নিশিমুখে
এমনি সীমন্ত রচি' যাদুমন্ত্রময়,
যেন তব চক্ষে ধরে যৌবন অক্ষয়
আজিকার নব-বধূ—আত্মহারা সুখে
অমর দম্পতী-প্রেম জরা করে জয় !

দুর্গোৎসব

১

নাহি বাদ্য কোলাহল, জনতা-গুঞ্জন
সহাস্য আননে নাই শাস্ত্র-আলাপন ;
নীরব মণ্ডপে বসি' জন দুইচারি
চেয়ে আছে শূন্যদৃষ্টি সমুখে প্রসারি' ;
শীর্ণদেহ, ম্লানমুখ—পুরোহিত বুঝি ?—
কাষায়-বসনে বসি' আছে চোখ বুজি' ।
সব যেন শূন্য রিক্ত—আঁধার, আঁধার,
সে আঁধারের জ্বলে শুধু মুখ প্রতিমার !
সোনার দেউল যেন শ্মশানের বুকে,
মলিন দীপের ভাতি রোগ-পাণ্ডুমুখে ;
সধবার গঙ্গাযাত্রা—শাড়ী ও সিঁদুর—
উজ্জ্বল শোকের ছবি, হৃদয় বিধুর !
কাজ নাই, ভেঙ্গে ফেল, করিব না পূজা,
জলদে বিদ্যুৎ-হাসি—ওই দশভূজা !

২

বছর আরম্ভ হ'তে প্রতীক্ষা-কাতর—
বঙ্গবাসী যার তরে তৃষিত-অন্তর
গাহিয়াছে আগমনী—আজ তারি শেষ ;
বিজয়া-দশমী আজ, তবু অশ্রুলেশ
নয়নে নাহিক তার ! মণ্ডপ-মাঝারে
অকাল-বোধন-মন্ত্রে জাগাইল যারে—
যুগ-যুগ স্মরণের সেই অভিজ্ঞান,
অতীতের সাথে বাঁধা চির-বর্ত্তমান—

সমগ্র জাতির আহা সাধনার ধন,
সে কি আজও আছে, হায়, আছিল যেমন !
মাতৃশক্তি-পূজা নয়, মাতৃশ্রাদ্ধ-দিন
বাৎসরিক !—দায়গ্রস্ত পুত্র দীনহীন
করিয়াছে কোনমতে তারি উদ্‌যাপন,
আজি শেষ বর্ষকৃত্য—প্রেতের তর্পণ !

নট-কবি শিশিরকুমার

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন,
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর !—
চমকি' চাহিনু ঊর্দ্ধে, নিশার চিকুর
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বিলীন !
হেরিলাম, কলা-লক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য-লীলায় ধরি' নবতন সুর,
নয়ন-মোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন।

ছন্দ হেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান !
শব্দ অর্থ প্রাণ মূর্ত রস-রাগে !
হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান,
নর-কণ্ঠস্বরে তার কি আকৃতি জাগে !
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা-সমান—
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র তাই কাব্যসুধা মাগে !

তীর্থ-পথিক

একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর-পর,
মেলে নি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে'-
শাল্মলীর রক্ত-ভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে,
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব-কেশর !

নরত্ব দুর্লভ জানি, সুদুর্লভ কবি-কলেবর—
সত্য সে কি? মনে হয়, এই মরু-সৈকত-সমীরে,
পাই যদি প্রীতি-মুক্তা অবগাহি' লবণাম্বু-নীরে,
বাণীর উদাস-দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।

চলেছিনু ক্লান্ত-পদে সুন্দরের তীর্থ-অভিলাষে,
সমুখে পড়িল ছায়া,—বনপথে এ কোন্ পথিক
গান গেয়ে চলে আগে ? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান !
জিজ্ঞাসিনু, কোথা যাও ? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্ত্যের অধিক !
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান্।

প্রেম ও কর্ম্মফল

হরিনাম যে নিয়েছে মৃত্যু তারে নাকি
নাহি ধরে ; যে করেছে সন্ন্যাস গ্রহণ
কর্ম্মক্ষয় লাগি'—সেও শাস্ত্রের শাসন,
বিধি ও নিষেধ যত সব দূরে রাখি'
বড়ই স্বাধীন মুক্ত, নিশ্চিন্ত, একাকী।
ভক্ত যেই তার তরে নিজে নারায়ণ
একে একে সব গ্রন্থি করেন মোচন,
জ্ঞানী আত্মবলে দেয় নিয়তিরে ফাঁকি।

আর সে প্রেমের যজ্ঞ—সেই হোমানল ?—
গরলে অমৃত-পান জীবন-মন্থনে !
তাহে বুঝি মুক্তি নাই? মৃত্যু আছে তায় ?
প্রেমে শুধু কর্ম্ম আছে, নাই কর্ম্মফল ;
প্রেমে নাহি কোন ভেদ মুক্তি ও বন্ধনে ;
সৃষ্টি প্রেমে, —ফলভোগ স্রষ্টার কোথায় ?

কবির প্রেম

ভালবাসি ভালবাসা—তোমারে ত' নয় !
তোমারে বাসিলে ভাল হইত অক্ষয়
জীবনের সুধাভাণ্ড, মৃত্যু স্মিতমুখে
মূর্তিমান পুণ্য যেন পরাইত বুকে
বৈকুণ্ঠের কৌস্তুভ-রতন!—মিথ্যা নয়,
ধ্রুব সত্য—প্রেমই শুধু মরণে অজয় ।
জানি তাহা, ভালবাসা ভালবাসি তাই—
মনেরি মাধুরী সে যে—হৃদয়ে ত' নাই !

জন্মান্তরে আছে ভালবাসিবার আশা,
এ জীবনে গানে শুধু দিনু তারে ভাষা !
তুমি বুকে মাথা রেখে চাও মুখপানে—
সে চাহনি মোর চক্ষে শুধু স্বপ্ন আনে ;
সেই স্বপ্ন, সেই সুখ—তাহারি দু'চারি
কুড়ায়ে রেখেছে কবি, প্রেমের পূজারী ।

যৌবন-যমুনা

(কোনও প্রীতিমুগ্ধ তরুণ-কবি-প্রেরিত প্রশস্তি-কবিতা পাঠে)

যৌবন-যমুনা-তীরে বাজিয়াছে মোহন মুরলী
কবিতা-কদম্ব-মূলে ; তাই শুনি' আহিরিণী বালা—
জানে না সে কার লাগি'—গাঁথিয়াছে মালতীর মালা
আষাঢ়ের দিন-শেষে, হেরি নভে নবঘনাবলী ।
কোন্ সুরে কত মধু, আজও তায় নহে কুতূহলী—
কান চেয়ে প্রাণে সুখ—মনে হয় সবই সুধাঢালা !
উতলা পিরীতি তার ! বৃষ্টি নামে, নিকুঞ্জ নিরালা—
কার গলে দিবে মালা ? আঁখি তাই উঠে ছল-ছলি' ।

হেনকালে কে পশিল দ্বার খুলি' সাঁজের আঁধারে—
অধরে গুমরে গীতি, প্রভাবীন নয়ন উদাস !
সেও বাঁশি শুনেছিল মায়াবিনী যমুনার পারে,
তারি মধুগন্ধ-স্মৃতি সুরভিছে প্রাণের নিশ্বাস !
নিমেষে চিনিল তারে, না জানিতে সব ইতিহাস
সঁপিল সাধের মালা, আর্দ্র করি' আঁখির আসারে ।

স্বপ্ন-সঙ্গিনী

১

হে অপ্সরী ! এক দিন ছন্দের টঙ্কারে
স্মর-ধনু ভঙ্গ করি', দেবগণে জিনি',
লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বিনী
স্বয়ম্বর-মালা ; কি রহস্য কব কারে?—
স্বর্গ-নটী হ'ল বধূ ! অঙ্কুল ঝঙ্কারে
সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
না ফুরাতে সপ্তপদী কেন যে, বুঝি নি—
কার লাগি' পুষ্পাসব ভরিলে ভৃঙ্গারে !

আমার কামনা-ধূমে হয় নি ত' ম্লান
তোমার অলকশোভী মন্দার-মঞ্জরী,
তনু তব উঠে নাই আবেশে শিহরি'—
উচ্ছ্বাস-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান ;
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান
সেবিতে ও রূপানল সারা বিভাবরী !

২

এই মোর অপরাধ ?—পুষ্পাসব-পানে
ঘূর্ণিত আঁখিরে তব আমার পিপাসা
করে নি অরুণতর ; সুপেলব নাসা,
স্ফুরিত সঘন-শ্বাসে ক্ষোভে অভিমানে—
পারে নি জাগাতে মোর উদাসীন প্রাণে

সুচির সন্তাপ ; মঞ্জীরের মঞ্জু ভাষা
উতলা করেছে শুধু,—সর্ব সুখ-আশা
অঞ্জলি ভরিয়া আমি ঢেলেছিনু গানে।

ভাল যদি লাগিবে না রূপের আরতি,
অনঙ্গের পরাভব—হায় গো অপ্সরা !
স্মর-ধনু-ভঙ্গ-পণে কেন স্বয়ম্বরা
হ'লে তুমি ? রূপমুগ্ধ মর্ত্ত্যের সন্ততি,
জানো না কি, রতিপদে করে না প্রণতি ?-
তাই শুধু ক্ষণতরে দিয়েছিলে ধরা !

৩

আদিকাল হ'তে সকরুণ সে কাহিনী
ফিরিয়াছে কবি-কণ্ঠে—স্বর্গের অপ্সরা
কবে কোন্ মর্ত্যজনে দিয়েছিল ধরা
অন্ধ অনুরাগে ! তার পর সে মোহিনী,
যৌবন-নিশার সেই স্বপন-সঙ্গিনী,
সহসা উষার সাথে মিলাইল ত্বরা
অন্তরীক্ষে,—পুরূরবা সারা বসুন্ধরা
কাঁদিয়া খুঁজিছে তারে দিবস-যামিনী !

হায় নর ! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন !
উর্বশী চাহে না প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে যে দৃপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন !
ফাগুনের শেষে তাই সে বসন্ত-পিক
পলায়েছে ; মরু-পথে, হে মৃত্যু-পথিক,
কে রচিবে পুন সেই প্রফুল্ল নন্দন ?

স্মরণ

সায়াহ্নে কুটীরতলে বসি' একাকিনী
গাঁথিতে বকুলমালা, আপনার মনে
কেহ কি গাহে না গীত—অতীত কাহিনী-
একদা যে প্রিয় ছিল তাহারি স্মরণে?
সুখ চেয়ে স্মৃতি সে যে আরো সুমধুর,
বেদনা-সুরভি! দিনশেষে সন্ধ্যা যথা,
ভোগশেষে উপভোগ,—হৃদি-ভরপুর
রাধিকার স্মৃতিময়ী শ্যামের মমতা!

তবু স্মৃতি স্বপ্ন আনে ভরিয়া নয়ন,
সেই সুরে বেজে ওঠে মনের মুরলী,
করাঙ্গুলি চাহে পুনঃ করিতে চয়ন
সেদিনের ফোটা-ফুল—অশ্রু-মুক্তাবলী।
মনে হয়, বৃন্দাবনে বাজিছে বাঁশরী,—
নাই শুধু অভিজ্ঞান, সে গেছে পাসরি'!

মরণ

জীবনের সব কক্ষ উচ্চ-নীচ-ক্রমে
ঘুরিয়া তোমার সঙ্গে শেষ কক্ষে দেখা ;
আলাপ-বিলাপ শেষে চুপে চুপে একা
ভেটিব তোমারে, বন্ধু, সংজ্ঞা-অপগমে।
মুছিয়া লইতে যদি ভুলে যাই ভ্রমে
বিফল বাঞ্ছনা আর লাঞ্ছনার রেখা—
ললাটে নয়নে যাহা রহিয়াছে লেখা,
মুছে দিও জীবনের জ্বর-উপশমে।

হে মরণ, সংসারের লজ্জা-নিবারণ!
ক্লান্ত নট,—নাট্য-শেষ তুমি যবনিকা ;
বৃন্দাবন-প্রান্ত-বাহী গভীর-গাহন
শীতল যমুনা তুমি, জুড়াবে রাধিকা।
তুমি সর্বভয়ত্রাতা, অভয়শরণ!
তুমি আছ, তাই জন্ম নহে প্রহেলিকা।

মহানিদ্রা

('When we are all Asleep'—Robert Buchanan)

ঘুমায়ে রহিব যবে মৃত্যু-ঘুমে যত নর-নারী,
বাল-বৃদ্ধ যুবা-শিশু—ফিরিয়া কি প্রভু সে সময়
সবাকার কানে-কানে মৃদুস্বরে সস্নেহে উচ্চারি'
কহিবেন—"জাগো"? হয়তো বা নারিবেন দয়াময় ;
উদিবে তখনি মনে—জেগে উঠে' ওই চোখগুলি
মেলিবে যে আঁখিতারা স্ফটিক-কঠিন, আমি তায়
সহিব কেমনে ! "ঘুমাইয়া ছিনু মোরা সব ভুলি'—
এ দয়া যে অসময়ে!" যদি কাঁদে, কি বলিব হায়!

মনে হয়, হেরি সেই গাঢ় ঘুমে মহাশান্তিসুখ,
দয়াময় দয়া বুঝি করিবেন যত মৃতজনে ;
মর্মরিবে চিত্তে তাঁর এই কথা বুঝি সেইক্ষণে—
"বড় দুঃখী ছিল এরা ধরাধামে—আদৃষ্ট বিমুখ,
পরিশ্রান্ত পান্থ সব সহিয়াছে নিদারুণ দুখ,—
আহা থাক্ ঘুমাইয়া, কাজ নাই পুন-জাগরণে।"

বন্ধু

(Brother Death—Edward Dowden)

যেদিন আসিবে, বন্ধু, সঙ্গে লয়ে যেতে সেইদেশে
নাই যেথা দিবালোক, আছে শুধু তিমির তরল—
মধুর অধরপুটে করিও না প্রেমিকের ছল
গুঞ্জরি' অস্ফুট-ভাষে ; আঁখিকোণে মৃদুহাসি হেসে
বাজায়ো না বাঁশিখানি—যেন মধু-মিলন-আবেশে ;
অথবা ভয়াল বেশে করিও না পরাণ বিকল,
মেঘ-ঝড়ে অট্টহাসে পথখানি কোরো না পিছল—
তুমি যে আপন জন, হেন কাজ করিবে কি শেষে!

না, না, এসো! সকল চাতুরী-ছল দূরে পরিহরি'
তোমার স্বরূপ-রূপে, প্রাণসখা! শ্মশান-ঈশ্বর !
বাড়াও বাহুটি তব, তারি 'পরে করিয়া নির্ভর
হেরিব নীরব ওষ্ঠে অতিমৃদু হাসির লহরী !
নির্ভয়ে রাখিব মাথা তব স্কন্ধে—ঘনঘোর করি'
যেথায় অলক-নীল রচিয়াছে তিমির-নির্ঝর!

অগ্রন্থিত - কবিতা

স্বর্গারোহণে

সমাপ্ত সাধনা তব হে মুক্ত সন্ন্যাসী
অজেয় অমর—সিদ্ধকাম বুঝি এবে ;
নিবে গেছে চতুরগ্নি অন্ধতমো নাশি
উষার আলোকরেখা প্রকাশিল যবে।

সারাটি রজনী জাগি' রাখিলে জাগায়ে
যে পবিত্র অগ্নিশিখা নহে সে ত আজি
নির্বাপিত ! শুধু গেছে অসীমে ছড়ায়ে
দিব্য প্রভা তার ; এখনো উঠিবে বাজি
প্রতি পলে পলে উর্ধ্ব হ'তে মন্ত্র তব !

স্নানান্তে দাঁড়াব' তাই শুভলগ্নে আসি'
তোমার তপস্যা শেষে, আশীর্বাদ লব
যুক্ত করে নত শিরে—দিবে স্মিত হাসি'
অদৃশ্য মঙ্গল হস্তে সিদ্ধ সাধনার
হোমানল—ভস্ম-টীকা ললাটে সবার।

অক্টোবর ১৯০৭

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মোহিতলালের প্রাচীনতম কবিতা।
সম্ভবত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত।

বিজয়া-দশমী

বিজয়া দশমী আজি ; অশ্রুসন্ধ্যা তার
চিরন্তন কাহিনী সে এনেছে বহিয়া।
উৎসবান্ত-সঙ্গীতের যেন মূৰ্ছনার
ক্ষীণ স্মৃতিটুকু পক্ষ রহিয়া রহিয়া
কাঁপিছে জাহ্নবীজলে চন্দ্রকরহার।

থামিয়াছে সানা'য়ের বিষাদ-রাগিণী
শেষ দীপ নিভে গেছে মণ্ডপ আঁধার,
স্তব্ধ-শূন্য জেগে আছে—সে স্মৃতি-বাহিনী।
হায় মাগো এসেছিলি তুই কি অভয়া
সত্য এ অভাগা বঙ্গে বরাভয় হাতে?
না শুধু এ উপহাস নিষ্ঠুর নিদয়া।
—চিরবিসর্জন বুঝি বহুপূর্ব রাতে
হয়েছে সে প্রতিমার, তারি ভ্রান্তিময়!
মূঢ় মোরা, প্রতি বর্ষে করি অভিনয়।

জাহ্নবী, কার্তিক ১৩১৫

সুন্দর

তোমার বিশাল পুরে কোন গান বাজিতেছে নিত্য অহরহ,
সারাটি চেতনা বাহি' মূর্ছি' আছে কোন রূপ, কহ দেব কহ,
আমার নয়ন' পরে রহে জাগি' স্বপ্নসম কি সে তব মায়া,
কার ধ্যান হৃদে জাগে মুগ্ধ ফিরি ঘুরে ঘুরে হেরি কার ছায়া।
মনে হয় রহি বসে' সারা নিশি প্রতীক্ষায় কার পথ চাহি',
কবে ধরা দিবে তার পরিপূর্ণ ছবিখানি, তারি গান গাহি।
কোন মন্ত্র পড়ি দে'ছে, এ মোর পরাণ 'পরে কোন যাদুকর,
বিশ্বের সকল সুর মিলিয়াছে এক সুরে দীপ্ত মনোহর।
আকাশে বাতাসে নাই আর কিছু কাণাকাণি, শুধু তারি কথা ;
তটিনী শিহরি উঠে, শত ঊর্মি চুপে চুপে জাগায়েছে তাহার বারতা।
আমি শুধু বসে আছি বুঝি না কিছুই তার, কেন এ বেদনা
হৃদয়ের ঊষা হ'তে আছে সাথে চিরদিন, আবিষ্ট চেতনা!
মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তার পাই দেখা, দিবসে নিশীথে
বিশ্বের ঘোমটা খুলি, তড়িৎ-চকিত-আঁখি কি বসন্তে শীতে
দেখা দিয়ে চলে' যায়, পিছে আর নাহি চায়, আমি চেয়ে থাকি,
যদি সে আঁচল তার অধরের হাসিটুকু পড়ে' থাকে বাকি—
তাই লয়ে রচি পুনঃ সুন্দর অমর বপু, গাহি মৃদু গান,
আনমনে কেটে যায় দীর্ঘ সে বিরহ নিশি, পুলকিত প্রাণ!
কখনো হাসিটি তার ফুটে উঠে ফুলে ফুলে প্রভাতে সুন্দর,
মৃদু মন্দ গন্ধবহ আনি দেয় কেশ-গুচ্ছ-সুবাসমধুর,

মদির নয়ন শোভা ঢ'লে পড়ে দিবা শেষে গগন কিনারে,
খচিত নিবিড় কেশ রজনীর সমাগমে নানা রত্নহারে ;
অভিমান ভরে কভু অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি করে ছল্ ছল্—
নিদাঘ সায়াহ্নে যবে নব মেঘ জল ভরে করে টল্মল্।
এমনি ত' কেটে যায় আমার সকল দিবা পথ চেয়ে চেয়ে,
তৃষিত এ মম কণ্ঠ, শুষ্ক ওষ্ঠ, পরিপূর্ণ পাত্র নাহি পেয়ে।
আভাসে যতই হেরি ও তব মোহন কান্তি হে শিব সুন্দর,
অতৃপ্ত আকাঙক্ষা মম বেদনায় উছলিয়া উঠিছে অন্তর।
তোমার ও বিশ্বরূপ বিশ্বের সকল মাঝে নির্বিশেষে নাথ,
আমার নয়ন 'পরে জাগিবে না কোন দিন—সে পুণ্য প্রভাত!

মানসী, আষাঢ় ১৩১৬

মন্দির-পথে

সাঁঝের আকাশে হৃদয় রাঙিয়া বিদায়ের কালে আঁকি'
হেমন্ত দিবা ধীরে নেমে গেছে কুহেলি জড়িত আঁখি।
মাঠের আকাশে সুদূর সীমায় গহন তিমির তীরে
ক্ষীণ শশিরেখা পাণ্ডু আলোকে জাগিয়া উঠিল ধীরে।
শীতল বাতাসে শিহরিছে শ্যাম ধরণীর চেলিখানি,
—আলোকে আঁধারে ছায়া মায়া ঘোরে ঘুমায় বক্ষে টানি।
মন্থর বায়ে মৃদু শোনা যায়, কোথায় উদাস স্বরে
খেয়া শেষ করে' পাটনী গাহিছে একা তরণীর প'রে।

এহেন সময়ে সবিজন পথে পথিক চলেছি একা ;
তরুশিরে ম্লান জ্যোৎস্নার মত হৃদয়ে কি আশা রেখা!
সারাদিনমানে আলসে যাপিনু করিনু কি হেলা ফেলা
তরিতে বাহিরি' এনু একা তাই শুধু এ সাঁঝের বেলা।
দূর মন্দিরে আরতি বেজেছে নিশীথ আকাশ ছেয়ে,
সন্ধ্যার তারা ইঙ্গিত করি' দূর হতে ছিল চেয়ে।
অনন্ত নিশা চুপে পাঠায়েছে চন্দ্রিকা তার যেন—
মরম দু'য়ারে সাগর জুয়ার উচ্ছল হয় হেন!
মনে হয় যেন শুনিতে পেয়েছি কি গান গাহিছে তারা—
ছায়ালোকতলে বিরাট দেউলে, আকুল হৃদয় সারা।

সবে মিলে সুর ধরেছে গভীর উদাত্ত, অসীমায়,
—ধূপাধার হ'তে ধূপ ধূমসম ঊর্ধ্বে মিশিয়া যায়।
বিশ্বনিখিল ফুটে' উঠে যেন কাহার পূজার ছলে,
শতদল সম সমীর পরশে মোহন মন্ত্র বলে!
স্ফুটনোন্মুখ হৃদয় আমার, তাহারি একটি দল
আলোক-আঁধারে খোঁজে দিশাহারা পরম-চরণ-তল ।

মানসী, পৌষ ১৩১৬

ধূমকেতু

কল্পান্তের সহচর, উপপ্লব-হেতু,
বিশ্বনাশ অমঙ্গল আমি ধূমকেতু।
উড়ায়ে পিঙ্গল-পুচ্ছ নিশীথ আকাশে
অনন্ত-দাহন দেহ সচকিত ভাসে
গ্রহ উপগ্রহ পরে ; সুপ্তি শ্রান্তিহীন
অনন্ত এ শূন্যপথে ছুটি নিশিদিন
গগনে গগনে,—যেথা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী
আলোক সভায় বসি আনন্দে উছলি'
গাহিতেছে চিরদিন সৃজনের গান—
কবে হবে সেই সৃষ্টি পূর্ণ অবসান
মহা অন্ধকার মাঝে, অন্ধ গতিহারা
কবে এই বিশ্বচক্র মহাকালধারা
স্তম্ভিত হইয়া যাবে ক্রমমন্দ স্রোতে,
উচ্ছৃঙ্খল অনিয়ত ভীম গতি হ'তে
হবে মুক্তিলাভ—অগ্নিস্বপ্ন, তারি লাগি',
বিশ্বের দীপ্তি পরে রহিয়াছে জাগি'।
সৃষ্টির বোধনদিনে মহোল্লাসে মাতি
মঙ্গলজনম লয়ে, দিশে দিশে পাতি'
আপন আসন, ছুটেছিল গ্রহতারা
যে শক্তি ধরিয়াছিল সর্বস্বার্থহারা
সুবিশাল নীহারিকা-জননী জঠরে,
তিলে তিলে সংহারিয়া, অতি ক্ষীণ করে'
আপনারে, দিয়েছিল যেই তেজ হায়,
পূর্ণ গ্রহণের লাগি'—অবহেলি তায়

সমাপ্ত না হ'তে তার পূর্ণ-সংহরণ
না ধরিতে পারি তার উৎকট স্পন্দন,
অন্ধ হয়ে বাহিরিল শিশু-চেতনায়,
বিশ্বব্যোম আন্দোলিয়া সীমা অসীমায়
নিয়ন্ত্রিত মহাঘূর্ণাপথে, সেই ক্ষণে
ব্যর্থ তেজের শেষ, ক্ষুব্ধ আমন্ত্রণে,
টঙ্কারিয়া নিক্ষেপিল অগ্নিশর সম,
প্রলয়ের ধূমশিখা ভয় মূর্তি মম!
ছন্দে ছন্দে আবর্তিয়া গ্রহ তারাদল
গাহিতেছে চিরদিন আলোক চঞ্চল
বিশ্বের জীবন গীতি, স্বপ্ন স্বপ্ন সহচর
ষড়ঋতু ফিরিতেছে ঘুরি' পবম্ভ পর
মানস উদ্যানে তার, বিচিত্র বিভায়
ফুটিতেছে সকলের দিগন্ত রেখায়
ভুবন মোহন জ্যোতি ; হরিৎ নীলিমা
রঞ্জিয়াছে তার দুকূল অঞ্চল সীমা।
সব আয়োজন পূর্ণ উৎসবের মত ;
(তবু) তারি মাঝে জীবনের উপদ্রব যত
রহিয়াছে অতন্দ্রিত মহাভয়ঙ্কর
নাহি শান্তি, নাহি প্রেম, নাহি অবসর
মিলনের ; কত শ্রমে কত না যতনে
বয়ন করিছে যেই সুন্দর স্বপনে—
যেমনি সার্থক করি তুলিবে তাহায়
সুপ্তোত্থিত বিপ্লবের মত্ত ঝটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন করি দেয় কুয়াসার সাথে,
—সৃজন করিয়া নাশে আপনার হাতে!
এ দারুণ অভিশাপ, নিয়তির মত,
পাছে পাছে তার ঘুরিতেছে অবিরত ;
আমি তারি ধ্বজা, প্রলয়ের অগ্নিকেতু
সৃষ্টির মঙ্গল মাঝে অমঙ্গল হেতু
জন্ম মোর। চন্দ্রালোকে তুহিনের প্রায়,
রবিকক্ষে রাহু মত, মিলন শয্যায়
আসন্ন বিচ্ছেদ, জীবনের মধ্যদিনে
অকাল মরণ, কোন্ যমুনাপুলিনে
অফুরাণ অশ্রুজল, প্রেমের উৎসবে
প্রাণস্রুত হাসিধারা অধর সীধবে

ফেনোচ্ছল হইবার কালে, প্রতিভার
পূর্ণ পরিণতিচ্ছলে উন্মাদ আকার
চিত্তের বিভ্রম, সত্যপন্থী ধার্মিকের
অহঙ্কার মোহ, নব-পুষ্প-কোরকের
প্রাণহারী দুষ্ট কীট, স্নেহের অন্ধতা,
জ্ঞানবৃক্ষে তিক্ত ফল পাপ নাস্তিকতা!
সৌন্দর্যে মোহিনী, বিষ মধু মদিরার,
আলোকের পাশে আমি চির অন্ধকার।
অতিদূর অতীতের ধ্রুব কর্মফল
কর্মীর বিস্মৃতিপরে অচল অটল—
সর্ব্বকাল জয় করি নিগূঢ় বেদনা
পীড়িত করিয়া থাকে সুষুপ্ত চেতনা।
যে প্রবৃত্তি শক্তি লয়ে দানবের মত
খেলিয়াছে উন্মত্ত অধীর, অসংযত
তীব্র বাসনার সেই গুপ্ত ইতিহাস,
অদৃষ্টের মর্ম্মন্তুদ মহা পরিহাস!—
তাই আমি, কাল পত্রে লেখা অগ্নি দিয়া,
কর্মসাথে নাহি যোগ, শুধু প্রতিক্রিয়া।
তারি পথ আঁকিতেছি,-জ্বালারেখা টানি
অনন্ত আকাশে। সেই মহাশেষ আনি'
বিভীষিকা জন্ম মোর ঘুচিবে যখন,
দাহ শেষ পুচ্ছ মোর অসিত বরণ
মিশে যাবে প্রলয়ের অন্ধকার সাথে,
কর্মহীন অচেতন মরণের রাতে।

মানসী, বৈশাখ ১৩১৭

পদ্ম-ফোটা

প্রভাতের পদ্মটিরে,
হেরিনু সরসী নীরে,
        সানন্দ-বিহ্বল,
তখন আকাশ রাঙা,
সিঁদুরের কৌটা ভাঙ্গা,
        ছিন্ন মেঘ-দল।

নিলীম শয়নে তলে,
তল তল স্নিগ্ধ জলে,
হাসি মুখখানি,
আধ' নিদ্রা জাগরণে
ফিরাইয়া আনমনে,
কেহ নাহি জানি।
উপরে আকাশ পানে,
চেয়েছিল কি সন্ধানে,
বিস্ময়-মগন,
অঞ্চলে কাঁপায়ে ধরি',
তারাটিরে বিভাবরী
পলায় তখন।

মনে হয়, ঘুম কার,
ভাঙ্গিয়াছে এইবার,
কৃষ্ণ নিশা শেষে,
গহন আঁধার তলে,
স্বপনের রসাতলে,
গিয়েছিল ভেসে ;
সেথায় অসুর দল,
হুঙ্কারিছে অবিরল,
মেঘে ও পবনে,
রজনী, তিমির রাণী
মুখেতে আঁচল টানি,
মুদ্রিত নয়নে।
সর্বোপরি সিংহাসনে,
ভীষণ ভ্রূকুটি সনে,
ছিল সেথা বসি—
বিভীষিকা-রুদ্ধশ্বাসে,
স্তম্ভিত দারুণ ত্রাসে,
দল যায় খসি'।

হেনকালে ধীরে ধীরে,
ধুলায় কপোলে শিরে,
হিমস্পর্শ কার—

বার বার আঁখি খুলে',
উপরে আকাশ তুলে'
স্পন্দ নাহি আর।
গত যামিনীর কথা,
স্বপ্নসম দূরগতা,
স্মিত হাসি মুখে,
চেয়ে চেয়ে দেখে দূর,
গোলাপী উষার পুর,
—সরসীর বুকে।
একি স্বপ্ন-জাগরণ,
একি মায়া আবরণ
খুলিল নিমেষে!—
নবীন আলোক লভি',
তমিস্রায় পদ্ম কবি
গাহিল আবেশে।

"কোথায় নবীন উষা
পরেছে বরণ-ভূষা
বিবাহের বেশ,
কুয়াসা ওড়না খানি,
দিয়াছে আঁখিতে টানি'
ঢাকিয়াছে কেশ।
উজল্ নিলীমাকাশ,
শুভশংসী ধূপ-বাস,
ধূসর বাসর ;
কাহার নয়নে জল—
অন্ধকারে অবিরল
তুহিন-নিঝর!

হাতে ধরি' কে তুলেছে
এতকাল কে ভুলেছে
দাসীরে বধূরে?
আজিকে দেখিব তারে—
কোন্ বর বিধাতারে,
লগন মধুরে—"

সহসা কুয়াসা সরে,
দেখিল আঁখির পরে
　　কার প্রেম-মুখ!
চকিতে সরম মাখা
মু'খানি গেল না ঢাকা,
　　ওষ্ঠে হাসি টুক্।
একে একে দলগুলি
শিথিল পড়িল খুলি',
　　সলিলে ঢলিয়া,
পদ্মরাঙা হয়ে উঠে
দুষ্ট উষা গেছে ছুটে
　　কখন চলিয়া।
প্রভাতের পদ্মটিরে,
হেরিয়া সরসী-নীরে,
　　আঁখি ছল্ ছল্—
এ মোর হৃদয়-পদ্ম,
এমনি ফুটিবে সদ্য,
　　কবে তোরা বল্!

বীরভূমি, অগ্রহায়ণ ১৩১৭

মানসিক

১

সারাদিনমান পল্লীর পথে বিজনে,
রৌদ্র আতপে ক্লান্ত কপোত কূজনে
　　মনে হয় কোথা শান্তি শীতল
　　শ্বেত গম্ভীর মন্দিরতল,
　　ধ্বজা যার উড়ে আকাশের গায়,
　　শ্যাম তৃণে ছায়া আলিপনা পায়,
শুধু গুঞ্জন দূর হতে আসে
　　　নীরবতা ঘন করি,—
আমি কবে সেথা পুঁছছিব, তাই
　　　আছিনু কেবল স্মরি।

২

সেথায় সন্ধ্যা নামিয়াছে মৃদু চরণে,
গোধূলি ধূসর দিবালোক ছায়া বরণে।
চন্দ্র উদিবে পূর্ব কোণায়,
আঙ্গিনাটি যাবে ধুইয়া সোনায়।
আরতি-বেলায় শেফালির ফুল
বিকশি উঠিবে সুরভি আকুল,
ধূপের মধুর গন্ধে উতল
উঠিবে, দেউল ভরি,—
আমি কবে সেথা পঁহুছিব, তাই
রয়েছি কেবল স্মরি।

৩

কলকোলাহল থেমে যাবে সব সুদূরে,
নীরব রাগিণী বাজিবে আকাশে মধুরে
মন্দিরতলে জাগিবে না কেহ,
পুরোহিত তুমি গৃহে চলে যেও!
আমিই জাগিব মুক্ত দুয়ারে,
অমৃত স্বপনে জ্যোৎস্না জুয়ারে—
নিবে যাবে শশী জাগিব বাসর
আঁধারের চেলি পরি'—
আমি কবে সেথা পঁহুছিব, তাই
আছিনু কেবল স্মরি'।

বীরভূমি, পৌষ ১৩১৭

প্রসাদ

অজানা দেশের অজানা অতিথি মন্দির মোর ঘর,
সকলেই হেথা আপন আমার সকলেই মোর পর।
প্রভাতে যখন দলে দলে আসে নর-নারী অগণন—
আঁচল-উতরী' গলায় জড়ায়ে আপনারে করে পণ.
হৃদয় আমার তাহাদেরি সাথে দেবতার পদে নমে,
এতগুলি মোর আত্মীয় মিলি' আত্মায় মোর রমে।

সন্ধ্যায় যবে বন্দনা শেষে একে একে যায় চলি ;
হৃদয় আমার বিজন-পুলকে ভরি' উঠে উচ্ছলি'।
তাহাদের পূজা, তাহাদের প্রীতি, একক করিয়া মোরে,
একটি পাত্রে ঢেলে দিয়ে যায়, আমারি হৃদয় ভরে'
নিম্নে ফুটিছে নিশীথের ফুল, ঊর্ধ্বে তারার দল,
তারি সাথে ফোটে অতুল গর্বে হৃদয়ের শতদল।

বীরভূমি, মাঘ ১৩১৭

নির্মাল্য

গোলাপ-রাঙা ফুলের মত মরম খানি ছিঁড়ে'
আজকে আমি দিলাম রেখে সন্ধ্যা-পূজার বেলা—
শেষ করে মোর দাও গো প্রভু, ঝরা-ফোটার খেলা,
অস্ত-উদয় আলোক-আঁধার চুকিয়ে পাতার ভিড়ে।

বাজাও শঙ্খ, ধূপের ধূমে পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে,
লও গো তুলে' দু'হাত ভরি' নবীন পুরোহিত,
চন্দন সে দাও বা না দাও, আছেই সুলোহিত,
দেবের রাঙা চরণ-তলে বারেক রাখো ফেলে।

তাহার পরে রইব চেয়ে সোনার বরণ প্রাতে,
শুকিয়ে যাব আঙ্গণ-কোণে দূর্বাদলের মত ;
সুদূর হ'তে আসবে যখন পান্থ পথিক যত,
একটি পাতা চাইবে না কি তীর্থ-ধূলির সাথে?

মানসী, ফাল্গুন ১৩১৭

তন্দ্রাতুর

প্রহরে প্রহরে জাগিয়াছি আমি, এখন ভোরের রাতে
ঘুমের ডোরটি জড়ায়েছে মোর আতুর আঁখির পাতে।
তন্দ্রাকুহেলি' আকাশে বাতাসে রচিয়াছে কার মায়া,
নয়ন সমুখে ঘনায়ে আসিছে কালো কালো কত ছায়া।

ঝাউএর শাখায় বাতাসের ধ্বনি রিম্ ঝিম্ করে কাণে,
আধ জাগরণে আধেক স্বপনে পরাণ তরাস মানে।
মাথাটি ঢলিয়া পড়িছে বক্ষে, শিথিল সকল দেহ,
মনে হয় কোথা নামিতেছি আমি, কোন রসাতল-গেহ!

বাহুর শিথানে শীতল সোপানে পড়ে' আছি নাহি জানি,
মন্দির মোর দুয়ারে রুদ্ধ সে কথা আর না মানি।
অলস তনুটি টানিয়া লইনু ভিতরে মোহের ঘোরে,
দেখিনু সেথায়, দেবতা কোথায়? প্রতারণা কেন মোরে–
বিকট আকার প্রেতের মূর্তি দাঁড়াইয়া সারে সারে,
নীরব সভায় আধেক আলোক আধেক অন্ধকারে।
মাথার উপরে শূন্যে দুলিছে বৃহৎ কৃষ্ণ ফণী!
বাহিরে আসিনু ভীতিবিহ্বল শিহরি' প্রমাদ, গণি'।
প্রভাতের বায়ু আর্দ্রশীতল পরশ বুলায়ে গেল,
বারেক শিথিল তন্দ্রা আবার ঘনতর হয়ে এল।
মনে হয় যেন মন্দির নয়, এ কোন প্রমোদশালা ;
বসনে ভূষণে উলসিছে হেথা উজল দীপের মালা।
ধরণী ঘুরিছে, মাথাটি টলিছে, লালসার কলরোল,
বিবশ পরাণ ডুবিয়া গিয়াছে, মদিরা দিতেছে দোল।
ফেনিলোচ্ছল সঙ্গীত ধারা, হা' হা'—রব তার সাথে,—
অন্তর মাঝে প্রতিরব জাগে—কখন জাগিনু প্রাতে।

মানসী, বৈশাখ ১৩১৮

থিওক্রিটাসের অনুকরণে

(ভিক্টর হিউগো)

নদীর তীরে কাশের বনে একলা ছিল বসে',
পা' দু'খানি জলের আলিঙ্গনে,
স'রে গেছে কপাল হ'তে ঘোমটাখানি খসে'
ধৃষ্ট বায়ুর শতেক চুম্বনে,—
স্বপন দেশের পরী-মেয়ে আমার মনে হ'ল।
কইনু ধীরে, মাঠের' পরে যাবে, এস চল'।

আমার দিকে এমনি করে' রইল চেয়ে বালা,
চাওনি সে যে দীপ্ত অচঞ্চল!
যেমন করে' চাইলে পরে বন্দী রূপের ডালা
প্রভুর প্রাণও করে টলমল।
গুঞ্জরিনু, 'মধুমাস, ঘাসের উপর দিয়ে,
ঘন বনের মাঝে, এস, তোমায় যাই নিয়ে।'

ঘাসের উপর পা'দুখানি ধীরে নিল মুছে,
—ঘাসের দলে কি আনন্দ জাগে!
বারেক তবু চাইল, যেন, কি জানি কি বুঝে',
দেখ্‌ল যেন প্রাণের ভিতরটাকে,
চিন্তা-মধুর মুখটি, তবু ধৈরয না মানে।
বনের পাখী সমস্বরে কি গাহিল গানে!

মেতে উঠে ঢেউ'এর দল কূলের উপর এসে
শিউরে' সবাই কর্ছে গলাগলি ;
বুকটি খোলা, ঘোমটা নেই, কাশের সারি ঘেঁসে,
আমার দিকে বাইরে এল চলি'—
উদাস স্বাধীন ললিতার চক্ষু ঢাকে চুলে,
তারি মাঝে হাসিটি তার ছড়িয়ে পড়ে খুলে।

বীরভূমি, বৈশাখ ১৩১৮

শেষ গান

ফুলগুলি সব ফুটে' ফুটে' গেল
কানন গহন তলে,
তারাগুলি ওই সব ফুটে যায়
সাঁঝের গগন তলে,
প্রভাতের মেলা কোথা ভেঙ্গে যায়,
সকল পথিক পথ পানে চায়
দিবসের সাথে দিনের ফুরায়
সকলের পাওয়া-চাওয়া,
শেষ হবে কবে শুধু ভাবি মোর
ভিখারীর নাম-গাওয়া।

শেষ হ'য়ে সে যে শেষ হ'য়ে যাবে
সকল শেষের মাঝে!
ঝরিবার মত ফোটেনি 'ত' গান,
এখনো এ ভরা সাঁঝে।
হৃদি গীত-হীন, ধূলি লীন বাঁশি,
টুটে' যাবে মোর পরাণের হাসি,
আঁধার নয়নে আলোকের রাশি
নিবে যাবে চিরতরে—
শেষের গানটি এখনো প্রভু গো
থাক্ অনেকের পরে।

একদিন যবে বাহুটি অলস,
বীণাটি পড়িবে বুকে,
মরণ-বরণ রুখু কেশপাশ
আবরিবে চোখেমুখে,
অধর আঁকিবে সেকি হাসি-রেখা!
নয়ন কিনারে সলিলের লেখা
আছে কিনা আছে নাহি যাবে দেখা
গুঞ্জরি অফুরাণ—
সব-শেষ-গীত সহসা কখন
হ'য়ে যাবে অবসান।

বীরভূমি, শ্রাবণ ১৩১৮

শ্রাবণে

গগন আঁধার ঝরে বারিধার জনহীন যমুনায় ;
এমন বাদলে, আঁখি ছলছলে সুগভীর বেদনায়।
কুলে কুলে জল, করে টলমল, চঞ্চল বহে বায় ;
দুটি চোখ কার, অশ্রু আঁধার, দেখিবারে নাহি পায়।

বাঁশরীর তান আকুলিছে প্রাণ, এখনো বাজিছে কানে ;
তমালের তলে সে যে কুতূহলে দাঁড়াইত এইখানে।

কত না বরষা, পরাণ বিবশা, শ্রাবণের আঁধিয়ার,
হরষ সরস তনুটি অলস, মঞ্জু সে অভিসার—
মেঘ গুরু গুরু, হৃদি দুরু দুরু, সঘনে কাঁপিছে বালা ;
কুঞ্জ দুয়ারে এ চাহে উহারে এখনো এলো না কালা।
পলকে পলকে দামিনী ঝলকে, যমুনার কলরোল ,
'হোথা শুনি কিযে!—বাঁশরী কাঁদিছে, সখি সখি, ধরে' তোল'
নিশি নিশি তাই কাঁদিয়াছে রাই, অবিরল বারিধার
আঁখি জল তার ফুরাল না আর, বরষা ভরসা সার!

সে কলরোদন অতুল বেদন ভোলেনি লহরী মালা,
আকাশে বাতাসে বিরহ হুতাশে কাঁদিছে ব্রজের বালা।
বাঁশী যেন কার ওই বার বার শোনা যায় সমীরণে,
সে যে কতদূর!—করিছে বিধুর—কি ছিল বঁধুর মনে!
কদম্ব আজ শিহরি সলাজ ফুটিয়াছে থরে থরে,
নব আনন্দে মদির গন্ধে তেমনি পাগল করে।
কেতকী কুতুকী, গুণ্ঠনমুখী, শ্বসিছে সুরভি শ্বাস,
আজিকে সকল হয়েছে বিফল বরষা বরষ মাস!
শ্রাবণেব রাতি, নিবিয়াছে বাতি নিখিল মানব ঘরে,
বাহির ভিতর ধারা ঝর-ঝর আকুল মেঘের স্বরে।
একখানি ছবি, ভরিয়াছে সবি, শুধু তারি গান জাগে,
তাহারি বিরহ শুধু অহরহ পরাণে প্রবেশ মাগে।
যমুনার তীর, পবন অথির, মেঘ এলায়েছে বেণী,
একূলে ওকূলে শাখা দুলে দুলে গুমরে বনের শ্রেণী।
কূলে কূলে জল করে টল্‌মল্‌ উন্মদ বহে যায়,
দু'টি চোখ কার, অশ্রু আধার, দেখিবারে নাহি পায়।

বীরভূমি, শ্রাবণ ১৩১৮

সূর্যাস্ত

আবার মিনতি করি' চাহিল দিবস-রাণী
বড় দু'টি ছলছল করুণ নয়নে,
দিবে না দিবে না ছাড়ি' বাসন্তী উতরী' খানি
—পড়েছিল প্রভাতের বাসক-শয়নে!

ধূসরিত নীলাম্বর, কবরী-শিথিল কেশ,
মেঘতলে নিপাতিতা বিধুরা বধূরে
আদরে তুলিয়া ধরি', চোখে তাঁর অশ্রুলেশ
কহিলা দিনেশ, চাহি' দুয়ার অদূরে—

আসি নাই কবে বল, ধরি নাই প্রেমভরে
গোলাপী অঙ্গুলীগুলি পূরব-দুয়ারে,
ঊষা তার স্বর্ণঝারি ধরেছে পথের 'পরে,
দিগ্‌বালা চেয়েছিল, এ জন উহারে।

তেমনি আসিব প্রিয়ে, ঘুমায়ে পড়িও তুমি,
বল কভু জাগিবে না পথ চেয়ে চেয়ে?
এই দেখ, এই বেশে, সুরভি অলক চুমি'
আঁখি দু'টি ফুটাইব মৃদু গান গেয়ে।

এত বলি দিনমণি উত্তরীয় ফিরে' লয়ে
রাঙ্গা চেলি পরে পুনঃ গোধূলি লগনে ;
সে রূপ নেহারি' দিবা আবেশে বিহ্বল হয়ে
শুনিল পূরবী গীতি গগনে গগনে।

হোথা অস্তাচলপাশে অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে ছিল
অসিত-বসনা সন্ধ্যা অভিসার-বেশে,
বাহুটি মধুরে রাখি' গিরি পরে, হেলি' দিল
অলস তনুটি তার আলুলিত কেশে ;

কক্ষে লয়ে মুক্তাঝাঁপি, পূর্ণ রতন-মঞ্জুষা,
শ্লথ চেলাঞ্চল তার লুটিতেছে পায়—
বিলম্ব সহে না আর, এক-তারা-সীঁথি-ভূষা
খুলিয়া ললাটে পবে অস্ত-প্রতীক্ষায়।

উজল আলোকে তার চমকি' চাহিল দিবা,
পলক ফেলিতে রবি অস্তে চলি' গেল,
সকল শোণিমা হরি' দিগন্ত কপোল-বিভা
মূর্ছাপরে মানিনীর নীল হয়ে এল।

মানসী, শ্রাবণ ১৩১৮

মালা গাঁথা

সাজিটি ভরিয়া প্রভাতের বেলা পুণ্য সিনান শেষে,
কে গো পূজারিণী গাঁথিতেছে ফুল আর্দ্র এলানো কেশে?
সিত সীঁথি মূলে তরুণ অরুণ সিঁদুর দিয়েছে ঢালি ;
স্বপন-মাখানো আঁখিতে দিয়েছে আরতির আলো জ্বালি।
শুভ্র বসনে ফুল্ল কুসুম তনু লতিকাটি নত!
ঈষৎ রক্ত কম করতল স্থল কমলের মত।
কি মালা গাঁথিবে—বিনা সুতে বুঝি?—মোহন কুসুম শর,
গলে যদি তাঁর নাহি উঠে তবু রাখিবে চরণ 'পর।
শিশিরে ভেজানো শেফালির দল অশ্রু-সুরভি ভরা,
আহা সে কামিনী শিথিলবৃন্ত পরশে গেল না ধরা!
ফুল বীথিকার চামেলি পসরা মালায় সাজিবে ভালো?
গরবী চাঁপার সোনার পাপড়ি সাজিটি করেছে আলো।
আধ' ফোটা কলি বেলা মালতীর মুখে ত' ফোটেনি হাসি,
টগর করবী সুরভি ভরেনি' কোমল কুন্দরাশি।
শিশিরে ভেজানো শেফালির দল অশ্রু সুরভি-ভরা—
তাই দিব হাঁ গা, হাসির রেখাটি পড়িবে না তায় ধরা।

গত প্রদোষের তারকার মত বকুল কুড়ায়ে আনি'
নিশীথ আঁধারে গাঁথিয়াছ মালা নয়নে নিদ্ না মানি।
দখিন-বাতাস হুহু করে' আসি নিবায়াছে দীপ দল,
বুঝি হেনকালে ঝরেছে কখন গোপন অশ্রু-জল।
মাথায় বাঁধিয়া রেখেছিলে তাই কবরী অন্তরালে,
নদী জলে আজ ভেসে গেছে খুলি মুক্ত চিকুর জালে।
পূজারিণী, ওগো ভিখারিণী, তাই প্রভাতের ফুল তুলি,
কি মালা বিনাও নূতন গাঁথনি, কতবার দিবে খুলি?
মল্লিকা দলে রচিব কি হার মাধবী মাঝারে দিয়ে?
তারো চেয়ে লাল আর কোনো ফুল কি হবে মালায় নিয়ে!
অপরাজিতার সুনীল সরস দিব কি হেথায় তুলি,
কোথায় বসাব কোনখানে তার সবুজ ঘোমটা খুলি'।
মধুযামিনীর নরম মাধুরী হেনার ঝুমুকা খানি
কেমনে দোলায়ে দিব এ মালায়, ডালায় নাহি সে জানি।
কি বরণ দিব মালিকায় মোর কার পরে কোন ফুল।
মল্লিকা দলে রচিব কি হার, বল গো, হবে না ভুল।

বেলা বেড়ে যায়, কি করিছ হায়, ওগো পূজারিণী নারি,
হের গো পীঠের সজল আঁধার শুকায়েছে তার বারি।
ম্লান হয়ে যাবে কুসুম পুষ্প, বৃথা এ ভাবনা তোর—
বিনা সুতে মালা গাঁথিবার কালে বৃথা এ মানস তোর।
ওইখানে গিয়ে মালা হ'য়ে যাবে প্রাণের সুতাটি ধরি,
যার পর যেটি আপনি মিলিবে পরিবেন যবে হরি।
আঁচলে তুলিয়া সকল পুষ্প বক্ষে পরশি লও।
চরণে ঢালিয়া অঞ্জলি করি কাঁপিয়া প্রণত হও।

বীরভূমি, আশ্বিন ১৩১৮

বিফল

নিশি না পোহাতে সকলের আগে জ্বলিত আমার বাতি
ধূপের ধোঁয়ায় সুরভি নেশায় পরাণ উঠিত মাতি।
বাছা বাছা ফুলে স্বপনের ঘোরে ভরিয়া তৃণের ডালা
মন্দির কোণে একেলা বসিয়া গেঁথেছি আমার মালা
অরুণ তখনো উঠে নি উষার কনক উদয়াচলে
গুঞ্জনধ্বনি জাগে নি তখনো পূজার বেদিকাতলে।

একদিন যবে চাহিয়া দেখিনু থরে থরে দীপজ্বালা,
জনতায় ভরি উঠেছে আমার নিভৃত পূজনশালা ;
সকলের আগে পূজা দিতে মোর তুলিলাম মালাখানি
গন্ধচূর্ণ মুঠা মুঠা লয়ে ভরিলাম ধূপদানি
তাহারি ধোঁয়ায় আঁধারিয়া দিল দেবতার বরানন
গলে দিতে মালা কোথা পড়ি গেল চিরসাধনার ধন।

বাণী, অগ্রহায়ণ ১৩১৭

অভিসারিণী

নিশীথ রাতে সবাই যখন
ঘুমাই বিছানায়,
আমি তখন বসে' থাকি
কিসের দুরাশায়

দুয়ার খোলা আমার ঘরে
প্রদীপ নিভ-নিভ'
শয্যাতলে কাহার লাগি
আঁচল পেতে দিব
নিদ্রা যখন জড়িয়ে আসে
কাতর আঁখির পাতে
আঁধার ঘরে রৈব বসে'
কাহার প্রতীক্ষাতে
যদি তারে স্বপ্নে দেখি,
মগ্ন ঘুমের ঘোরে?
সেটি যে মোর সইবে নাক',
কাঁদব আবার ভোরে।

২

প্রদীপ যখন নিভে গেছে
আজকে একটি বার
দুখিনীরে দাও গো দেখা
বড় অন্ধকার!
চোখের কোণে কাজর-রেখা
কখন গেছে ধুয়ে,
অমানিশায় নিদ্রাকাতর
ঘাড়টি পড়ে নুয়ে।
সন্ধেবেলার খোঁপায়-বাঁধা
বকুলমালাখানি
কোথায় খুলে পড়ে গেছে
কিছুই নাহি জানি।

৩

নিশীথ রাতের বিজন পথে
তোমার পদধ্বনি
এই দিকেতে শুনব্ বলে'
আছি প্রহর গণি'।
প্রভুর আমার লজ্জা হবে,
সজ্জা করে' তাই

দিনের আলোক চাইব না ত'
অন্ধকারই চাই।
জানি আমি, কেমন করে'
আসবে তুমি আর
সবার মাঝে আমার ঘরে,
—এমন পতিতার!
তাই ত' ডাকি গভীর রাতের
গোপন অভিসারে ;
একটি দীনও পাব নাকি
প্রেমের অধিকারে

বীরভূমি, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

ভীষণ মধুর

মৃত্যু আসি কহে মোরে, "একবার ওগো প্রিয়তম
চাহ মোর মুখ পানে ; বক্ষ মোর তুহিন শীতল,
নিশ্চল তারার মত দেখ মোর নয়ন যুগল,
আলুলিত কেশপাশ তন্দ্রাময়ী নিশীথিনী সম ;
দিবারাত্র ধুক্ ধুক্ হৃৎপিণ্ড নাহি করে মোর
বিস্মৃত-অমৃত ঝরে দু'অধরে হাসির ধারায়
কেন বৃথা জাগরণ জগতের স্বপন-কারায়?
এস এস, ওগো সখা পরাইয়া দিব বাহু-ডোর,
চুমিব নয়নে সুখে—মুছে যাবে চির-অন্ধকারে
জীবনের মরুচিকা, শতবর্ণ অলোকের লীলা ;
আলিঙ্গনে অঙ্গ হবে সুকঠিন গিরিহিমশিলা
ঈশান অমরনাথ হ'য়ে রবে অনন্ত তুষারে।"
অপাঙ্গে চাহিনু শুধু একবার আননে তাহার,
এত রূপ! হায়, হায়, তবু কাঁপে হৃদয় আমার।

বীরভূমি, মাঘ ১৩১৮

বসন্তের চিঠি

বসন্তের প্রথম প্রভাতে
বসে আছি মন্দির দুয়ারে,
চেয়ে দেখি, নীলিম আকাশ
ভরে' গেছে আলোক-জুয়ারে!
মঞ্জরিত চূতশাখাগুলি
হেলিয়াছে পুলক-রভসে,
ফুলবনে মধুপের মেলা,
—মিলিয়াছে গুঞ্জন-হরষে!
অশোকের রাঙা ফুলবাস
রচিয়াছে বিবাহ-বাসর,
মুকুলিত নবমল্লিকারে
মনে হয় বধূর বেসর।
মনে হ'ল কত কাল তা'র
পাই নাই প্রেমের পরশ,
জানাইতে ভুলে গেল সখা
বসন্তের নবীন হরষ!
ভরি' উঠে হৃদি-পুষ্প-পুটে
ফাগুনের আকুল সৌরভ,
খুলিব না মাধবী কলিকা—
বরষের কিসের গৌরব?
কতক্ষণে চেয়ে চারিদিকে
বুঝিলাম, মিছা এ বেদনা,
বসন্তের বর্ণে গন্ধে গানে
প্রভু মোর করিছে চেতনা।
পাঠায়েছে প্রেমলিপি তার
প্রতি ছত্র ফুলের গাঁথন,
পৃষ্ঠা তার খোলা চারিদিকে
কোনখানে পড়েনি বাঁধন।

বীরভূমি, চৈত্র ১৩১৮

কবি-কাহিনী

এমনি বসন্তপ্রাতে হয়েছিল দেখা
বহু বহু দিন,
নিশিশেষে ধূলিপথে চলেছিনু একা
অতি দীন হীন।
কেন যে কাঁদিয়াছিনু নিশীথ-স্বপনে
নাহি ছিল মনে।

অশোকের হাসি দেখে হেসে হনু সারা,
রাঙিল পরাণ ;
বকুল কুড়া'তে গিয়ে ঝরি' আঁখিধারা
তিতিল বয়ান ;—
পরাণে জড়া'য়ে গেল কুসুমের হাস
আর দীর্ঘশ্বাস।

হেনকালে কে আনিল মাধবী-বিতানে,
কার এ ছলনা?
কি কথা উঠিল ফুটে চুপে কানে কানে,
—সে কোন ললনা?
অপাঙ্গে দেখিনু চাহি' শুধু দুটি চোখ,
—অচেনা আলোক!

চূতমঞ্জরীর মদে কণ্ঠ সিক্ত করি'
গাহিল কোকিল,
শত ফুলকামিনীর চুম্বন আহরি'
বহিল অনিল,
বাসন্তী-বাসনা-রঙ্গে রঞ্জিল ভুবন
দুরন্ত যৌবন।

দুটি চাঁপা গেঁথে দিনু দুটি কর্ণমূলে,
পুলক বিহ্বল,
ফুলবনে বাড়ে বেলা পথ গেনু ভুলে,
হায় রে চপল!

আপনার মনে শুধু গাহি অকারণ,
কে করে বারণ?

*　*　*

নিদাঘের তপ্তশ্বাসে ঝরে' মরে' গেল
যত ফুলদল,
বরিষার জলে তবু নিবে নাহি এল
কল্পনা-অনল,
শরতে দাঁড়ানু এসে সাগরের কূলে,
গান গেনু ভুলে'।—

সুবর্ণ সৈকতে তার নবীন প্রভাতে
জীবন্ত নীলিমা,
ফেন-পুষ্প ফুটে উঠে তরঙ্গ আঘাতে
কোথা' নাহি সীমা।
বসন্তের সে কটাক্ষ শারদ সাগরে
একি রূপ ধরে!

শব্দের তরঙ্গ একি, যেন নিরবধি

সব কথা এক হ'য়ে মথিয়া জলধি
উঠিছে ওঙ্কার!
লীলালোকে বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে শয়ান!
ভুলে গেনু গান।

মনে কিছু নাহি আর, হাসি কান্না ভুলে',
নীরব মূরতি,
ছায়ালোকে করি খেলা রাশি রাশি তুলে'
ঝিনুক শুকতি,
আঁখি পরে হাত রাখি, দিগন্তের দিকে
চাই অনিমিখে।

* * *

শীত ও হেমন্ত যবে বুনিবে নয়নে
কুহেলিকা-জাল,
কে আসি চাহিবে মোর সমাধি-শয়নে,
ভুলি দেশ কাল?
শিয়রেতে কোন' পাখী করিবে বিলাপ,
ফুটিবে গোলাপ?

মানসী, শ্রাবণ ১৩১৯

আলো-জ্বালা

১

হাতে আছে একটুখানি বাতি,
মিট্ মিটিয়ে জ্বল্‌বে সারা রাতি।
অমারাতে সেটুক্ আলো
জ্বালো কিম্বা নাই বা জ্বালো,
কে খোঁজ রাখে তার?
তার চেয়ে তা' নিবিয়ে দিয়ে বাড়াও আঁধিয়ার।
মাটির প্রদীপ আঁচল দিয়ে ঘিরে
ঝোড়ো হাওয়ায় ধ'রে রাখবি কি রে?
হায় রে অবোধ, তা'ও কি আবার হয়!
কাপড়খানাই হবে অগ্নিময় ;
যায় যাক্ না তবে নিবে—
আলোর জ্বালা ঘুচিয়ে চোখে আঁধার-কাজল দিবে।

২

একটু আছে আলো
বেশীক্ষণ যে জ্বলতে হ'লে জ্বলবে কি সে, ভালো?
তবু তারে ভাল করেই জ্বালো।'
চার পহরের আলোর খোরাক
দণ্ড দু'য়ের বাজী পোড়াক,
কিসের দুঃখ ভাই!

ফুলঝুরি আর রংমশালে জ্বালো রে রোসনাই।
ঝড়ের মুখে আলো
জ্বালা নয় ক' ভালো
—নিবে যাবার ভয়?
বারেক তবু জ্বলুক, যদি নিবেই যাবার হয়।
এত আছে খড়ের' পালুই'
তাইতে ফেলে দিস্ নাক তুই—
নিবে যাবার আগে
দেখুক তবু জ্বলা কেমন লাগে।

মানসী, মাঘ ১৩২০

বাসন্তিকা

রবি-কনকিত লতার কুঞ্জে পতঙ্গ করে খেলা,
পথের দু'ধারে ঘাসের সকাশে শিশির-শিশুর মেলা ;
মাঠের প্রান্তে দূর বন-নীল কুয়াসায় জ্বলে আলো,
হেথায় গহন শাখা-প্রশাখায় এখনো' ঘোচেনি কালো।
কূজনমুখর বায়ুমরমব তিন্তিড়ী-বেণুবীথি,
অরুণ সিমূল রাঙা'য়ে দিয়েছে কানন-রাণীর সিঁথী।
আমের অঙ্গে সোণার গহনা, সজিনার রূপা-ফুল,
পক্কবদরী বিলাইছে ঘ্রাণ, নেবুফুলে অলিকুল।
তরুণী দিবার আলোকাঞ্চল নীল অম্বরে লোটে,
আম্রমুকুলগন্ধে অন্ধ মন কতদূর ছোটে!
মনে হয় কবে দেখেছি কাহারে কোন্ অলিন্দ পাশে,
এখনো তাহার হাসির লহরী পাগল বাতাসে ভাসে।
নীল কুন্তল আঙ্গুরের দল, ললাটে চন্দ্রলেখা,
মসৃণ-শিলা-মর্মর-ভালে দু'টি বাঁকা মসী-রেখা ;
দীর্ঘ রেশমী পক্ষ্মের ছায়া কাঁপিছে কপোলতলে ,
কালো কটাক্ষে চির-অসফল বাসনা-বহ্নি জ্বলে!
ঈষৎ-স্ফুরিত নিখুঁত নাসিকা, মৃগমদ নিঃশ্বাস,
উত্তরাধরে সঞ্চিত মধু চুম্বন-নির্যাস।
আলোকশিখার মত অঙ্গুলি অলোক-পদ্ম ধরি'
কুটি কুটি করি' ছিঁড়িয়া ফেলিছে আন্‌মনে কারে স্মরি'।

লোল কবরীর গোলাপের মালা বক্ষের 'পরে লোটে,
বসন-কিনারে পদপল্লব কুবলয় সম ফোটে।
এমন প্রেয়সী মহীয়সী নারী মানসীর পায়ে ধরে'
বলেছিনু হায়, 'আমি ভালবাসি, তুমি ভালবাস' মোরে—
'আমার হৃদয় নীলিমহ্রদের বিশাল সলিলে ঢালি'
ও নদী-হৃদয়, তারকিত নভঃ বিম্বিত কর, আনি!
এস, মোরা দু'টি কপোত মিথুন উড়ে' যাই একই নীড়ে,
পাশাপাশি দোঁহে পক্ষ মেলিয়া সব বন্ধন ছিঁড়ে।'
ছবির পুতলি হ'ল না উতলা, অধর কাঁপিল না!
গণ্ড-গোলাপ অধিক ফুটিয়া নয়ন নামিল না!
তবু কত নিশি নিরাশ আশায় পরাণের দীপশিখা
জ্বালা'য়ে রেখেছি সুরভি তৈলে, রাঙা'য়েছি মরীচিকা ;
বাসনা-বর্তি ঘিরিয়া ঘিরিয়া স্মৃতি-ধূম প্রাণে লাগে ;—
আজ তারি শেষ সৌরভ-বেশ আম্রমুকুলে জাগে!

মানসী, চৈত্র ১৩২০

তরুকুমারী

Now begins the tale of Hamadryad.
—W. S. Landor

যেথা হ'তে দেখা যায় দূরে অতি দূরে
উঠিয়াছে 'কারিয়া'র রত্নসিঁথী যেন
'নিডস্' নগরী, সেই দূর গিরিদেশে
জন্মেছিল রাইকস্। নিকটে তাহার
ফেন-পুষ্প শিরে ধরি' সাগরোর্মিদল
খেলিতে খেলিতে দূরে মিলাইয়া যায়
আরক্তিম জলনীলে। উৎসবের দিনে
গীতি-বাদ্য মুখরিত যাত্রীর জনতা
দেখা যায় সেথা, হ'তে ; দেশোয়ালী যারা—
কপালের চারিপাশে গোলাপের সাথে
পরিয়াছে শ্যাম-লতা ; বাড়ী যাহাদের
'পাণ্ডিয়নে' (বিরাজেন সিন্ধুকূলে যার,

বিরাট মন্দিরে, দেবী ভৈরবী 'এথেনী')
তা'রা পরে ভায়োলেট, বড় পরিপাটি,
গোছা-করা, জলপাই পাতার সহিতে।
নানান্ জাতির নানান্ ধরণ তাজ,
কিন্তু এক পূজাবিধি—ভক্তি সবাকার
এক দেবী-পদে—বিধি তাঁর[১] সর্বমান্য
হাসিতে তাঁহার কোষে অসি ফিরে' যায়
দেব-সেনানীর, বজ্র তুলে' রেখে দ্যায়
স্বর্গরাজ ; বন্দে তাঁরে সাগর-অধিপ
অতি সে চঞ্চলমতি দেব 'পসীডন্',
শীতল গহ্বরে বসি' অতলের তলে।
প্রেতরাজ[২] 'ডিস্'—এত যে কঠিন প্রাণ—
তিনিও করেন স্তুতি, যদি কৃপা করি'
বধূর বিমুখ মুখ ফিরাইয়া দেন
ওষ্ঠে তাঁর চুম্বন-পিয়াসী,—বলে হরি'
আনিলা যাহারে[৩] ; শুধু তাই নয়, শেষে
ভীষণ সে বৈতরণী-স্রোতঃ সাক্ষী করি'
জানাইলা পণ এই, বাসনা পূরিলে
নিত্য যোগাবেন ফুল, 'এনা'র উদ্যানে[৪]
বধূর অঞ্চল টানি' ফেলেছিলা যত—
তারো বেশী, সুরভি ও মনোহরতর।

দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' পিতার ভবনে
চেয়ে আছে রাইকস্। উপত্যকাবাসী
সকলে চলেছে ধেয়ে নগরীর পানে ;

---

১. আফ্রোদিতি বা ভিনাস—রতিদেবী

২. পাতাল বা মৃত্যুপুরীর ঈশ্বর।

৩. ডিস্ বা প্লুটো—'সিরিস'-দেবীর কন্যা 'পার্সিফনি'-কে হরণ করিয়া পাতাল-পুরীতে লইয়া যান ও সেখানে বিবাহ করিয়া, তাঁহাকে আপনার রাণী করেন। সিরিস-দেবী কন্যার পিতা স্বর্গরাজ "জ্যুস্"কে অভিযোগ জানাইলে, তিনি, মৃত্যুপুরী হইতে ফিরাইয়া আনা কঠিন বলিয়া সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই ; অবশেষে সিরিস দেবী একান্ত অধীর হওয়ায়, পৃথিবীতে শস্যহানির সম্ভাবনায়, (সিরিস-দেবীই পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন) এই ব্যবস্থা করিলেন যে 'পার্সিফনি' ছয়মাস পাতালে ও ছয়মাস পৃথিবীতে বাস করিবেন। সেইরূপ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে—পৃথিবী ছয়মাস শস্যবতী থাকেন, বাকী ছয়মাস সিলিস-দেবী কন্যাবিরহে মুহ্যমানা।

৪. ডিস্ যখন 'প্যাসিফনি'কে হরণ করেন, তখন উক্ত দেবকন্যা 'এনা' অধিত্যকায় পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। হরণকালে অঞ্চল বিস্রস্ত হওয়ায় ফুলগুলি পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

দীর্ঘ জনস্রোত, যেন আলোক-পুলকে
বাহিরিছে উৎসমুখে গিরিনদী-ধারা,
ঊর্মির উপরে ঊর্মি। যেতে মানা তার,
পাইবে না করিবারে একটি মানসা,
লভিবে না করস্পর্শ, কে জানে কাহার!—
ভেবে প্রাণ কাঁদে। পিতা ডাকি কহিলেন
'পুত্র রাইকস্‌, বয়স হয়েছে মোর,
আমি জানি ও সকল নিরর্থ আমোদ।'
একটি নিশ্বাস ফেলি' থেমে গেল বুড়া,
বুড়াদের ধরণ যেমন, বোধ হয়
অন্তর-অন্তরে বোঝে কত নিরর্থক।
রাইকস্‌ কহে মনে মনে, 'আমি কিন্তু
জানিনি এখনো'—পরখ করিতে তাই
বাসনা তাহার।

"তার চেয়ে যাও তুমি
—একিয়ন গেছে চলে'—পাহাড়ের ধারে,
বল্কল তুলিয়া ফেল' ওক-বৃক্ষটার,
শাখাগুলো কেটে আনো, পরে একদিন
গোড়াটার চারিপাশে বেশী করে' খুঁড়ে'
চালাবে কুঠার,—শীত এলে কোরো সেটা।"

গেল রাইকস্‌। দাঁড়াইল যেথা আসি'
সেথা হ'তে ভালো করি', বহুদূর ধরি',
চোখে পড়ে চলে যারা নগর-তোরণে।
দেখিল তথায় রহিয়াছে একিয়ন,
—কালোচুল, নগ্নবাহু, দৃঢ়পেশী তার,
কোন্‌খানে প্রথমে যে করিবে আঘাত
ঠিক নাহি পেয়ে, তুলিয়া কুঠারখানা
থমকি' দাঁড়ায়ে আছে যেন দ্বিধাভরে।
হেরি' তারে ডাকি' কহে সাবধানী বুড়া—
'হ্যাদে দেখ, হেথা আসি থালিনস-সুত,
মউমাছি আছে নাকি নিকটে কোথা'ও?
—না ও ভীমরুল?'

যুবা কর্ণ ফিরাইয়া
আবরিল করপুটে, সুদূর উদ্দেশে,

অবহিত হয়ে। অতি মৃদু কলশব্দ
শুনিল প্রথমে ক্রমে সে গুঞ্জন হ'ল
স্ফুটতর, আরো সুমধুর ; তারপর
বোধ হ'ল পরিচ্ছিন্ন যেন সুর-লয়ে,
শেষে ভাসে ভাষা—মধুর মিনতি যেন।
কহিল ফিরিয়া, 'কাজ নাই, একিয়ন,
কাটিয়ো না, সব ফাঁপা ; দেবযোনী কেহ
ভিতর হইতে যেন কহিছেন কথা!
আরো কাছে এস দেখি'—দুইজনে পুনঃ
ফিরিল গাছের দিকে ; হেনকালে ও কি!
ভূমিতলে বসি' এক কুমারী-রতন,
জীবন্ত প্রতিমা, দুই করে দুই দিকে
শেহালার মখ্‌মল্‌ চেপে ধরে' আছে।
নয়ন পল্লবে তার দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি
অবনত, ইন্দুপাণ্ডু কপোলের বিভা,
কিন্তু সে নিখুঁত দুটি অধর-পাতার
কি রঙ্গিমা! বিম্বফল বর্ণে হারি মানে!
অলকে দুলিছে যেই 'আনিমণি' ফুল—
নহে তত ঢলঢল পেলব কোমল,
তলে তার মুখখানি যেমন, আমরি!

'কি করিছ হেথা একা?' কহে একিয়ন
কিছু ভয়ে কিছু ক্রোধভরে। দুটি আঁখি
তুলিয়া চাহিল বালা, কিছু কহিল না।
রাইকস সচকিতে দাঁড়াইল সরে'
এক পা' পিছায়ে, ভয় তবু বেশী নহে ;
বক্ষ ঘন দুলে উঠে, শ্বাস রুদ্ধ হয়—
কি কথা বলিবে তবু কথা না জুয়ায়।'
'বিরস বুড়ারে ত্বরা কর না বিদায়!'
কহে বালা ; কোনো কথা প্রভুপুত্র-মুখে
শুনিতে সে দাঁড়াল না, চলে গেল বুড়া,
সে তখন ভয়ে সারা, পলাইলে বাঁচে।
ঝকিয়া উঠিল তার পিঠের কুঠার
দুজনারি চোখে!

ত-কু। 'তুমিও তাহলে চাও
নির্দোষীর রক্তপাত! কেন বল না গো?

নাহি ত' মানত কিছু—কোনও দেবতা
মাগিছে না বলি ওই ওক-তরুটিরে?

রা। 'কে তুমি? কোথায় থাকো?
কেন বা হেথায়?
কোথা যাবে বল শুনি? শুভ্র-পীত-বাস,
অথবা সে আকাশের মতন নির্মল
উষাসম ভূষা যাঁহাদের, হেরি নাই
তাঁহাদেরো অঙ্গে কভু এ হেন বসন!
কি সুন্দর শ্যামল নিচোল অঙ্গে তব
রয়েছে নিলীন! শৈবাল শিলার গায়ে,
বৃক্ষে পত্র যথা ; হের তবু তারি তলে
উঠিছে পড়িছে তব উরস-যুগল,
মৃদুমলয়পরশে পল্লব যেমতি
নদীতীরে, সুভঙ্গিম পুন্নাগ-পাদপে।'

ত-কু। বড় ভাল লাগে বুঝি পিতৃগৃহখানি?

রা। ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে ; তবু তারে
ছাড়িয়া আসিতে পারি তব গৃহ লাগি',
যেখানেই হোক্ ; যদিও দুয়ারে সেথা
আছে চিহ্ন আঁকা,—তৃতীয় বরষ হ'তে
প্রতি জন্মদিনে ক্রমে কত বাড়িয়াছি
তারি নিদর্শন ; আছে সেথা শয্যাপাশে
আমার মায়ের হাতে কত কি যে বাঁধা,
কুদৃষ্টি লাগে বা পাছে তাই কাটাবারে।
আর আছে ধনু মোর—দেখাব তোমায়—
জিনিয়াছি গত চৈত্রে ছুটাছুটি খেলি'।

ত-কু। ভেবে দেখ কত কষ্ট ছেড়ে চলে আসা
হেন গৃহ, একদিন একরাত্রি তরে
ছেড়ে কভু থাকনি' যাহারে!

রা। ওগো বালা,
কষ্ট নহে, জন্মগৃহ ছেড়ে চলে' আসা
কষ্ট কেন হবে?—যদি এই পৃথিবীতে
বেসে থাকি ভালো একজনে, সেই আদি
সেই শেষ, চিরতরে ; সেও যদি বলে,
'ভালো আমি বাসিব তোমারে চিরযুগ'—
শুধু এইটুকু বলা, মুখে বলা শুধু,

তা' হলেই হবে , কম সে কি! সেই সাথে
প্রাণ যদি সায় দেয় প্রেমের বিশ্বাসে।

ত-কু। কে শিখা'ল এ বয়সে এত বাতুলতা?
রা। দেখেছি প্রণয়ীজনে, তাই শিখিয়াছি।
ত-কু। বাঁচাবে না বৃক্ষটীরে?
রা। পিতা শুধু চান
বল্কল উহার ; বৃক্ষ কিছুকাল আরো
রহিবে যেমন আছে।
ত-কু। কিছুকাল আরো!
পিতা তব দিন মোর গণিছেন তবে?
রা। আর কোনো বৃক্ষ হেথা নাই? তলে যা'র
এমনি কোমল ঘন শেহালার দল?
কে তোমারে পাঠাইবে দূরে? কেবা তোমা'
বিলম্বিলে শুধাইবে কেন দেরী হল?
মেষ তব চরে বুঝি নিকটে কোথাও?
ত-কু। মেষদল নাহি মোর যত ক্ষুদ্র হোক্—
আছে যার চেতন স্পন্দন, সূর্যালোক
বায়ু আর সুস্নিগ্ধ শিশির ভুঞ্জে যারা—
হিংসা নাহি করি! যে জন সুন্দর, আহা,
(তুমিও সুন্দর কত!) কেন ব্যথা দেয়
সকল সৌন্দর্যমূলে? শোন নাই কথা
তরুকুমারীর, পূর্বে কভু কারো মুখে?
রা। কিছু শুনিয়াছি বটে, কহ তবু শুনি
তাদের কাহিনী কোনো। বসিব কি হাঁগো
তোমার চরণমূলে? ক্লান্ত নহ তুমি?
হেথাকার তৃণলতা বড়ই কোমল!
না-না, তুমি ব'সো ওইখানে, ভয় নাই,
খুব কাছে আসিব না—কোরো না সংশয়!
একটু দাঁড়াও দেখি, গত বছরের
বীজকণা বৃক্ষতলে যদি পড়ে থাকে!
এত সূক্ষ্ম বসন তোমার—বীজটিও
বাজিবে বরাঙ্গে তব, যত ক্ষুদ্র হোক!
নাই তবে, বাঁচা গেল। যবে ইচ্ছা পরে
আমারে বিশ্বাস কোরো, ততদিন শুধু
বসিবারে পাই যেন সম্মুখে অদূরে।

ত-কু। এই বসিলাম, তুমি বোসো, শান্ত হও!
রা। কি দেব-দুর্লভ রূপ! ওগো মর্ত্যবাসী
পূজা কর,—এ যে আফ্রোদিতি! স্বর্গে তিনি?
না, এই এখানে বসি'! বসেছিলো আসি'
পূর্বে যথা সেই এক রাখালের পাশে
সাগর বিম্বিত ছায়া পর্বত-শিখরে,
ঘটাইল বংশে তার সে কি সর্বনাশ![৫]
ত-কু। ভক্তি রেখো দেবতায়, কেন অবিশ্বাস
প্রার্থিজনে? পাবে প্রতিদান—কতখানি
জানিতে চেয়োনা ; জেনো শুধু—খুব বেশী।
বস, বস, না, না,—উঠিওনা রাইকস্।
প্রেম যে অবৈধ বিনা পাণিগ্রহপণ!
বল আগে কভু তব অধর-আস্বাদ
পাইবে না মর্ত্যকন্যা কেহ, তবে লহ
চুম্বন আমার ; আগে বল, তবে পাবে।
রা। স্বর্গদেবতারা! হেরাদেবী! আফ্রোদিতি!
সাক্ষী থাকো সবে, তোমাদের নামে
এ বন্ধন হোক তবে সুবিধি-সম্মত ;
এস তবে লয়ে যাই পিতৃগৃহে মোর।
ত-কু। না, মোর ঘরে রবে তুমি— তা'ও হবেনা!
রা। সে কোথায়?
ত-কু। এই বৃক্ষমাঝে।
রা। ঠিক বটে!
তরুণকুমারীর কথা শুনি এইবার।
ত-কু। অনুনয় করিও পিতারে, বৃক্ষ মোর
নষ্ট নাহি হয় ; বোলো তাঁরে ভালো করে',
বছর বছর দিব মধু, মূল্য যার
ন'টি বড় মেষ ; মোম দিব যত লাগে
জ্বালাইতে বারোমাস সকল পূজায়,
—তারো বেশী। ওকি! মুখ কেন নুয়ে পড়ে।

[৫] ট্রয় রাজকুমার 'পারিস' রতিদেবীর প্ররোচনায় মেনেলস-পত্নী হেলেনকে হরণ করিয়া সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বাল্যে পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া রাখালদের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন তখন 'আইডা' পর্বতে সুবর্ণ আপেল ঘটিত বিবাদের মীমাংসা-সূত্রে আফ্রোদিতির মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হন। এই কাহিনী টেনিসনের কবিতায় বড় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কাঁটা লেগে কেটে যাবে চপল যুবক!
ওঠো ছি!

রা। কি লজ্জা! কেমনে দেখাই মুখ!
ওগো দয়া কোরো! বলিবনা 'ভালবাসো',
তা' বলে কোরো না ঘৃণা। আর একবার
দেখি তোমা—না না, প্রতিদিন দিও দেখা!
তুমি ভালোবাসিওনা, আমিই বাসিব।
বড় উচ্চে লক্ষ্য করেছিনু, শর তাই
ফিরে আসি' ভেদিয়াছে আমারি মাথায়।

ত-কু। 'ভালোবাসি' না বলা'য়ে ছাড়িবে না?
—যাও!

রা। সুখ যদি হয় আহা অমৃত-নিদান
(নহিলে ত্রিদশগণ ভুঞ্জিবে কেমনে।)
আমিও অমর তবে ; দেবতা শুনেছে
পণ মোর! বামে চাও, ফিরায়ো না মুখ!
আমার চুম্বন কই?

ত-কু। পুরুষের রীতি বুঝি
আগে পেয়ে চায় পিছে, স্বভাব এমন!

রুদ্ধ হ'ল অধরে অধর, বক্ষ 'পরে,
নুয়ে প'ল মাথা। সেই কালে বনমাঝে
দিকে দিকে হাস্যধ্বনি হয়েছিল নাকি,
কার হাসি, কেন হাসে, কেবা শোনে তায়!

মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে বহুক্ষণ,
থালিনস্! গৃহে তব সুগন্ধ সঞ্চরে।
মরুবক পুদিনা তুলসী আদি কত
সুগন্ধি বনজ-মিশ্র ছাগমাংসভাগ
সুদগ্ধ, সাজানো আছে রাইকস্ তরে।
অবশেষে আসিল যুবক ; ক্ষুধা নাই,
তবু ভাণ করি' বসিল সে টানি' লয়ে
চিনিটাই আগে ; তা'' হেরি কহেন পিতা—
'বৎস রাইকস্, বহুক্ষণ রৌদ্রে থাকি'
দৃষ্টি তব গেছে ঝলসিয়া ; বৃক্ষটারে
কাটিতে হয়েছে কষ্ট? রস আছিল না?
এত শুষ্ক হ'ল কিসে! হইবারি কথা—

আমারি মতন বৃদ্ধ, বহু পুরাতন!
রাইকস্, মুখে তার গ্রাস বেড়ে যায়
চিবাতে চিবাতে, মাংস হিম হয়ে এল,
বিরস বিস্বাদ, অবশেষে সুবর্ণ-মদিরা
বারেক করিল পান ; তাও ভুলেছিল
এত পিপাসায়! পিতা নিজে দিল ঢালি
'পাত্র ভরি,' কহিলেন 'জল ঠিক নয়,
ছাগমাংস সাথে কর মদিরা সেবন,
ভেবোনা এ প্রথামাত্র, শাস্ত্রের বিধান!

হেন মতে চিত্ত দৃঢ় করি' কহিল সে
আধেক সাহসভরে আধেক লজ্জায়—
'পিতা, বৃক্ষটি যে দেব-বৃক্ষে! বর্ষে বর্ষে
মোম মধু দিবে তোমা বহু পরিমাণ ;
দেবগণে ভয় করে—দেবতার প্রিয়
আছে একজন ; সেইজন (কহিল না
কেবা সেই, মুখ লাল হ'ল) বলিয়াছে
দিবে সব, পরে আরো করিতে সে পারে।
বেশী নহে, দুই চারি পূর্ণিমার পরে
কি করে দেখি, তার পরে যদি
নাহি পাও মধু কিম্বা মোম, কেটে ফেলো।'
'বুদ্ধি তোরে দিয়াছে দেবতা!' কহে পিতা
খুসী হয়ে, 'সদা চোখ রাখিবি সেথায়,
উপরে ও নীচে, সকল ফাটল হ'তে
আরো বেশী পাই যেন, কে রাখে হিসাব?'

রাইকস্ যায় প্রতিদিন, বনদেবী
দেখা নাহি দেয় বেশী ; প্রেম নিয়ে খেলা
জানে সে অপ্সরী। বড় মৃদু বাজে যবে—
বাঁশীখানি না বাজায়ে শ্বাস চেপে ধরা
আরো যে মধুর! প্রণয়ীর হা-হুতাশ
বড় ভালো লাগে, —যবে অলক কাঁপায়ে
গভীর দীরঘশ্বাস পড়িত কপোলে,
সুখ উপজিত, শীতল করিত যেন
নীল ধমনীর তাপ, প্রেমের প্রদাহ।
বিরহের কালে তার উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ

লাগিত মধুর। ভালো যারা খুব বাসে,
—হোক্ দেবী অথবা মানবী—কোন্ বালা
সুখ চেয়ে দুঃখ দিতে ভালো নাহি বাসে ?

একদিন রাইকস্ বন হ'তে ফিরে'
চলিয়াছে দুঃখ ভরে ; দেখে দুঃখ হ'ল,
ডাকি' কহে 'ফিরে এস', এত বলি' তার
স্কন্ধবাস' পরি আপনার দুইহাতে
বিনাইল করাঙ্গুলি, পাশে দাঁড়াইয়া।
নিয়ে গেল তারে যেথা এক স্রোতস্বিনী
শীতলসলিলা, সমতল বালু দিয়ে
বয়ে যায় লতাপাতা ফুলের মাঝার।
সেথা বসি' ধুয়ে দিল পা'দুখানি তার,
কোলে তুলি' মুছিল আপন দুই হাতে।
তখন সাহস হ'ল রাগ করিবারে ;
ভালোবাসা বেশী পেলে পরে বেড়ে যায়
সাহস সবার,—তবু কহিল মধুরে,
'ওগো চির চঞ্চল প্রতিমা! একি শাস্তি
নিয়তির? অথবা সে তোমার খেয়াল
সুকঠিনতর? বল তবু বল মোরে,
জেনে রাখি কবে মোর প্রেম-লতিকায়
সে ফল ফলিবে প্রিয়তমে, ফলে যাহা
শুধু এইখানে—'এত বলি' তুলি' নিল
ফল তার নম্র শাখা হ'তে।

'কি অধীর!'

কহে বালা, 'উত্তর কেমনে দিই বল,
এমন করিলে! যতনে-পালন করা
আছে এক মধু-মাছি মোর, সে আমার
মন জানে, যা' বলিব পালিবে তখনি।
দূত করি পাঠাইব তারে ; যদি কভু
অপরার প্রেমে মোরে ভুলে যাও সখা,
কহিওনা কিছু, শুধু মাছিটিরে তুমি
দিও তাড়াইয়া—তা'হলে জানিব মোর
কপাল ভেঙেছে ; তুমিও করিও শোক—
জানি আমি তোমারো সে কম কষ্ট নহে!
এ মোর হৃদয় যবে ওই হৃদি সাথে

সমান স্পন্দনে চাবে ব্যথা ভুলিবারে,
পাঠাইব দূত মোর, সন্ধ্যায় প্রভাতে,
যখনি এ বন হবে নির্জন নিরালা।'

তারপর, দিন পরে দিন যায় চলি' ;
ঋতু হোরাগণ সকলেই দেখিয়াছে
সুখ তাহাদের ; বর্ষ পরে বর্ষ গত,
তবু সুখী তারা। যে বলে, প্রণয় মধু
তিক্ত হয় অতিরিক্ত হ'লে—সে কখনো
তরুকুমারীর প্রেম জানে না কেমন।

ক্রমে রাত্রি দীর্ঘ হ'ল ; তরুকুমারীরা
বোধ হয় হেন কালে একাকী নির্জনে
বড় নিরানন্দে থাকে অরণ্য-ভবনে।
এমনি যাপিছে নিশি একজন হায়,
শেষে ডাকিল সে অনুগত মাছিটিরে ;
তখন সকল মাছি ঘুমায়ে পড়েছে,
সেই শুধু জাগে। তারে এবে যেতে হ'ল
সেই আলো আনিবারে, যে আলো কখনো
বৃষ্টি বা তুহিন-পাতে নিবিয়া না যায়!
সে আলো যে প্রেমিকের দুই আঁখি হ'তে
বরষে কিরণ-ধারা আর দুটি 'পরে—
তেমনি প্রণয়-ভরা—শেষে দুঁহু দোঁহা
দেখিতে না পায়।
হেথা, অগ্নিকুণ্ড পাশে
বসে আছে রাইকস্ পিতার আলয়ে।
একখানি মেজ, পিতা পুত্র দুইদিকে ;
শরতের সুপ্রচুর ফলভার তাহে
ছিল না সাজানো—মৌরীর পিঠা কিম্বা
সুরভি মদিরা। আসন পড়েছে আজ
সতরঞ্জ-খেলা তরে ; বৃদ্ধ থালিনস্
জিতিছেন বারবার ; পুত্র অপ্রতিভ,
ভাবিয়া না পায় কিছু, বিরক্ত বিরস।
হেনকালে ভন্ শব্দ কাণের নিকটে,
হস্ত দ্রুত উঠে গেল, আর শব্দ নাই।
চলে' গেল মাছি, তবু যতক্ষণে আরো

না ফুটিল উষালোক, ফিরিল না বনে।
তখনো তেমনি হাতে মাথাটি রাখিয়া
ব্যথিত প্রকোষ্ঠ আহা তরুসুন্দরীর!
দেখাইল অর্দ্ধ-ভগ্ন একখানি পাখা,
অন্যটির ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম পক্ষজাল,
আরো কত কাটা-ছেঁড়া! তরু-কন্যারাই
সে সব দেখিতে পায় ভালো।
হেরি' তায়
ঝুঁকে প'ল অবশ মাথাটি, হাত দুটি
পড়ে' গেল। ধ্বনি এক অতি সকরুণ
সহসা পশিল দূর থালিনস-পুরে ;
বৃদ্ধ শুনিল না, পুত্র শুনি' ত্রস্ত হ'য়ে
তখনি ছুটিয়া গেল বনের ভিতরে।
বৃক্ষে আর নাহিক বল্কল, পাতাটিও
সবুজ নাহিক শাখে, বিদীর্ণ হয়েছে
তরুদেহ একেবারে ! সেই দিন হ'তে
কোনো কথা, কোনো মৃদু গোপন আলাপ
জুড়ায় না কর্ণ তার, আর শোনে না সে
পতঙ্গের পক্ষধ্বনি কভু ; দিনে-রাতে
একটি বছর ধরি' ক্রন্দনের রোল
শুনেছে রাখাল আর বনচর জনে।
রাইকস্ কিছুতেই গেল না ত্যেয়াগি'
তরুমূল, মৃত্যু শেষে জুড়াল যাতনা।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

সে

(আর্যা-যন্ত্র নির্বৃতি)

তপ্ত ধোঁয়ার মুখের উপর মেঘের মত সে যে—
আমার বুকের আগুন-হাওয়া সেই ত' জুড়ায়েছে!
আঁধার-ঘন কেশের রাশে কুঞ্জ রচি' সে যে
গোপন করি' আনন আমার অধর মধু দে'ছে।

শ্রাবণ-রাতে ক্ষণিক-চাওয়া চাঁদের মত হেসে
মুক্ত করি মেঘের দুয়ার স্বপন দেখায় যে সে,
কালোর কোলে হঠাৎ-আলোব ঝিলিক নাহি তার
দীপ্ত চেয়ে তৃপ্তি দেবে আঁখির কোলে ভেসে।

শরৎ-প্রাতের আকাশ যেমন—স্বচ্ছ নয়ন দুটি—
আগমনীর গানের সুরে আলোক উঠে ফুটি ;
কোজাগরের জ্যোৎস্নামধুর বিষাদহারা হাসি
ধূলায় যেন শিউলি লোটে রূপের গরব টুটি'!

বসন্তেরি লক্ষ্মী সাজে সাঁঝের আঙিনাতে,
সিঁথীর সীমায় অশোক-শোভা প্রদীপ-চাঁপা হাতে,
জুড়ায় আঁখি জুড়ায় যে গো ফুরায় নাক' আশা,
পেয়েছি তার কত জনম-যুগের সাধনাতে!

ভারতী, ফাল্গুন ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

মূকেরে বাচাল করে—হেরি নাই, শুনিয়াছি—দেবতার বরে,
বাচালে অবাক করে—এ কথা যে সত্য, বুঝি অন্তর-অন্তরে,
যখন তোমার বাণী, তোমার ও প্রতিভার সীমাহীন ভাতি
সমগ্র ধরিতে মোর রসনার—রচনার—জাল খানি পাতি!
শুধু স্তব্ধ, শুধু মুগ্ধ, শুধু লুব্ধ, চিরদিন অতৃপ্ত-পিয়াসী—
তোমার ঝরণাতলে আমি নিত্য সুনির্জনে যাই আর আসি!

তাই আমি কাব্য-গীতি-মুখরিত তব পূজা উৎসবের দিনে,
লুপ্ত করি' আপনারে, একান্ত নিঃসঙ্গ যেন জনতা-বিপিনে,
বসেছিনু বাক্যহারা ; গণি নাই মানি নাই কিবা প্রয়োজন
খুলি' দিতে কণ্ঠ মোর সে-সভায়, মুক্ত যবে নয়ন-শ্রবণ।
কত ভক্ত নিবেদিল পূজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
মন্ত্র পড়ি' পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্য-সম্ভার।
হেরি' মোর মূঢ় দৃষ্টি, রিক্ত হস্ত, নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
ডাকে নাই কেহ মোরে,—ধন্যবাদ! সে যে হ'ত বড় অশোভন!

তোমারে পূজিব আমি কোন্ মন্ত্রে, বুঝি না যে হে রবীন্দ্রনাথ!
যে বীজ যখনি জপি—ভুল হয়, হেরি' নিত্য নব রশ্মিপাত!
ধ্যানে মোর, জ্ঞানে মোর ধরিবারে চাই তোমা অখণ্ড-স্বরূপে,
তা' না হ'লে চিত্ত মোর প্রসন্ন হ'বে না জানি, দীপে আর ধূপে!
সত্য আর সুন্দরের যে বিগ্রহ গড়িয়াছ মানস-ভুবনে,
অসীমের রূপ-সীমা ফুটায়েছ আঁখি-আগে জাগ্রতে-স্বপনে—
হেরি তা'য় রাত্রি দিবা একাকার! ভেদ নাই আলো-অন্ধকার!
অধরে নির্বাণ বাণী। মন্ত্রহীন তাই মোর গুরু-নমস্কার!

তোমারে বরেছি আমি আমা হ'তে বহুদূরে, আমার বাহিরে—
সত্যের শাশ্বতলোকে, শেষতীর্থে, নিস্তরঙ্গ পারাবার-তীরে!
যতটুকু যেই দিন অগ্রসরি পথে মোর—সেই মোর পূজা!
আনন্দ-আরতি মোর—সে যে তোমা নিত্য আরো বড় ক'রে বুঝা!
তোমার কবিতা-বিশ্বে অন্তহীন বিবিধ সে বিচিত্রের পানে—
দিকে-দিকে ধাই, তবু জানি তার সত্য এক!—সেই কোন্‌খানে
এক-বৃন্তে অগণন ফুটিয়াছে অবিচ্ছেদ! জানি, আমি জানি,
তোমার কবিতা মোরে দিবে সেই আদিমন্ত্র, একাক্ষরা বাণী।

ভারতের শেষ ঋষি! যে সাধনা অর্দ্ধ পথে গিয়েছিল থামি'
সহস্র বর্ষেরও আগে.—যে আলোক পূর্ণ হ'য়ে আসে নাই নামি'—
অসমাপ্ত সেই সিদ্ধি, পরমা সে ঋদ্ধি আজ দৈবী প্রতিভায়,
ফুলের মতন করি' স্বচ্ছন্দ সতেজ বৃন্তে, ফুটাইলে গানে-কবিতায়!
রসে-রঙ্গে-রূপে তুমি, সম্বোধিলে সনাতন নিত্য সত্য-ধনে—
ধূলায় আসন রচি' বসিলা যে মহেশ্বর সহাস্য আননে!
সৃষ্টিপদ্মে যেই মধু মর্মকোষে চিরদিন বিরাজে বিমল,
তারি বর্ণে গন্ধে স্বাদে ভরি' দিলে জন্ম-জরা—কটু-তিক্ত ফল!
সেই মন্ত্র প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছি হৃদয়ের গভীর অতলে,
জ্ঞানের ললাটে-নেত্রে নেহারিব যেই দিন,—লয়ে করতলে
সেই সত্য পূজাঞ্জলি, বাহিরিব মহাহর্ষে উচ্চারিয়া জয়!
ততদিন র'ব মৌনী, অন্তরে বহিয়া শুধু ব্যাকুল বিস্ময়।

ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

প্রেমাঞ্জলি

[গত অক্টোবর সংখ্যা 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকা Love-Offerings -নামে প্রকাশি গদ্যকবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির বাংলা পদ্যানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, এগু ঠিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ বলা চলে। মূল গদ্য-কবিতাগুলি ফার্সী কবিতার অনুবাদ।]

নিশীথ স্বপনে তোমারেই হেরি,
দিবসে ভাবি গো তোমারি কথা,
বিজনে তোমার পথ চেয়ে থাকি,
খুঁজে ফিরি তোমা জনতা যথা।
তবু তুমি প্রিয়, আছো চিরদিন
কাছে কাছে—মোর ছায়ারও চেয়ে
নিশাসের চেয়ে অন্তরতর
অন্তর মোর রয়েছে ছেয়ে!

*

চুনী টুকটুকে ঠোঁট সে ত' নয়,
ছিপ্ ছিপে কটি—করবী-লতা—
যার লাগি জ্বলে আশক-আগুন,
যার লাগি জাগে প্রেমীর ব্যথা।
সে যে চিরদিন রহিবে গায়েব্—
চির-রহস্য হইয়া রাজে,
তার পরিচয় বড় যে গোপন—
চোখ দিয়ে দেখা চোখের মাঝে।

*

সকল ভাবনা দূর করি' দাও, বোলাও পেয়ালা
রূপসী সাকী!
জীবনের রোদ পড়ে' এল ওই মহা-নিশা সব
দিবে গো ঢাকি!

*

ভাগ্যে আমার যাই হোক্ আর
যেমনি হোক্
তাহাতেই রাজী, নাই আহ্লাদ
করি না শোক।

প্রেম বল আর অনাদরই বল
সুখ কি দুখ,
কিছুতেই মোর নাই উল্লাস,
দমে না বুক।
ঘটনা এ-সব— জলের উপরে
ঢেউ এর খেলা!
আসে য়ায় যেন বায়ু-চলাচল
সারাটি বেলা!

*

অধর রেখেছে যে কথা রুধিয়া
পরাণ-পণে,
নিলাজ নিদয় আঁখি বলে' দেয়
মিলন-ক্ষণে!
মনোমঞ্জুষা ভরা আছে সেই
গোপন সুখ
অতি অনুপম সেই সে গভীর
প্রেমের দুখ।

*

ভোরের বেলায় কহে বুল্ বুল্
গোলাপে মিনতি করি'—
চাঁদ ধুয়ে দেছে ও-মুখ তোমার,
জানি তাহা সুন্দরি!
তাই বলে' সখি করোনা দেমাক্—
তোমারি মতন হেসে
এই বনে গেছে কত ফুল-ঝরি'
ক্ষণিক বাসর-শেষে!

শ্রীমধুব্রত

ভারতী, বৈশাখ ১৩২৯

ফার্‌সী ফরাস

'কলিকাতা-রিভিউ'—পত্রিকায় প্রকাশিত ফার্‌সী কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে।

প্রেমীদের নাকি এই রেওয়াজ—
প্রাণে প্রাণে হয় কথা-বলাবলি,
সে ভাষার নাকি নেই আওয়াজ!
তবে কেন মোর চোখের জলের
জবাব মেলে না কোনো দিনই,
মিছে কেঁদে মরি—আর্‌জি আমার
জানি গো সেথায় পৌঁছে নি!

*

বুলবুল গায় গুঞ্জরি'—
যা' কিছু শাখায় মুকুলিয়া ওঠে
প্রেম সে ত' নয়, সুন্দরি!
সে ত নয় সবই আশার কুসুম
যা' ওঠে লতায় মুঞ্জরি'

*

চাই না প্রণয়—চির-সৌহৃদ,
সেই ত' রহে না, সে যে গো বৃথায়!
আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি—
নিমেষের দেখা, মধুর বিদায়!

*

শুধু এক পাক ঘুরিব দু'জনে
ফুলের বনে,
হাতখানি চেপে ধর একবার
অন্যমনে।
আবেশে অবশ দাও গো বারেক
আলিঙ্গন,
একটি সে চুমা—অধীর অধরে
আলিম্পন!
নিঠুর বিধিরে ফাঁকি দিয়া মোরা
এস গো সখি,
একটি নিমেষ উজলিয়া তুলি,
অমৃত ভখি!

তারাগুলি সব ওই চলে' যায়
অস্তপারে,
যাত্রীরা হবে এখনি বিদায়
অন্ধকারে!

*

গুল্‌শন্‌ চুমি' বুলে বুলবুল,
পোকা নাচে হের ঘেরি' চেরাগ!
[illegible]—
আশকের হের কী অনুরাগ!
আপনা-আহুতি করিতে হোথায়
অন্ধ প্রেমীর মরণ-যাগ!

*

শয়ন তেয়াগি' উঠিনু যখন
আকাশে প্রথম ভোরের আলো,
নবীনা সাধ্বী প্রকৃতি-কুমারী
বুকে এল মোর—লাগিল ভালো!
কোমল পরশে জাগিল হরষ,
পাখীর কাকলী শুনি মধুর!
আমার মনে যে আন কথা আনে,
আমারে এরা যে করে বিধুর!
কাণে কাণে কয়—আয়ু ক্ষয় হয়,
সুখ শোভা সব অকিঞ্চিৎ!
আর সবই ঝুটা—ভাঙা আর ফুটা,
মৃত্যুই শুধু সুনিশ্চিত!

*

প্রেমে যে ব্যথা দেয় প্রেমিক হ'য়ে
কখনো যে ব্যথা যাবে না স'য়ে!
সান্ত্বনা নাহি রে!
হাত তা'য় বুলায়োনা,
জুড়াতে না চাহি রে!
আশাটি হত হ'লে যে-ক্ষত হয়—
ব্যথা সে চিরদিন সমানই রয়!
সান্ত্বনা নাহি রে!
হাত তায় বুলায়োনা
জুড়াতে না চাহি রে!

প্রেম যে আরাধনা—সুখ যে প্রীতি!
দুখ সে হবে তারি সাধন-রীতি।

*

সুখ সুখ করে' মিছে ঘুরে মরি'
অরুচি আনে!
ধন-দৌলত?—মন কভু তায়
তৃপ্তি মানে?
জ্ঞানের সাধনা ঘুচা'ল না,
আঁধার তব!
সন্তোষ-মধু শান্তি কোথায়?
কোথায় প্রভু!

*

বক্ষে বাজিছে আঘাত-চিহ্ন,
আদুল করিয়া গা' দিব কি?
দুঃখ জানাব? কাঁদিব কি?
না গো, কাজ নাই! বন্ধুর হাত
হানিল বক্ষে যেই আঘাত —
আদুল করিয়া তা' দিব কি!
যে-ব্যথা গুমরে আমারি এ মনে,
হয় ত' সে মিছা, জানাব কেমনে—
কাঁদিব কি।
হায় সখি!

*

কার তরে তুই ছেয়ে দিলি ভুঁই—
তুলিলি আকাশ ঘিরে'
উদ্ধত ওই গুম্বজগুলা
মস্‌জেদ-মন্দিরে?
কার কাছে তুই জুড়িস, দু'হাত,
জানু পাতি' পূজা কার?
ধূম-কুণ্ডলী, ধূপের অর্ঘ—
কারে এ রক্তধার?
কাঙাল-জনেরে বঞ্চিত করি'
অন্নহীনের গ্রাস
ভারে ভারে তুই যারে দিস্ সে যে
কিছুরই করে না আশ!

*

মাঝে মাঝে কেন মনে হয় হেন
যৌবন যেন ফিরে আসে!
সুখ অনন্ত, নব বসন্ত!—
বধূ-বেশে যেন ধরা হাসে!
সেই উৎসব, গত বৈভব
মানসে উদিছে কেন আজি?
সেই মধুমাস সেই সুখহাস,—
কেন সেই সুর ওঠে বাজি'?
বুঝি দেয় দোলা কোন্ আধ্-ভোলা
মনোব্যথাখানি—তারি গীতি!
হরষ-অশ্রু, মুছে-আসা সেই
পুরোণো স্বপন—তারি স্মৃতি!

*

শুধু যৌবন ফিরে দাও, দেব!
ফিরে দাও, ফিরে দাও!
তাই পেলে মোরা চাহি না কিছুই,
আর যাহা আছে নাও!
যে চায় সে নিক্ তব কণ্ঠের
চির-মন্দার মালা!
যে চায় সে নিক্ মুকুট তোমার
অমৃত-কিরণ ঢালা!

*

প্রেম করিয়াছি পড়েছে অনেক
দীরঘ শ্বাস,
দুখ পাইয়াছি—সহিয়াছি সে যে
বরষ-মাস।
ভাগ্যে কি আছে সে ভাবনা মোর
ছিল গো মনে,
ভয় ভরিয়াছে দিবারাতি মোর
দুঃস্বপনে!

তবু সহিয়াছে সকলি আমার
হে মনোরমা,
কেমন করিয়া—জানিতে চেয়ো না
মিনতি তোমা!

*

চুলগুলি তোর কাকের পালক
ঘাড়ের কাছটি বরফ-সাদা!
টুক্‌টুকে ঠোঁট লালা-ফুল যেন!
চোখ কি নরম্—আদর-সাধা'
পিয়ারী! করিনু ধর্ম্ম শপথ—
এর একটিরো বদলে আমি
কায়কোবাদ আর কায়-খসরুর
চাই না মুক্তামণির গাদা!

*

এস এস বঁধু, শুধু ক্ষণতরে
বসি একাসনে তোমার সনে,
এস প্রাণসমা, এস প্রিয়তমা,
কুসুম তুলিব কালের-বনে।
মনে মনে গাঁথি', মনে মনে পরি'
চাপিব দু'হাত বুকের 'পর
মরণের মহা ঊর্মি এখনি
গ্রাসিবে সকলি, সহে না ত্বর।

*

দুঃখের কথা কে আজ বলে!
ডুবে যাক্ দুখ পেয়ালা তলে!
বুকে বাঁধি আয় সহেলি মোর,
খুলিব না আর এ বাহু-ডোর!
দুখ চিরদিন সাথেই আছে—
মানুষ বল্ ত' ক'দিন বাঁচে?
কর্ জীবনের এ-সুধা-পান,
হাতে যতখন পেয়ালাখান!

শ্রীমধুব্রত

ভারতী, আশ্বিন ১৩২৯

কবি-বিদ্রোহীর প্রতি

মাথায় তোমার কৃষ্ণমেঘের নিশান দোলে!
নহে ত অশ্রু!—তরল তড়িৎ চোখের কোলে!
ও কি ও পিপাসা! নিদারুণ আশা বক্ষে ধরি'
ঘোষিছ প্রলয়-ডমরু-নিনাদ বজ্ররোলে!

মানস-আকাশে রক্ত-সাগরে ডুবিছে রবি?
কাল-নিশীথিনী বধূ কি তোমার মরণ-লোভী?
একটুকু আলো কোথাও নাহিরে!—সৃষ্টি শেষ!
চিতায় চিতায় ফুৎকারি তাই ফিরিছ কবি!

যুগান্তরের বহ্নি-আহবে মশাল জ্বালি'
করোটি-কপালে বিষ-অভিশাপ-আসব ঢালি!
একি সুধাপান! ভয়ঙ্করের এ কি এ নেশা!
উদ্যত-ফণা ফণীর সমুখে কি করতালি!

তবু যে তোমার ললাটে জ্বলিছে উদয়-তারা!
কণ্ঠে তোমার প্রভাতী রাগিণী দেয় যে সাড়া!
নবজীবনের নবীন নবনী মুঠায় ভরি'—
কোন পুতনার স্তনপান করি আত্মহারা!

ওরে উন্মাদ, চিরশিশু, তোর এ কি এ খেলা!
কি স্বপন তুই দেখেছিস বল রাত্রি বেলা?
সে যে শশিকলা ছুরিকার ফলা নহে সে নহে?
রোজ-কিয়ামত নয়, সে যে নওরোজের মেলা!

আমি জানি, ওই কণ্ঠে তোমার অমৃত রাজে ;
বিষ যদি থাকে থাক্ না সে ওই বুকের মাঝে!
তার জ্বালা, সে যে জীবনের দাহ, সঞ্জীবনী—
তাহারি দহনে চিত্ত-গহনে দীপক বাজে!

হাজার বছর মরে আছে যারা তাদের কানে
কি বাণী দানিবে ঘূর্ণী হাওয়ার নৃত্য-গানে?
জাগরণ নয়!—দণ্ড দুয়ের দানোয় পাওয়া।
তারপর? ছি ছি মড়ার উপর খাঁড়া কি হানে?

তুমি নির্ভীক, তুমি দুর্দম, ঝড়ের সাথী ;
তুমি সমীরণ, ফুলেদের সনে কাটাও রাতি ;—
জীবন-মরণ দুই সতীনেরে করেছ বশ—
যখন যাহারে খুশী হয়, দাও চুমা কি লাথি!

রক্ত যাদের নেই এক ফোঁটা দেহের মাঝে—
খুন-খারাবী ও মন্ত্র তাদের দেওয়া কি সাজে?
পচা দেহে যার কিল্‌বিল্‌ করে শতেক ক্রিমি,
কোনো আগুনের তাপ তারে কভু লাগিবে না যে!

কারা সে করিবে মরণের মহাগরল পান?
বিষ-নিশ্বাসে আপনা দাহিবে—কোথা সে প্রাণ?
যারা মরে' আছে তারা কি আবার মরিতে পারে!
ভেবে দেখ নিজে, ত্যাগ কর বৃথা এ অভিমান।

চেয়ে দেখ দেখি পূর্ব-তোরণে কিছু কি জাগে—
নিশীথের নীল আঁচলে আলোর ছোপ কি লাগে?
ও নহে রক্ত!—শতেক ভক্ত ছেয়েছে হোথা
উদয়ের পথ হৃদয়ের প্রেম-পদ্মরাগে!

তুমি গেয়ে চল ওই পথে পথে আপনা-হারা,
জন্ম বাউল! আলোকের দূত!—পথিক পারা,
চুলগুলি তুলি চূড়া বাঁধি লও, খঞ্জনীতে
ঝঙ্কার তুলি জাগাও সারাটি ঘুমের পাড়া।

তুমি শুধু ডাকো—'জাগো সবে জাগো, আলোক জাগে!
হিরণ-কিরণ প্রাণের দুয়ারে প্রবেশ মাগে!
মোর মুখে তোরা চেয়ে দেখ্‌ দেখি অবিশ্বাসী!
এমন হাসিটি দেখেছিস কোনো গোলাপবাগে?

'ওরে কেটে গেছে চিরতরে ঘোর দুঃস্বপন!
কাঁটা যেথা ছিল দেখরে সেখানে ফুলেরি বন!
মহা-আশ্বাস ছায় নীলাকাশ—দেবতা জাগে!
সাগর-সিনানে যাবি যদি—এই পরম ক্ষণ!

'শুধু একবার ডেকে বল্ তোরা—মরি নি মোরা!
মরণ!—সে যে গো মহাকাল-হাতে রাখীর ডোরা!
জীবনেরি মোরা পরমাত্মীয় চিনেছি তারে!
জীবনেই জয়, প্রেমেই অভয়—বল গো তোরা!

'মারিয়া যে বাঁচে—বাঁচা তার নয়, সেই ত মরে!
বাঁচাতে যে মরে, মরণ তাহারে প্রণতি করে।
যুগে যুগে এই মহাবাণী এই অমৃত-গীতা
গেয়েছেন যাঁরা জন্মেছি মোরা তাঁদেরি ঘরে।'

হে কবি নবীন জীবন তোমার মুক্তধারা!
তুমি গাও গান—শুনিবে সকলে নিদ্রাহারা।
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বাস—অভয়বাণী
আলোক-আঘাতে ভেঙে দাও এই আঁধার কারা!

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩০

রোগ-শয্যার চিঠি

এতদিনে ফিরেছেন বাদুরবাগানে
মনে করি' পাঠাইনু পত্রে সেইখানে—
বিজয়া-প্রণাম মোর আর আলিঙ্গন।
কুশল বটে তো সব? মিলন-লগন
হয়েছিল সুমধুর? ফিরিবার কালে
শিশুদুটি মুখপানে কেমন তাকালে?
ম্লান-মুখ অভিমানে-ছলছল-আঁখি—
চিরবিরহিণী দ্বারে দাঁড়ালেন না কি?
না জানি সে শারদীয়া শুক্লাতিথিগুলি
দম্পতীরে কি দানিল! জ্যোৎস্নার তুলি
প্রেমিকের হৃদিপটে ,সুবর্ণ-লেখায়
ফুটাইল কত চিত্র বাস্তব-রেখায়!
আমার কল্পনা সে কি মিথ্যা হবে, দাদা?
ধন্য হই, যদি সত্য হয় তার আধা।

কল্পনারে এইবার করিনু বিদায় ;
আমার যা সত্য তাহা লিখিব কি হায়!
ভেবেছিনু, সেটা বুঝি বিরহের জ্বর—
স্নেহের শুশ্রূষা মাত্রে ছুটিবে সত্বর।
ভুল! ভুল! ছিনু ভাল পাঁচ-সাত দিন—
তাও সে দুর্বল বড়, অতিশয় ক্ষীণ ;
পুনরায় পূর্ণিমার কোজাগর-রাতে
ভগ্নদেহে জ্বর লয়ে পড়িনু শয্যাতে।
বিরহ আছিল ভাল—মিলন-চুম্বন
তিক্ত হ'ল কুইনিনে, শ্লথ আলিঙ্গন।
সাবু খেয়ে বড় কাবু, কি বলিব আর—
ভাল নাহি লাগে মোটে যতন প্রিয়ার।
বিশ্বের যা-কিছু মিঠা হয়ে গেছে তিত ;
কাব্যসুন্দরীর হাসি চির-পরিচিত
তাও আর নাহি পারে ভুলাইতে দুখ,
উদাস উন্মনা আমি, বড় শূন্য বুক!
সাহিত্য-চর্চার আশা ছুটির ভিতরে—
ছেড়ে দিছি একেবারে, বুঝি চিরতরে!
বুক-জ্বালা, মাথা-ধরা আর বিবমিষা,
অপরিপাকের পীড়া, নিদ্রাহীন নিশা—
এর মাঝে কোথা পাব মোহের মাধুরী?
এইখানে ধরা পড়ে কবির চাতুরী।
শুধু সে সাবুর সাথে পলতার ঝোল,
কভু একখানি রুটি ; আবোল-তাবোল
কন্যার বিচিত্র বুলি—বহু উপদ্রব ;
প্রভাতে সন্ধ্যায় নিত্য চায়ের উৎসব!
(গৃহিণীর উৎসাহ সে ; জানে, লোভ আছে
ওইটুকু 'পরে শুধু, সে পিপাসা পাছে
মন্দ হয়—তাই, তার বলয়-শিঞ্জিত
শোনা যায় যথাকালে, চা পাতা-সিঞ্চিত
উষ্ণ জল ঢালে যবে পেয়ালায় ভরি')
এর বেশী নাই কিছু। সারাদিন ধরি'
বসে' থাকি, শুয়ে কভু, শূন্য বিছানায়
জানালার ধারে। চেয়ে দেখি আঙিনায়
ভ্রমিছে শরৎ-রৌদ্র, ঊর্ধ্বে নীলাম্বর—
এখনো রয়েছে চাঁদ, শীর্ণ কলেবর।

নিম্নে হেরি সুচিক্কণ পল্লব-পুঞ্জিত
বন-শোভা ; নহে বটে ভ্রমর-গুঞ্জিত,
তবু গৃহ-প্রাঙ্গণের পুষ্পতরুগুলি
বিবিধ-বরণ ফুলে উঠেছে মুকুলি'।
গভীর বেগুণী-নীল অপরাজিতার
ডাগর আঁখির আহা মরি কি বাহার!
একটি গাঁদার ঝাড়ে দুটি ম্লানমুখ
ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়াছে—আলোক-উৎসুক
পীত-পাণ্ডু শীর্ণ-দেহ রোগীদের মত—
তার চেয়ে কুমড়ার ফুলে শোভা কত!
পাশে তার ঘনঘোর সবুজের ভিড়ে
চেয়ে আছে রক্তজবা, তার একটিরে
দু'হাতে ধরিতে হয় অঞ্জলি ভরিয়া!
এত লাল!—কে তরুণী রয়েছে ধরিয়া
সদ্য-ছিন্ন হৃদ্‌পিণ্ড বলি-উপহার—
রক্ত-প্রস্রবণ যেন! ছুরীর প্রহার!
পীড়িত জনের সে কি ভাল কভু লাগে?
দৃষ্টি তাই খুঁজে ফিরে বহু অনুরাগে
মধুর কোমল স্নিগ্ধ আবীর-বরণ
আর এক প্রিয় ফুলে ; দূরে তারি বন—
আলো-করা ছোট ছোট অসংখ্য কুসুমে ;
এখন এ রৌদ্রে তারা ঢুলে আছে ঘুমে!
সরম-শঙ্কিত তনু—নাম কৃষ্ণকলি,
আমি তারে পুষ্পমণি পদ্মরাগ বলি ;
বাহিরিবে হাসমুখে গোধূলি-আঁধারে,
বৃথা চেষ্টা দিবাভাগে লজ্জা ভাঙিবারে।
একটি শিউলি আছে, গাছ বড় নয়,
সকালে তলাটি তার ফুলে ফুলময় ;
শিউলি, দিনের যেন স্বাগত-বন্দন,
কৃষ্ণকলি যেন তার বিদায়-চন্দন!
এই সব ফুল দিয়ে দিনগুলি ঢাকি,
একটু আনন্দ পাই তাই চেয়ে থাকি।
মোর মনে হয়, যার ভগ্ন দেহমন,
রোগশীর্ণ, অবসন্ন নয়ন শ্রবণ—
ফুল তার ভাল লাগে। প্রকৃতি-মাতার
স্বহস্ত-রচিত সে যে স্নেহ-উপহার!

এ নহে কবির চিন্তা, সকল মানব
সমভাবে এই স্নেহ করে অনুভব।

তবু এই শরতের সুবর্ণ-জুবিলি
ম্লান হয় দিন-দিন—হেমন্ত-কুহেলি
অভিভব করে তারে অলক্ষ্য সঞ্চারে ;
এমন প্রখর রৌদ্র, হানে তবু তারে
বিষ-অবসাদ! এ যেন আমারি প্রাণ—
দিন-দিন জ্যোতি তার হয়ে আসে ম্লান,
অকাল-শিশির-সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসে।
অন্ধকার গৃহতল, নিশীথ-আকাশে
জ্যোৎস্না আজো অফুরান্—মোর অধিকার
নাহি তায়, বাতায়ন (যেন বাসনার)
রুদ্ধ করে' পড়ে' থাকি রোগশয্যা 'পরে,
বাতি জ্বলে মিটমিটি আমার শিয়রে!
এমনি কাটিছে দিন। সুখ দুখ তার
কহিলাম ;—আর নয়, আসি এইবার।
আর আর বন্ধুজনে বিজয়ার প্রীতি
জানাবেন হৃদয়ের। আজ তবে ইতি।

আশ্বিন, ১৩৩০

দ্রোণ-গুরু

[কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য কুরুসেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্মণ্য বলিয়া দ্রোণ-বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ-শিষ্য অর্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া ওঠে। এই বিদ্বেষের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে, কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাটির কথা মূল মহাভারতে নাই। কর্ণাটদেশে প্রচলিত মহাভারতের তামিল-সংস্করণের একটি গাথা অবলম্বনে এই কবিতা রচিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্যের মনে অর্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য এবং তাঁহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে, অর্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্রোহসূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।]

কি বলিস্ তুই অশ্বত্থামা! আমি মরে' যাই লাজে!
আমি ব্রাহ্মণ, তবু বলিব না—ক্ষত্রিয়কুলমাঝে

হেন কাপুরুষ আছে কোনো ঠাঁই,—ভীরু, আত্মম্ভরি—
মিথ্যা দম্ভ-গর্বের ভরে আপনারে বড় করি'
আপনার পূজা ষোড়শ-উপচার মাগে যে গুরুর কাছে!
অনুষ্ঠানের ত্রুটি পাছে হয়, সদা সেই ভয় আছে!—
তাহারি লাগিয়া আক্রোশ করি' শিষ্য হইয়া বীর
বন্যবরাহ-হনন করা সে ঘৃণ্য ব্যাধের তীর
চীৎকার সহ নিক্ষেপি' করে বাতাসের সনে রণ—
বলে পাণ্ডব-কৌরব-গুরু আমারি সে প্রিয়জন!
পাণ্ডব সে কি? কোন্ পাণ্ডব? কে বা সে ছন্নমতি?
আমার নিকটে অস্ত্রশিক্ষা!—হায় একি দুর্গতি!
বলে, সে পার্থ!—কৃষ্ণ-সারথি! নব-অবতার নর!—
মহাবিপ্লব-যুগান্তরের নবীন যুগন্ধর!
যার পৌরুষে যত মহারথী দ্রুপদের সভাতলে,
মুগ্ধ হইল লক্ষ্যভেদের অপূর্ব কৌশলে ;
যার বীরত্বে বিস্মিত নিজে শঙ্কর ত্রিপুরারি—
দানিল দিব্য পাশুপত যারে দানবদহনকারী ;
যার প্রতিভায় ব্রাহ্মণ-দ্রোণ ব্রহ্মণ্যের চেয়ে
মানিয়াছে বড় ক্ষাত্র-মহিমা—শিষ্য যাহারে পেয়ে,
—এই লিপি তার!—অশ্বত্থামা! হয়েছিস্ উন্মাদ?
কি কথা বলিস? কে শুনাল তোরে এ হেন মিথ্যাবাদ?

—অর্জুন?—আরে ছিছি, ছিছি, ছিছি! তার হেন দুর্মতি!
তার মুখে হেন অনার্য বাণী!—আপন গুরুর প্রতি,
মিথ্যা রটনা—এই অপবাদ-মিথ্যার অভিনয়ে
পটু হবে সেই! অসি ছেড়ে শেষে মসীর পাত্র লয়ে
ছিটাইছে কালি, রণ-অঙ্গনে অঙ্গনা-রীতি ধরে!—
রমণীর মত বাতাসে ভেজায়ে কোন্দল সুরু করে!
বিরাটপুরীর অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলার কথা
মনে আছে বটে—অকীর্তিকর!—সেথাকার বাচালতা
পুরস্ত্রীদের কুৎসা-কলহ, সেই নটনটী-লীলা
স্বভাব নষ্ট করেছিল বুঝি? আজো অন্তঃশীলা
নপুংসকের বিকৃত শোণিত কিণাঙ্ক-করমূলে
বহিছে নাড়ীতে? হায়, হতভাগা এখনো যায় নি ভুলে!
গুরুনিন্দার পাতকের ভয় এতটুকু মনে নাই!
আজ তুমি বড়! গুরুমারা চোর! তুমি মহাবীর, তাই
একটা ক্ষুদ্র মশকের হুল সহিতে পারো না তুমি!
—অত্যাচারীর খড়্গ ভাঙ্গিবে, রাখিবে ভারত-ভূমি!

ছলের আঘাতে, কুরুক্ষেত্রে ফেলি দিয়া গাণ্ডীব,
রথ হতে নামি মৃত্তিকা'পরে মাথা ঠোকে ঢিব্-ঢিব্!
নারায়ণী-সেনা হাসিছে অদূরে, রঙ্গ দেখিছে তারা,
আমার মাথা যে হেঁট হয়ে যায়, পশ্চিমে ওই কারা-
ফেরুপাল বুঝি—হর্ষিত-চিতে চীৎকার করি' ওঠে,
সূর্যের মুখে অস্তমলিন হাসি বুঝি ওই ফোটে!

* * *

কেন তোর এই অধঃপতন বল্ দেখি, ফাল্গুনি!
এই বিদ্বেষ ঈর্ষার জ্বালা কার তরে বল্ শুনি?
আমি গুরু তোর, একা তোরি গুরু?—আর কেহ নাহি রবে?
আজিকার এই সমরাঙ্গণে যদি কেউ যশ লভে—
রণ-কৌশলে আর কেহ যদি আমারে প্রণাম করি'
দূর হ'তে পায় আমারি শিক্ষা-সাধনার কারিগরি—
ধর্মক্ষেত্রে সে কি অধর্ম? তোমারি হইবে জয়?
তোমার দর্পে আর কেহ যদি হেসে কুটি-কুটি হয়,
সে কি তার মহা ধর্ম-দ্রোহ?—হয় যদি তাই হোক্,
তার লাগি' মোর অপরাধ কিবা —কেন তায় এত শোক!
আজ দেখিতেছি, একদিন সেই নিষাদের নন্দনে
করেছিনু ঘোর অবিচার আমি মমতা-অন্ধ মনে।—
তোমারি লাগিয়া অঙ্গুলি তার চেয়েছিনু দক্ষিণা,
সে পাপের সাজা কেবা দিবে আর ক্রূর অর্জুন বিনা
আজ পুনরায় নব ধানুকীর অঙ্গুলি কাটি' লয়ে
পাঠাতাম যদি তোমার সকাশে—হর্ষে ও বিস্ময়ে
গুরুদেব বলি' কত বাখানিতে বৃদ্ধের বীরপনা!—
সে আর হবে না—আর করিব না ধর্মেরে বঞ্চনা।
এত কাল ধরি' দিয়াছ যে গুরু-ভক্তির পরিচয়,
সেই ভালো ছিল, তার বেশী এ যে হয়ে গেল অতিশয়!
মনে ভেবে দেখ, কিবা মানে তার, কি বুঝিবে রাজগণ,—
ধিক্কারে আজ মুখরিত হ'ল কুরুদের প্রাঙ্গণ!

* * *

না-না, না-না, না-না, একি এ প্রলাপ বকিতেছি বার বার!
অশ্বত্থামা! ফের পড়্ লিপি, —হয় নি পরিষ্কার!
মোর প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই কিরীটীর নহে লিপি,
এ লিখেছে কোন্ কুলশীলহীন পরের প্রসাদজীবি!

লেখার মাঝারে ওঠে না ফুটিয়া সেই মনোহর মুখ,
আজানু-দীর্ঘ সেই বাহু তার, বিরাট বিশাল বুক!
হ্রস্ব খর্ব এ কোন্ বামন উপানৎ পরি' উঁচা
হইবারে চায়, চুরী-করা চূড়া মাথায় বেঁধেছে ছুঁচা!
অর্জুন নিজে শ্যাম-কলেবর—কৃষ্ণের সখা সে যে!—
সে কি ঘৃণা করে কৃষ্ণবরণ? বধূ কৃষ্ণার তেজে
বাহুতে বীর্য, বক্ষে জাগিল যৌবন ব্যাকুলতা,—
সে করেছে গ্লানি মসীরূপ বলি'? সম্ভব নহে কথা!
এ কোন্ শবর কিরাতের গালি, অনার্য জাতি-চোর!
নকল কুলীন!—বর্ণ-গর্বে কুৎসা রটায় মোর!
হয়েছে! হয়েছে! অশ্বত্থামা! জেনেছি এতক্ষণে—
বীরকুলগ্লানি সেই নিন্দুকে এবার পড়েছে মনে!
আমি ব্রাহ্মণ, চির-উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্যের শিখা
ললাটে আমার—মিথ্যা-দহন জ্বলে যে সত্যটীকা!
রাজসভাতলে জনগণমাঝে করি না যে বিচরণ,
পথ-কুক্কুর নীচ-সহবাস ত্যজিয়াছি প্রাণপণ।
তবু যে আমার ধনু-নির্ঘোষে টঙ্কার-ঝঙ্কারে
নিজে গায়ত্রী ছন্দ-জননী আসিয়া দাঁড়ান দ্বারে!
আমার পর্ণ-কুটীরের তলে রাজার দুলাল বীর—
গড্ডলিকার দল নহে—আসি' মাটিতে নোয়ায় শির!
আমি সাধিয়াছি আর্য-সাধনা—সনাতন সুন্দর!—
যে-মন্ত্র-বলে শাশ্বতীসমা সদ্‌গতি লভে নর।
ত্যজি' অনার্য-জুষ্ট পন্থা, অন্ত্যজ-অনাচার,
ক্ষত্রিয় সাজি' ক্ষত্রিয়ে দিছি ব্রাহ্মণ-সংস্কার।
কর্ণপটহ বিদারণ করি', বিদারিয়া নভোতল,
পথে পথে ফিরি' ইতরের সাথে করি নাই কোলাহল।
যুগ-ধর্মের সুযোগ বুঝিয়া চির-সত্যের গ্লানি
করি নাই কভু,—যশোলিপ্সার—স্বার্থের আপ্‌সানি!
নিজ হৃদয়ের পুরীষ-পঙ্ক দুই হাতে ছড়াইয়া,
যুগবাণী বলি', ধ্রুব-শাশ্বত পদতলে গুঁড়াইয়া,
যত মূর্খ ও ষণ্ডামার্কে ভক্তশিষ্য করি',
এই দেবতার দিবারে করিনি পিশাচের শর্বরী!
জানিস্ বৎস, কোন্ মহারথী—এ কোন্ নূতন গ্রহ,
মোর সাথে চির-শত্রুতা মানি', বিদ্বেষ দুঃসহ
পুষিয়াছে মনে?—বৈরী সে, যথা কৃষ্ণের শিশুপাল!—
সত্যের এই মিথ্যা-বৈরী যুগে যুগে চিরকাল!

আজ আসিয়াছে নূতন ছদ্মে শিষ্যের সাজ পরি'—
গুরু-শিষ্যের ভক্তি ও স্নেহ কুৎসায় লবে হরি'!

চিনেছি তোমারে, হে কপটচারী দাম্ভিক দুর্জন!
বক্ষের মণি অর্জুন নও—পাদুকার অর্জন!
বীর সে পার্থ আর্ত হয় না স্বার্থের সংকোচে,
—গুরুহত্যার পাতকের ভয়ে ললাটের স্বেদ মোছে!
বজ্র-আঘাতে হয় না কাতর বীর সে সব্যসাচী—
তারে কাবু করে গোটা দুই তিন বাতাসের মশা-মাছি!
তাহারি কারণে উন্মাদ হ'য়ে করিবে সে গুরু-দ্রোহ!
একি পাপ! একি অহঙ্কারের নিদারুণ সম্মোহ!
সে কি পাণ্ডব! দ্রোণের শিষ্য ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি!—
খুলে ফেল্ তোর ক্ষত্রিয়-বেশ, ওরে পাণ্ডব-শনি!
রাধেয় কর্ণ পরিচয় তোর! আর যাহা পরিচয়—
সে কথা কহিতে ঘৃণায় আমার রসনা ক্ষান্ত হয়!
চিরদিন তুই মিথ্যার দাস, মিথ্যাই তোর প্রিয়—
গুরু ভার্গবে প্রতারণা করি, সেজেছিলি শ্রোত্রিয়!
সেই কীট তোরে ছাড়িল না আজও! সেদিন পড়িলি ধরা
দংশন সহি'! —আজ বিপরীত—হ'লি যে অর্ধমরা!
জামদগ্নির অভিশাপব বহি' গলায়ে আসিলি চোর!
জাতি আপনার লুকা'তে নারিলি, লজ্জা নাহি যে তোর!
দ্রোণ গুরু নয়, সার্থক তোর গুরু সে পরশুরাম—
বিস্ময় মানি দম্ভে তোমার—রেখেছ গুরুর নাম!

* * *

ওরে নির্ঘৃণ! আপনি আপন বিষ্ঠার পর্বতে
চড়ি' বসিয়াছ—মনে করিয়াছ আঁধারিবে হেন মতে
সবিতার মুখ!—মোর যশো-রবি-রাহু হ'তে সাধ যায়!
আরে, আরে, তোর স্পর্ধায় দেখি জোনাকীও লাজ পায়!
কেমনে আনিলি হেন কথা মুখে? যজ্ঞের হবিটুকু
সন্তর্পণে রাখিয়াছি ঢেকে, তাও হেরি' চাকু-চুকু
করিয়া লেহন, সাধ যায়—সেথা উগারিতে একরাশি
অমেধ্য যে সব উদরে রাজিছে—কতকালকার বাসি,
চুরী-করা যত গর্‌হজমের!—পথে প্রান্তরে যার
সৌরভ পেয়ে এতদিন পরে ভরিয়াছে সংসার
লালা ও পঙ্কবিলাসীর দল—শবভুক নিশাচর,
শকুনি, গৃধিনী, শৃগালের পাল—রসনা-তৃপ্তিকর

পাইয়াছে ভোজ! ভাবিয়াছ বুঝি সেই রস উপাদেয়?
দেব-যজ্ঞের আহুতি সে ঘৃত সোমরস হবে হেয়?
উন্মাদ—তুই উন্মাদ! তাই পতনের কালে আজ
বিষ-বিদ্বেষ উথলি' উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ!
আমারে করেছে কুরু-সেনাপতি কৌরব নৃপমণি,
তাই হিংসায় পুরীষ-ভাণ্ডে মাছি ওঠে ভন্‌ভনি'!
তাই তাড়াতাড়ি পার্থের নামে কুৎসার ছল ধরে'
তারি নামে লিপি পাঠালি আমারে কুৎসিত গালি ভরে'
আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরী নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা' তুহারে!—ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর-সাজা
ঘুচিবে তোমার,—মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোস-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস—
চরম ক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!
মিথ্যায় ভুলি' যে মহামন্ত্র গুরু দিয়েছিল কাণে,
বড় প্রয়োজনে পড়িবে না মনে, সে বিফল সন্ধানে
নিজেরি অস্ত্র নিজেরে হানিবে—শেষ হবে অভিনয়,
এতদিন যাহা নেহারি' সকলে মেনেছিল বিস্ময়!

শনিবারের চিঠি, ৮ কার্তিক ১৩৩১

নব-রুবাইয়ত্

(এক)

ঘাট থেকে হাটে চুব্‌ড়ী মাথায়
যেও না, সজনি, যেয়ো না!
মিশি দিয়ে দাঁতে শুধু মুখে সখি,
দোক্তা ও চূণ খেও না!
তুমি যে আমার কবিতার বঁধু,
বয়স-কালের চাক-ভাঙা মধু!—

মৎস্যগন্ধা প্রেয়সী আমার
যেথা সেথা তুমি ধেয়ো না!
ঘাট থেকে হাটে চুব্‌ড়ী মাথায়
যেয়ো না সজনি যেয়ো না।

বিকালে বসিয়া তোমারি দাওয়ায়
ছোট কলিকায় ফুঁ দিয়া,
ভুঞ্জিব তব রস-আলাপন,
মাঝে মাঝে শুধু হুঁ দিয়া।
তার পর যবে ও মোর বিরাজী,
ঢেলে দেবে ভাঁড়ে তালের সিরাজী,
কোঁৎ কোঁৎ কোঁৎ ঢক্ ঢক্ ঢক্
পিইব নয়ন মুদিয়া—
তুমিই তখন এই পরাণের
উনুন ধরাবে ফুঁ দিয়া।

বড় ভালবাসি সুঁট্‌কি-মাছ আর
পান্তা-ভাতের পোলাও,
নোনা-ইলিসের চাটনির চাট্
বোলাও, পিয়ারী, বোলাও!
ফাঁদি-নথ আর মাকড়ীর ছাঁদে
হৃদয় আমার ডুকুরিয়া কাঁদে,
ভির্মি যে যাই, কুলকুচো কালে
গাল দুটি যবে ফোলাও?
তবু ভালোবাসি তোমার হাতের
সুঁট্‌কি মাছের পোলাও।

ওই খাঁদা নাকে নাক-ছাবি পরে'
কেড়ে নিলে মোর মনটি,
তারি লাগি মুই জাত খোয়ালেম
বদল করিনু কণ্ঠি!
ওর কাছে কোথা লাগে 'কালো তিল',—
তাই গানে মোর এত ভালো মিল,
নাকেরি পীরিত—তাই নাকী সুরে
ভরে তুলি সারা বনটি,
মরি মরি! ওই নাকছাবি তোর
কেড়ে নেয় মোর মনটি!

আর নাহি ভয়, কহিনু নিচয়
যৌবন মোর জেগেছে,
সেই সনাতন সুরের মাতন
শিরদাঁড়াটায় লেগেছে।
পশু-মানুষের সহজ তন্ত্র
হবে আজি মোর সাধন মন্ত্র,
পেত্নী-দেবতা ভর করিয়াছে,
ভগবান-ভূত ভেগেছে!
আর নাহি ভয়, কহিনু নিচয়
যৌবন যে গো জেগেছে।

চাহিনা আঙুর—শুধু চানাচুর,
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান্ দুই,—
ঘল্‌ঘসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ বেল যুঁই।
লোকে বলে গানে আঁশ্‌টে গন্ধ,
বোঝে না আমার এমন ছন্দ!—
আর কিছু দিনে ইহারি ক্ষুধায়
নাড়ী যে করিবে চুঁই চুঁই।
চাবে না আঙুর, চাবে চানাচুর
চিংড়ির চপ খান দুই।

এস তবে এস, সাঁজালের ধোঁয়া
দেয় বুঝি ওই গোয়ালে,
কলসীর রস ভাঁড়ে ঢেলে দাও—
খাল ধরে বুঝি চোয়ালে!
প্রেমনদে মোর এসেছে জোয়ার,
ওগো এসো আর কোরো না খোয়ার-
ভাঁটা পড়ে যাবে, নেশা যে ফুরাবে
এই রাতটুকু পোয়ালে—
সাঁজ হয়ে গেছে, সাঁজালের ধোয়া
দেয় বুঝি ওই গোয়ালে!

শনিবারের চিঠি, ১৫ কার্তিক ১৩৩১

রুবাইয়ত্-ই-চামার খায়-আম

(দুই)

১

দেখ সখি, চাঁদ ওঠে ঠিক যেন কাস্তে!
আজ বড় সাধ যায় হাস্তে ও কাস্তে।
এখনো হ'ল না বাধা অত সরু বিউনি!
জান্‌লা ভেজিয়ে দাও, কথা কও আস্তে!

২

যতখন তুমি আছ আর আছে জোয়ানি,
আর এই জেবে আছে টাকা-সিকে-দোয়ানি,
নেহি কুছ পরোয়া!—মোল্লা কি আল্লা!
শেষ কালে থাকে থাক লিভারের চোঁয়ানি।

৩

ওগো সাকি! মুখে মাখি' পাউডার আল্‌তা
বেড়ে আনো অম্বল—গুড় আর চাল্‌তা,
সজিনার খাড়া—সখি তায় দিয়ে বড়ি থোড়,
চচ্চড়ি রেঁধে রাখো, খাব দোঁহে কাল তা!

৪

কেউ চায়, কেউ পায়, কেউ ফেলে হারিয়ে ;
কেউ কোলে কাঁদি নিয়ে কলা খায় ছাড়িয়ে!
কারো কুল বেল হয়, কারো আম আমড়া—
দুনিয়ার এই ধারা, মুস্‌কিল ভারী এ!

৫

দাও ঢেলে, মেপো নাক'—আহা, আহা, কর কি!
ঘোল না ও দই তোর—আগে দেখি পরখি',
এর চেয়ে ভালো ছিল দুধটুকু বল্‌কা,
চুমুকে চুমুকে হ'ল গা'টা জ্বর-জ্বর কি?

আয় মোরা যাই চলে কাবুলে কি ভুটানে,
নিয়ে চল্ কাঁথাখানা, আর ঘটি দুটা নে ;

সেথা তুই খাবি শুধু মুড়ি আর পেস্তা।
আমি দেব কাঁথা মেলে রোদ্দুরে উঠানে।

৭

আমি রোগা বৃষ কাঠ? তবু যদি প্রাণ চায়
পারি কি না তোর সাথে লড়ে' দেখ্ পাঞ্জ
শিস্ দিয়ে গান গাই, তাল দিই তুড়িতে—
মাঝে-মাঝে তবু কেন পেটে কি যে খাম্‌চ

৮

ও গো ধনি, যৌবনই জীবনের সার যে,
রেখো না ও ধন ঢেকে মলিদা কি সার্জে।
পান খাও, খেয়ে হাসো লাল ঠোঁটে খিলখিল,
ছোপ দাও মোর মুখে, লাজ কি ও কার্যে?

৯

মান করে থাক কেন, কেন কর ন্যাক্‌রা?
নেকলেস্ গড়াবে কি? ডাকিব কি স্যাক্‌রা
ফুর্তির ফাউটুকু আর কারে দিও না,
আমি তোর পোষাপাখী নই ও'রে ড্যাক্‌রা

১০

মেঘ দেখে খামোকা এ মন কেন হামলায়?
যেন আমি বসে' আছি গোবরের গামলায়!
ডাক ছেড়ে গাই যবে—'এস এস প্রেয়সী',
ঘরে ঘরে কেন সবে ঘটি-বাটি সামলায়!

১১

চিঁচি করে' ঝিঝি ডাকে চাঁদামামা চোট্টা
ডুব দিল এখনি? ও বড় কাটখোট্টা।
গান মোর শেষ হ'ল, আসি তবে এইবার—
কি বলিস—আমি জানি কোথা তোর গোটটা?

শনিবারের চিঠি, ২২ কার্তিক ১৩৩১

রুবাইয়াৎ-ই-চামার খায়-আম

(তিন)

১

ভোর-আকাশে দেখ্‌নু চেয়ে তামার বরণ আলোর চাকী,
তোমায় তখন পড়ল মনে, ওগো আমার গুড়ের সাকী!
তাই ত আমার প্রাণটা হ'ল রঙীন তোমার রূপের রঙে—
লাগছে এমন "কোল-আঁধারে"—পাগল হওয়াই কেবল বাকি!

২

মনের কথাই বল্‌ব এবার গান যে হবে প্রাণের জোলাপ,
থাক্‌বে তা'তে ভাঙা ভিটেয় বাস্তু ঘুঘুর করুণ বিলাপ ;
কড়্‌কড়িয়ে পড়বে যে বাজ, ছন্দমামীর ঝুমুর নাচে,
আঙুর হবে আমড়া-আঁটি, দোপাটিসই রক্ত গোলাপ।

৩

আয় কুড়ানি, আমার রাণী, মুছিয়ে দি তোর চক্ষু দুটি,
তোর পানে সই চাইলে পরে ভাঙের নেশা যায় কি ছুটি?
এবার রথে দেব তোমায় এ্যয়সা বড় কলসী কিনে,
জল্‌কে যেতে নজর যে দেয় মারব তারে জল-বিছুটি।

৪

ঝিনিক ঝিনিক বাজবে যবে কটির 'পরে চন্দ্রহার,
বাঁশতলাতে ভুলব তখন বাঁশের খোঁচা যন্ত্রণার ;
আনবে যখন কুড়িয়ে গোবর ছাতিম গাছের দিক থেকে,
হুমড়ি খেয়ে পড়ব নাগো—হোক্ না সে ঠাঁই অন্ধকার।

৫

হোঁপার ফুলে বাঁধবে খোঁপা, ডেল্‌কোটিতে পিদিম জ্বেলে
সন্ধেবেলা বসবে কাছে, ছড়িয়ে দু'পা, আঁচল মেলে',
কপাল জোড়া উল্কি দেখে' পড়বে না আর চোখের পাতা,
মজবে নয়ন সেই রূপেতে—পিঠে এবং পায়েস ফেলে।

৬

হ্যাঁ দ্যাখ্‌, সেদিন আস্‌তেছিলাম এক্‌লা পথে শেষ রাতে,
তারিখ যে তার মনেই আছে—অগ্রহায়ণ তেস্‌রাতে—

জোনাক্ পোকা জ্বলতেছিল, চোখে— না সে বনের পাতায়?
সত্যি, শুধু একটি ছিলিম!—হয়নিকো পা' পেছ্লাতে ;

৭

এমন সময় হঠাৎ কে দেয় তেঁতুলতলায় হাতছানি—
ডাকলে যেন খোনা গলায়—লাগল এমন আঁতকানি!
ঘোম্টা পরা জ্যোৎস্নাপরী! একটু কেবল দাঁত উঁচু
বল্লে, "পরাণ, যাচ্ছ কোথায়? দেখছ কেমন রাতখানি"!

৮

বস্বে এস আমার পাশে, মিথ্যে কেন কষ্ট পাও?
যেখান সেখান ঘুরছ কেন? এমন দেহ নষ্ট তা'ও!
তোমার গানের ভাব লেগেছে আমার প্রাণে সত্যিকার—
কালকাসিন্দের বনে বসে' ডাক ছেড়ে আজ পষ্ট গাও!

৯

জুটবে কত গোভূত এসে মাম্দো এবং কন্ধ-কাটা,
বলবে, বাঃ ভাই! মন্দ মোটেই নয় যে তোমার বন্দনাটা।
ভূতের 'গা'ও শিউরে ওঠে এমনি তোমার দরদ খাঁটি!
এবার থেকে পুকুর-পাড়ে কোরোনা আর বন্ধ হাঁটা।

১০

শুনে আমার প্রথমটা যে ডজন খানেক পড়ল হাঁচি,
ভয় হ'ল না, একটু বরং ইচ্ছে তা-ধেই তা'-ধেই নাচি!
দেখনু আছে বনের মাঝে আমার গানের সমজদার,
থাক্লে বেঁচে বল্‌ত এমন? ভাগ্যে মরে' গেছ্‌ল পাঁচি!

১১

সেই থেকে মোর প্রাণের ভেতর কচ্ছে কেমন গুরুগুরু,
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে যেদিন পাঁচি হ'ল গানের গুরু ;
সেদিন থেকে দিচ্ছি কেবল পিলের উপর বেলেস্তারা—
ভাবছি এবার পাঁচালিতে পাঁচির পাচন করব সুরু।

১২

পাঁচি আমার লক্ষ্মী ছিল—রাগ কোরো না সৈরভি!
তোমার প্রেমে ডাঁটা চিবুই, পাঁচির প্রেমে হই কবি!
নাকের জলে বইল নদী পাঁচি যেদিন তুল্‌লে পটল,
সে ছিল বেদন-বেহাগ, তুমি ভজন-ভৈরবী।

১৩

কে বলে ওই বেগুনগুলোয় নেই সে দাঁতের মিশির দাগ!
কুমড়ো-ফুলে ওই দেখ তার ন্যাবা-চোখের হলুদ রাগ।
মাচার পানে চাইতে নারি—মনটা যে-হয় কেমন ধারা।
এখনো সেই পাঁচির শোকে পাঁচিলে ওই ডাকছে কাগ।

১৪

এমন করে' কাঁদতে যে কেউ আর পারে নি পারবে না।
আমার বুকের রক্তরেখা—যক্ষ্মা যে আর সারবে না।
কাব্য কাসি কাস্‌ছি এত হাঁপাই সারা সকালটি,
তেঁতুল-তলায় হাত ছানিতে টকের নেশা ছাড়বে না!

১৫

পাঁচির ভয়ে তুমিই না হয় সন্ধ্যেবেলায় দোর দিও,
আমায় কিন্তু রাখছি বলে'—তেঁতুল তলায় গোর দিও।
কান্না যদি পায়ও গেয়ো দু'চার খানা আমার গান,
তাতে ও যদি ঝরে কিছুই, বল্‌বে লোকে সর্দি ও!

শনিবারের চিঠি, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩১

চৌঠা আষাঢ়

(চিত্তরঞ্জন-শোকগীতি)

মরণ! তোমায় আজ্‌কে মোরা বুকের ভিতর বরণ করি,
এবার তোমার নিত্য-সেবা,—আর তোমারে বৃথাই ডরি!
হাসছি মোরা সব-খোয়ানো সব-হারানোর অট্টহাসি—
যা ছিল শেষ, দিলাম সঁপে'—সকল আশাই ভস্মরাশি!

আর কিছু নেই, নেই গো কিছুই!—মরণকে আর শঙ্কা কি?
ন্যাংটা মোরা—বাটপাড়ে তাই দেখাই নবডঙ্কাটি!
সর্বনাশের খোলা-হাওয়া লাগাও বুকে—খুব লাগা'!
এবার থেকে সমান রে, ভাই, রাত-জাগা আর দিন জাগা!

একে একে সব দিয়েছি জীবন-মরণ-যজ্ঞ পণে!—
অশন, বসন, ভূষণ গেছে—শেষ-কড়াটি স্বস্ত্যয়নে!
বুকের রক্ত, বাহুর পেশী—দিয়েছিলাম মাথার মগজ,
মহামারীর মৌসুমে দিই শীর্ণ হাড়ের রক্ষা-কবচ!

এত দিয়েও হইনি মোরা নিঃস্ব তবু নিঃশেষে—
ছিল তবু একটি রতন—তুলনাহীন বিশ্বে সে!
পিঁজে গেছে পাঁজর তবু তলায় তারি পূরন্ত
উঠ্‌ত ঠেলে প্রকাণ্ড হৃদ্‌পিণ্ড সে কি দুরন্ত!

অদৃষ্টেরি সঙ্গে যে তাই লড়েছিনু শেষ লড়াই—
মস্ত সে বুক এগিয়ে দিয়ে করেছিলাম ঢের বড়াই!
লুটিয়ে দিয়ে, উড়িয়ে দিয়ে আমার জাতের শেষ পুঁজি,
চলেছিলাম আঁধার-রাতে প্রাণের শিখায় পথ খুঁজি!

ভেবেছিলাম, দেবতা বুঝি এবার বা দেয় পথ ছেড়ে,
শেষ-দানেতে জিত্‌ব বাজি,—নেবে কি আর সব কেড়ে!
গোত্র-জীবন-যজ্ঞে এবার হব্য যে ভাই প্রাণ-হবিঃ!
হৃদয়টাকে উপ্‌ড়ে দিলে বর দেবে না ভৈরবী?

কাজ কি ভাই, আর সে সব কথায়?—এখন তবে বাজ্‌না বাজা!
বেড়া-আগুন দিয়ে এবার দেশটা ঘিরেই চিতা সাজা!
রইল যা তা বাসি মড়া, জ্যান্ত যা তা আজ সরেছে ;
মরছিল দেশ পলে পলে!—শেষ-মরা সে আজ মরেছে!

মানুষ তোদের মুখ দ্যাখে না, দেব্‌তা ছিল সদয় তবু—
দলে দলে মরতে এল, এমন ভাগ্য হয় না কভু!
ফিরে গেল সবাই কেঁদে—পার্‌লে না ত কেউ তরা'তে!
এমন মরা মানুষ-পশু আছে কোথাও এই ধরাতে!

যত কিছু মন্ত্র ছিল জীবন্মৃত-সঞ্জীবন—
আত্মাহুতির আগুন জ্বেলে করলে সবাই উচ্চারণ,
কেউ তা শুনে উঠ্‌ল না রে—দেব্‌তা গেল হার মেনে!
শেষ ডাক তার ডেকে গেল, আজ থেকে তাই রাখ্‌ জেনে।

বাংলাদেশের বুকের থেকে খসে' গেল শেষ-মণি,
খসে' গেল হাড় থেকে তার রক্ষা-রাখীর বেষ্টনী!
পিতৃ-পিতামহের পুণ্যে আজ্‌কে হল অঙ্ক শেষ!
যুগান্তরের অন্ধকারে সত্যি এবার ডুবল দেশ!

চলে' গেলে!—বাংলা-মায়ের সবার-সেরা বুকের ধন।
প্রাণ-বাঙালী! মন-বাঙালী!—স্বপ্ন চিরযুগসাধন!
দুটো দিনও রইতে আরও পার্‌লে না এই প্রেত-পুরে?
ছুটে গেল প্রাণের নেশা! দেখ্‌লে ছায়া কার দূরে?

দেখ্‌লে কি এই শ্মশান জুড়ে' পিশাচ শুধুই দিচ্ছে হানা!
শবেরা সব শিব হতে চায়, আসল শিবের নেই আস্তানা!
কোনো আশাই নেই ক' যাদের , জাগিয়ে তবু তাদের আশা,
এমন করে' ফেললে চলে'!—আফ্‌সোসের যে পাইনে ভাষা!

জান্‌তে যদিই, মায়ের এবার বাঁচার মোটেই নেই ক' আশ,
কেমন করে' পালিয়ে গেলে, না পড়্‌তে তাঁর শেষ-নিশাস!—
তোমার পরে নেই যে কেউ আর—চোখের দু'কোণ মুছিয়ে নিতে,
ভাগীরথীর বক্ষে চিতা ভস্মটুকু ভাসিয়ে দিতে!

তাই ত তোমার শ্মশান-পথে দাঁড়িয়েছে আজ সকল দেশ,
চেয়েছে আজ লক্ষ চোখে—অশ্রুধারা নির্নিমেষ!
কণ্ঠে কারো নেই ক' বাণী, স্তব্ধ যেন বুকের দোলা!
চরম দুখে বুক যে পাথর! মনের সকল গ্রন্থি খোলা!

এসেছে সব দেখতে যেন শেষ পূজারী-বিসর্জন!
ডুবল যা আজ কালের জলে, হবে না আর তার বোধন!
নেই রে আশা, নেই নিরাশা!—মিথ্যে সকল জল্পনা!
মিথ্যে রে ভাই ঠোঁটের হাসি, মিথ্যে চোখের জল-কণা!

মরণকে আর ভয় করিনে, এবার মোরা মরণ-জয়ী!
অসাড় যখন সকল দেহ, অগ্নিদাহে আর কি দহি?
ভয়ের ভরা ভর্‌লে রে আজ!—মরার বাড়া আর কি হবে?
আজ্‌কে তবে উড়াও নিশান, চিরমরণ-মহোৎসবে!

আষাঢ়, ১৩৩২

বাণী-বৈজয়ন্তী

(সুইনবার্ণের অনুসরণে)

বিদেশের নদীকূলে বসিয়া সকলে মোরা স্মরিণু তোমায়
তিতি অশ্রুনীরে—
বন্দী ছিনু পরবাসে—যুগান্ত-যাতনা সহি তুমি অসহায়
চাহ নাই ফিরে!
বিদেশের নদীকূলে দাঁড়ায়ে উঠিনু মোরা, গাহিলাম গান
নূতন রাগিণী
গাহিলাম' ওই শোন—জননীর মুক্তিভেরী! হ'ল অবসান
যন্ত্রণা-যামিনী!'
বজ্রসম তূর্যনাদে, জাগরণী গানে-গানে জাগায়ে মেদিনী
উদিল আলোক!
নিশারে দিবস-যথা—তোমারে তুলিল ঠেলি' শক্তি আহ্লাদিনী
ভুলাইল শোক!
ঘুরেছিনু তব লাগি' কত দূর দূরান্তরে, বিজন শ্মশানে
রুদ্র পিপাসায়—
চিত্তে জ্বালি চিতানল ফিরেছিনু দিশে দিশে জলের সন্ধানে ,
বুক ফেটে যায়!
শুনেছিনু রূঢ়বাণী—"জানি বটে হৃৎপিণ্ড কঠিন তুহার,
তবু হবি নত!
তোরা দাস দাসীপুত্র!— তুহাদের মেরুদণ্ড উঞ্ছ কর্মভার
প্রভুসেবা ব্রত।
তপ্ত লৌহ শূলমুখে শরীর বিঁধিয়া তা'রা পশুপালসম
বাঁধিল সবলে,—
গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা আসে, বর্ষ পরে বর্ষ যায়, তবু সে নির্মম
ভাগ্য নাহি টলে !
তব তটিনীর তটে নগর-নগরী যত নাগরীর বেশে
মগ্ন নিরন্তর
দিবাস্বপ্ন-নৃত্যগীতে, যতদিন না উদিল দীর্ঘ নিশাশেষে
সৌভাগ্য ভাস্কর।
ফুল হিন্দোলায় শুয়ে সুখতন্দ্রারত সবে চন্দ্রাতপতলে,
—ওষ্ঠে মৃদু জ্বালা!
ললাটে কলঙ্ক, তবু কুঞ্চিত কুন্তলদাম—পরিয়াছে গলে
মল্লিকার মালা!

তা'রা কভু হেরে নাই তব গিরিনদীতীর,—পিতৃপিতামহ
পরিচয়হারা!
ভুলেছিল শক্তিমন্ত্র, ইষ্ট দেবাদেবীগণে ছিল অহরহ
মধু-মাতুয়ারা।
তব নদনদীপথে শুষ্ক খাতে যবে পুনঃ আইল জুয়ার
তীব্র তৃষাহরা—
মিথ্যার মুকুট খুলি' ফেলিল ধূলায় টানি' সন্তান তুহার,
কলঙ্ক পসরা!
যারা ছিল মুখে চেয়ে, নিতান্ত ব্যথার সাথী, দূর পরবাসে
মৃতকল্প তা'রা
মহাহর্ষে নেহারিল অরুণ আলোকে তব ললাট-সকাশে
শুভ্র শুকতারা!
চিরসাথী ছিনু মোরা তোমার দুখের দিনে—তব অনুরাগ—
বিরাগে অটল,
মশানের শূলাসনে দাঁড়ায়েছি তব পাশে, লাঞ্ছনার ভাগ
লয়েছি সকল।
বধ্যভূমি সিক্ত করি' বাহিয়াছে রক্তস্রোত,—দুই নেত্র ছাপি'
শোণিতাশ্রুধারা!'
হেরিয়াছি অরুন্তুদ যাতনা সে জননীর—যুগযুগব্যাপী
আদিঅন্তহারা!
দক্ষিণে দেখেছি শুধু, ধূ-ধূ-ধূ-ধূ চারিদিক, নাহি ফুলফল—
দগ্ধ দীর্ণ তরু!
উত্তরে পিশাচপুরী—লোহিত বরণ ধূমে অন্ধ নভোতল,
জলহীন মরু!

* * *

দূর বন্দিশালা হতে তোমার সমাধিপাশে ফিরে এনু যবে,
করিতে রোদন—
চমকি হেরিনু এ কি! উঠিয়া গিয়াছ তুমি! প্রহরীরা সবে
ঘুমে অচেতন!
মুক্ত সে গহ্বরদ্বার— কবাট-পাথর পরে দেবতা-সমান .
হেরিনু মূরতি—
সহসা সে দিব্যকণ্ঠে উচ্চারিল ঐশ তেজে শ্লোক সুমহান-
উদাত্ত ভারতী!

"হের হের জননীর দেহ হতে ঘুচিয়াছে প্রেতের বসন
শ্মশান আগারে,
পিশাচ-প্রহরী যত মন্ত্রৌষধিবশে যেন ভূমে অচেতন
স্বপন বিকারে!
হের হেথা শূন্য শয্যা! স্বর্ণজ্যোতিকিরীটিনী অনিন্দ্যসুন্দরী
নাহি যে শয়ান!
মাতা আর মৃতা নয়!—ভুবনললাম সে যে রাজরাজেশ্বরী!
মুছ দু নয়ান!
সেই মাতা কহিছেন মোর কণ্ঠে তোমা সবে, কর্ণে, মর্ম্মমূলে
আজি এ বারতা—
কোরো না বিশ্বাস কেহ অভিজাত-জনে কভু, কিম্বা রাজকূলে
রাজাদের কথা।
নিজকর্ম-ফলভুক্‌ পুরুষ নিজেই পাতে নিজ সিংহাসন
ধরণীর পর,
বিশ্বতরে আত্মপ্রাণ যেবা করে পরিহার—জেনো সেই জন
মরিয়া অমর!
মিটায়ে দিয়েছে সে যে মৃত্যুর সকল দাবী', আছে তার কিবা
শমন-শাসনে?
দু'দিনের বিনিময়ে বরিয়া লয়েছে বীর অন্তহীন দিবা
অমর্ত্য আসনে!
প্রহরের অদর্শন!—পাবে না তাহারে শুধু দণ্ডদুই তরে
—মুহূর্ত সংশয়!
তার পরে ঊর্ধ্বে চাও!—হেরিবে অম্লান মুখ, মাথার উপরে
মুকুট অক্ষয়!
স্মৃতির হিমাদ্রি-শিরে জীবযাত্রা-উৎসমূলে, মানব-মানসে—
সে কীর্তিকিরণ
যে ঠাঁই যেখানে পড়ে, মৃত-সঞ্জীবন সেই প্রাণের পরশে
মরিবে মরণ!
যে দীপ নির্বাণ আজি—বিফল হয়েছে যেই পুণ্য অবদান
কালকুক্ষিগত,
সেই ব্যথা, ব্যথিতের চন্দ্রানন হারাবে না—রবে জোতিষ্মান্‌
সুন্দর শাশ্বত!"
সেই বাণী প্রচারিল দেশজাতিত্রাতা সেই দেবতার মুখে।
আজও সেই গান
শোনা যায়!—বাঁচিয়া উঠেছি তাই মৃতপ্রায় জননীর বুকে
স্তন্য করি পান।

মায়ের মন্দিরে আর হইবে না পশুযাগ—বেদীর পাষাণ
রবে শুভ্র-শিলা!
বিদেশ নদীর কূলে কাঁদিব না!—দেশে হেথা আলোর নিশান,
—দেবতার লীলা?

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩২

তীর্থ পথিক

(মার্কিন কবি George Sylvester Viereak -এর অনুসরণে)

নিশি নিশি গণিকাভবনে
দুয়ার ঠেলিত এক পুরুষ প্রবর
দৃষ্টি তার পিপাসা-প্রখর
অধর পাণ্ডুর তবু বিরস চুম্বনে!

তরুণী সে তন্বী রমণীর
গ্রীবায় বাহুতে বক্ষে, নীল ধমনীর
অতিসূক্ষ্ম বক্র রেখা পরে,
কম্পিত অঙ্গুলি তার অনুক্ষণ কেমনে বিচরে!

বুকের যে মোমে-গড়া শুভ্র ছাঁচ দুটি
কি যেন পরখছলে দেখিত সে খুঁটি—
যেন সে খুঁজিছে কিবা আতিপাতি
রূপের সে রুদ্ধ কারাঘরে।

তারপর পরিশ্রান্ত বিফল সাধনে
টানিয়া লইত তারে সুকঠিন বাহুর বাঁধনে,
নেহারিত, নিজে নির্বিকার—
স্বৈরিণীর সারাদেহে মদনের মূর্ত অধিকার।
—নির্দয় পীড়নে তার তনুতন্ত্রী শিহরে কেমন,
কণ্ঠে কিবা জাগে কুহরণ
দুই গণ্ডে ফুটে ওঠে আবীর কুঙ্কুম
অলস নয়নতারা যেন ঘুম-ঘুম!—

নারী যত ভুঞ্জে রতি, তত সে পুরুষ
কত না ভ্রূকুটী করে, ভঙ্গী তার ততই পরুষ ;
উঠে যায় সম্ভোগের শেষে
রক্তহীন পাণ্ডুমুখে বুকে তবু জেগে রয় ক্ষুধা সর্বনেশে
তবু একদিন
ফিরিয়া চলিতে পথে একটু সে আশা যেন ক্ষীণ
চমকিল চিত্ত প্রান্তে, ফিরিল পথিক
পুনঃ সেই দিক,
আবার হানিল কর নারীর দুয়ারে!
কানে কানে কহিল তাহারে—
সে কথা পুরুষমুখে নারী কভু করে নি শ্রবণ।
শুনি সে প্রার্থনা
শয্যা ত্যজি দাঁড়াইল ঘৃণ্য বারাঙ্গনা,
সহসা মুখের পরে নিক্ষেপিল দ্রুত নিষ্ঠীবন!

অমনি সে অতিথির নয়নে অধরে
আনন্দের সুধাস্নিগ্ধ হাসি নাহি ধরে!
এতদিনে সাঙ্গ বুঝি সুদীর্ঘ ভ্রমণ,
মিলিয়াছে দেবদরশন!
নীরব ভাষায় শুধু তুলি দুই হাত
নিবেদিল স্বস্তিবাণী উর্ধ্বলোকে করি আঁখিপাত,
বেড়িয়া সে ললাট সহসা
প্রকাশি জ্যোতিশ্ছটা বিদ্যুৎপরশা!
চাহিল না রমণী সে-মুখে
তখনো সে উন্মাদিনী গালি দেয় নিদারুণ অবমানদুখে।
কহিল গর্জিয়া
সত্য বটে, দয়াধর্ম লজ্জা বিসর্জিয়া
এ দেহ করেছি পণ্য, তবু আমি নারী!
নহি তবু তোর মত পশু আমি, এত কদাচারী!—
পুরুষ কহিল ধীরে স্নিগ্ধস্বরে,—
আমি চিরসত্যের ভুখারী।

উত্তরা, বৈশাখ ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ গমন উপলক্ষে বৃহত্তম ভারত পরিষদের পক্ষে রচিত।

বাণী যাঁর অতিক্রমি' সুন্দরের সহস্র তোরণ
শান্ত-শিব-রূপোত্তমে ধ্রুবলোকে করিল আরতি,
মন্ত্রে যাঁর উদীরিত মধুচ্ছন্দা বিশ্বের ভারতী
ভারত-ভারতী-মুখে, তাঁরে আজ করি গো বরণ—
অতীত-কীর্তির কূলে ভারতের বাণী-আহরণ,
তারি যোগ্য পুরোধার পদে মোরা ক্ষুদ্র স্বল্পমতি,
উৎসাহ-অধীর, সত্য-সুন্দরের হে যজ্ঞ-সারথি
হোমভস্ম-পূত হস্ত রাখ শিরে শঙ্কা-নিবারণ।

হেরিয়াছ তুমি, কবি, হেথা মহামানব-সাগরে
বিরাট মিলন মেলা!—ভারতের সে তীর্থ-প্রমাণ
দেখি মোরা দেশে দেশে লেখা আছে অক্ষয় অক্ষরে !
সসাগরা ধরিত্রীর নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণ সমান
একদা হেরিল যারা, তাহাদেরি শ্রেষ্ঠ বংশধরে
পূজে আজ এই 'মহা-ভারতে'র নব প্রতিষ্ঠান।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪

সরস-সতী

হাঁসের উপরে না তুলি' পা'খানি, হাঁস-পা তালে
কি ওটা বাজাও, নাচিয়া নাচিয়া শ্যাওড়া-ডালে?
শ্বেতভুজে তব ধবলের শোভা—মরি গো মরি!
বাক্‌রোধ তবু হ'ল না আমার, বাগীশ্বরী!

বক্ষ তোমার হাঁস-ফাঁস করে কি সুধা পিয়ে—
কিসের ক্ষুধায় উধাও হইলে 'রাশ্যা' গিয়ে?
অভ্র-আবীরে রুচি নাহি আর, রক্তমাখা
মাছের আঁশের রাশিতে ঢেকেছ হাঁসের পাখা!

বিড়ি-সিগারেট-ধোঁয়া-ভুরভুর ধুপের বাস,
রাঙ্গা চন্দন ছিটায় তোমারে যক্ষ্মাকাশ,
'খোসা-ওঠা' মুখে 'মৌটুস্কি'রা গামছা পরি',
'ঘামে-ভেজা তনু হাত' দিয়ে লয় বরণ করি'!

'ঠাঠা-পড়া' রোদে জ্বলে' পুড়ে গেছে সেকেলে ঠাট-
ন্যাকা বঙ্কিম মধু ও রবির মন্ত্র পাঠ।
গোর্কি ঘোরায় ভাবের চর্‌কি —দেখিয়া তায়
ঠোঁট চেপে ঠুঁটো 'ঠোটেকলা' হয়ে রবে কি হায়?

পেঁয়াজে রসুনে রসুই করেছে তোমার খানা—
কত সে হাটের পচা বুক্‌নির ঘুগ্‌নিদানা!
'কুটে কালো ঝড়ে' মড় মড় করে তোমার খুঁটি—
রাজ্যের যত সাধু-সজ্জন পলায় ছুটি'।

ক্নুট হামসুন, চেহভ, মোপাসাঁ, টলষ্টয়—
হুইট্‌ম্যানেরও জাত মেরে দিয়ে তোমার জয়!
'বিবাহের চেয়ে বড়' যেই বিধি তাহারি বলে,
নূতন জাতির জন্মের লাগি' চেষ্টা চলে!

নামহীন কাম-শিশুরাই এবে কুলীন সেরা—
'ঠাঠারি বাজার' হ'ল সতীদের সাধন-ডেরা!
ঝুঁটি-বাঁধা চুল, গোলাপী সেমিজ, চুরুট মুখে—
'ইভে'র দুহিতা—নহে বিবাহিতা—রাখিবে সুখে।

বৌ নয় তারা, মা'ও নয়, নয় বোন কি মেয়ে—
তারা শুধু নারী, যৌবন-তরী যাইবে বেয়ে!
হোক্ সে যেমনই বয়স, অথবা যেমনি ছিরি,
তবু মনে হয়, যেন পটখানি 'দা ভিঞ্চি'র-ই?

সধবা বিধবা কুমারী হ'ল যে পাগল পারা—
সকলেরই 'টান' বাহিরের পানে, গৃহ যে কারা!
বস্তিবাসিনী প্রেম-প্রসারিণী—ঘরণী সেও!
ঘরে এনে তারে ষ্টোভ্ কিনে দিয়ে—নিম্‌কি খেয়ো।

ভিক্ষা মাগিয়া পথে পথে ফেরে বিদ্যাবতী—
'পদ্মার ঢেউ' কাব্যকলায় পোক্ত অতি!
বারোয়ারী প্রিয়া হবে সেই,—তার জন্মদিনে
উপহার দিবে শেলী, ব্রাউনিং, পতিরা কিনে!

বেশ, বাহা, বেশ! ওগো নব দেবী-সরস্বতী!
আমরা তোমারে কি বলে' ডাকিব—মন্দমতি?
পূজা উপচার নাহি যে কিছুই—করেছি বিয়া,
'বৌ-বৌ'-খেলা কেমনে খেলিব, কাহারে নিয়া?

নামহীন মোরা নহি যে গো হায়, বাপ-মা আছে—
কোন্ মুখে মোরা দাঁড়াব বল না তোমার কাছে?
যক্ষ্মাকাশেরে বড় যে ডরাই, বাঁচিতে চাই—
মদ খেয়ে খেয়ে কেনই খামকা অক্কা পাই?

ঘরকে বাহির যদি নাই করি, বাহিরে ঘর,
তবে কি তোমার পাব না প্রসাদ অতঃপর?
কাব্যি ও প্রেম হবে কি ছাড়িতে একেবারে—
মা, বোন, মাসীরে রেখে দিই যদি আরেক ধারে?

রুগ্ন শিশুরে বক্ষে দলিয়া উপোসী নারী
ক্ষুধায় আকুল, জানায় ব্যর্থ বাসনা তারি!—
এই কি বীণার শেষ সুর তব, হে বীণাপাণি?—
আহা আহা মরি!—কি নাম নিয়েছ?—বঙ্গবাণী?

তবু পুরোহিত শরৎ নরেশ রাগিয়া খুন—
এমন লেখারো নষ্টেরা সব গাহে না গুণ!
রাধা-মাহেন্দ্রী ভাষ্যে তাহার ভাসিল কাশী,
সেই তালে আজও কত জটীরাম বাজায় কাঁসি!

ছেলেদের সাথে বুড়ারাও দেখি ধরেছে পোঁ,
রাষ্ট্রনীতির চিলেরাও তায় মারিছে ছোঁ!—
তরুণেরে তুড়ি না দিলে যদি বা ফাঁসায় ভুঁড়ি,
তাই দিকে দিকে মাতালের সাথে মিলিছে শুঁড়ি!

সারাটা জাতের শির-দাঁড়াটায় ধরেছে ঘুণ—
মা'র জঠরেও কাম-যাতনায় জ্বলিছে ভ্রূণ!
শুকদেব যথা করেছিল বেদ-অধ্যয়ন—
গর্ভে বসেই শেষ করে তারা বাৎস্যায়ন!

বুলি না ফুটিতে চুরী করে' চায়—মোহন ঠাম!
ভাষা না শিখিতে লেখে কামায়ণ—কামের সাম!
জ্ঞান হ'লে পর মায়েরে দেখে যে বারাঙ্গনা!—
তার পরে চায় সারা দেশময় অসতী-পনা!

সমাজের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, শেষে
বীরের মতন প্রাণ দিবে তারা মধুর হেসে।
বুকের ব্যথায় টানে সিগারেট ঘড়িক্ ঘড়ি,—
যক্ষ্মায় যদি না মরে, আছে ত গলায় দড়ি!

এদেরি পূজায় ধরা দিয়েছ যে-সরস্বতী,
চিনি নে তোমায়, কোন্ বনে তুমি আছিলে, সতী?
দেখি, তুমি শুধু নাচিয়া বেড়াও হাঁস-পা-তালে,—
অঙ্গে ধবল, কুষ্ঠও বুঝি ওষ্ঠে গালে!

জানি, পূজা হয় লক্ষ্মীর সাথে আ-লক্ষ্মীর—
সে পূজায় কেহ দেয় না অর্ঘ্য, দধি ও ক্ষীর।
কড়ি ও গোবরে গড়িয়া শুধুই মূর্তি তার,
কুলার বাদ্য বাজায়ে করে যে বহিষ্কার!

বাণীর পিছনে তেমনি তুমিও প্রেতিনী-বাণী—
তেমনি গব্যে গড়িব তোমার প্রতিমাখানি ;
ভাঙ্গা কলসীর কানা দিয়ে গলে, বরণ করি
এস গো তোমায়, নব-নবীনের বাগীশ্বরী!

শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা

শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৩৪

রমনার তাজ

সুপ্রশস্ত রাজপথ, প্রায় পান্থহীন ;
নাহি উচ্চ সৌধরাজি—শুধু দুই পাশে
ঘন কুঞ্জবীথিকার আড়ালে বিলীন
দুই-চারি রম্য হর্ম্য সহসা প্রকাশে।
এই পথে মাঝে মাঝে করি যাওয়া আসা,-
অপরিচয়ের যেই মুগ্ধ ভালাবাসা
আজও তা' অটুট আছে সদ্য-পরবাসে।

এ নহে গ্রামের শোভা, নগরেরও নহে ;
প্রকৃতির রূপখানি মনোমত করি'
সাজাইলে হয় যাহা—শিল্প যারে কহে—
সেই শোভা ধরিয়াছে এ পল্লী-নগরী।
সমুখে উদার মাঠ, উপরে আকাশ,
সেথা হোথা সুমসৃণ ঘাসের ফরাস,
ফুলের আঙিনাগুলি রঙে গেছে ভরি'।

এই পথে একদিন, নূতন পথিক—
ফিরিতেছিলাম যবে সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
রেশমের মত যেন করে ঝিকমিক
গোধূলির নীলাকাশ পাণ্ডুর আভাসে।
কালো হ'য়ে উঠে তবু দেবদারু-শির,
একটি তারার আঁখি চেয়ে আছে থির,
সমীরণে মাঝে মাঝে মৃদু গন্ধ ভাসে।

ঘুরিতে পথের বাঁক সহসা থমকি'
হেরিনু বনেল কোণে ম্লান চন্দ্রালোকে
একখানি গৃহ, তারে গৃহ বলিব কি?—
মৃতের সমাধি সে যে, বুঝিনু পলকে।
কিছু সে চাঁদের আলো, কিছু অন্ধকার,
তারি তলে ছায়াঙ্কিত দেহলি তাহার—
সুন্দর সুঠাম থাম আগে পড়ে চোখে।

বেড়া-ঘেরা একটু সে ভূমিখণ্ড 'পরে
লতাকুঞ্জ, ফুলবীথি, তৃণ-আস্তরণ

রচিয়া দিয়াছে কেবা—পাখীদের তরে
দুই-চারি ছায়া-তরু করেছে রোপণ?
    মনে হ'ল, কোন ভক্ত হৃদয়-আকুল
    একান্তে পূজার লাগি' এ ক্ষুদ্র দেউল
নিরমিল বুঝি এই নির্জন প্রান্তরে!

পূজার দেউল বটে! সরল রেখায়
গাঁথা তার যত-কিছু বাস্তু-আভরণ ;
তাহারি সুষমা হেরি' নয়ন জুড়ায়,
ক্ষুদ্র, তবু সর্ব-অঙ্গ সুচারু-শোভন।
    একখানি শিলাপট্ট—সে যেন ললাট,
    আছে তায় লেখা লিপি, নাহি জানি পাঠ—
যেন কোন পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন।

এ যেন একাকী হেথা সর্ব-অগোচরে—
ঘাসের জাজিমে পাতি' চাঁদিনী-চাদর,
রচি' শয্যা—দয়িতার মরণ-শিয়রে
বসিয়া হেরিছে মুখ বিরহী কাতর!
    সে মুখের সেই রূপ কারো নহে চেনা,
    সে বুকের দুঃখ-সুখ কেহ বুঝিবে না,
আর কেবা সে-স্মৃতির করিবে আদর?

সে দিনের সেই চির-বিদায়-আরতি
আজিও হয় নি সারা, ওই ভূমিতলে
এখনো রয়েছে কার প্রাণের প্রণতি—
এখনো সে তনু-তটে সে রূপ উথলে!
    শ্যাম শষ্প-পীঠিকায় পুষ্প-আলিপনা,
    পাখীদের গানে হয় প্রভাতী বন্দনা,
মধ্যাহ্নে বুলায় ছায়া ছায়াতরুদলে।

তবু এই দিবা শেষ ম্লান জ্যোৎস্নালোকে
সহসা পথের পাশে কি হেরিনু আজ!—
সম্রাট মহিষী নয়—প্রেয়সীর শোকে
প্রিস তার রচিয়াছে অভিনব 'তাজ'।
    বিরাট প্রাসাদ নয়, অতি ক্ষুদ্র গেহ,
    কে আছে ঘুমায়ে হোথা জানিবে না কেহ,-
সে কাহিনী, হে পথিক, শুনিয়া কি কাজ?

শুনিতে চাহিনা কিছু—হেরিতেছি সব ;—
আজ রাতে তার যে গো জ্যোৎস্না-জাগরণ।
আকাশে আসিবে ভাসি' দূর বাঁশি-রব,
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিবে যে মৃদু কুহরণ!
আজি সে ওড়না খুলি' বসিবে অঙ্গনে,
রূপার সেতারে আর সোনার কঙ্কণে
গুমরিবে একটি সে সুরের ক্রন্দন!

রমনা, ১৯২৮

ভারতভাষা-বাচস্পতি

(শ্রীযুক্ত স্যার জ্যরজ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের উদ্দেশে)

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সেই শ্বেতদ্বীপের উদ্দেশে
তোমার হৃদয়পদ্মখানি খুঁজে নিলে ভারত সরস্বতী!—
হিমসায়রের মরাল-গলে পরিয়ে মাগে মালায় গাঁথা মোতি,
ধব্‌ধবে তার পালক দিয়ে মরণবীণায় মুছিয়ে নিলে হেসে!
সূর্য যখন এই আকাশে অস্ত গিয়ে উঠল তোমার দেশে,
সন্ধেবেলার সাবিত্রী কি সঙ্গে ছিল? আয কুলের সতী
চিন্‌লে তোমায়।—তুমিই বুঝি আর জনমে ছিলে বাচস্পতি?
এবার এলে ভাষা-সরিৎ-শতবেণীর শঙ্খধারীর বেশে।

আমরা তোমায় স্মরণ করি, বরণ করি-প্রণাম করি মোরা
নূতন ঋষি দ্বৈপায়নে, ভাষা-মহাভারত-রচয়িতা!
সত্যবত-সুত সে তুমি, তোমার তপে বাণী শুচিস্মিতা
অষ্টাদশ পর্বে ঘিরে পরিয়ে দিলে একই পুঁথির ডোরা!
এম্‌নি প্রেমেই ধন্য হবে তোমার জাতির শাসন ভারতজোড়া
তোমার আসন বুকের মাঝে—তুমি মোদের চিরদিনের মিতা।

প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৮

মহাপ্রয়াণ

শেষ হল কার?
তোমার, না আমাদের?
তাই ভেবে আজ মোরা হেরি অন্ধকার!

তোমার তো শেষ নাই! বাণী তব সুর তব
সঞ্চারিবে শতযুগ জগৎ ভরিয়া,
মহান্ আত্মার সেই সরস-শীতল ছায়া
ধরণীরে চিরস্নেহে রবে আবরিয়া।
তোমারে যেমন-দেখা দেখিয়াছে সর্ব্বজন দেশে ও বিদেশে,
এখনো তেমনি তারা নেহারিবে তব রূপ—
সত্যের জাগ্রত চোখে, সুন্দরের স্বপন-আবেশে!
তোমার সে দিব্যমূর্ত্তি—সুন্দর সুঠাম তনু,
সে নয়ন, ললাট উদার
লিখে রেখে গেছ তুমি বিশ্বের মানসপটে
যে তুলিতে, রঙ রেখা তার
লেহিয়া লইতে নারে কোন চিতানল ;
যেমন আছিলে তুমি, আজিও তেমনি রবে চির-সমুজ্জ্বল।

তোমার ত' হয় নাই শেষ,
রবিরে হারা'ল শুধু এ দিগন্ত—আঁধারিল শুধু এই দেশ।
তুমি ছিলে আমাদের গৃহ-ভানু, রজনীর রবি,—
সুদূর আকাশে নয় এ দীন কুটীরতলে ত্রিদিবের দেব-মুখচ্ছবি!
সেই মুখে বারে বারে চাহিয়াছি দারুণ দুঃস্বপ্ন হতে জাগি,
ডরি নাই মহাভয়ে, ওই নাম লয়েছিনু—বিধাতারো ক্ষমা নিত্য মাগি'
দুষ্কৃতির মহাঘোরে স্মরিয়াছি তব সুকৃতিরে,
তোমার দীর্ঘায়ুঃ ছিল শুভাশিস আমাদেরি শিরে।
সেই তোমা হারায়েছি, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি মোরা—
এতদিনে খসি' গেল মণিবন্ধ হতে সেই
চির-রক্ষা-রাখীটির ডোরা।
ভারতের—জগতের—যত পূজা এসেছিল এতদিন যেই ঠিকানায়,
সে যে ছিল আমাদেরি এই গৃহ—আজ আর তুমি সেথা নাই!

মোদের গগনে যবে হয়েছিল তোমার উদয়—
উৎসবের দিন সে যে, আনন্দের কোলাহলময়!

তার পর এল নিশা, ঝঞ্ঝাঘোর দুর্যোগ-নিশীথ,
সে তিমির-তরঙ্গিণী পার হলে একা তুমি
কণ্ঠে ধরি আলোকের গীত।
তারো পরে নিভে গেল একে একে দুই কূলে শেষ দীপাবলী,
তবু সে তমিস্রামাঝে তোমারি ও প্রাণশিখা ক্ষণে ক্ষণে উঠেছিল জ্বলি'।
আজ যবে নাই আর কোনো খানে এতটুকু আশার আলোক,
আরো মূঢ়, আরো মূক-ম্লান সবে—হতাশার অশ্রুবাষ্পলোক
ঘেরিতেছে সর্বদেশ, সেই কালে শেষ-অস্তে অস্ত গেল রবি!
বলিবার নাই কিছু, শক্তি নাই কাঁদিবারো, হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ সবি।

শুধু ভাবি, যে-জীবন জেগেছিল এই দেশে শতবর্ষ আগে,
যে মহা-যজ্ঞাগ্নি হেথা জ্বলেছিল ভারতের এই পূর্বভাগে—
এতদিনে নির্বাপিত তার সেই দীপ্ততম শিখা,
মোদের ললাট হ'তে মুছে গেল যজ্ঞ-শেষ জ্যোতির্ময় টীকা।
ভারতের ইতিহাসে বাঙালীর সেই মহাবস্তু-অবদান
শেষ হল এতদিনে, তোমা-সাথে হল তারি চির-অবসান।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

তর্পণ

১

মরিতে চাহি না আমি এই চিরসুন্দর ভুবনে—
প্রাণের কামনা সেই নিবেদিলে কবে না সে জানি!
তার পর ফুরাল না সেই গান সারাটি জীবনে,
মৃত্যুও মধুর হেসে বার বার গেল হার মানি'
সেই এক মন্ত্রে তুমি জীয়াইলে বাঙ্‌লার বাণী—
ভুবন সুন্দর, তাই সুদুর্লভ মানব-জীবন ;
আকাশে তারায়-ভরা নিশীথের নীল ফুলবন,
তারো চেয়ে ভাল লাগে পৃথিবীর পান্থশালাখানি!

২

ভুলিতে পার নি তবু, একদিন আসিবে মরণ ;
যেতে নাহি দিবে ধরা—তবু তার বাহুপাশ খুলি'
বাহিরিতে হবে দূরদীর্ঘ পথে ; কাঁপিবে চরণ,
নয়নে নামিবে ধীরে দিক্‌হারা দিনান্ত-গোধূলি।
সে দিনের কথা ভাবি' বার বার বীণা ল'য়ে তুলি'
রচিলে রাগিণী জিনি' জ্যোৎস্নালোকে পিক-কুহরণ,
বিরহেরি ব্যথা হ'তে মিলনের মধু আহরণ
করিলে যে সুরে সুরে—তৃণ হতে তারারে আকুলি'!

৩

ফাগুন করিল হাহা সেই সুরে ফুলেদের বনে,
করুণ কপোত-কণ্ঠে নিদাঘ যে গাহে মুলতান!
বহুযুগ-পার হ'তে আষাঢ় ঘনায়ে আসে মনে,
মালবিকা, রেবা-নদী—মনে পড়ে কবেকার গান!
শরতে শেফালি-মূলে সেই সুরে বিলাইয়া প্রাণ
মালা গাঁথা ভুলে গিয়ে বসে থাকে কোন্ দেয়াসিনী!
সোনার-আঁচল-খসা, তন্দ্রালসা, সন্ধ্যা মায়াবিনী
না জ্বালাতে মণি-দীপ—হেমন্তের দিবা অবসান!

৪

'মরিতে চাহি না' বলি', ভুবনের বাসর-ভবনে
মরণেরে পরাইলে জীবনের স্বয়ম্বর-মালা!
শ্রাবণের মেঘ হয়ে নামিল সে তমালের বনে,
নীলকান্ত-রূপে তার নিশীথিনী হলে যে উজালা!
উষার অঞ্জলি হতে সন্ধ্যা ভরে আবীরের থালা,
একই রঙে রাঙা হয় অস্ত আর উদয়-সরণি!
গাহিলে কি সুর তুমি মরণের পরাণ-হরণী—
ভরিল সে নিজ হাতে জীবনের রসের পেয়ালা!

৫

এত দিন পরে আজ যেতে হল তেয়াগি' তাহারে—
যার শুধু দরশনে অঙ্গে জাগে দিব্য-পরশন!
যাহার কুন্তল-গন্ধ বন্ধ করি' আঁখি অন্ধকারে
অতুল পুলকে ভরি' তুলেছিল স্বপ্ন-জাগরণ!

সারাটি জীবন ধরি' যে কাননে করি' বিচরণ
চয়ন করিলে কত নামহারা রূপের মঞ্জরী,
মাঠে বাটে আঙিনায় কুড়াইলে কত সাধ করি'
মাটির সে মিঠা-মূল—অমৃতের ক্ষুধা-নিবারণ।

৬

প্রাণের সে রাজপাটে এক-ছত্র গানের শাসন
সম্বরি' চলিলে আজ কোন্ মহানীরবতা-কূলে!
কোন্ দূর জ্যোতির্লোকে—জন্মমৃত্যু-তিমির-নাশন—
লগ্ন হবে ভৃঙ্গ সম পূর্ণস্ফুট পূর্ণিমা-মুকুলে!
মধু তার পান করি' জুড়াবে কি মরমের মূলে
সুচির গানের দাহ? সেথা কোন' ভুবন সুন্দর
জাগাবে না মৃত্যুভয়? অনিমেষ-আঁখি, অকাতর,
নেহারিবে কোন্ বিভা আলোকের যবনিকা তুলে'।

৭

তবু যে হয় নি ব্যর্থ সেই তব কামনা প্রাণের—
চেয়েছিলে তুমি, কবি, 'মানবের মাঝে বাঁচিবারে' ;
এত দিন বুঝি নাই, আজ বুঝি মর্ম সে গানের,
শত-শিখা হয়ে সেই প্রাণ জ্বলে শত দীপাধারে।
গান হয়ে গুঞ্জরিছে অশ্রু আর হাঁসির মাঝারে,
মুকুলে মুঞ্জরি' ওঠে অলক্ষিতে শতেক শাখায়,
শতেক, নয়নে সে যে স্বপনের কুহক মাখায়,
বাণী হয়ে ফিরিছে সে হৃদয়ের দুয়ারে দুয়ারে!

৮

তোমার কীর্তির চেয়ে, বলিব না, তুমি যে মহৎ—
বলিব না, সৃষ্টি হতে স্রষ্টা আছে ঊর্ধ্বে, বহু দূরে।
জানি, সে কায়ার ছায়া মিলাইয়া যাবে স্বপ্নবৎ,
অজর অমর যাহা—বেঁচে রবে এই মৃত্যুপুরে।
সেই তব মূর্তিখানি, ছায়া যার আলোক-মুকুরে
পড়িলে সরে না কভু, যত দূরে দেহ যাক সরি'—
মহান্ তাহার চেয়ে আছে কিবা? জন্ম জন্ম ধরি'
কে লভিবে হেন প্রাণ, রূপ, স্বর্গমর্ত্য ঘুরে?

৯

ফুটে আছে সেই প্রাণ—বিকশিত বিশ্ব-চেতনার
অরবিন্দ সম—তব কবিতার অকূল সায়রে!
নাহি তার নাম-ধাম, সে তো নহে কেবলি তোমার—
তোমা চেয়ে বড় যেই সেই সেথা নিয়ত বিহরে।
ছিল যাহা বিন্দু তাই রূপ নিল বাণীর সাগরে!
তোমার ও কীর্তি মাঝে তুমি শুধু হও নি অমর,
হয়ে আছ অন্তহীন রূপ আর ভাবের নির্ঝর,—
অমৃতের হাসি সে যে চিরজীবী মৃত্যুর অধরে!

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮

বসন্ত-উৎসবে 'বাসন্তিকা'

আজি বসন্ত-পূর্ণিমা-নিশি জ্যোৎস্নার সীমা নাই,
মর্ত্য-মাধুরী মিলিয়াছে মরি স্বর্গের সীমানায়!
বারোমাস ধরি' বারেবারে এই একটি লগন লাগি'
সাধিয়াছে ধরা—আগুনে- তুহিনে সলিল-শয়নে জাগি'।
একাদশ নিশি এমনি কেটেছে প্রাণের পৌর্ণমাসী
পূরে নাই তবু হাসির সোহাগে, বেহাগে বাজেনি বাঁশি।
আজ আলোকের অলকানন্দা ভরিয়াছে চরাচর,
হের তারি 'পরে ভাসে কুবলয়—কাঞ্চন-শশধর!
তারা নয় ওরা—ফেন-বুদ্বুদ অমল সুধার স্রোতে
উঠিয়াছে যেন লক্ষ যুগের স্মৃতির সমাধি হ'তে।
আকাশের নীলে পড়িয়াছে হোথা নীলমাধবের ছায়া,
শ্যামা ধরণীরে গৌরী সাজালো কাহার মোহিনী মায়া!
রূপ নয় শুধু, রূপের সায়রে পীরিতির শতদল
ফুটিয়াছে, তাই নিখিল আজিকে সৌরভ-বিহ্বল।
আজি রজনীর এই অপরূপ রূপ-রস-রসায়নে
শোধন করিয়া প্রাণের পানীয় পিয়াইব জনে জনে।
আর কিছু নাই—শুধু একটুকু চন্দ্রিকা-চন্দন,
তাহারি তিলক পুলকে পরায়ে করিব আলিঙ্গন!
গানের আবীরে রঞ্জিত করি' কাব্য-কুসুম-মালা
দুলাব কণ্ঠে—জগৎ করিব প্রাণের সুরভি ঢালা।

যেমন ছন্দে, যেমনি সে সুরে, গাহি আনন্দগান,
লাজ কিবা তায়? আজ গান নয়—তারো চেয়ে বড় প্রাণ!
সেই সে, প্রাণের মধুর পরশ দাও আর নাও সবে—
তারি লাগি আজ মিলিয়াছি মোরা মধুঋতু-উৎসবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

পাত্র ও পানীয়

আমারে করেছ পাষাণপাত্র—মসৃণ, মনোহর,
তোমার সভায় সুধাপানে তাই তার এত সমাদর!
ওষ্ঠে সবার তুলিয়া ধরি যে পরম পিপাসাবারি—
কণাটিও তার আপন অঙ্গে আমি যে শুষিতে নারি!
হায়, প্রভু হায়! একি গৌরব, একি মোর সম্মান!
পাত্র হইয়া র'ব চিরদিন—কভু না করিব পান!

জীবনজিজ্ঞাসা, ১৩৫৮

দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব

[মৃত্যুর প্রায় বত্রিশ বৎসব পূর্বে কবি কবিতাটির মাত্র কয়েকটি ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, শেষ করেন নাই। তাঁহার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স হইতে কবি কবিতালেখা একরকম ত্যাগ করিয়াছিলেন। কবি বলিতেন, "কবিতা আর আমার আসে না।" বঁড়িশায় বাস-কালে শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার নামে একজন বি এ পরীক্ষার্থী তাঁহার নিকট পড়িতে আসিতেন—সে সময় তাঁহাকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকটি পড়াইতে পড়াইতে মনে হয়, 'আলমগীর-চরিত্র' কিছুমাত্র ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে কবিতাটি হঠাৎ লিখিয়া ফেলেন।]

[স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ-সংলগ্ন শাহীবুরুজ
কাল—প্রত্যূষ
ফজরের নামাজ-শেষে অতিশয় অস্থিরভাবে নিভৃত-নির্জন কক্ষে
পদ-চারণা করিতে করিতে—]

আরংজীব

দারা-সুলেমান মোরাদ-শিপা'র! তার পর?—তার পর?
তবু ছুটি নাই, কতদিনে মোর ঘটিবে যে অবসর!

জানি, ওই হোথা চলে যে ভিখারী পথে পথে ভিখ মাগি—
ওরও আরামের আছে অবসর, রাতেও রবে না জাগি'।
সেও মরে যদি, কবরে তাহার দু'ফোঁটা আঁখির জল
হয়তো ঝরিবে, ফুরাবে না তার ঐটুকু সম্বল ;
মানুষের সাথে মানুষের রীতি পালিবে না হেন জন
কোথা দুনিয়ায়? পিশাচেরও আছে মমতার প্রয়োজন।
সেই মমতায় করিয়াছি জয়। চাহি না দুনিয়াদারি—
কাফের-মুলুকে করিবারে চাই খোদার আদেশ জারি!
স্নেহ-ভালবাসা—ফুলা-কলিজার রক্তের কারখানা
নাহি চাই প্রভু! বান্দারে কভু করিও না মাস্তানা
তোমার নিমক-হারামী শরাবে ; মাটির পেয়ালাখান
খোশবু'তে ভরি' শয়তান যেন করে নাকো বেইমান।
ভুলিয়াছি ভয়, স্নেহ ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি রাজনীতি ;
রমণীর রূপ হারাম করেছি,—ফকিরের যেই রীতি
ধরিয়াছি তাই ; জগৎ জানিবে, বাদশা আলমগীর
দুনিয়াদারির খাতির করেনি,—খোদার দুয়ারে শির
বাঁধা রেখেছিল ; চেয়েছিল সে যে আল্লারই নিজ হাতে
তুলে দিতে এই রাজ্যের ভার—আপনারে সেই সাথে!
দাও বল দাও! যে-বলে একদা ইব্রাহিমের বুক
নিজ সন্তানে জবে' করিবারে কাঁপে নাই এতটুক!
আমি কেহ নই—বান্দা তোমারি, ওগো মহা-মহীয়ান্!
সত্যের তরে বাঁধিয়াছি বুক, তব বলে বলীয়ান্।

(হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করিয়া)

সেদিন শহরে রাজপথে সেই দেখিয়া দারার হাল
কেঁদেছিল যারা—জানোয়ার যত, কুত্তা-ভেড়ীর পাল!—
জানে কি তাহারা, কে তারে মারিল পতেবাদ-সামুগড়ে—
নিমেষে মিলালো কাফেরের সেনা কার কটাক্ষ-ঝড়ে!
তখন ভাগিছে মহাভয়ে মোর শিপাহী গোলন্দাজ,
শয়তান ছুটে আসিতেছে রুখে—উদ্যত যেন বাজ!
পাহাড়ের মত উঁচু হাওদায় বসেছে দম্ভভরে
শাদা মেঘ যেন—সিংহলী হাতী ঘন হুঙ্কার করে।
দাঁড়াইনু একা ; মোর হাতী পাছে ভয় পেয়ে হটে' যায়,
হুকুম করিনু জিঞ্জির বেঁধে দিতে তার চারি পা'য়।
নমাজের বেলা হয়েছে তখন, ত্বরিতে নামিনু ভূঁয়ে—
আল্লার নামে শেজ্‌দা করিনু বারবার মাথা নুয়ে।

উঠিনু যখন, স্বপ্নের মত ময়দান দেখি সাফ্,
শুধু মাথার উপরে জ্বলিছে কার আঁখি আফ্‌তাব!
খোদার হুকুম পাইনু সেদিন, বুঝিনু এ কার কাজ,
কেন, কেবা দিল—নিজ হাতে তুলি' আমার মাথায় তাজ।
দারা-দুষ্‌মন আল্লার সে যে হিন্দু-কেরেস্তান!
কাফেরের রাজা! তবু নাম তার এখনো মুসলমান।
জোহর-নমাজ শেষ ক'রে আজ শোকর করিব তাঁয়—
রুটি-জল তার বন্ধ করেছি তাঁহারি এ দুনিয়ায়।

(আবার পায়চারি সুরু করিয়া)

এখনো এলো না! এত দেরী কেন? ঘটে নি তো কিছু পথে?
কে তারে বাঁচাবে?—বিচার হয়েছে খাঁটি শরীয়ত্-মতে।
সবচেয়ে পাকা জল্লাদ যেই, তারে পাঠায়েছি আমি—

(পদশব্দ শুনিয়া)

ওই আসিতেছে! —হঠাৎ কি হল? কপাল ওঠে যে ঘামি!
নাজের! নাজের!

(খাঞ্জায় ঢাকা ছিন্ন মুণ্ড লইয়া নাজির খাঁর প্রবেশ)

নাজির খাঁ

গোলাম হাজির, আনিয়াছি, দেখে লও ;
দেখ এই কিনা, বান্দার 'পরে এইবার খুশী হও!

(আবরণ উন্মোচন করিল)

আরংজীব

এ কার মুণ্ড!—আরে বেতমিজ! বে-অকুফ! বেইমান!
এ কি করেছিস! হুঁশ নেই তোর—নিয়েছিস্ কার জান্!
দারার মুণ্ড!—ধূলায় রক্তে কে মাখালো এই কাদা?
ভেঙে গেছে নাক, ছেঁড়া দাড়ি চুল, চোখ দুটা শুধু শাদা।
দাঁতে আর ঠোঁটে একি কাটাকাটি!—ঘসেছিলি বুঝি ভূঁয়ে?
রক্তের ফেনা দুই গাল বেয়ে পড়িয়াছে চুঁয়ে চুঁয়ে!
একবারও তোর হল নাকি মনে মুণ্ড কাটিলি যবে,
সে-যে দিল্লীর বাদশার ছেলে! আমারেও তুই তবে

তাহার হুকুমে করিতিস বুঝি এমনই বে-ইজ্জৎ?
তোর কাছে তবে রাজমুণ্ডের কিছু নাই কিস্‌মৎ?
শাহ্‌জাদা দারা—হায়, হায়, তুই এত বড় জল্লাদ!—
কুত্তার মত মারিলি তাহারে?—ওরে ও হারামজাদ!

নাজির খাঁ

সারা দুনিয়ার মালিক, আর সে দীন-দুনিয়ার যিনি—
দুয়েরি কসম, করিনি কসুর!—দুয়েরেই আমি চিনি।
জল্লাদ আমি নহি যে শুধুই, আমারও ইমান আছে।
হালাল হারাম দুই যদি এক হইত আমার কাছে,—
যদি সে নিমকহারামির ভয় না রহিত এতটুক,
তোমার হুকুমে পাষাণে বাঁধিতে পারিতাম এই বুক!
খোদা রহমান, তাঁরো রহমতে আর দাবি নাই মোর,
দাঁড়াব সম্মুখে হাঁটু-জোড় করি—হারায়েছি সেই জোর।
তামিল করেছি হুকুম তোমারি—তোমারে করেছি ভয়,
খোদার বান্দা বেইমান বটে, তোমার বান্দা নয়।
দারা শাহ্‌জাদা—শিরায় তাহার তোমারি রক্ত বহে,
শির নেওয়া তার অপরাধ নয়—বে-ইজ্জত সে নহে!
কাটা মুণ্ডটা ছুড়ে' ছিঁড়ে গেছে, লাগিয়াছে ধুলা-মাটি,
তাই দেখে বুক বিদরে তোমার (বুকখানা বড় খাঁটি!)
শুধু ফাটিবে না আমারি এ বুক ; মানুষ নহি তো—অসি!
তবু সে তোমার মুঠিতেই বাঁধা, কেন কর তা'য় দোষী?

(আরংজীবের ক্রোধ বাড়িতেছে দেখিয়া)

গোস্তাখি মাফ কর খোদাবন্দ! ভাবিনি একথা আগে,
ভেবেছিনু এই মুণ্ডের লাগি' প্রভু মোর রাত জাগে।
ধুয়ে সাফ করে' আনিতে সময় যেটুকু লাগিত, সেও
পলকে প্রহর হ'ত যে তোমার—মোর চেয়ে জানে কেহ?
তবু দেরী হল, ক্ষমা চাই তারি—আর যাহা অপরাধ
তার লাগি' গালি দিও না আমারে, আমি যে গো জল্লাদ!
মুণ্ডটা দেখো ভাল করে' চেয়ে—নহে ও কি শা'জাদার?
ভুল করিনি তো? করে' থাকি যদি চাহিব না মাফ তার!

আরংজীব

জবান দেখি যে বড় বে-দুরস্ত—হয়েছিস দেওয়ানা?
মুণ্ড কাহার শুনিতে চাহি না—ধুইলেই যাবে জানা।
তুই জল্লাদ, আমি চাই তোর কাজের কৈফিয়ৎ—
দারা শাহজাদা—তার মুণ্ডের করিলি বে-ইজ্জত!

নাজির খাঁ

সে কৈফিয়ৎ চেয়ো না তুমিও, বান্দারে দয়া কর—
ভুলিবারে দাও, বুক যে আবার কেঁপে ওঠে থর থর।
আল্লার চোখ পারিনি ঢাকিতে—ঢেকেছিনু মোর চোখ,
সে চোখ খুলিতে বোলো না, বোলো না—গোস্তাখি মাফ হোক্।

আরংজীব

আরে বুজরুক! বুজরুকি রাখ! কথার জবাব চাই—
আমি চেয়েছিনু শিরটাই শুধু, এ তো আমি চাহি নাই।

নাজির খাঁ

হারে জল্লাদ! আল্লা, মানুষ—কাহারে করিস ভয়?
দিল্ সাথে তোর এক্কি দিল্ লাগি —এখনও শরম হয়?
কাহারে ভুলাবি ওরে ও মূর্খ! জল্লাদপনা তোর
সাধ মিটায়েছে কাল রাতে, সে কি মানিবি না খুন-চোর!
ছুরীর ফলকে ঝলকে-ঝলক রক্তের ফোয়ারায়
অট্টহাসির তুফান তুলেছি—খোদা চেয়ে ছিল ঠায়!
জানিতে চাহ কি জাঁহাপনা, এই নফরের কেরামতি?
—রহিবে না রোষ—দেখিবে যখন এতটুকু গাফিলতি
করেনি বান্দা ; গোনা হয়ে থাকে মনিব সহিবে কেন?
আলমগীরের নফর আমি যে, সে-কথা ভুলিনে যেন।

(একটু থামিয়া)

আলোয় আকাশ উঠেছে ভরিয়া, আমি যে আঁধার চাই!
রাত্রির তারা সেও সহিবে না—সেটুকুও রোশনাই।
বন্ধ করিনি ঝরোকা কপাট, তুমি শুধু চেয়ে থাকো,
ঐ আঁখি দুটা—উহার আলোকে ভয় আর পাব নাকো।
বন্দীশালায় দারার কক্ষে প্রবেশ করিনু যবে,
এমনই আঁধার, স্তব্ধ রাত্রি, দুই পহরই সে হবে।

এক কোণে শুধু মিটি মিটি জ্বলে, ক্ষুদ্র দীপের শিখা,
তাহারই আলোকে দারা লিখিতেছে কি জানি কিসের লিখা।
একপাশে তার ছেঁড়া কাঁথা 'পরে শুয়ে আছে শিপাহার,
আমারে দেখিয়া বুঝিল তখনি—সে কি তার চীৎকার!
সিপাহী দু'জন হাত পা বাঁধিয়া বাহিরে লইল তারে,
ফিরিয়া চাহিতে হেরিনু কী মুখ!—আঁকা সে কি হাহাকারে!
হা হা, হা হা, ধ্বনি শুনি, তবু সেই মুখে নাই কোন রব,
কি দেখিতে কি যে দেখিলাম! ঘুরে গেল সেই মতলব।
এয় খোদা! ওকি মানুষের মুখ!—দেয়ালের মত শাদা।
চেয়ে আছে—তবু চাহনি কোথায়? এই দারা, শাহজাদা!
সহসা শুনিনু, কে যেন কোথায় ডেকে বলে, "সাবধান!
রক্ত উহাতে কিছু নাই আর, হয়ে গেছে কোরবান—
আল্লার ছুরী জবেহ করেছে—বক্‌রি ও সব-সেরা!
বদ্-নসীবের সব লাঞ্ছনা—খুন সে কলিজা-ছেঁড়া—
নিঃশেষ করে' নিয়েছে নিঙাড়ি' ; আর কেহ ওর পরে
এত সহিবে না, ও যে সহিয়াছে সব মানুষের তরে।"
শুধু একবার—

আরংজীব

এ জবান তুই শিখেছিস্ কোন্ খানে?
জিব্‌খানা টেনে ছিঁড়ে ফেল্ তোর! যা বলিলি তার মানে
বুঝেছিস্ নিজে? না-পাক্! হারাম!— তুই না মুসলমান!—
দারারে আল্লা সবার বদলে লইয়াছে কোরবান্!
হেন কথা তুই শিখিলি কোথায়—খাঁটি এ কোরেস্তানী?
দারা নিজে বুঝি দিয়ে গেছে তোরে তার সেই বেঈমানি?
ফের যদি তুই আমার সমুখে করিবি বদ্ জবান,
নিজ হাতে এই তলোয়ারে আমি নিব তোর গর্দান।

নাজির খাঁ

দোহাই তোমার, আলা হজরত্! মাফ্ কর গোস্তাখি ;
কি বলিতে কি যে বলে' ফেলি আমি, বুঝি নাকো, চেয়ে থাকি।
সে সময়ে তবে বুকের ভিতরে শয়তান নিশ্চয়
করেছিল বাসা—বুঝিনু, সে মুখ দারার কখনো নয়!

ঝাপটে তখনি বাতিটা নিবানু, হেরিনু অন্ধকারে
জ্বলে ওই আঁখি—আগুনের ফোঁটা!—নিবাতে নারিনু তারে।
এক লাফে ধরি' গর্দান শেষে ঠাহর মেলে না আর—
জড়াইয়া যায় দাড়ি আর চুলে কণ্ঠনালীর হাড়।
হঠাৎ কেমনে খঞ্জরখানা হাত হ'তে গেল ছুটে' ;
হাতাড়িতে গিয়ে আর একখানা আসিল আমার মুঠে।
ছোরা নয়—ছুরী, কলম কাটিতে দারা রেখেছিল বুঝি,
তাই দিয়ে জোরে গর্দানে টান দিনু শেষে সোজাসুজি।
বসিল না তবু, পিছলিয়া আসে, মুখ ঘসে যায় ভুঁয়ে,—
একটি আওয়াজ করিল না তবু, ঘাড় গেছে ভেঙে নুয়ে।
খুনের ফিন্‌কি সারা দেহময়, কণ্ঠ হয়েছে ফুটা,
তবু সাড়া নাই, শুধু দেহখানা যেন সে লোহার খুঁটা!
কলম-কাটা সে ভোঁতা ছুরীখানা হানিতেছি বার বার—
আর সে বাহিরে ছেলেটার সেকি বুক-ফাটা চীৎকার!
তারি মাঝে, যেন পাগলের মত হাঁটু দিয়ে তার বুকে,
মাথাটা ছিঁড়িতে মেঝের উপরে কতবার গেল ঠুকে'।
হাতে করে' নিয়ে ছুটে বাহিরিতে দেখি সে আরেক বাধা,
ঘরের দুয়ারে ছেলেটা লুটায়—বেহোঁশ, হাত-পা-বাঁধা,
ভাবিনু তাহারো যাতনা জুড়াই—হুকুম ছিল না জানি,
খুন-মাখা হাত ছাড়িবে না তবু করিতে মেহেরবানি।
কাটা-মুণ্ডটা ফেলিনু মাটিতে—চাহি' লয়ে তরবার
তুলিনু যেমনি, চোখ মেলে পুন চাহিল যে শিপাহার।
তলোয়ার ফেলে, মুণ্ডটা শুধু চুলের মুঠিতে ধরি'
পলাইয়া এনু ; ছেলেটারে তারা রাখিল বন্ধ করি'
সেই ঘরে, যেথা দারার দেহটা রক্তে ভাসিয়া আছে,
পুত্র পিতার ধড়খানা ল'য়ে বাকি রাত জাগিয়াছে!
সারা পথ আর ভাবি নাই কিছু ; তবুও ভুলিনি, প্রভু!
তুমি জেগে আছ, ঐ দু'টা চোখে পলক পড়েনি কভু।
দারা শাহজাদা—তার ইজ্জত্ রাখিতে পারিনি বটে,
তোমার হুকুম তামিল করেছি, কহিনু তা অকপটে।

আরংজীব

বুঝিলাম, যত বেইমান তুই, বে-অকুফ তার বেশি,
শয়তান সাথে লড়াই করিয়া, জিতেছিলি শেষাশেষি।
ঘুচেছে তো ভয়, এইবার তবে খুলে দে জান্‌লাগুলা।
ওটারে এখনি সাফ করে' আন্ মুছায়ে ময়লা-ধুলা।

ঢাকা দিবি এই জরীর কাপড়ে, করিবি না তাড়াতাড়ি,
দেখিস, এবার ঠিক থাকে যেন ও মুখের চুল-দাড়ি।

(মুণ্ড লইয়া নাজিরের প্রস্থান)
(জানু পাতিয়া)

বান্দা তোমার বুজদিল্ নয়—তুমি জানো, তুমি জানো!
দিল্ যদি টলে এতটুকু, তবে বজ্র তাহাতে হানো।
দারা দুষমন আমারও—কেননা, তোমারি সে দুষমন,
কাফেরের সাথে কেরেস্তানিতে সঁপেছিল প্রাণমন।
তোমার আদেশ—শ্রেষ্ঠ সে বাণী—কোরাণের তৌহিদ্
বরবাদ্ করে' বুত্‌পরস্তি করিবারে তার জিদ।
সেই দারা চায় তখ্‌ত-তাউস্! ইসলামে করি নাশ
আকবর-শাহা চেয়েছিল যাহা—পূরাইতে সেই আশ।
ভাবিতেও সে-যে শিহরিয়া উঠি ; মন বলে, না-না—না-না!
বাদশাহি নয়—তোমারি হাতের পেয়েছি এ পরোয়ানা,
হিন্দুস্থানে কাফেরের ডেরা বিলকুল ভাঙা চাই!—
তখ্‌তে বসিয়া মোগলেরা কেহ সেই কথা ভাবে নাই।
আমি করিয়াছি জীবনের সার-মন্ত্র, 'লা-ইল্লাহা'
সে যে 'লা-শরীফ'—আর কিছু তরে করি যদি 'আহা, আহা'!
তবে সেই 'এক'—সেই আহদের খেলাপ হবে যে তায়,—
নিষ্ফল হবে মক্কা হইতে ছুটে আসা মদিনায়!
হোক ভাই, হোক পুত্র কি পিতা, তোমা-চেয়ে কেহ প্রিয়?
ছুরী দিয়ে তুমি কলিজায় মোর এই কথা লিখে দিও!
খোদার বান্দা নহে যেই জন, এনসান তারে কহে?
সাপ, বাঘ, আর ক্ষ্যাপা শিয়ালের মারিতে কে করে শোক?
মানুষের রূপ ধরে যদি তারা, আরো সে যে ভয়ানক!
দারা বেইমান, কাফেরের রাজা।—হিন্দু, কেরেস্তান!
আমি মরি নাই, তোমারি গজবে হারায়েছে তার প্রাণ।
তবু আফসোস নাই যদি ছাড়ে, দিল্‌টারে ছিঁড়ে নাও!
নাও ছিঁড়ে নাও, মারো শয়তানে, বান্দারে বল দাও!

(পদশব্দ শুনিয়া পূর্বের ভাব-ধারণ ; নাজিরের পুনঃপ্রবেশ)

এইখানে রাখ্, ঝালর-ঝুলানো রূপার কুর্সি 'পরে ;
খুলে দে কাফন, কুর্ণিশ কর্।—ফের বেয়াদপি করে!...

সেই মুখই বটে, তবু সোবে হয়, যায় নাকো ঠিক চেনা ;
দেখি চোক দু'টা,—বুজে আছে কেন? ভাল করে' খুলে দে না!
থাক্ থাক্! তুই ছুঁস্ না উহারে—করে' দাঁড়া কুক্কুর!

(তরবারি খুলিয়া)

—তবুও হ'লি না দূর!

নাজির খাঁ

বান্দা হাজির রবে যে হুজুর! এখনো বলনি তুমি,
দারারই মুণ্ড আনিয়াছি কিনা ; তার পর মাটি চুমি'
শেষ কুর্ণিশ করিব তোমারে, তার আগে ছুটি নাই।

আরংজীব

ঠিক্ ঠিক্। তুমি হুঁশিয়ার বটে—ইনামটাও যে চাই!

(তরবারির মুখ দিয়া দারার দুই চোখ একে-একে খুলিয়া দেখার পর)

আছে বটে,—আছে!—শাদার উপরে ছোট সেই কালো দাগ।

নাজির খাঁ

(কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে অস্ফুটস্বরে)

এবার চলিনু, গরিবেরে 'পরে আর করিও না রাগ।
চাই না ইনাম, তোমাকেই দিনু দিল্লীর ঐ তখ্‌ত—
এই জল্লাদ—এই নাজিরের নজরানা।

আরংজীব

(দারার ছিন্নমুণ্ডের পানে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া)

বদ্‌বখ্‌ত!

১৩৬০

প্রেম ও কর্মফল[১]

যে নিয়েছে হরি-নাম মৃত্যু তারে নাকি
নাহি ধরে? যে করেছে সন্ন্যাস গ্রহণ
কর্ম-ক্ষয় লাগি, সে-ও সমাজ শাসন
নাহি মানে,—বিধি-নিষেধেরে দূরে রাখি'
সংসারে স্বাধীন সে যে নিঃসঙ্গ একাকী!
ভক্ত যেই, তার তরে নিজে নারায়ণ
খুলিছেন একে একে সকল বন্ধন ;
জ্ঞানী আত্মবলে দেয় নিয়তিরে ফাঁকি।

প্রেমের প্রব্রজ্যা শুধু কেবলই বৃথায়?
সে যে মহাশক্তি-মন্ত্র মুক্তি সাধনায়—
সারা জন্ম কেঁদে-হাসা, হো-হো-হাহাকার!
আনন্দ-মন্থন সে যে মহা বেদনায়!

প্রেমে কর্মফল ত্যাগ, নাশ মমতার ;
সৃষ্টি প্রেমে—ফলভোগ স্রষ্টার কোথায়?

১. 'ছন্দ-চতুর্দশী'র একই নামের কবিতার পাঠান্তর

শেষ গান

১

ঘুমাইতে চাহি আমি স্বপ্নহীন অচৈতন্য-সুখে—
দেহে আছে প্রাণ, তবু প্রাণের সে দুরন্ত দহন
নাহি আর ; কৃতাঞ্জলি দুই হাত রাখি মোর বুকে
নয়ন মুদিয়া আছি—নদীস্রোতে শবের মতন!
অধরে নাহি সে হাসি, যে-হাসির দুরন্ত উচ্ছ্বাসে
দেবতা বিস্ময় মানি' ভেবেছিল—যেন বিষ-মধু

কেমনে মাতাল করে! যেই ধূমে আঁধার মশান
তাহারি কাজলে আঁখি উজলিয়া লয় বরবধূ!
নাই সেই অশ্রু-মেঘ এ-প্রাণের প্রাবৃট্-আকাশে
যার 'পরে একদিন দিক হতে দিগন্ত সকাশে
গড়েছিনু ইন্দ্রধনু! আজ আমি নিস্পন্দ পাষাণ!

২

তরী মোর ছিল না যে তীরে বাঁধা, এপার ওপার–
আছিল সমান দুই-ই জলযাত্রী পথিকের চোখে।
জন্মেছিনু যেই তীরে সেথা জন্ম-ভবন-দুয়ার
খুলিয়া বাহিরি' এনু ভুবনের অসীম আলোকে।
স্থলে বাধা পদে পদে, চলা তবু মানে না বারণ,
প্রখর দিনের দাহ, প্রাণ উষ্ণ দেহের কটাহে;
নিম্নে হেরি নির্বাপিয়া চিন্তাবহ্নি বহিছে জাহ্নবী!
ঝাঁপ দিনু হরজটা-ভ্রষ্ট সেই শীতল প্রবাহে।
জুড়াইল জ্বর জ্বালা, তার পর শীত-শিহরণ ;
তারো পরে হিম-তনু, ধীরে ধীরে চেতনা-হরণ ;
এইবার মুছে যাবে স্বপনের তারা-শশী-রবি।

গ্রন্থ-পরিচয়, কবিতা-সূচি
ও রচনাপঞ্জি

গ্রন্থ-পরিচয় ও কবিতা-সূচি

দেবেন্দ্র-মঙ্গল

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ দেবেন্দ্র-মঙ্গল প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে। প্রকাশক ও প্রণেতা : 'শ্রীমোহিতমোহন মজুমদার'—প্রিন্টার : শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স। ৩৪নং মেছুয়াবাজার স্ট্রিট। কলকাতা। ১লা কার্তিক, ১৩১৯।
বইটিতে মোট ১৬টি সনেট ছিল—কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের উদ্দেশে রচিত। বইটি দ্বিতীয়বার আর প্রকাশিত হয় নি। শুধু ১২ সংখ্যক সনেটটি পরবর্তী গ্রন্থ 'স্বপন-পসারী'তে গৃহীত হয় 'দেবেন্দ্রনাথের সনেট' নামে। পরে কবির 'ছন্দ-চতুর্দশী' গ্রন্থে এই কবিতাটিই প্রবেশক-কবিতা। আমরা এই কাব্যসংগ্রহে কবিতাটিকে পরবর্তী দুটি কাব্যে নয়, তার প্রথম প্রকাশ-স্থলেই সন্নিবেশিত করেছি। দেবেন্দ্র-মঙ্গল বইটিতে কবিতাগুলির কোনো নাম ছিল না—সংখ্যা অনুসারে সজ্জিত। নিচে তাই সেই-সংখ্যাগুলির সঙ্গে প্রথম পঙ্‌ক্তির সূচি প্রদত্ত হল।

স্বপন-পসারী

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। প্রকাশক : শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত; ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে শ্রীকালাচাঁদ দালাল-কর্তৃক মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণে মোট ৪৩টি কবিতা ছিল— দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে একটি প্রবেশক কবিতা এবং সেইসঙ্গে আরও ৭টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। 'স্বপন-পসারী'র কবিতা-সূচি নিচে দেওয়া হল। তারকা-চিহ্নিত কবিতাগুলি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিস্মরণী

কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। প্রকাশক : প্রবাসী কার্যালয়, কলিকাতা ; ৯১ আপার সার্কুলার রোড। প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৩৩। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বহুকাল পরে ১৩৫২ সালে। কিন্তু অল্পদিনেই সেই সংস্করণ নিঃশেষ হওয়াতে পরের বৎসরই ১৩৫৩ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে একটি প্রবেশক কবিতা এবং তৎসঙ্গে ২৫টি কবিতা ছিল—পরে আর কোনো নতুন কবিতা সংযোজিত হয় নি।

স্মর-গরল

কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'স্মর-গরল' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ; ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। প্রচ্ছদ-চিত্র : শিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়-পরিকল্পিত। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। বইটিতে একটি প্রবেশক কবিতা, ২২টি সাধারণ কবিতা এবং ১৮টি সনেট অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন সংস্করণে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত ২২টি সাধারণ কবিতার অন্যতম 'প্রেম ও ফুল' কবিতাটি দুটি পর্বে বিভক্ত কয়েকটি কবিতার সমাহার।

হেমন্ত-গোধূলি

কবির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। প্রকাশক : শ্রী অজিত শ্রীমানী ; নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫।৭ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল-কর্তৃক মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৪৮ সাল। এই গ্রন্থে একটি প্রবেশক কবিতা, ৩৯টি সাধারণ কবিতা এবং আরও একটি প্রবেশক কবিতা-সহ ৪৭টি বিদেশী কবিতার অনুসরণে রচিত কবিতা সন্নিবেশিত হয়।

বিদেশী কবিতা

রূপকথা

কবির ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'রূপকথা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ; জেনারেল প্রিন্টার্স : অ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ, মুদ্রণ বিভাগে : অবিনাশ প্রেস, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৫৩ অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল। বইটিতে অন্তর্ভুক্ত তিনটি কবিতা পূর্বে প্রকাশিত অন্য গ্রন্থে ছিল ('রূপকথা'—হেমন্ত-গোধূলি ; 'শিউলির বিয়ে'—বিস্মরণী এবং 'ঘুমপাড়ানি' কবিতাটি 'নিদালি' নামে হেমন্ত-গোধূলি'তে)। সেই কবিতাগুলি এই গ্রন্থে বর্জিত এবং নিম্নবর্তী সূচিতে পূর্ববর্তী গ্রন্থের উল্লেখসহ তারকা-চিহ্নিত হল। এই তিনটি ব্যতীত একটি প্রবেশক কবিতা এবং আরও ১২টি কবিতা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

ছন্দ-চতুর্দশী

কবির সপ্তম ও সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'ছন্দ-চর্তুদশী' বিশেষ ভাবে সনেট-সংকলন। প্রকাশকাল ১৯৫১। প্রকাশক : শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রণ : অবিনাশ প্রেস, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৫৮। বইটিতে প্রবেশক কবিতা হিসাবে দেবেন্দ্র-মঙ্গল-এর অন্তর্ভুক্ত ১২ সংখ্যক কবিতাটি (পরে 'স্বপন-পসারী'তে 'দেবেন্দ্রনাথের সনেট' নামে গৃহীত) এবং পূর্ব-পূর্ব কাব্যগুলিতে অন্তর্ভুক্ত আরও ৪১টি সনেট এই গ্রন্থে পুনরায় সংকলিত হয়।— সেইসঙ্গে আরও ১৩টি নতুন সনেট এই গ্রন্থে সংগৃহীত। নিম্নবর্তী সূচিতে এবং সেগুলি যে-যে গ্রন্থের অন্তর্গত তা উল্লিখিত হল।

অগ্রন্থিত কবিতা

কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত সাতটি কাব্যগ্রন্থের বাইরে আরও অনেক ছোটো-বড়ো কবিতা ছিল—সেগুলি তিনি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। নানা পত্র-পত্রিকা সন্ধান করে এবং বিভিন্ন সূত্রে আমরা তাদের মধ্যে নিম্নবর্তী ৪৭টি মাত্র কবিতা সংগ্রহ করতে পেরেছি। পত্রিকার প্রকাশকাল অনুক্রমে আমরা সেগুলি বিন্যস্ত করেছি। বাল বাহুল্য, আরও অনেক কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এবং কবির অনুরাগীদের কাছে থাকা সম্ভব।

রচনা ও গ্রন্থপঞ্জি

কাব্য :

১. দেবেন্দ্র-মঙ্গল। প্রথম প্রকাশ ১৩১৯, ১লা কার্তিক। ষোলটি সনেট।
২. স্বপন-পসারী। প্রথম প্রকাশ শ্রীপঞ্চমী ১৩২৮। উৎসর্গ—তোমাকে।
৩. বিস্মরণী। প্রথম প্রকাশ শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৩। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিবরেষু।
৪. স্মর-গরল। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, বন্ধুবরেষু।
৫. হেমন্ত-গোধূলি। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৪৮। উৎসর্গ—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে।
৬. রূপকথা। কিশোর কাব্য, প্রথম প্রকাশ ১৩৫২। উৎসর্গ—অমিয়া ও অরুণা।
৭. ছন্দ-চতুর্দশী। ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৮। উৎসর্গ—কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন স্মরণে।
৮. মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা। ১ম প্রকাশ ৭ই আষাঢ় ১৩৬৩। ভূমিকা—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
৯. মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ড° ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত। ১ম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৬, মার্চ ১৯৭০।

নিবন্ধ ও সমালোচনা :

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ১ম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৪৩। উৎসর্গ—স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণোদ্দেশে।
২. সাহিত্য-কথা। ১ম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। উৎসর্গ—শ্রীমান সজনীকান্ত দাসের করকমলে।
৩. বিবিধ কথা। ১ম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৮। উৎসর্গ—সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিক স্বর্গত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে।
৪. বিচিত্র কথা। ১ম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৮। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় সহৃদ্বরেষু।
৫. সাহিত্য-বিতান। ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৯। উৎসর্গ—সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিক স্বর্গত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে।
৬. বাংলা কবিতার ছন্দ। ১ম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫২। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু সোদরপ্রতিমেষু।
৭ বাংলার নবযুগ। ১ম প্রকাশ শ্রীপঞ্চমী ১৩৫২। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অচলপ্রতিষ্ঠেষু।
৮. জয়তু নেতাজী। ১ম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩। উৎসর্গ—নেতাজীর পরম প্রিয়, পরমাত্মীয় ভারতের সর্বজাতি ও সর্ব সম্প্রদায়ের স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্দেশ্যে।

৯. কবি শ্রীমধুসূদন। ১ম প্রকাশ ১৬ই কার্তিক ১৩৫৪। উৎসর্গ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের করকমলে স্নেহ-উপহার।
১০. সাহিত্য-বিচার। ১ম প্রকাশ ১৩৫৪। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভিন্নহৃদয়েষু।
১১. বঙ্কিম-বরণ। ১ম প্রকাশ ১৬ই কার্তিক ১৩৫৬। উৎসর্গ—শ্রীমান মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী কল্যাণীয়েষু।
১২. রবি-প্রদক্ষিণ। ১ম প্রকাশ পৌষ ১৩৫৬। উৎসর্গ—কল্যাণীয় শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য করকমলেষু।
১৩. জীবন-জিজ্ঞাসা। ১ম প্রকাশ ২৮শে আষাঢ় ১৩৫৮। উৎসর্গ—শ্রীমান ভূমীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু।
১৪. শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র। ১ম প্রকাশ জন্মাষ্টমী ১৩৫৭। উৎসর্গ—শরৎচন্দ্রকে (কবিতায়)।
১৫. বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি। ১ম প্রকাশ ১৯৫১ (১৩৫৮)।
১৬. বাংলা ও বাঙালী। ১ম প্রকাশ ১৩৫৮। উৎসর্গ—কাব্যানুরাগী ও কবিবৎসল কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায় সুহৃত্তমেষু।
১৭. কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য। ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড। ১ম প্রকাশ যথাক্রমে ১৩৫৯ ও ১৩৬০। উৎসর্গ—কবিগুরুর এক প্রাচীন শিষ্য ও মুক্ত-সঙ্ঘ ভক্তের সাত্ত্বিক ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ এই গ্রন্থ বঙ্গের বাণী-মন্দিরে রবীন্দ্র-পূজায় নিবেদিত হইল।
১৮. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৫৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ভূমিকা : ড° শ্রীকুমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯. বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ১ম প্রকাশ মাঘ ১৩৬৯।

অনুবাদ :

১. বিদেশী ছোটগল্প সঞ্চয়ন। ১ম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৭। উৎসর্গ—খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অশেষ প্রীতিভাজনেষু।
২. বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন। ১ম প্রকাশ কার্তিক ১৩৫৯। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দী বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। তাঁর ভূমিকা থেকে জানা যায় 'একবক্তার বৈঠক' বঙ্গ ভারতীতে এবং বাকী প্রবন্ধগুলি ১৩৫৪ হতে ১৩৫৬ সালের মধ্যে নব পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল।

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ :

১. বঙ্কিম স্মৃতি (শ্রীশচন্দ্র দাস সহযোগে) ১৩৪৬। ঢাকা বঙ্কিম শতবার্ষিকী-সমিতির পক্ষ হতে প্রকাশিত।
২. কাব্য-মঞ্জুষা। ১ম প্রকাশ ১৩৪৯।
৩. কাব্য-মঞ্জুষা। ছাত্রপাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৫৭
৪. অভয়ের কথা (ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), ১ম প্রকাশ পৌষ ১৩৫৪।
৫. দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), বিশেষ সংস্করণ— ১৯৪৭।

৬. কপালকুণ্ডলা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।
৭. কাব্য-চয়নিকা (দেবেন্দ্রনাথ সেন), ১ম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৬৬।
৮. কাব্য-চয়নিকা (অক্ষয়কুমার বড়াল), ১ম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৬৬।

গ্রন্থাবলী :

১. মোহিতলাল কাব্য সম্ভার, ১ম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৭।

সম্পাদিত পত্রিকা :

১. বঙ্গদর্শন (তৃতীয় পর্যায়—মাসিক)। শ্রাবণ ১৩৫৪, শারদীয় ১৩৫৬।
২. বঙ্গভারতী (মাসিক) ১৩৫৯ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

পত্রগুচ্ছ।

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, আজহারউদ্দীন খান্ ও ভবতোষ দত্ত সংকলিত ও সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৬, ইং ১৯৬৯। উৎসর্গ—অধ্যাপক তারাচরণ বসুর স্মৃতিতে।

মোহিতলাল মেমোরিয়াল সোসাইটির পক্ষে শ্রী চিত্ত মিশ্র-সম্পাদিত 'কবি মোহিতলাল-সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা'র মে ১৯৮৬ সংখ্যা থেকে প্রাপ্ত।